তাফসীরে সাঈদী
সূরা আল-আসর
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

تـفـسـيـر سـعـيـدى

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল আসর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

تَفْسِيْرِ سَعِيْدِيْ

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল আসর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

কোরআন, হাদীস, দর্শন, ইতিহাস ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের অতুলনীয় সমাবেশ ঘটেছে সূরা আল-আসর-এর এই তাফসীরে। প্রতি বছর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বন্দর নগরী চট্টগ্রামে। ১৯৯৮ সনে উক্ত তাফসীর মাহফিলে সূরা আল-আসর-এর তাফসীর শুনে ৩৪ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে সাঈদী– সূরা আল আসর
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
পঞ্চম প্রকাশ ঃ ২০০৮ নভেম্বর
প্রথম প্রকাশ–২০০৩ জানুয়ারী
প্রচ্ছদঃ মাসউদ সাঈদী
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রচ্ছদ ঃ মাসুদ সাঈদী
মুদ্রণে ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা–১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ৪০০/- টাকা

Tafsir-e-Sayedee- Sura Al-Asar
Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global publishing network
66 Paridhash Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Fifth Edition 2008-November
First Edition 2003- January
Price : Tk. Four hundred only
Twenty Doller (U.S) Only
Fifteen Pound Only

ভূমিকা

মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচ্য সূরায় যে চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কোন্ পথ অবলম্বন করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ পৃথিবী ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে, সে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তিনি সে পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সফলতা ও ব্যর্থতার পথ মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, আর কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের এই উভয় জগতের জীবন সাফল্যমন্ডিত হবে। আলোচ্য সূরা আসরে মানুষের স্রষ্টা, মানুষের সফল জীবনে উত্তম প্রতিদান দেয়ার মালিক এবং ব্যর্থ জীবনে অশুভ পরিণতি ভোগ করানোর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো ব্যক্তি বিশেষকে, কোনো দল-গোষ্ঠীকে বা কোনো বিশেষ দেশের মানুষকে লক্ষ্য করা এ কথা বলা হয়নি যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। বরং 'ইনসান' শব্দ ব্যবহার করে গোটা মানবমন্ডলীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তারা মহাক্ষতিতে নিমজ্জিত। সমস্ত মানুষ ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবমান।

এতটুকু বক্তব্য পেশ করে মানবমন্ডলীকে হতাশার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করা হয়নি। সাথে সাথে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে এবং কোন্ কাজসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করলে মানুষ সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় হবে, তা আলোচ্য সূরা আসরে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, মানুষকে ঈমান আনতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন, তেমনভাবে ঈমান আনতে হবে। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, শুধু ঈমান আনলেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা যাবে না। সেই সাথে ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল পৃথিবীতে জীবন-যাপনের লক্ষ্যে যে বিধান পেশ করেছেন, সেই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঈমান এনে ও আমলে সালেহ্ করে যে ব্যক্তি মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বার্থপরের মতো নিজেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে না, অন্য মানুষকেও মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে। অর্থাৎ যে জীবন ব্যবস্থা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করলে মহাক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে এবং সফলতা অর্জিত হবে বলে সে বিশ্বাস করে তা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করছে, সেই জীবনাদর্শ অনুসরণ করার জন্য অন্য মানুষকেও আহ্বান জানাবে। যার ভেতরে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে, তা মানুষ সমাজে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে সদাতৎপর থাকবে।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার ও সফলতা অর্জন করার চতুর্থ বিষয়টি হলো, 'হক' অনুসরণ করতে গিয়ে এবং 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট, বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্মুখে আসবে তার মোকাবেলায় সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ তথা 'সবর' অবলম্বন করতে হবে, 'হক'-এর পথে অটল-অবিচল থাকতে হবে, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে মন্‌যিলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর নামই হলো ধৈর্য। এই চারটি কাজ বিশ্বস্ততার সাথে আঞ্জাম দিতে পারলেই মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা অর্জন করা যাবে এবং এই চারটি কথাই আলোচ্য সূরা আসরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন। প্রত্যেক যুগে যাঁরা সফলতার পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁরাও এই চারটি কাজকে জীবনের অন্য সকল কাজের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই চারটি কাজ যারা সফলভাবে করতে পেরেছেন, তাঁরাই মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টির আওতায় এসেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন।

আল্লাহর কোরআনের গবেষকগণ বলেছেন, মানুষ যদি সূরা আসর সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এই সূরাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলেই তাঁরা একে অপরকে এই সূরাটি তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং একে অপরকে এই সূরা না শুনিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেন না। এই সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে ভাবের এক মহাসমুদ্র প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরার ভেতরে মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেন ক্ষুদ্র ঝিনুকের মধ্যে একটি মহাসমুদ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এই সূরার তাফসীর করে শেষ করা যাবে না। পুনরায় চিরসত্য সেই কথাটি উল্লেখ করছি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার পদ এবং অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হবার অর্থ সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতার অর্থ হলো, আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণকে নিজ চরিত্রের অলঙ্কারে পরিণত করা। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বুদ্ধিমত্তার সাথে অতিক্রম করে নিজেকে মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়ে তোলার নামই হলো সফলতা।

বস্তুত এই সূরায় বিবৃত চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, যে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ-লুন্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতন-নিষ্পেষন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণমুক্ত ভীতিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সূরা আসরের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফিক এনায়েত করুন।

ময়দানের বক্তব্য বহুলাংশে ময়দানেই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আলোচিত বিষয় স্থায়ীভাবে পৌছে দেয়ার মানসে শব্দধারণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে বর্ণমালায় সুন্দর ও সুপাঠ্য করে সাজিয়েছে আমার সন্তানতুল্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক আব্দুস সালাম মিতুল। শুধু শব্দ ধারণ যন্ত্রের সাহায্যই নয়-সে আমাকে ছায়ার মতোই অনুসরণ করে আমার সফর সঙ্গী হিসাবে আমার পাশে অবস্থান করে আমার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহন করে পান্ডুলিপি রচনা করেছে এবং পরবর্তীতে আমি প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করেছি।

আমার নিদারুণ ব্যস্ততা, দেশে অনুপস্থিতি ও সময়ের স্বল্পতার কারণে এই বিশাল গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের প্রতি যতটা যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। এ কারণে মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোনো তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তা আমাকে জানানোর জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করছি। সুতরাং, ভুল-ত্রুটি সংশোধনে যে কোন পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণীয়। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ। অনুলিখক এবং প্রকাশকসহ গ্রন্থটির সাথে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যতটুকু যোগ থাক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল সবাইকে দান করুন এর উত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

সূচীপত্র

ঈমান

আমলে সালেহ্

'হক'–এর দাওয়াত

ধৈর্য বা ‘সবর’

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ ط اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ
وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ط اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ
مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّيْلِ
وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আল্লাহ! আমায় কবরে আমার একাকীত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে
কোরআনের আলো দিয়ে প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ! কোরআন দিয়ে
তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম,
নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা
কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু
আমি–আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তার জ্ঞান তুমি
আমায় প্রদান করো, তুমি আমাকে দিবানিশি এর
তিলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের
মালিক! তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে
চূড়ান্ত দলিল বানিয়ে দিয়ো।
আমীন ! আমীন !!

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার প্রতিপালক আমাকে নয়টি কাজের হুকুম দিয়েছেন, আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষা অনসন্ধিৎসু হয়। আমার নীরবতা যেন চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। আমার কথাবার্তা যেন আল্লাহর স্মরণমূলক হয়। ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় যেন ইনসাফের কথা বলি। যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে যেন আমি দান করি। আমার উপর যে জুলুম করে তাকে যেন আমি ক্ষমা করি। যে আমার থেকে সরে গেছে তাকে যেন আমি জুড়ে নেই। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং দারিদ্র ও প্রাচুর্য যে কোনো অবস্থায়ই যেন আমি সততা ও মধ্যপন্থার ওপর থাকি। (মিশকাত)

কোরআন ও আপনার ঘর

আপনার এই ঘরে কি রীতিমতো কোরআন পড়া হয়?
এই ঘরে বয়স্কদের কয়জন আছে যারা কোরআন পড়ে?
এই ঘরের ছেলে-মেয়েদের কি কোরআনের গল্প ও ঘটনা মাঝে মাঝে পড়ে শোনানো হয়?
এই ঘরে কি কোরআনের আয়াত এবং এর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা হয়?
এই ঘরের বয়স্ক ও ছেলে-মেয়েদের কোরআনের কি পরিমাণ অংশ মুখস্থ আছে?
এই ঘরের বয়স্ক ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে কোরআনের অর্থ বোঝে?
এই ঘরে কোরআনের তাফসীর ও কোরআন সম্পর্কিত কোনো বই কি আছে?
এই ঘরের দেয়ালে কোরআনের আয়াত ও অর্থ সম্বলিত কোনো পোষ্টার কি আছে?
এই ঘরের পুরুষ কিংবা নারী কি কোনো কোরআনের মাহফিলে শরীক হয়?
প্রশ্নগুলো একান্তই আপনার জন্যে

وَالْعَصْرِ ۙ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) সময়ের শপথ! (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত আছে), (৩) সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তা'য়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সেই (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

এ সূরার শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ওয়াল আ'সরি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কেও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। অনেকেই বলেছেন, এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক গবেষক ও তাফসীরকার মন্তব্য করেছেন, এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রাথমিককালে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি হতো অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মর্মস্পর্শী। যেন তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে হৃদয় আন্দোলিত হয় এবং প্রবলভাবে মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। শোনার সাথে সাথে তা যেন স্মৃতিপটে চিত্রিত হয়ে যায় এবং ভুলে যেতে চাইলেও যেন ভোলা না যায়। এ জন্য প্রথম দিকে অবতীর্ণকৃত সূরাসমূহ মানুষের মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উচ্চারিত হতো।

ইমাম শাফেয়ী (রাহ) এই সূরাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, মানুষ যদি এই সূরাটি সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূলের সাহাবাদের দৃষ্টিতে এই সূরাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলেই তারা একে অপরকে এই সূরাটি তিলাওয়াত করে শোনাতেন। তাঁরা একে অপরকে এই সূরা না শুনিয়ে বিদায় গ্রহণ করতেন না।

এই সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে ভাবের এক মহাসমুদ্র প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই সূরাটির মূল আলোচিত বিষয় হলো, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি এবং কোন পথে তার ধ্বংস ও বিপর্যয় তা স্পষ্টভাবে এই সূরায় বলে দেয়া হয়েছে। মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরার ভেতরে মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেন ক্ষুদ্র ঝিনুকের মধ্যে একটি মহাসমুদ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এই সূরাটিতে সময়, কাল বা ইতিহাসের শপথ করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বিশেষ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে সমস্ত মানব মন্ডলীর কথা। সমস্ত মানুষ ক্রমশঃ মহাক্ষতির দিকে এবং নিরুদ্দেশের পথে অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান। যে ক্ষতিকর পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে সে পথের শেষে রয়েছে এক মহাধ্বংস গহ্বর। তবে সেইসব লোকগুলো এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাহার ঘটেছে। প্রথম গুণটি হলো ঈমান। দ্বিতীয় গুণটি হলো আমলে সালেহ বা সৎকাজ। তৃতীয় গুণটি হলো মহাসত্যের ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেয়া বা উৎসাহিত করা। চতুর্থ গুণটি হলো, মহাসত্য গ্রহণ করার পরে যে সব পরীক্ষা আসে, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে উৎসাহিত করা।

এখানে প্রশ্ন জাগে, এই কথাগুলো বলার জন্য কেন সময়ের শপথ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ কোন বিষয়ের বা কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অথবা নিশ্চিত করে বলার জন্য মহান আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ যখন কোন বিষয়ের শপথ করে যে কথা বলতে চান, শপথকৃত বিষয়ের সাথে মূল কথার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকে। যে কথাটি তিনি বলতে চান, শপথকৃত উক্ত জিনিস তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তিনি সে বিষয়ের শপথ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরায় কালের শপথ করেছেন। কাল বা সময় অত্যন্ত তীব্র গতিতে মানব জীবনকে জীবনের শেষ প্রান্তে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। এ জন্য সময় মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে যতটুকু সময়কাল নির্ধারণ করেছেন, তার অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও কারো পক্ষে এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানুষ সময়ের যে হিসাব করে, সেই সময় অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যদি ৮০ বছর তিনদিন তিন ঘন্টা তেত্রিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যাবতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চৌত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে পারবে না। মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সময়কাল থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্ধারিত এই সময়ের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

মানব সন্তান শৈশব অতিক্রম করে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের কোঠা ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে, এর অর্থ হলো বদ্ধ কলি থেকে ফুল যেন প্রস্ফুটিত হলো। আর ফুল প্রস্ফুটিত হবার অর্থই হলো এখন সে যে কোন মুহূর্তে ঝরে যাবে। রোদ, বৃষ্টি-ঝড়ে ফুল ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার অর্থই হলো সে এখন ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের সোনালী যৌবনের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, মহাকাল সেই সৌরভ ক্রমশ নিঃশেষে চুষে নেয়। যৌবনের সুষমা, লাবণ্য আর মাধুরীময় আভা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যে সময় মানব জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সে সময় প্রাণান্তকর সাধনার পরেও আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে মহামূল্য সময়। এই সময়ই মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না। নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া বা তার গতি পরিবর্তনও করা যায়, কিন্তু কালের স্রোতের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। অর্থের অপব্যবহার করলে তাকে অমিতব্যায়ী বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় অমিতব্যায়ী হলো সময়ের অপব্যবহার যে করে। কারণ সময় হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর মানুষ এই বড় সম্পদই সবচেয়ে বেশী অপচয় করে থাকে।

আজকের এই নবীন উষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। বর্তমান বলে কিছুই নেই, যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়, অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ-আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, এরই নাম সময়। যে ফুল গভীর নিশীথে ঝরে পড়েছে, তা আর কখনোই ফুটবে না। যে সময় চলে যাচ্ছে মানব জীবনের ওপর দিয়ে, তা আর ফিরে আসবে না।

এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ এই জীবনের সময়কাল অতিদ্রুত ফুরিয়ে আসছে, অথচ সেই সময়কে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা হচ্ছে না। এই জন্যই বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, ব্যতিক্রম শুধু তারাই-যারা জীবনকালকে উল্লেখিত চারটি গুণে গুণান্বিত করে অতিবাহিত করছে।

এখানে বর্তমান বলে কিছুই নেই-এই মুহূর্তটি পর মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিটি অনাগত মুহূর্ত এসে ভবিষ্যতকে বর্তমানে রূপান্তরিত করছে এবং বর্তমান মুহূর্ত চোখের পলকে অতিবাহিত হয়ে কালের গর্ভে প্রবেশ করে বর্তমানকে অতীতে রূপান্তরিত করছে। বাড়ির ঘড়িটি সেকেন্ডের স্তর পার হয়ে মিনিট অতিক্রম করে ঘন্টা

চিহ্নিত স্থানে গিয়ে শব্দ করে বাড়ির মালিককে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'ওহে গৃহকর্তা! এখনো সাবধান হও, তোমার জন্য নির্দিষ্ট জীবনকাল থেকে একটি ঘন্টা পুনরায় কোনদিন ফিরে না আসার জন্য মহাকালের বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো।' মানুষ তার জীবনকাল সম্পর্কে দীর্ঘ আশা পোষণ করে অথচ ক্ষণপরে কি ঘটবে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। এ জন্য কবি বলেছেন-

আগাহ্ আপনি মওত সে কো-ই বাশার নেহি
সামান সও বরস্ কা হ্যায় প্যলকি খবর নেহি।

মানুষ সজাগ সচেতন নয়, মৃত্যুর ভয়শূন্য তার হৃদয়। মুহূর্ত পরে কি ঘটবে এটা তার জানা নেই অথচ সে শত বছরের জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ যোগাড়ে ব্যস্ত।

পৃথিবীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রশ্ন পত্রের ওপরে লেখা থাকে, 'সময়-৩ ঘন্টা।' অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলা হয়েছে, তা তিন ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। শুধু লিখলেই চলবে না, সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষায় যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। নির্দিষ্ট এই সময় অতিক্রান্ত হলে পরীক্ষার্থীকে সময় দেয়া হয় না। পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার স্থানে প্রশ্নের উত্তর না লিখে সময় ক্ষেপণ করে, তাহলে সে কোনভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে পরীক্ষার্থী যত অনুরোধই করুক না কেন, তাকে কিছুতেই সময় দেয়া হয় না।

মানব জীবনের বিষয়টিও ঠিক এমনি। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট সময়কাল দেয়া হয়েছে এবং তাকে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে তার কাজ হলো সে আঁকা-বাঁকা পথ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ যে পথ তাকে প্রদর্শন করেছেন, সেই পথে সে তার জীবনকাল অতিবাহিত করবে। সময় মানব জীবনের প্রকৃত মূলধন। এই মূলধন তাকে যথার্থ পন্থায় ব্যয় করতে হবে। যে কাজের জন্য বরফ নিয়ে আসা হলো, সেই কাজে বরফ ব্যবহার না করে তা যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে সে বরফ তো অত্যন্ত দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা কোনো কাজেই লাগবে না।

মানুষের জীবনও বরফের মতোই। তাকে যে নির্ধারিত জীবনকাল দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কালের কৃষ্ণকালো বিবরে গিয়ে প্রবেশ করছে। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়কে যদি অপচয় করা হয় বা আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, সে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে স্বয়ং নিজের যে ক্ষতি করছে, সেই ক্ষতি কখনো পুষিয়ে নেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ জন্য কালের শপথ করে বলেছেন, মহাকালের তীব্র গতিশীল স্রোতই জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চারটি গুণ বিবর্জিত মানুষ অর্থহীন কাজে নিজের মহামূল্যবান জীবনকাল ক্ষয় করছে, তা সবই অকল্পনীয় ক্ষতিকর বিষয়। এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র মুক্ত থাকতে পারবে তারাই, যারা নিজের জীবনে উক্ত চারটি গুণ

অর্জন করেছে তথা নিজেকে উক্ত চারটি গুণে গুণান্বিত করেছে। আলোচ্য সূরায় যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়-ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল, গোষ্ঠী তথা পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। তীব্র হলাহল-গরল যদি কোনো ব্যক্তি পান করে, তাহলে তার ওপর যেমন গরলের প্রতিক্রিয়া হবে, তেমনি সমাজের সকল ব্যক্তি বা একটি দেশের সকল জনগণ যদি তা পান করে, তাহলে এক ব্যক্তির ওপরে তা যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, গোটা দেশের জনগণের উপরও সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

আলোচ্য সূরায় উল্লেখিত চারটি গুণের অভাবে যেমন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা মানব সভ্যতা। এই সূরায় উদ্ধৃত চারটি মৌলিক গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি ও জাতি এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এটা এমনই এক ক্ষতি যে, এই ক্ষতি কোনভাবেই পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে, ক্ষতির ধরনটা কেমন? কারণ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তারা যে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত-সেটা তেমন একটা বুঝা যায় না। কারণ তারা একের পর এক আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে অবাক করে দিচ্ছে। তাদের জীবন যাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমরাস্ত্র ইত্যাদি-দিক থেকে ক্রমশঃ উন্নতিই করছে। অর্থাৎ এই দৃশ্যই সর্বত্র দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত চারটি গুণ ব্যতীতই তারা সফলতা ও কল্যাণ লাভ করছে।

ক্ষতির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য

সফলতা ও কল্যাণের যে সংজ্ঞা কোরআনে পেশ করেছে, আমরা ইতোপূর্বে সূরা ফাতিহা ও আমপারার তাফসীরে তা আলোচনা করেছি। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোরআন আলমে আখিরাতে মানুষের সাফল্য লাভকেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ এবং সেই জগতে তার ব্যর্থতাকেই প্রকৃত ব্যর্থতা বা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই পৃথিবীতে এক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করলো, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের মূল কর্ণধারের পদটি তাকে দেয়া হলো এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ তাকে নেতা হিস্যাবে অনুসরণ করলো, ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তার পদানত হলো, কোন কিছুর অভাব এবং দৈন্যতার সাথে তার কখনো পরিচয় ঘটলো না, গোটা বিশ্বের ওপরে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা পাকাপোক্ত হলো, মানুষের দৃষ্টিতে এই লোকটিই হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সফলতার অধিকারী এবং তার মাতা-পিতা একজন সফল সন্তানের অধিকারী হিসাবে মানুষের কাছে বিবেচিত হলো।

পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টিতে সেই সফল ব্যক্তি তার জীবনে মুহূর্ত কালের জন্যও তার আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি আদেশও মানলো না, বরং তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী লোকটি পৃথিবী থেকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দল ও লোকগুলোর প্রতি জুলুম

অত্যাচার চালালো, আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করলো। এই ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে সবথেকে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে এবং সবার তুলনায় এই ব্যক্তিই ব্যর্থতার মুখোমুখি হবে। পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহ বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, হাশরের ময়দানে তাদের সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে এবং এরাই সফলতা অর্জন করবে। আর যারা মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, তাদের পাল্লা হাল্কা হবে এবং এরাই হবে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَأُولئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِايتِنَا يَظْلِمُوْنَ-

যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কারণ তারা আমার বিধানের সাথে জালিমদের অনুরূপ আচরণ করছিলো। (সূরা আ'রাফ-৮-৯)

মানুষ মূলতঃ সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর গোলামী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করার পরপরই তাদেরকে আপন স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আমি কি তোমাদের রব নই? সমস্ত মানুষ সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিশ্চয়ই আপনিই আমাদের রব।' অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই আইন-কানুন ও বিধান অনুসরণ করবো এবং আপনারই দাসত্ব করবো। আপনার দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করবো। এভাবে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আনুগত্যের স্বীকৃতি (Oath of allegiance) দিয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টিলোকও সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষকে একমাত্র ঐ রব-এরই গোলামী করতে হবে, যিনি তাকে অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় কিছু তার অনুকূল করে দিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তার আপন রব-এর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে তাঁরই গোলামী করবে। এরপর পৃথিবীতে এসে যারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে অথবা মানুষের বানানো বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তারাই মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَاللّٰهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مِيْثَاقِه-وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤاَمَرَ اللّٰهُ بِه اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ-اُولئِكَ هُمُ الْخسِرُوْنَ-

যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যাকে যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা বাকারা-২৭)

এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ যতক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই আইনদাতা, বিধানদাতা হিসাবে অনুসরণ করে, ততক্ষণ সে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। আর যখনই মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ত্যাগ করে ভিন্ন কোন বিধান অনুসরণ করে, তখনই সে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় নিমজ্জিত হয় এবং গোটা পৃথিবীব্যাপী ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়। সুতরাং যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে তারাই সফল আর যারা এই বিধান ত্যাগ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَّكْفُرْبِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

যারা এর সাথে (আল্লাহর বিধানের সাথে) কুফরী আচরণ করে মূলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা-১২১)

এই পৃথিবীতে মানুষ পরকাল ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ একমাত্র পরকালের ভয় তথা পৃথিবীর যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের পক্ষেই এই পৃথিবীকে একটি শান্তির নীড় হিসাবে গড়া সম্ভব। আর যাদের ভেতরে সেই অনুভূতিই নেই, তারাই মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এরাই হলো সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ-

ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার খবরকে মিথ্যা মনে করেছে। (সূরা আনআ'ম-৩১)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিই সবথেকে সফলতা অর্জন করলো, যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজের জীবন পরিচালিত করলো তথা সূরা আসরে উল্লেখিত চারটি গুণ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করলো। যদিও সে ব্যক্তি পৃথিবীতে চরম অভাবের ভেতরে জীবন অতিবাহিত করেছে-তবুও সে তাঁর স্রষ্টা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সফলতা ও কল্যাণ অর্জন করেছে। মোট কথা, পরকালে যারা সফলতা অর্জন করতে পারবে কেবলমাত্র তারাই সফল হবে আর পরকালে যারা ব্যর্থ হবে, তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং এটাই স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَاذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ–

বলো প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার, পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। (সূরা আয্ যুমার-১৫)

কোন মানুষের ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যবসার অঙ্গনে তার পাওনাদারের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, নিজের যাবতীয় কিছু দিয়েও সে দেনামুক্ত হতে পারে না তাহলে এই অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়া (Bankrupt) বলে। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম বিরোধিদেরকে লক্ষ্য করে এই রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, মেধা, দেহ, শক্তি, যোগ্যতা, যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধাসহ যত জিনিস মানুষ লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পৃথিবীর জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যয় করে।

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া এ পুঁজির সবটুকু এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ব্যয় করে যে, এমন কোন শক্তি নেই যার আইন তাকে মেনে চলতে হবে এবং পরকালে একমাত্র তাঁর কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অথবা পৃথিবীতে যেসব কৃত্রিম শক্তি রয়েছে সে তার গোলাম এবং এসব শক্তির আইন তাকে মেনে চলতে হবে এবং মাথানত করতে হবে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সমস্ত কিছুই হারিয়ে ফেললো। এটা হলো প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষতি হলো, এই ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকেসহ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং মহান আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর গোটা জীবনকালব্যাপী না-ইনসাফী করলো।

সুতরাং এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবীদার আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবী পূরণ করতে সক্ষম। এ ছাড়া আরো ক্ষতি হচ্ছে, সে ব্যক্তি নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, নিকট আত্মীয়, প্রিয়জন ও পরিচিত মহল এবং নিজের জাতিকেও তার ভ্রান্ত চিন্তাধারা, প্রভাব, শিক্ষা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ গুলো মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি। সুতরাং পরকালের সফলতাই প্রকৃত সফলতা এবং পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা আশ শূরা-৪৫)

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং কোরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজেদের শারীরিক শক্তি, মেধা, অর্জিত অর্থ-সম্পদসহ যাবতীয় যোগ্যতা ব্যয় করেছে, এই লোকগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং নেক আমলসহ দ্বীনি আন্দোলন করেছে, আল্লাহর কোরআন এসব লোকদেরকে 'পবিত্র' হিসাবে চিত্রিত করেছে। আর যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কদর্যতায় নিমজ্জিত থাকে, এদেরকে 'অপবিত্র' হিসাবে চিত্রিত করেছে। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকগুলো এবং দ্বীনি আন্দোলন বিরোধী লোকগুলো এই পৃথিবীতে একই সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং ক্ষেত্র বিশেষে একই পরিবারে অবস্থান করে থাকে। কিয়ামতের দিন এই পবিত্র লোকগুলোকে অপবিত্র লোকদের থেকে পৃথক করা হবে এবং অপবিত্র লোকগুলোকে তথা অপরাধীদেরকে একত্রিত করে ঘেরাও অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ- لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِىْ جَهَنَّمَ- اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

যেসব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির কাজে ব্যয় করে, ভবিষ্যতে আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত ও পরাভূত হবে, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ অপবিত্রতাকে বেছে নিয়ে পৃথক করবেন এবং সব ধরনের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন। অবশেষে এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলত এই লোকেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনফাল-৩৬-৩৭)

মানুষ যে পথে যে উদ্দেশ্যে নিজের যাবতীয় শ্রম, মেধা, অর্থ ও যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা নিয়োজিত করে, পরিণামে যখন জানতে পারে যে, সেই পথ তাকে সোজা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে-যে পথে সে তার যাবতীয় মূলধন ও যোগ্যতা নিয়োজিত করেছে। এ পথে সে কোনক্রমেই লাভবান হতে পারবে না বরং উল্টো তাকে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাহলে এই ধরনের ব্যক্তির তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত আর কে হতে পারে? বর্তমানে যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কৃত্রিতম সফলতা অর্জনের পথে যাবতীয় কিছু বিনিয়োগ করছে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। পরকাল হবে না এবং পৃথিবীর জীবনের কোন কর্মের হিসাব

কারো কাছে কখনোই দিতে হবে না। এই চিন্তা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছেন, বৈধ-অবৈধের কোন সীমা এরা মানেনি। যে কোন পথে ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে, জীবন-যৌবনকে দ্বিধাহীন চিত্তে আকণ্ঠ ভোগ করেছে। এসব লোকই পরকালীন জীবনে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَاكَانُوْا مُهْتَدِيْنَ–

প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেসব লোকেরা, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। (সূরা ইউনুস-৪৫)

ইসলামের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবে না, কোরআন নির্দেশিত পথে আমলে সালেহ্ করবে না, পৃথিবী থেকে অনাচার-অবিচার দূর করার লক্ষ্যে কোরআনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন যারা করবে না, আল্লাহর দেয়া বিধানকে যারা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করে এড়িয়ে চলবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। যারা আল্লাহর বিধানকে অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, সেকেলে, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করে এবং মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে এবং সেই আন্দোলনের প্রতি যারা সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়, তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ–

আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অনথ্যায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস-৯৫)

পরকালকে মিথ্যা মনে করে এই পৃথিবীর জীবনকে যারা কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পথ ও মত রচনা করেছে, ভোগ-বিলাসের নানা ধরনের উপকরণ তৈরী করেছে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি, দল বা কোন বুযর্গকে বিশাল শক্তির অধিকারী মনে করে তার আনুগত্য করেছে, কিয়ামতের ময়দানে এসব কোন কিছুই তাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর দাসত্ব না করে যারা ভিন্ন কিছুর দাসত্ব করতো, তাদের সামনে মাথানত করতো, শক্তিমান লোকদের রচনা করা বিধান অনুসরণ করতো, কিয়ামতের দিন এসব কিছুই তাদের কাছ থেকে সট্‌কে পড়বে। নিজের রচনা করা বিধান, দেব-দেবী ও কল্পিত শক্তির অধিকারী কোন কিছুরই অস্তিত্ব সেদিন থাকবে না। কিয়ামতের দিনে এসব লোকদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ لاَ جَرَمَ
أَنَّهُمْ فِى الاٰخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ–

এরা সেই লোক, যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর তারা যা কিছু রচনা করেছিল, তার সবকিছু তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা হূদ-২১-২২)

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করাকে যারা কঠিন মনে করেছে, রাসূলের আনুগত্য করাকে যারা কষ্টকর বলে চিন্তা করেছে, ইসলাম বিরোধী শক্তির দাপট দেখে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, অবৈধ ভোগ-বিলাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে, সময়ের কোরবানী দিতে হবে, অর্থ-সম্পদের কোরবানী দিতে হবে, ইসলাম বিরোধিদের কোপানলে পড়তে হবে, লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত হতে হবে, কারাগারের অন্ধকার জীবনকে মেনে নিতে হবে। এসব দিক চিন্তা করে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেয়নি, এই আন্দোলনকারীদেরকে সমর্থন দেয়নি, সুবিধাবাদী দুনিয়া পুজারী এই গাফিল লোকগুলোও কিয়ামতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَفِلُوْنَ–لاَ جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الاخِرَةِ هُمُ الاَخْسَرُوْنَ–

এরা গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত, নিঃসন্দেহে আখিরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা নাহ্‌ল-১০৮-১০৯)

মুসলিম পরিচয় দানকারী একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা নিজের মুসলিম পরিচয়ও বজায় রাখতে চায় এবং ভোগবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিরও অনুসরণ করে। অর্থাৎ এরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে মোটেই রাজী নয়। অপরদিকে নিজেদের মুসলিম পরিচয় মুছে দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার সবটুকু গ্রহণ করতেও রাজী নয়। ইসলামের দুই একটি সহজ নিয়ম-নীতি ইচ্ছানুসারে অনুসরণ করবে এবং ভোগবাদী পশ্চিমা সভ্যতাও অনুসরণ করবে। এরা দুনিয়া পুজারী এবং এদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, এদের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত নড়বড়ে, এরা প্রবৃত্তির পুজা করে। এসব লোক পার্থিব স্বার্থের কারণে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়।

এদের ঈমানের সাথে এই শর্ত জড়িত যে, এদের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দেয়া বিধান তাদের কাছে কোন ধরনের স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং পৃথিবীতে তাদের কোন ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। আল্লাহর বিধান যদি এদের মনের চিন্তা-চেতনা ও চাওয়া-পাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে তাহলে ইসলাম তাদের কাছে সবথেকে ভালো আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখনই ইসলাম এদের অবৈধ কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে অগ্রসর হবে, তখনই এরা বলে উঠবে ইসলাম সেকেলে, পশ্চাৎপদ, প্রগতি বিরোধী, মৌলবাদ।

আর মুসলিম হওয়ার কারণে যদি কখনো এদের ওপরে কোন আপন-বিপদ নিপতিত হয়, কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় অথবা এদের কোন আশা-আকাংখা পূরণের পথে ইসলাম অর্গল তুলে দেয়, তাহলে এরা আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌমত্বের কোন তোয়াক্কা করে না, রাসূলের রিসালাতের প্রতি ও কোরআনের সত্যতার প্রতি এরা সংশয়িত হয়ে পড়ে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি এদের বিশ্বাসের ভিত্তি কেঁপে ওঠে।

এই অবস্থায় দুনিয়া পুজারী এ লোকগুলো এসকল স্থানে মাথানত করে, এসব ঠুনকো শক্তির দাসত্ব করতে থাকে, যেখানে তাদের পার্থিব স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তারা পার্থিব জীবনে লাভবান হতে পারবে। এসব লোকই হলো দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোক। এদের আপদ-মস্তক শয়তানের গোলামীতে নিমজ্জিত থাকার পরও এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয় এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য মাঝে মধ্যে ইসলামের কিছু নিয়ম-নীতি প্রদর্শনীমূলকভাবে পালন করে থাকে।

দ্বৈত-ইবাদাতকারী এসব নামধারী মুসলিমদের অবস্থা সব থেকে খারাপ। কাফির, মুরতাদ ও নাস্তিকরা নিজের রব-এর মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং মন-মস্তিষ্ককে পরকালের ভীতিশূন্য করে ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে ছুটতে থাকে তখন সে নিজের পরকাল বরবাদ করলেও পার্থিব স্বার্থ কিছু না কিছু অর্জন করে থাকে। অপরদিকে মু'মিন যখন পূর্ণ ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প সহকারে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে থাকে, তখন যদিও পার্থিব সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার পদ-চুম্বন করেই থাকে, যদি পৃথিবীর স্বার্থ একেবারেই তার নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে, তবুও আখিরাতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে দ্বৈত-ইবাদাতকারী মুসলমান নিজের পৃথিবীর স্বার্থও লাভ করতে সক্ষম হয় না এবং আখিরাতেও তার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তার মন-মস্তিষ্কের কোন এক প্রকোষ্ঠে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের অস্তিত্বের যে ধারণা রয়েছে এবং আল্লাহর বিধানের সাথে সম্পর্ক তার মধ্যে নৈতিক সীমারেখা কিছু না কিছু মেনে চলার যে ভাব-প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীর স্বার্থের পেছনে ছুটতে থাকলেও এগুলো তাকে পেছন থেকে টেনে ধরে। ফলে নিছক বস্তুগত স্বার্থ ও বৈষয়িক স্বার্থ অন্বেষার জন্য যে ধরনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা একজন কাফির-নাস্তিক ও পরকালের ভীতিহীন লোকদের মতো তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

আখিরাতের কথা চিন্তা করলে পৃথিবীর লাভ ও স্বার্থের লোভ, ক্ষতির ভয় এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বিধি-নিষেধের শৃংখলে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মানসিক অস্বীকৃতি সেদিকে যেতে দেয় না বরং বৈষয়িক স্বার্থ পূজা তার বিশ্বাস ও কর্মকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে, আখিরাতে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে এসব দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোকগুলো পৃথিবী ও আখিরাত-দুটোই হারিয়ে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ এসব লোকদের সম্পর্কে বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ-فَاِنْ اَصَابَه خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِه-

وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِه-خَسِرَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةَ-ذٰلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ-

আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ রয়েছে, যে এক প্রান্তে অবস্থান করে আল্লাহর দাসত্ব করে, যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোন বিপদ আসে তাহলে পেছনের দিকে ফিরে যায়। তার দুনিয়াও গেলো এবং আখিরাতও। আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্জ-১১)

আল্লাহর নাযিল করা জীবন বিধান ব্যতীত পৃথিবীতে প্রচলিত ও আবিষ্কৃত যত মত ও পথ রয়েছে, নিয়ম-নীতি, প্রথা, আইন-কানুন রয়েছে তা সবই বাতিল। এই বাতিল মতাদর্শ-মতবাদ যারা অনুসরণ করবে, তারাই মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ-اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرِيْنَ-

যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনকাবুত-৫২)

মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের অনুসারীরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধানকে মসজিদ-মাদ্রাসার চার দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চায়। মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন-পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গনে আল্লাহর বিধানের পদচারণা বরদাশ্ত করতে এরা রাজী নয়। আল্লাহ তা'য়ালাকে এরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এরা বলে থাকে, দেশের জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এরাই হলো বাতিল পথ ও মতের অনুসারী এবং এরা হাশরের ময়দানে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ-

যমীন এবং আসমানের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা জাসিয়া-২৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধু এই পৃথিবীই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে রয়েছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণের তা সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং একমাত্র সেই আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে।

দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোকগুলো পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, শক্তি ও ধন-সম্পদের আশায় অন্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য ধর্ণা দেয়। এই ধরনের অবস্থা যাদের তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা যাবতীয় কিছু দেয়ার মালিক তিনি এবং সমস্ত কিছুর চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। যমীন ও আসমানের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (সূরা যুমার-৬৩)

উল্লেখিত আয়াতে 'আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে' এ কথার অর্থ হলো মহান আল্লাহকে সর্বশক্তির অধিকারী মনে না করা। অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে যে, একমাত্র তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র তিনিই ধনীকে নির্ধন ও গরীবকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে তিনিই হেফাজত করতে পারেন এবং মনের আশা-আকাংখা তিনিই বাস্তবায়ন করতে পারেন। তিনিই একমাত্র দোয়া কবুলকারী। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা সাহায্যের আশায় মাজার আর দরগায় গিয়ে ধর্ণা দেয়, তারাই আল্লাহর আয়াতের সাথে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের সাথে কুফরী করে এবং এরাও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সাহায্যকারী, আশা পূরণকারী, দোয়া কবুলকারী, ধন-সম্পদ দানকারী, রোগ থেকে আরোগ্যকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ইত্যাদী মনে করা হয়, তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক।

একশ্রেণীর মানুষ দরগাহ, মাজার ও একশ্রেণীর পীরদেরকে এসব গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করতে থাকে এবং মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে, তারা নেক কাজ করছে। কোরআনের ভাষায় এসবই হলো শিরক। এদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ-لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

তোমার কাছে এবং ইতোপূর্বেকার সমস্ত নবীর কাছে এই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার-৬৫)

মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ

প্রত্যেক নবী-রাসূলই পরকালে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা বলেছেন এবং মানুষের মনে পরকালের ভীতি সঞ্চার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তার সিংহভাগ জুড়ে থেকেছে পরকাল সম্পর্কিত আলোচনা। সর্বশেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানব জাতির জন্য যে সর্বশেষ জীবন বিধান-আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভেতরেও পরকালের বিষয়টিই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

গোটা ত্রিশপারা কোরআনে পরকাল সম্পর্কিত যে আলোচনা এসেছে, তা একত্রিত করলে প্রায় দশ পারার সমান হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বিশাল আলোচনা কেন করা হয়েছে? আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে এবং আমপারার তাফসীরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে সংক্ষেপে বিষয়টি এভাবে পেশ করছি যে, পরকালে জবাবদিহির ভীতি ব্যতীত কোনক্রমেই মানুষের মন-মস্তিষ্ক অপরাধের চেতনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সর্বাধিক কঠোর আইন প্রয়োগ করেও মানুষকে অপরাধ মুক্ত সৎ জীবনের অধিকারী বানানো যায় না। কারণ অপরাধীর প্রতি শাস্তির দন্ড প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন হবে সাক্ষ্য প্রমাণের। পক্ষান্তরে যে অপরাধী কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ না রেখে অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করে, সে থাকে আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং তার প্রতি পৃথিবীতে দন্ডও প্রয়োগ করা যায় না।.

সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন আইন-কানুনের অস্তিত্ব নেই, যে আইন মানুষকে নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে একাকী অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। এই অবস্থায় মানুষকে অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে পারে কেবল পরকাল ভীতি তথা আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি। এ কারণেই মানব মন্ডলীর জন্য প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে পরকালের বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

অপরদিকে প্রত্যেক যুগেই একশ্রেণীর মানুষ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং পরকালের স্বপক্ষে যারা কথা বলেছে, তাদের বিরোধিতা করেছে। এই শ্রেণীর লোকগুলো কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে চায়নি যে, মৃত্যুর পরে মানুষ পুনরায় পুনর্জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর আদালতে যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে। এই শ্রেণীর মানুষদের একজন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট।

এ জন্য তারা কোনভাবেই মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনকে বিশ্বাস করতে চায়নি। মৃত্যুর পরে মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি, চর্ম, গোস্ত এবং প্রতিটি অণু-পরমাণু ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মাটি সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে।

এরপরে কিভাবে পূর্বের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ জীবন লাভ করবে? এই বিষয়টি হলো পরকাল সম্পর্কে সংশয়িত লোকদের চিন্তা-চেতনার অতীত।

প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা যখন পরকালের কথা বলে মানুষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছেন এবং মানুষের ভেতরে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তখন পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো নবী-রাসূলদেরকে পাগল হিসাবে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে কোন মতবাদ তারা গ্রহণ করতে চায়নি বরং পরকাল বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যারা পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির কথা বলেছে, তাদের প্রতি একশ্রেণীর মানুষ কেন মারমুখী আচরণ করেছে এবং কেনই বা তাদেরকে নির্যাতন করেছে? পরকাল বিরোধিদের এমন কি ক্ষতি হচ্ছিলো যে, তারা পরকাল বিশ্বাসীদেরকে বরদাশ্ত করেনি?

আসলে পরকাল বিরোধিতার পেছনে এক মনস্তাত্বিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সেই কারণ হলো, যেসব লোক পরকালে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে-এ কথা বিশ্বাস করে, তাদের চরিত্র, আচার-আচরণ, মননশীলতা ও রুচি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি হয় এক ধরনের। আর পরকাল অবিশ্বাসীদের উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এ কথা আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে সত্য বলেই প্রমাণিত হয়ে আসছে।

যে ব্যক্তি পরকাল বিশ্বাস করে, তার এমন এক মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে যে, সে প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখে যে, তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কর্মকান্ড রেকর্ড হচ্ছে এবং মৃত্যুর পরের জগতে এ সম্পর্কে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। মহান স্রষ্টা তার ওপরে যে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, তার দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই গোপন করা যাবে না। সে যদি কোন অপরাধমূলক কর্ম করে থাকে তাহলে এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে-এ বিশ্বাস তার ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই সে যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

আর যারা পরকাল অবিশ্বাস করে অথবা পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তাদের চরিত্র হয় পরকাল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই সুতরাং তাদের কোন কর্মের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। পৃথিবীর জীবনে তারা যদি অবৈধভাবে জীবন-যৌবনকে ভোগ করে, অপরের অধিকার খর্ব করে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়ে, দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য দেশ ও জাতির ক্ষতি করে, জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ক্ষমতার বলে অধীনস্থদের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে, স্বৈরাচারী নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করে, সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করে-তবুও তারা ভয়ের কোন কারণ অনুভব করে না। কারণ তারা এ বিশ্বাসে অটল যে, মৃত্যুর পরে তাদের এসব হীন কর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

কারণ পরকাল বিশ্বাস করলেই নিজের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিতে হবে, যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করতে হবে, অন্যায় ও অবৈধ পথে নিজের জীবন-যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, অন্যায় পথে অর্থ-সম্পদের স্তূপ গড়া যাবে না, ক্ষমতার মসনদে বসে দেশ ও জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল করতে হবে, নির্দিষ্ট একটি গন্ডির ভেতরে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। আর এসব করলে তো জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা যাবে না। পরকালের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণের পেছনে এটাই হলো মনস্তাত্ত্বিক কারণ।

এই ধরনের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা গঠিত হয় পরকাল অবিশ্বাস করার কারণে। নৈতিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সুবিচার, দুর্বল, নির্যাতিত-নিপীড়িত ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন ইত্যাদি সৎ গুণাবলীতে তারা বিশ্বাসী নয়। অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অনাচার, হত্যা-সন্ত্রাস, অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা এদের কাছে কোন অপরাধ বা নৈতিকতার লংঘন বলে বিবেচিত হয় না। নিজের যৌন কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নারী জাতিকে এরা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। ব্যক্তি স্বার্থ, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য একটি মানুষকেই শুধু নয়, গোটা একটি দেশ বা জাতিকে নিজেদের গোলামে পরিণত করতে বা ধ্বংস করে দিতেই এরা কুণ্ঠাবোধ করে না। পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সাক্ষী, এই পৃথিবীর বুকে এমন বহু জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করার পরও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছে নৈতিক অধঃপতনের অতল তলদেশে।

পরকাল অবিশ্বাসের কারণে তারা নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করে ন্যায়ের শেষ সীমা যখন অতিক্রম করেছে, তখনই তারা আল্লাহ তা'য়ালার গযবে নিপতিত এই পৃথিবী থেকে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবার এটাই হলো মূল কারণ যে, তাদের অন্তরে পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। পরকাল বিশ্বাস অন্যায়কারীর কণ্ঠে জিঞ্জির পরিয়ে দেয়, ফলে সে অন্যায় পথে অগ্রসর হতে পারে বিধায় অন্যায় পথ অবলম্বনকারীরা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে করেছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত এবং আঘাতে আঘাতে তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে, ফাঁসির রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের উত্তরসূরিদের আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এই শ্রেণীর লোক পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত, সুশৃংখল এবং উদগ্র কামনা-বাসনাকে দমন করতে অতীতে যেমন রাজী ছিল না বর্তমানেও রাজী নয়। নিজ দেশের জনগণ বা ভিন্ন দেশের জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করার কলুষিত কামনাকে এরা নিবৃত্ত করতে আগ্রহী নয়। নিজের স্রষ্টা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও পরকালের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই হলো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ-اُولٰئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

প্রকৃত বিষয় এই যে, যারা আমার সাথে আখিরাতে মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে করেছে। (সূরা ইউনুস-৭-৮)

এসব লোক পৃথিবীর জীবন নিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছে এবং কখনো এ চিন্তা তাদের মনে উদয় হয়নি যে, তাদের একজন স্রষ্টা এবং প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপালন করছেন এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছেন। সেই আল্লাহ তা'য়ালা যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দেখছেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত কিছুর হিসাব দিতে হবে, এই বিশ্বাস তাদের নেই। এ কথা তারা বিশ্বাস করে না যে, এমন একটি সময় আসবে, সে সময়ে তাদের নিজেদের দেহের চামড়া, চোখ, কান, হাত-পা ইত্যাদি স্বয়ং তারই বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে। এই বিশ্বাস না থাকার কারণেই তারা পৃথিবীতে যা খুশী করছে এবং মারাত্মক ক্ষতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। কিয়ামতের দিন এসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে বলা হবে-

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ-

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের সংবাদ আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা-যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে-তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বিনিময়েই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো। (সূরা হা-মীম সাজ্দাহ্-২২-২৩)

পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী ও অবিশ্বাসী লোকগুলো এই পৃথিবীতে আপাদ-মস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত থেকেছে, নিজের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যায় কাজে ব্যবহার করেছে কিন্তু নিজের অজান্তেও এ কথা তারা কল্পনা করেনি যে, তার দেহের যে অঙ্গগুলোর

প্রতি সে এত যত্নশীল এবং এসব অঙ্গের শোভাবর্ধন করার লক্ষ্যে সে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, এসব অঙ্গ-ই একদিন তার বিরুদ্ধে তার অন্যায় কাজের সাক্ষী দেবে। এসব লোক বিশ্বাস করেছে স্রষ্টা বলে কেউ নেই এবং কোন কর্মের হিসাবও কারো কাছে দিতে হবে না, তাদের এই বিশ্বাসই তাদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে হাশরের ময়দানে।

ভ্রান্ত এই বিশ্বাস অনুসারে এসব লোক পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালিত করেছে এবং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রভাবাধীন আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় লোকজন এবং নিজের অধীনস্থদের পরিচালিত করে তাদেরকেও মহাক্ষতির দিকে নিক্ষেপ করেছে। কিয়ামতের দিন এসব লোকদেরকে যখন গ্রেফতার করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকগুলো ঐ লোকগুলো সম্পর্কে বলবে-

وَقَالَ الَّذِيْنَ امَنُوْا اِنَّ الْخسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ-

যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা শূরা-৪৫)

ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোই সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীতে যাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং এরা মনে করতো, তারা যা করছে তা সঠিক কাজই করছে। এরা লেখা-পড়া করেছে, বিদ্যা অর্জন করেছে, সমাজ কল্যাণমূলক কোন কাজ করেছে, রাজনীতি করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, মিছিল-মিটিং ধর্মঘটসহ যা কিছুই করেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে করেছে। কারণ এরা ভেবেছে এই পৃথিবীর জীবনই আসল জীবন, মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। সুতরাং কারো কাছে নিজের কাজের কোন হিসাব দিতে হবে না। এসব লোক পৃথিবীর জীবনে সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে।

এই শ্রেণীর লোকগুলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই আল্লাহ কোন্ কাজে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট হবেন, তাঁর সামনে গিয়ে একদিন উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এ চিন্তা তারা কখনো করেনি। পক্ষান্তরে এসব লোকগুলো পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করতো। তারা ধারণা করতো, তারা যা করছে-তা অবশ্যই সঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে আন্দোলন মিছিল-মিটিং, হরতাল করছে, সন্ত্রাস করে দেশ ও জনগণের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি করছে, দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে, তবুও এরা জোর গলায় প্রচার করছে, তারা যা কিছুই করছে তা মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই করছে। এসব লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا- اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

হে রাসূল! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। (সূরা কাহ্ফ-১০৩-১০৪)

ঈমানের ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য

মানুষকে সেই মারাত্মক ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে কেবলমাত্র চারটি গুণ। এর প্রথম গুণ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বললেই ঈমানের শর্ত পূরণ হবে না। মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের বাস্তব ছবি নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলার নামই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হলো-কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আনুষঙ্গিক এমন কতকগুলো দিক এর সাথে জড়িত রয়েছে যে, সেদিকগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ও প্রবল বিশ্বাস না থাকলে মৌখিক স্বীকৃতির কোন মূল্য নেই। ঈমান আনার সাথে সাথে ঈমানের শর্তগুলো পূরণ না করলে সে ঈমানের কোন মূল্য নেই। প্রথম শর্ত হলো, মহান আল্লাহর অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, আল্লাহর গুণাবলীর ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তৃতীয় শর্ত হলো, আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। চতুর্থ শর্ত হলো, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সে অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে হবে। এই কিতাবকে জীবন বিধান হিসাবে অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ যে ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা যাঁদের নবী-রাসূল হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে। আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস আবার কোন নবী-রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করা যাবে না। বিচার দিবসের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করতে হবে। মূলতঃ এগুলো ইসলামের মৌলিক আকীদা। এগুলোর প্রতি কারো অন্তরে সন্দেহ-সংশয় থাকলে তার পক্ষে ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের এসব মৌলিক আকীদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ- كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ-لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ-وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا- غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছে, যা তাঁর রব-এর কাছ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যারা এই রাসূলের প্রতি ঈমানদার তারাও সেই হেদায়াতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সবাই আল্লাহ, ফেরেশ্তা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই যে, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমরা তোমারই কাছে গুনাহ্ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা-২৮৫)

উল্লেখিত আয়াতে পাঁচটি বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই পাঁচটি বিষয় হলো ইসলামের মৌলিক আকীদা এবং এই আকীদা কবুল করার পরে একজন মুসলমানের প্রতি এটা ফরজ হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন, সে ব্যক্তি শুধুমাত্র সেই বিধানই অনুসরণ করবে–অন্য কোন বিধানের প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব দেবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের কাছেই কেবলমাত্র মাথানত করবে এবং সে অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করবে। নিজের যাবতীয় দোষক্রটির জন্য শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখবে যে, একদিন তাকে মহান আল্লাহর আদালতে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে। অবশ্য করণীয় এই বিষয়গুলোর প্রতি যে ব্যক্তি অবহেলা প্রদর্শন করবে, সে ব্যক্তির ঈমানের দাবী কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ঈমান এনেছি–এ কথা বলার পরে কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, সে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করবে, অন্য কোন আইন-বিধান অনুসরণ করবে। অথবা এটাও তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে ব্যক্তি কোন নবী-রাসূলকে নবী-রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেবে আবার কোন নবী-রাসূলকে নবী-রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। তাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করবে বা তাদেরকে গালি দেবে। বরং তারা সমস্ত নবী-রাসূলকে সত্য বলে ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেবে। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ-لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ-وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ-

হে রাসূল ! আপনি বলে দিন, আমরা আল্লাহকে মানি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা মানি আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানি। সেই হেদায়াতের প্রতিও আমি ঈমান রাখি যা মূসা, ঈসা ও

অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের রব-এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য বা তারতম্য করি না এবং আমরা আল্লাহরই ফরমানের অধীন ও অনুসারী। (সূরা ইমরান-৮৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে কোরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, যেমন তাওরাত, যাবুর ও ঈঞ্জিল। এসব কিতাবের প্রতি আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে। পক্ষান্তরে এসব কিতাব যাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁদের অনুসারীগণ পরবর্তীতে ঐসব কিতাবকে যে বিকৃত করেছে-এ কথা পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ঐসব কিতাবের অনুসারী বলে দাবীদার ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় দাবী করে থাকে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নাযিল করা ঐসব কিতাব মওজুদ রয়েছে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়তার সাথে তাদের পক্ষে কখনো বলা সম্ভব নয় যে, তারা যেসব কিতাবকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করছে, তা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর বাণী এবং তার মধ্যে কোন বিকৃতি ঘটেনি।

শুধু তাই নয়, এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, তাওরাত, যাবুর ও ঈঞ্জিল কিতাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে করতে তা বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌছানো হয়েছে যে, কিতাবগুলোর নাম ব্যতীত এর ভেতরের একটি শব্দও আল্লাহর বাণী হিসাবে দাবী করার কোন যোগ্যতা রাখে না। মূল যেসব ভাষায় ঐ কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, সেই ভাষাও যেমন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং সেই মূল ভাষায় অবতীর্ণ করা কিতাবের একটি কপিও গোটা পৃথিবীর কারো কাছেই সংরক্ষিত নেই। শুধু তাই নয়, ঐসব কিতাবের একজন হাফেজও সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং মহান আল্লাহ কোরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তার অস্তিত্ব বর্তমানে পৃথিবীতে নেই এবং দুই চার ছত্র থাকলেও তা অবিকৃত অবস্থায় নেই। তবে এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তাওরাত, যাবুর ও ঈঞ্জিল নামক কিতাবসমূহ মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। বর্তমানে ঐসব নামাঙ্কিত যেসব কিতাব আল্লাহর বাণী হিসাবে মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছে, তার প্রতি কোনক্রমেই ঈমান আনা যাবে না এবং তা আল্লাহর বাণী হিসাবে গ্রহণও করা যাবে না। বিশ্বাস করতে হবে শুধুমাত্র কোরআনকে এবং একমাত্র কোরআনকেই জীবন বিধান হিসাবে অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ-وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرَسُوْلِه وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَللاً م بَعِيْداً-

হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি, যা তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। সেই কিতাবের প্রতিও ঈমান আনো, যা আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে নাযিল করেছেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাবর্গ

তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে চলে গেল। (সূরা নিসা-১৩৬)

উল্লেখিত আয়াতে ঈমানদারকে ঈমান আনার কথা বলার অর্থ হলো, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার তাগিদ দেয়া হয়েছে, সেসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ করবে। পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করবে। নিজের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রুচি, পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতি, আচার-আচরণ, বন্ধুত্ব-শত্রুতা, চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম ইত্যাদিকে নিজের ঈমানের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যশীল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিলো, 'ঈমান এনেছি' এতটুকু কথার মধেই নিজের ঈমানকে সীমিত রাখলে সেই ঈমানের কোন মূল্য দেয়া হবে না। ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন গঠন করতে হবে। এ জন্যই যারা ঈমান এনেছি বলে দাবী করে, তাদেরকেই ঈমানদার বলে উল্লেখিত আয়াতে সম্বোধন করে ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনার তাগিদ দেয়া হয়েছে-যেন তারা মহান আল্লাহর কাছে ঈমানের মূল্য লাভ করতে পারে।

অনেকে বলে থাকেন যে, আহলি কিতাবের লোকজন অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরাও তো আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি মোটেও ঈমানদার নয়। কারণ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার অর্থ তো শুধু এতটুকুই নয় যে, স্রষ্টা একজন আছেন। বরং ঈমানের অর্থ হলো, আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য, মালিক, রব, প্রভু, প্রতিপালক, আইনদাতা, বিধানদাতা, ভয় করার যোগ্য, সাহায্যদাতা হিসাবে মেনে নিতে হবে এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে না নিজে শরীক হবে, না অপর কাউকে শরীক বলে মেনে নেবে। কিন্তু ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় আল্লাহ তা'য়ালার উল্লেখিত গুণাবলীর প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে, এ প্রমাণ তারা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্তও দিতে পারেনি।

ঠিক একইভাবে পরকাল বিশ্বাসের অর্থও এটা নয় যে, মৃত্যুর পরে তাকে পুনরায় উঠানো হবে। বরং সেই সাথে এ কথার প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, সেদিন যাবতীয় কাজের হিসাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে এবং এই বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করতে হবে। সেদিনের বিচার, শাস্তি ও প্রতিদানের ব্যাপারে কারো কোন ধরনের চেষ্টা, সুপারিশ বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ চলবে না। কেউ কারো প্রাপ্য শাস্তির পরিবর্তে নিজে শাস্তি গ্রহণ করতে পারবে না। অর্থাৎ কাফ্ফারা হিসাবে জাহান্নাম থেকে কেউ কাউকে রেহাই দিতে পারবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদালতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইনসাফ করা হবে এবং ঈমান ও আমল ব্যতীত সেখানে অন্য কোন জিনিসের প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব দেয়া হবে না। এই ধরনের বিশ্বাস ও চেতনা ব্যতীত পরকাল বিশ্বাসের কোন গুরুত্ব নেই। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো, তারা যাকে স্বয়ং স্রষ্টার সন্তান হিসাবে বিশ্বাস করে, সেই সন্তান তাদের যাবতীয় পাপের কাফ্ফারা আদায় করে তাদের সবাইকে জান্নাতে প্রেরণ করবে। সুতরাং কোরআনের দৃষ্টিতে তাদের পরকাল বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রকৃত অর্থ

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এবং মানুষ সে দায়িত্ব তার সর্বোচ্চ যোগ্যতা দিয়ে পালন করবে। মানুষ যে ময়দানে এই দায়িত্ব পালন করবে, সে ময়দান কুসুমাস্তীর্ণ নয়-কন্টকাকীর্ণ এবং সম্পূর্ণ প্রতিকূল। পক্ষান্তরে এই দায়িত্ব পালন না করলে মানুষের মুক্তিরও কোন মাধ্যম নেই। এই দায়িত্ব যারা পালন করবে, তারাই কেবল মুক্তি লাভ করবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। মানুষের মুক্তি, সম্মান ও মর্যাদা লাভের এই বিষয়টিকে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এভাবে পেশ করেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ-تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ-ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

হে বিশ্বাসীগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা বলবো না, যে ব্যবসা তোমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ? তোমরা ঈমান আনয়ন করো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-মাল ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। (সূরা-সফ-১০-১১)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, হে বিশ্বাসীরা তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোন ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো না, যে ব্যবসা তোমাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে, এমন একটি ব্যবসার কথা আমি কি তোমাদেরকে বলবো না ?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ কথার অর্থ হচ্ছে, আমি অবশ্যই এমন একটি সর্বোত্তম ব্যবসার কথা তোমাদেরকে বলবো।

এই পৃথিবীতে কোন্ পদ্ধতিতে চললে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে, সে কথাটি মহান আল্লাহ গোপন রাখেননি, তিনি অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ করেছেন। মানুষের মুক্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহর কথাটি সম্পূর্ণ Open secret করে দিয়েছেন। মানুষকে সঠিক পথ দান করার দায়িত্ব কোন মানুষের নয়, এমনকি এ দায়িত্ব কোন নবী-রাসুলের প্রতিও অর্পণ করা হয়নি। এই মহান দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। (সূরা আন্ নাহ্ল-৯)

মহান আল্লাহ যে সঠিক পথ দান করেছেন, সে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের। তাঁরা হলেন ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী, সুসংবাদ দানকারী, অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সংবাদ দানকারী।

মহান আল্লাহ মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেননি যে, পরিশেষে তিনি সমস্ত মানুষদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পরিপূর্ণ করতে আগ্রহী। বরং সমস্ত মানুষ সত্য-সঠিক পথের অনুসারী হয়ে জান্নাতের অধিকারী হোক, এটাই আল্লাহ তা'য়ালার প্রবল ইচ্ছা। এ কারণেই তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন এমন এক ব্যবসার কথা, যে ব্যবসায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি এই মানুষ লিপ্ত হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে এবং পরিণামে জান্নাত লাভ করবে।

উল্লেখিত আয়াতে তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। প্রথম গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।' দ্বিতীয় গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রাসূলের প্রতি বিশ্বাস' এবং তৃতীয় গুণ হিসেবে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা।' আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তথা বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন ফরজ করা হয়েছে তেমনি ফরজ করা হয়েছে রাসূলের প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। সেই সাথে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করাও আল্লাহর এই প্রতিনিধি মানুষের ওপরে ফরজ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা সফ্-এর উল্লেখিত আয়াতে যে তিনটি গুণের কথা বলেছেন, এই তিনটি গুণের সমাহার যে মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে তিনিই সঠিক অর্থে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হবেন। এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে ঘোষণা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা 'ব্যবসা' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে অত্যন্ত সহজভাবে বুঝানোর জন্য এমন সব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, যে শব্দসমূহ সহজে মানুষের বোধগম্য। যে শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবে, আল্লাহ তা'য়ালা সেই শব্দই ব্যবহার করেছেন। মানুষের বোধের অগম্য কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

কিয়ামতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে, 'সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।' সূরা নাবার এই আয়াতে 'সূর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সূর শব্দের অর্থ হলো শিঙ্গা। অতীতে যখন বর্তমানের ন্যায় অত্যাধুনিক প্রচার যন্ত্র ছিল না, তখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মানুষকে অবগত করাতে হলে শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষকে একত্রিত করা হতো। বর্তমানেও সৈনিকদেরকে একত্রিত করার জন্য বিউগল্ বাজানো হয়। অর্থাৎ বিষয়টি যেভাবে পরিবেশন করলে মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হবে, সেভাবেই পরিবেশন করা হয়েছে। তেমনি 'ব্যবসা' শব্দ এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মানুষ সহজে বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

আর ব্যবসার কথা উল্লেখ করার কারণ হলো দুটো। প্রথম কারণ হলো, মানুষ স্বভাবগতভাবেই লাভের প্রতি প্রবল মাত্রায় আগ্রহী। যে ব্যবসায় অধিক লাভবান হওয়া যায়, মানুষ সে ব্যবসার প্রতি নিজেকে নিয়োজিত করে। সামান্যক্ষণ শ্রমদান করে যদি

অধিক লাভবান হওয়া যায়, তাহলে মানুষ সেদিকেই নিজের চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে। অল্প পূজি বিনিয়োগ করে যদি অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়, তাহলে এই সুযোগ কেউ হারাতে চায় না। এই বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য মাওলানা এহ্তেশামুল হক থানবী (রাহঃ) রূপক অর্থে এভাবে উদাহরণ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যার পেশা ছিল ব্যবসা এমন একজন ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। লোকটির পাপ ও পূণ্যের পাল্লা সমান থাকবে। ফেরেশ্তা লোকটিকে জানাবে, 'তোমার পাপ ও পূণ্যের পাল্লা তো সমান, এখন তুমি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে ?'

ব্যবসায়ী লোকটি ফেরেশ্তাকে বলবে, 'জনাব, আমি জান্নাত বা জাহান্নাম বুঝি না। যেখানে গেলে আমার লাভ হবে সেখানে আমাকে পাঠাও।'

এই রূপক গল্পটির অবতারণা এ জন্যই করা হলো যে, মানুষ ভীষণভাবে লাভজনক ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট। ব্যবসায় যদি কোন কারণবশত ক্ষতি হয় তাহলে মানুষকে বিমর্ষতা পেয়ে বসে। হৃদয়-মন থেকে তার আনন্দ-উচ্ছ্বাস দূরীভূত হয়। এ কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যবসার কথা বলেছেন, যেন মানুষের মন ঐসব গুণাবলী অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেসব গুণাবলী অর্জন করতে পারলে মানুষ প্রকৃত অর্থে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে পারে এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উত্তপ্ত ময়দানে দৃঢ়পদ থাকতে পারে।

ব্যবসার কথা উল্লেখ করার দ্বিতীয় কারণ হলো, ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে পূজিই শুধুমাত্র মূখ্য ভূমিকা পালন করে না। পূজির পাশাপাশি ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং শ্রম দানের ক্ষমতা থাকতে হবে। বাজারে কোন্ পণ্যের বর্তমান অবস্থা কি এবং কিভাবে তা বাজারজাত করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকলে ব্যবসায় ধ্বস নামতে বাধ্য। ব্যবসা সম্পর্কে কর্ম ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি যদি কয়েক কোটি টাকা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে নিরবে বসে থাকে, তাহলে তার লগ্নিকৃত সমুদয় অর্থ পূজির ভান্ডারে আর ফিরে আসবে না, মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তাকে।

সুতরাং ব্যবসায় সফলতা আনয়ন করতে হলে শুধুমাত্র পূজিই একমাত্র প্রয়োজন নয়, সেই সাথে ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মেধা, শ্রমদানের ক্ষমতা ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজন। এসব কিছু বিনিয়োগ করেও প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা আশা করা যায় না–ক্ষতিও হতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসা সম্পর্কিত যাবতীয় মূলধন ও যোগ্যতা প্রয়োগ করার পরেও মুনাফার সম্ভাবনা যেমন প্রবল তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা অবশিষ্ট রয়ে যায়। ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি পাশাপাশি অবস্থান করতে থাকে।

সূরা সফের উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ যে ব্যবসার কথা অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়েছেন এবং যে ব্যবসার প্রতি বান্দাদেরকে আকৃষ্ট হবার কথা বলেছেন, সে ব্যবসাটা হলো ঈমান সম্পর্কিত ব্যবসা এবং এ ব্যবসার উদ্দেশ্য হলো কঠিন পীড়াদায়ক

শান্তির স্থান জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা। এই ব্যবসার প্রধান মূলধন হলো ঈমান। সর্বপ্রথমে মানুষকে ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে স্বীকৃতি দিতে হবে–

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

ব্যবসায় অর্থ তথা পূজি বিনিয়োগ করে নীরবতা অবলম্বন করলে যেমন ব্যবসা হয় না, ব্যবসায় সফলতা অর্জন করতে হলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন হয়, তেমনি মৌখিকভাবে কালেমা পাঠ করে ঈমান আনার স্বীকৃতি দিয়ে অর্থাৎ 'ঈমান এনেছি' এই মূলধন বিনিয়োগ করে নীরব থাকলেই আল্লাহর সাথে ব্যবসা হবে না। আল্লাহর সাথে ব্যবসার মূলধন হলো তিনটি। যথাঃ–আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসুলের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করা।

ঈমান নামক মূলধন বিনিয়োগ করার সাথে সাথে এই প্রস্তুতিও তাকে গ্রহণ করতে হবে যে, আল্লাহর সাথে ব্যবসার ময়দানের অনিবার্য দাবি হিসেবে তাকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ ঈমান নামক মূলধন বিনিয়োগ করার পরপরই যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিনিয়োগকারীকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

কালেমা পাঠ করে ঈমানের পূজি বিনিয়োগ অর্থাৎ 'ঈমান এনেছি' এ কথার স্বীকৃতি দিলেই আল্লাহর সাথে ব্যবসা হবে না, ঈমান নামক পূজির পেছনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, মেধাশক্তি ইত্যাদিও যত্নের সাথে বিনিয়োগ করতে হবে। যে বিষয়টির ওপরে ঈমান আনয়ন করা হলো, তার সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে, যে কালেমা পাঠ করা হলো, তার আদর্শ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং সে আদর্শ ভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করার জন্য যাবতীয় যোগ্যতা বিনিয়োগ করতে হবে, আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে। আন্দোলনের ময়দানে প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রতিটি পদে তাকে অসহনীয় মারাত্মক ধরনের বিপদ-মু সিবতের মোকাবেলা করতে হবে। আল্লাহর সাথে যিনি ঈমানের ব্যবসা করবেন, বিপদ হবে তার চির সাথী। যে ব্যক্তি চরম বিপদে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই হবেন সফল ব্যবসায়ী।

ঈমান এনেছি অর্থাৎ ঈমানের পূজি বিনিয়োগ করেছি, এ কথা বললেই মানুষ দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে না এবং মহান আল্লাহও তাকে ছেড়ে দিবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ–

মানুষ কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি, এটুকু কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (সূরা আন্‌কাবুত-২)

এখানে এ কথা উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও যাবতীয় যোগ্যতা প্রয়োগ করার পরও যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়, আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসা সে ধরনের নয়। অর্থাৎ আল্লাহ যে ব্যবসার কথা বলেছেন, এই ব্যবসায় যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত করবে, সে ব্যক্তি কখনও ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। সে শুধু লাভবানই হতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন- تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ-

আল্লাহর সাথে ব্যবসায় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। (আল কোরআন)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে ঈমানের এই ব্যবসা করতে গিয়ে, অর্থাৎ ঈমান আনার পরে ঈমান আনয়নকারীর কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ঈমান আনার অপরাধে তাকে যদি অত্যাচারিত হতে হয়, অনাহারে দিবানিশি অতিবাহিত করতে হয়, পরম প্রিয়জনদেরকে চিরতরে হারাতে হয়, কারারুদ্ধ হতে হয়, ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে প্রাণ দান করতে হয়, তবুও সে লাভবানই হতে থাকে। ঈমান আনার পরে আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে যদি সে জীবিত থাকে তথা গাজী হয়, তবুও যেমন সে লাভবান হয়, কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দিয়ে যদি তাকে হত্যা করা হয়, তবুও সে লাভবানই হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে ব্যবসায় কোনভাবেই কোনদিক দিয়েই সামান্যতম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

কারণ বান্দাহ ঈমান আনার মাধ্যমে যখন মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা শুরু করে, তখন তার কোন দুঃখ বা চিন্তার রেশ অবশিষ্ট থাকে না। যাবতীয় দুঃখ, ব্যথা-বেদনার উর্ধ্বে এক স্বর্গীয় জগতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ পরিবেশে সে বিচরণ করতে থাকে। কারণ তার হৃদয় গহীনে সদা সর্বদা এ কথা গুঞ্জরিত হতে থাকে যে, এ জীবন এবং অর্থ-সম্পদ বলতে তার যা কিছু আছে, এসব তার নয়, এসবই মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই ব্যবসার পথে যে আঘাত আসছে, প্রহৃত হতে হচ্ছে, অনাহারে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করতে হচ্ছে, কারারুদ্ধ হতে হচ্ছে, ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ পূর্বক নির্মম রশি কণ্ঠে ধারন করতে হচ্ছে, তা সবই ঐ মহান আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক।

সুতরাং আল্লাহর সাথে যিনি ঈমানের ব্যবসা করেন, তাঁর কোনো দুঃখবোধ থাকে না। কারণ তাঁর আল্লাহ তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সমস্ত কিছু ঐ আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। (সূরা আনয়াম)

ঈমানের দাবিতে অটল থাকার উপায়

কালেমা পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ওপরে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা হলো। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আনুষঙ্গিক এমন কতকগুলো দিক এর সাথে জড়িত রয়েছে যে, সেদিকগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ও প্রবল বিশ্বাস না থাকলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে যিনি উত্তপ্ত ময়দানে দায়িত্ব পালন করবেন, তিনি মুহূর্তের জন্যেও ময়দানে দৃঢ়পদ থাকতে পারবেন না। বাতিল সৃষ্ট তান্ডবের আঘাতে তিনি কোমল লতার মত মুর্হূতেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়বেন।

সুতরাং দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে যারা আত্ম নিবেদিত, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ময়দানে টিকে থাকার জন্য পাথেয় একান্ত প্রয়োজন। এই পাথেয়গুলোই শক্তিশালী পাথেয়, রক্তঝরা ময়দানে টিকে থাকার সম্বল। প্রথম পাথেয়, মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন। দ্বিতীয় পাথেয়, আল্লাহর গুণাবলীর ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস। তৃতীয় পাথেয়, আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি ও দৃঢ় বিশ্বাস। চতুর্থ পাথেয়, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

ময়দানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা সংগ্রামরত, উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস থাকা একান্ত জরুরী। এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে যাদের ধারণা অস্বচ্ছ, বিশ্বাস দুর্বল তাদের পক্ষে কোনক্রমেই আন্দোলনের ময়দানে ক্রিয়াশীল থাকা সম্ভব নয়। এদিকগুলো সম্পর্কে যাদের হৃদয়ে অস্বচ্ছ ধারণা বিদ্যমান এবং বিশ্বাস দুর্বল, বিপদের ঘনঘটা দেখলেই তাদের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয়, 'আল্লাহ কি আছেন !'

বিপদ পরিবেষ্টিত হবার পরে হৃদয়-মনে এ ধরনের চিন্তার উদ্রেক হয় এবং মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হয় দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের। দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, ঈমান যত দুর্বল হবে তারা ততবেশী হতাশ হয়ে পড়বে। কারণ ঈমানের দুর্বলতা মানুষের ভেতরে নৈরাশ্য আর হতাশা সৃষ্টি করে, অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, ভীতি সৃষ্টি করে।

আর যাদের ঈমান যতটা সবল হবে, তারা ততটা দৃঢ়পদে ময়দানে অবিচল থাকেন। তাদের ভেতরে সামান্যতম নৈরাশ্য, হতাশা, ভীতি সৃষ্টি হয় না। কারণ তাদের এ চেতনা শানিত থাকে যে, 'মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীত বা অতিরিক্ত কোন কিছুই ঘটা কখনই সম্ভব নয়। যা ঘটবে তা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঘটবে।'

ঈমানের শর্তের প্রতি এই স্বচ্ছ ধারণা ও বিশ্বাস থাকার কারণে মুমীন কখনও হতাশাগ্রস্থ হয় না। দুঃখ-বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। চরম বিপদে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে না, সে চোখ নিবদ্ধ থাকে মহান আরশে আযীমের দিকে। ফাঁসীর মঞ্চেও তার মুখে ফুটে ওঠে মাধুর্যমন্ডিত স্নিগ্ধ হাসি।

প্রথম শর্তই হলো মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন। এ বিষয়ে তেমন কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা

যায় যে, আল্লাহ নেই-এ কথার পক্ষে অবিশ্বাসীরা কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ যে আছেন, এ কথার পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সময়ে আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে দাবি করেছিল, আল্লাহ নেই। এ ব্যাপারে ইমামের সাথে কথোপকথনের জন্য একদিন সময় নির্ধারণ করা হলো।

নাস্তিক ব্যক্তি যথা সময়ে এসে বিতর্ক স্থলে উপস্থিত হলো। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) নির্ধারিত সময়ের বেশ পরে এসে উপস্থিত হলেন। নাস্তিক ব্যক্তি অভিযোগের সুরে বললো, 'এমন ব্যক্তির সাথে কোন বিতর্ক করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা-যাঁর কথার কোন মূল্য নেই।'

ইমাম বললেন, 'কেন আমার আসতে দেরী হলো তা তোমাকে জানানো প্রয়োজন। নদীর ওপারে আমার আবাসস্থল। এখানে আসতে হলে আমাকে নদী পাড়ি দিয়ে আসতে হয়। আমি নদীর পাশে এসে দেখলাম, নদী পারাপারের কোন উপকরণ নেই। হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একটি বৃক্ষ। আমি দেখতে পেলাম কোথা থেকে একটি করাত এসে বৃক্ষটিকে কেটে তক্তায় পরিণত করলো। তারপর নৌকা প্রস্তুত করার যাবতীয় উপকরণ এসে উপস্থিত হলো। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকলাম কোন মানুষের সহযোগিতা ব্যতীতই একটি নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল।

এরপর নৌকাটি আমার সামনে এসে উপস্থিত হলো। আমি নৌকায় আরোহণ করলাম। তারপর নৌকাটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমাকে নদীর এপারে পৌছে দিয়ে গেল। এ কারণেই আমি নির্ধারিত সময়ে এসে তোমার কাছে পৌছতে পারিনি।

ইমাম আযম (রাহঃ)-এর কথা শুনে নাস্তিক লোকটির দৃষ্টি বিস্ফোরিত হলো। সে ইমামের প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিদ্রুপ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলো,'সময় ও কথার মূল্যই তুমি শুধু দিতে জানো না তাই নয়-সেই সাথে তুমি একজন বড় মিথ্যাবাদী। কেননা, কোন মানুষের সহযোগিতা ও পরিকল্পনা ব্যতীত একটি গাছ তক্তায় পরিণত হয়ে আপনা আপনিই নৌকা তৈরী হতে পারে না।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) নাস্তিক লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে দৃঢ় প্রত্যয়ে বললেন, 'কোন পরিকল্পনাবিদের পরিকল্পনা ও সহযোগিতা ব্যতীত এভাবে যদি একটি সামান্য নৌকা নির্মিত না হয়, তাহলে এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সৌরজগত কিভাবে সৃষ্টি হলো ? কিভাবে এগুলো সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে ?'

নাস্তিক লোকটির হৃদয়ের বদ্ধ দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে গেল। লোকটি স্পষ্ট অনুভব করলো, দীর্ঘ দিন সে মারাত্মক ভ্রমে নিমজ্জিত ছিল। দ্রুত সে ইমামের হাতে হাত রেখে তওবা করে ইসলাম কবুল করলো।

পৃথিবীর এই মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো কোন সাধারণ মানুষ সৃষ্টির সেই শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহর অস্তিত্বে

অবিশ্বাস পোষণ করেনি। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং বর্তমানেও করছে, শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর তথাকথিত দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণই আল্লাহকে অস্বীকার করেছে।

বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নাস্তিক্যবাদে আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গ নানা ধরনের ডিগ্রী অর্জন করেও গ্রামের ঐসব নিরক্ষর কৃষকের সমপর্যায়ের যোগ্যতাও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যে কৃষক তার নিজের দেহ আর পালিত পশুর মল ত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করে মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। কৃষক যখন দেখেছে, তার পালিত পশুটি বৃক্ষ-তরুলতার পাতা আর ঘাস ভক্ষণ করে এবং মল হিসেবে ত্যাগ করে ভক্ষিত দ্রব্যের বিপরীত বস্তু, তখন তার চিন্তার জগতে এ কথার উদ্রেক হয়েছে, বিষয়টি কোন পরিকল্পনাবিদের পরিকল্পনা ব্যতীত কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা। পদার্থের রূপান্তর এভাবে যিনি ঘটাচ্ছেন তার পেছনে একজন মহান স্রষ্টা নিশ্চয় রয়েছেন, যার নাম 'আল্লাহ'–তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন।

নিরক্ষর কৃষক যখন তার নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, তার এই হাতটি কিভাবে খাদ্য উঠিয়ে নিয়ে মুখের কাছে আসে। হাতের এই অবস্থা দেখে তার চিন্তার সাগরে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। সহজ-সরলভাবে সে বুঝেছে, তার এই গোটা হাতের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলো না থাকলে তার এই হাত নামক অঙ্গটি একটি লাঠি ব্যতীত আর কিছুই হতো না এবং তা বক্র হয়ে মুখের কাছেও আসতো না। এক মহান সত্তার পরিকল্পনার অধীনে হাতের এই গ্রন্থিগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিকল্পনাবিদের নাম হলো 'আল্লাহ।'

অক্ষর জ্ঞানহীন মজুর ব্যক্তিটি তার বাড়িতে পালিত কবুতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সে দেখেছে, ক্ষুদ্রাকৃতির দুটো ডিম থেকে ২০/২১ দিনের ব্যবধানে বিস্ময়কর ছোট্ট দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এলো। একটি শস্যদানাও আহার করার এবং পরিপাক করার ক্ষমতা তার নেই। বাচ্চা দুটোর জনক-জননী নরম মাটি ভক্ষণ করে এসে তা উদগিরণ করে বাচ্চাকে আহার করাচ্ছে।

নিরক্ষর ব্যক্তিটি এ দৃশ্য দেখে চিন্তা করেছে, কবুতর আহার করে শক্ত শস্যদানা। কিন্তু যে কবুতরের ছোট্ট শাবক রয়েছে সে কবুতর আহার করছে কোমল মৃত্তিকা। এর কারণ কি? এর কারণ হিসেবে তার সহজ-সরল বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে, শক্ত শস্যদানা আহার করালে তার বাচ্চা এখন তা হজম করতে পারবে না। এ কারণে কবুতর তার ছোট্ট শাবককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোমল মৃত্তিকা আহার করে এসে তা বাচ্চার মুখে উদগিরণ করে দিচ্ছে–যেন বাচ্চা তা সহজে পরিপাক করতে পারে। বাকশক্তিহীন সামান্য একটা কবুতরকে এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের জ্ঞান যিনি দান করেছেন, তার পরিচয় হলো 'আল্লাহ।'

ব্যাড়ির গাভী বা ছাগল বাচ্চা প্রসব করেছে। সে বাচ্চা কিছুক্ষণ পরেই টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে গর্ভধারিণীর পেছনের দু'পায়ের মাঝে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যের সন্ধান করছে। দুধ মুখের ভেতরে নিয়ে চুষতে আরম্ভ করেছে আর মাথা দিয়ে বার বার দুধের স্থানের গোস্ত পিন্ডে আঘাত করছে। বাচ্চা প্রসবের পূর্বে সে স্থানে দুধ ছিল বরফের মতই জমাট বাঁধা। শাবকের মাথার আঘাতে সে দুধ গলে গলে দুধবাহী নালীতে এসেছে আর শাবক তা চুষে পান করে উদর পূর্ণ করছে। এই দৃশ্য যখন রাখাল অবলোকন করেছে, তখন তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, এই প্রক্রিয়া সদ্যজাত ঐ শাবককে কে শিখিয়ে দিল ? তার মনের গহীন থেকে প্রশ্নের উত্তর এসেছে, শিক্ষাদাতা হলেন স্বয়ং 'আল্লাহ।'

মুরগীর বাচ্চার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, চিল বা বাজ পাখী দেখলে মা মুরগী একটা বিশেষ ধরনের শব্দ করে। সদ্যজাত মুরগী ছানা সে শব্দ শোনার সাথে সাথে আত্মগোপন করে। মা মুরগী একটা বিশেষ শব্দ করলো আর সদ্যজাত ছানাগুলো বুঝে নিল এটা একটি বিপদ সংকেত। এখন ঐ বাচ্চাকে এই সিগ্ন্যাল সম্পর্কে কে অভিহিত করলো যে এটা বিপদ সংকেত ?

এই বিপদ সংকেত বোঝার ক্ষমতা যিনি দান করলেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। একশ্রেণীর নাস্তিকগণ বলে থাকেন যে, মুরগী ছানার জনক-জননীর ভেতরে ভীতির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল, চিল বা বাজপাখী যে তাদের জন্য বিপজ্জনক এই প্রবণতা তাদের রক্তের ভেতরে বিদ্যমান। যে ধরনের অনুভূতি জনক-জননীর ভেতরে বিদ্যমান ছিল, প্রজননের মাধ্যমে যে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলো, ঐ প্রবণতা বাচ্চার ভেতরেও সংক্রামিত হলো। এ কারণে মুরগীর বাচ্চা চিল দেখেই আত্মগোপন করেছে।

তাদের এই যুক্তি যে কতটা অর্থহীন তা এই নাস্তিকগণ অনুভব করতে চায় না। এরা হলো হতভাগ্য, এ কারণে সামান্য বিষয় তাদের মাথায় প্রবেশ করে না। যেমন মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়। নারী-পুরুষ উভয়েই সাপ দেখলে ভয় পায়। এই নারী ও পুরুষ থেকে আরেকটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো, এই শিশুটি যখন এক বা দেড় বছরের হলো তখন সে হাতের কাছে যা পায় তাই ধরতে শিখলো। তার সামনে যদি একটি বিষাক্ত সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়ায়, শিশু সাপ দেখে ভয় পেয়ে পালায় না বা চিৎকার দেয় না। সে খেলার ছলে সাপটিকে ধরতে যায়।

মাতা-পিতা সাপ দেখলে ভয় পায় অর্থাৎ তাদের ভেতরে ভীতির অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এই অনুভূতি কেন তার শিশু সন্তানের ভেতরে সংক্রামিত হলো না ? প্রকৃত অর্থে বিষয়টি হলো, মুরগীর বাচ্চার কাছে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ নেই, তাকে হেফাজত করার কেউ নেই, এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে বোঝার তওফিক দান করেছেন কোনটা বিপদ সংকেত। আর মানুষের শিশুকে লালন-পালন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন তার মাতা-গিতার ওপরে। এ কারণে শিশুর ভেতরে বিপদ সংকেত বোঝার মত অনুভূতি দেয়া হয়নি। এই ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তাঁর নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

বিড়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, তার যখন প্রসব কাল অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে তখন সে নিরব নির্জন গোপন স্থান অনুসন্ধান করতে থাকে। প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব থেকেই গর্ভবতী বিড়াল প্রসবের স্থান খুঁজতে থাকে। তারপর সে গোপন স্থানে বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চা সে একস্থানে রাখে না, কয়েক দিন পরপর সে স্থান পরিবর্তন করে। মা তার শাবকের ঘাড়ে আলতোভাবে কামড়ে ধরে স্থান পরিবর্তন করে। শত্রু যেন কোনক্রমেই তার শাবকদের সন্ধান না পায় এ জন্য মা বিড়াল এটা করে থাকে। শাবককে রক্ষা করার জন্য বিড়ালকে সতর্কতা অবলম্বনের অনুভূতি যিনি দান করেছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এসব দেখে সাধারণ মানুষের মনে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পরও এক শ্রেণীর পন্ডিত ব্যক্তি মহান আল্লাহ সম্পর্কে অবিশ্বাস পোষণ করেছে। যৌগিক পদার্থ আর মৌলিক পদার্থের পেছনে ছোটাছুটি করতে করতে এদের অনেকেই বয়সের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছে, কিন্তু নিরক্ষর কৃষকের মতো স্রষ্টার নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের সময় এদের ভাগ্যে জোটেনি। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকগুলো হলো সবচেয়ে হতভাগা। এদের আকার আকৃতি মানুষের মত দেখতে হলেও মহান আল্লাহ এদেরকে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ-لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا-اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ-اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ-

এ কথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তকরণ রয়েছে, কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-গবেষণা করে না। তাদের চোখ রয়েছে; কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ শক্তি রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তা থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা আ'রাফ-১৭৯)

যারা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাদের বুঝার মত জ্ঞান রয়েছে, এই জ্ঞান দিয়ে তারা সমস্ত কিছুই অনুভব করলো, অনুভব করতে পারলো না শুধু মহান আল্লাহকে। এদের দর্শন শক্তি রয়েছে, শ্রবণ শক্তি রয়েছে, আল্লাহর দেয়া এসব শক্তির সাহায্যে তারা পৃথিবীর সমস্ত কিছুই দেখেছে এবং শুনেছে, কিন্তু মহাসত্য তারা দেখতে পায়নি, মহাসত্যের বাণী তারা শুনেও শোনেনি। এ জন্যই এদেরকে পশু পদবাচ্যে বিশেষিত করা হয়েছে।

আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিদেরকে পশু পদবাচ্যে চিহ্নিত করার কারণ হলো; এক শ্রেণীর পশু তার মনিবের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত এবং অবগত। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক দেশেই বাড়িতে কুকুর লালন-পালন করা হয়। বিভিন্ন দেশের সরকারের কুকুর বাহিনী রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরগুলো লুকায়িত মাদক দ্রব্যের, অস্ত্রের সন্ধান জানিয়ে দেয় এবং অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারে। গৃহপালিত কুকুর চৌকিদারের ভূমিকা পালন করে। তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ করে সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। গভীর রাতে নিকষ কালো অন্ধকারে গৃহকর্তা বাড়িতে আসার সময় কুকুর তার ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে অনুভব করতে পারে, তার মনিব আসছে। সে ছুটে গিয়ে মনিবকে স্বাগতম জানায়। আর অপরিচিত কেউ আসতে লাগলে কুকুর ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে, আক্রমণ করার জন্য ছুটে যায়।

সুতরাং কুকুরের মতো একটি প্রাণীও তার মনিবকে চিনে। কিন্তু মানুষের মতো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ একটি জীব যখন তার আপন প্রভু মহান আল্লাহকে চিনতে ব্যর্থ হয়, আল্লাহকে অস্বীকার করে, তখন তো সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। কারণ পশুর যে যোগ্যতা বিদ্যমান, সে যোগ্যতা আল্লাহকে অস্বীকারকারী ঐ মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অতএব ঈমান আনার প্রথম শর্ত বা আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসার সর্বপ্রথম কথাই হলো, আল্লাহকে চিনতে হবে, আল্লাহর অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো আল্লাহর গুণাবলীর ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন পানি, পানির অপর নাম হলো জীবন। কিন্তু এই পানি আবার জীবনহানির কারণও ঘটাতে পারে এ কথা মানুষ বিশ্বাস করে। প্লাবন যখন তীব্র গতিতে আসে, তখন বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়, অসংখ্য ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদের ক্ষতি হয়, প্রাণহানী ঘটে। পানির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা এমন গুণাবলী দান করেছেন, যা দ্বারা কল্যাণও লাভ করা যায়, আবার অকল্যাণও হতে পারে—পানির এই গুণাবলীর প্রতি মানুষ বিশ্বাসী।

গোটা সৃষ্টিকে প্রতিপালন করার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পানির ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ পাক। এই পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ হলো পানি আর এক ভাগ হলো স্থল। পানির ভাগ বেশী করার কারণ হলো, পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখা। পানি ব্যতীত পৃথিবী টিকে থাকতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ পাক বিশাল আকারের জলাধার নির্মাণ করেছেন। সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এসবের পানি প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বত্র পৌঁছতে সক্ষম হবে না বলে আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড় নির্মাণ করেছেন। মাটির প্রতিটি স্তরে তিনি পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

এত পানির ব্যবস্থা করার পরও চাহিদা পূরণ হবে না বলে মহান আল্লাহ বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাপ সৃষ্টি করেছেন। এই তাপের কারণে পৃথিবীর জলভাগের পানি বাষ্প আকারে উর্ধ্বে চলে যায়। তারপর তা মেঘমালায় পরিণত হয়। তারপর তা আল্লাহর আদেশে শীতল থেকে শীতলতর হতে থাকে। এক সময় তা প্রচন্ড ভারী হয়ে যায়। আল্লাহ

আদেশ দান করেন, বৃষ্টির আকারে পানি পৃথিবীর বুকে ঝরতে থাকে। এ পৃথিবীর কোথায় কোন কোণে একটি শুষ্ক বালু কণা অবস্থান করছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেটাকেও সিক্ত করার সুব্যবস্থা করেন।

এমনিভাবে মানুষ বিষের গুণাবলী, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাবলী, মৃত্তিকার গুণাবলী তথা দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান যাবতীয় বস্তুর প্রতি শুধু বিশ্বাস-ই করে না, এসব বস্তুর গুণাবলীর প্রতিও মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আগুনের অস্তিত্বেই মানুষ শুধু বিশ্বাস করে না, আগুন যে একটি দাহ্য বস্তু, আগুনের দহন ক্ষমতা রয়েছে, এ কথা প্রতিটি মানুষই বিশ্বাস করে। সাপের অস্তিত্বে মানুষ যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি সাপের এ গুণাবলীর প্রতিও মানুষ বিশ্বাস করে, সাপ দংশন করলে তার বিষের ক্রিয়ায় প্রাণ হারাতে হবে। মানুষ বনের হিংস্র বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই সাথে এ কথাও মানুষ বিশ্বাস করে যে, বাঘের ভেতরে হিংস্রতা বিদ্যমান। বাঘের এই গুণাবলীসহ মানুষ বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকে।

এই পৃথিবীতে মানুষ শুধুমাত্র বস্তুর প্রতিই বিশ্বাস করে না, বস্তুর গুণাবলীসহ বস্তুকে বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি, শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলেই যথাযথ অর্থে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হওয়া যাবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না, জাহান্নাম থেকে মুক্তিও লাভ করা যাবে না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পূর্ণ ধারণা না থাকলে ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মীর পক্ষে ময়দানের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকাও যাবে না। এ জন্য মুমীন হতে হলে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বে যেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হতে হবে, সেই সাথে মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিও গভীর আস্থাশীল হতে হবে।

মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এবং যা কিছু মানুষের দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে বিদ্যমান, তারও স্রষ্টা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মাছির সামান্য একটা পাখা তৈরী করতে সক্ষম। তবে মানুষকে এ জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম-কিন্তু মানুষ স্বয়ং কোন বস্তুর স্রষ্টা নয়। বস্তুর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনি প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতিপালক হিসেবে অন্য কোন শক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তিনি তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির লালন ও পালন কর্তা। কোথায় কোন্ সৃষ্টি অবস্থান করছে, কোন্ সৃষ্টির কখন কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। সাগর-মহাসাগরের অতল তলদেশে শৈবালদামে আবৃত প্রস্তর খন্ডে বসবাসরত এমন ক্ষুদ্র একটি পোকা, যা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টি গোচর হবে না, সে পোকাটিরও আহারের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করে থাকেন।

মানুষের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছে না এবং যেখানে অনুভূতিও ক্রিয়াশীল থাকে না, এমন কোন স্থানে কোন সৃষ্টি যদি বিপদগ্রস্থ হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, সে আর্তনাদ তিনি শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

তিনিই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী। তিনি স্রষ্টা, তিনিই প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্য তিনিই দান করেছেন, পৃথিবীকে যেমনভাবে সৃষ্টি করলে অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জীবসমূহের যে অঙ্গ দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি স্থাপন করেছেন। যে বস্তুর মধ্যে যে ধরনের গুণাবলী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, সে বস্তুর ভেতরে তিনি সেই গুণাবলীই দান করেছেন। প্রতিটি খাদ্য বস্তুকে তিনি তার বান্দার আহারের জন্য আবৃত করে দিয়েছেন। যাবতীয় প্রশংসামূলক কর্ম এবং প্রশংসাযোগ্য কার্যাবলী তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। এ জন্য যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনিই সর্বশক্তিমান। সমস্ত কিছুর ওপরে তিনিই একমাত্র শক্তিশালী। তাঁর শক্তি সমস্ত কিছুর ওপরে পরিব্যপ্ত। তাঁর শক্তির মোকাবেলায় তাঁরই সৃষ্টি অন্যান্য শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে অসহায়। তাঁর শক্তির সামনে দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একেবারেই ভঙ্গুর। তিনি মুহূর্তেই সমস্ত কিছু ধ্বংস স্তুপে পরিণত করতে সক্ষম এবং প্রজ্জ্বলিত অনল কুন্ড পুষ্পকাননে পরিণত করতেও সক্ষম। মানুষ যাকে মহাশক্তিশালী হিসেবে জ্ঞান করে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় এসব শক্তির সামান্যতম কোন মূল্য নেই। মানুষের কাছে অসম্ভব বলে যা বিবেচিত হয়, আল্লাহ পাকের কাছে তা অত্যন্ত সহজ।

মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কাঠি একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তিনিই মানুষকে ধন-দৌলত দান করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে অসহায় দরিদ্রে পরিণত করতে পারেন। তিনিই মানুষকে বিপদগ্রস্থ করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এ সমস্ত গুণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কারো ভেতরে উপস্থিত নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذاً مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কোন সত্ত্বাকে ডেকো না যারা তোমার কোন কল্যাণ করার বা কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যদি তোমরা এমন কাউকে ডাকো তাহলে তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুছ-১০৬)

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তাহলে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।

মানুষসহ যে কোন প্রাণীর আহার দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত খাদ্যের ব্যবস্থা আর কেউ করতে পারে না। কোথা থেকে কিভাবে তিনি মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা করবেন, এ দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, কাউকে তিনি অনাহারে রাখবেন, সেটাও তিনি পারেন আবার তিনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কাউকে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিয্ক প্রদান করবেন, তাও তিনি পারেন। তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়, তাঁর কার্যাবলীতে কেউ হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম নয়। যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম।

সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোন প্রয়োজনের জন্য তাঁকে কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় না। বরং সমস্ত সৃষ্টিই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ পাকের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে থাকে। মাতৃগর্ভে যে সন্তান অবস্থান করছে, সে সন্তান কি আহার করে বৃদ্ধি লাভ করবে, এ চিন্তা সন্তানের জনক-জননীকে করতে হয় না। পৃথিবীর কোন কর্তৃত্ব পরায়ণ শক্তিও গর্ভস্থ সন্তানের আহারের চিন্তা করে না। আহার দাতা আল্লাহ পাক, মাতৃগর্ভে ঐ সন্তানকে জীবিত রাখার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার আহারের ব্যবস্থা করেন।

মুরগীর ডিম দেয়া যখন শেষ হয়ে যায়, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ মুরগীর শরীরের স্বল্প মেয়াদী এক ধরণের জ্বর সৃষ্টি করে দেন। ফলে মুরগীর শরীরে ঐ পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি হয়, যে পরিমাণ উত্তাপ থাকলে ডিম ফুটে বাচ্চা নির্গত হবে। ডিম দেয়া শেষে মুরগীর শরীরের যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, এর ফলে মুরগীর ভেতরে জড়তা সৃষ্টি হয়। মুরগী এক স্থানে বসে থাকতে চায়। বাচ্চা ফোটানোর জন্য মুরগি ডিমগুলো পেটের নিচে নিয়ে শুধু নিরবে বসেই থাকে না। নিজের মুখের সাহায্যে ডিমগুলো সে দিনের মধ্যে কয়েক বার ওলট-পালট করে দেয়-যেন সবগুলো ডিম সমপরিমাণ তাপ লাভ করতে পারে।

এরপর ডিমের মধ্যে যখন বাচ্চার অস্তিত্ব দেখা দিল, তখন তার আহারের প্রয়োজন হয়। ডিমের মধ্যে সাধারণত দুটো অংশ দেখা যায়। একটি হলো সাদা অংশ আরেকটি হলো কুসুম বা হলুদ অংশ। ঐ হলুদ অংশ থেকে বাচ্চা সৃষ্টি হলো। আর এই বাচ্চা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে তার চারপাশে অবস্থিত সাদা অংশগুলো ফলে ডিমের খোসা ঘনত্ব হারিয়ে ফেলে। যেদিন খাবার শেষ হয়ে যায়, সেদিন বাচ্চা নিজের ঠোঁটের সাহায্যে ঠোকর দিয়ে ডিমের পাতলা খোসা ভেঙ্গে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেরিয়ে আসে। এই ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক পন্থায় যিনি সম্পাদন করেন, তাঁর নাম হলো 'আল্লাহ।'

এভাবে আল্লাহ ছুবাহানাহু তা'য়ালার যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর অস্তিত্বে পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। এরই এসব গুণাবলী সম্পর্কে একজন মুসলমানের যদি স্বচ্ছ ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি যত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হন না কেন, অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। প্রতিকূল ময়দানে তিনি দৃঢ়পদে অবস্থান করতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে ঈমানের ব্যবসার তৃতীয় শর্ত হলো, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, **'সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ।'**

তিনি ইচ্ছে করলে দিনকে রাতে পরিণত করতে পারেন, আবার রাতকে দিনে পরিণত করতে পারেন। বিশাল ঐ আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরকে নিমিষে স্থলভাগে পরিণত করতে পারেন। আবার এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগকে মুহূর্তে জলভাগে পরিণত করতে পারেন। তিনি জীবিতকে মৃতে পরিণত করতে সক্ষম, মৃতকে জীবিত করতে পারেন। যে লোক কপর্দকহীন অবস্থায় ছিন্ন বস্ত্রে ভিক্ষার থালা হাতে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে একটি পয়সার জন্য আর্তচিৎকার করছে, আল্লাহ তা'য়ালা মুহূর্তের ভেতরে তাকে সেখানে থেকে উঠিয়ে রাজ সিংহাসনে আসীন করে দিতে পারেন।

যিনি রাজ তখ্‌তে বসে ক্ষমতার দম্ভে অহংকারে মদমত্ত হয়ে দোর্দন্ড প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন, ক্ষণিকের মধ্যে এই দোর্দন্ড প্রতাপশালী লোকটিকে লাঞ্ছিতাবস্থায় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়ে দিতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুই ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে দিতেন। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়ে নানা ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এসব যন্ত্রের সাহায্যে অসম্ভব বলে যা মনে হয় তাই তারা সম্ভবে পরিণত করছে।

মাতৃগর্ভে ভ্রুণাকারে যা অবস্থান করছে, সে ভ্রুণ কোন লিঙ্গের অধিকারী, তা মানুষের আবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা চিহ্নিত করা যাচ্ছে। বুকের ভেতরে হৃদপিন্ডের সামান্যতম দুর্বলতাও চিহ্নিত করছে। কিন্তু আল্লাহ ছুব্‌হানাহু ওয়াতা'য়ালা কোথায় কখন কোন অবস্থায় তাঁর অসীম ক্ষমতার সামান্য অংশ প্রয়োগ করবেন, তার আগাম পূর্বাভাষ দান করার মত কোন যন্ত্র মানুষ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুরস্কে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে অগণিত মানুষ প্রাণ হারালো, শত শত কোটি ডলারের সম্পদ বিনষ্ট হলো, এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ কেউ দিতে পারেনি। ভারতের গুজরাট রাজ্যে গত ২৬/০১/২০০১ তারিখে ভূমিকম্পের তান্ডব বয়ে গেল। কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালো। যে মুহূর্তে সেখানে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল, সে মুহূর্তে সেখানের মানুষ তাদের জাতীয় উৎসব পালনে ছিল বিভোর। কেউ নৃত্যরত ছিল, কেউ ছিল পানরত। নিঃশঙ্ক চিত্তে বন্ধনহীন আমোদ ফূর্তিতে তারা মেতে উঠেছিল। সামান্য কোন বিপদ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে–এ কথা তাদের কল্পনাতেও ছিল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর একটি অংশ সেখানে প্রয়োগ করলেন। চোখের পলকে জলাধার পরিবর্তিত হয়ে পর্বতে পরিণত হলো, নৃত্যরত হাস্যোচ্ছল অসংখ্য নারী-পুরুষ প্রাণ হারিয়ে চিরতরে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গগন চুম্বী অট্টালিকাসমূহ মাটির অতলে তলিয়ে গেল, ধ্বংস স্তুপে পরিণত হলো। ব্যর্থ হয়ে গেল মানুষের তৈরী করা যাবতীয় রাডার ব্যবস্থা। জনকোলাহল পূর্ণ নগরী মৃত নগরীতে পরিণত হলো। প্রবল একটা মাত্র ঝাঁকুনিতেই স্তব্ধ হয়ে গেল মানুষের মিথ্যে আস্ফালন।

ভূমিকম্পের ধ্বংস লীলা কিভাবে সাধিত হয়, আমি টিভির পর্দায় তা নিজের চোখে দেখেছি। বেশ কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের লসএ্যাঞ্জেলস্-এ এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হয়েছিল। আমেরিকার মহাশুন্য গবেষণাগার (নাসা) ভূমিকম্পের ধ্বংস লীলার সে দৃশ্য ধারণ করেছিল। এই নাসার ওয়াশিংটনস্থ অফিসে বিশাল টিভির পর্দায় ভূমিকম্পের দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছিল। সেখানে আমাকে নেয়া হয়েছিল। আমি দেখলাম ভূমিকম্পের দৃশ্য। সাগর-মহাসাগরের ভেতরে পানি যেমন আবর্তিত হতে থাকে, প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডব লীলায় মহাসাগরের বুকে যেমন পর্বত সমান উচুঁ ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়, তেমনি দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার বুকে।

সেখানের রাস্তাগুলো দোতলা-তিনতলা। গোটা শহর ব্যাপী যখন সাগরের মতো ঢেউ সৃষ্টি হলো, তখন দোতলা-তিনতলা রাস্তাগুলো একটার ওপরে আরেকটা আছড়ে পড়ে এমনভাবে মিশে গেল যে, রাস্তাগুলো এক সময় বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল তা বোঝার কোন উপায় রইলো না। সেই দোতলা-তিনতলা রাস্তার প্রতিটি রাস্তাতেই সে সময় অসংখ্য যান-বাহন দ্রুতবেগে ধাবমান ছিল। ধাবমান গাড়িগুলো এক মুহূর্তে চ্যাপটা হয়ে টিনের পাতে পরিণত হলো। বিশালাকৃতির অট্টালিকাসমূহ চোখের পলকে এমনভাবে মাটির সাথে মিশে গেল যে, কোনদিন যে এখানে অত্যাধুনিক নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, তো বোঝার কোন চিহ্ন রইলো না। আমি টিভির বিশাল পর্দায় প্রলয়ঙ্করী এই দৃশ্য দেখে স্থান কাল পাত্র ভুলে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে উঠে ছিলাম।

এই ধ্বংস লীলা সাধিত হলো মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী এই প্রবল ধ্বংসকরী ভূমিকম্পে অগণিত আদম সন্তান, অসংখ্য প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলো, বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ধন-সম্পদের ধ্বংস স্তুপে পরিণত হলো। কল্পনার অতীত এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে আল্লাহ্ তা'য়ালার বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়নি। এই ধ্বংস লীলা সাধন করার জন্য কোন বাহিনীরও প্রয়োজন হয়নি। তিনি শুধুমাত্র একটি আদেশ দান করেন, 'কুন' হও—আর অমনি হয়ে যায়।

আল্লাহর জন্য মাত্র দুটো অক্ষর প্রয়োগ করতে হয়। 'কুন'—এই কুন বলার সাথে সাথে তা সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তার ব্যাপারে কুন বলার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَه كُنْ فَيَكُوْنَ-

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের উদ্ভাবক তিনি আল্লাহ, যিনি কোন জিনিসের প্রতি যখন আদেশ দেন তখন শুধু বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। (বাকারা-১১৭)

পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত এই 'কুন' শব্দের দুটো অর্থ করা হয়েছে। বর্তমান কালে ও ভবিষ্যৎ কালে শব্দ দুটো ব্যবহৃত হলে বিষয়টি এমন হবে যে, মহান আল্লাহ এখনই যেটা চান, তা কুন বলার সাথে সাথে তা সংঘটিত হয় যায়। আর ভবিষ্যতে যেটা হবে, সে ব্যাপারে কুন বলার সাথে সাথে তা সংঘটিত হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

এসব ঘটনা চোখে দেখেও একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতায় বা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায় না। এদের জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয় না। এরা বলে থাকে যে, এসব সংঘটিত হয় প্রকৃতির কারণে-এই ঝড়, বৃষ্টি, জলোচ্ছাস, প্লাবন, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস ইত্যাদি হলো প্রকৃতির লীলাখেলা। কিন্তু এরা এ কথা বুঝতে চায় না, এই প্রকৃতি তো স্বাধীন কোন সত্তার নাম নয়। এই প্রকৃতি তো মানুষের মতো স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন কোন জীবের নাম নয় যে, তা আল্লাহর অবাধ্য হবে। এই প্রকৃতিও মহান আল্লাহর গোলাম। তিনি যেভাবে তা পরিচালিত করেন, তা সেভাবেই আদেশ পালন করতে বাধ্য।

মহান আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকরী। এসব কিছু সংঘটিত করতে তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট। তিনি যা খুশি তাই করে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ-

তিনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত কর্ম সম্পাদনকারী। (সূরা বুরুজ-১৬)

ঐ সমস্ত মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো এটাই যে, এসব দৃশ্য দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান দেখেও তাদের চেতনা উদয় হয় না। সামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ সীমা লংঘন করতে থাকে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। দেশ ও জাতির বুকে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেয়। পরিণতির কথা এরা চিন্তা করে না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা দেখেও এরা আল্লাহর কাজের প্রতি স্বীকৃতি না দিয়ে বলে থাকে, এসব হলো প্রকৃতির কর্ম। এ ধরনের কথা বলার অর্থ হলো মহান আল্লাহর প্রতি উপহাস করা। আর এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেছেন-

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ-

আল্লাহও এদের প্রতি বিদ্রুপ করেন; তিনি এদের রশি ঢিল দিয়ে লম্বা করে দেন। আর এরা আল্লাহদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে। (সূরা বাকারাহ্-১৫)

যারা সীমা লংঘন করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সুযোগ দান করেন। তিনি দেখতে থাকেন, পৃথিবীর জালিমগুলো কতদূর যেতে পারে। তাদেরকে সুযোগ দেয়ার অর্থ হলো, তারা যেন এ কথার বলার সুযোগ না পায় যে, আমরা তো মহাসত্যের পথে ফিরে আসার সুযোগ পাইনি, আমরা সংশোধন হবো-সে সময় আমাদেরকে দেয়া হয়নি।

কিন্তু তারা আল্লাহর দেয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, জুলুমের সয়লাব বইয়ে দিতে থাকে। তারপর এক সময় তারা যখন প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায়, তখন তিনি জালিমকে গ্রেফতার করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ-

মূলতঃ তোমার প্রভুর গ্রেফতার বড় কঠিন। (সূরা বুরুজ-১২)

আকাশে ঘুড়ি ওড়ে। পক্ষান্তরে ঘুড়ির পেছনে একজন মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সেই মানুষের হাতে থাকে লাটাই। লাটাইয়ে জড়ানো সুতার এক প্রান্ত থাকে ঘুড়ির সাথে বাঁধা আরেক প্রান্ত থাকে সেই ব্যক্তির হাতে লাটাইয়ে বাঁধা। ঘুড়ি উন্মুক্ত আকাশে যেদিকে খুশি সেদিকেই যেতে থাকে। তারপর ঐ ব্যক্তিটি যখনই ইচ্ছা করে তখনই সুতোয় টান দিয়ে ঘুড়িকে নিচে নামিয়ে আনে। তেমনি জালিম যখন সীমা অতিক্রম করে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম ক্ষমতার মাধ্যমে জালিমকে দমন করার ব্যবস্থা করেন।

সুতরাং ঈমান এনেছি, আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি, এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী এ কথার ওপরেও বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভয় করার একমাত্র যোগ্য সত্তা তিনি, শুধুমাত্র তিনিই মানুষের পাপমোচন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, দাসত্ব লাভের উপযোগী একমাত্র সত্তা তিনি, তিনি তাঁর দাসদের সর্বদ্রষ্টা, তিনিই উত্তম সিদ্ধান্ত দানকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, সমস্ত কৌশল ও জ্ঞান তাঁর হাতে নিবদ্ধ, তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি তাঁর দাসদের অপরাধ ক্ষমাকারী, তিনি অত্যন্ত মেহেরবান-দয়ালু, তিনিই আইনদাতা ও বিধানদাতা।

তিনি মহাশক্তিশালী-মহাপরাক্রান্ত, তিনিই যাবতীয় ঘটনার স্পষ্ট ব্যক্তকারী, তিনি অসীম ধৈর্যশীল, তিনিই অমর-অক্ষয়, চিরঞ্জীব, তাঁর সত্তা চিরস্থায়ী, তিনি সমস্ত কিছুই পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না, মানুষের মনের গহীনে যে কল্পনার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কেও তিনি জানেন, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সমস্ত বিষয়ে তিনি জ্ঞাত, তিনি অভাবমুক্ত, তিনিই মহিমান্বিত, তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত, তিনিই তাঁর সৃষ্টির প্রার্থনা শ্রবণকারী ও কবুলকারী, তিনি মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, তিনিই আবেদন গ্রহণকারী। এ ধরনের অসংখ্য গুণাবলী সমন্বিত সত্তা হলেন আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা।

আল্লাহর অস্তিত্বের ওপরে বিশ্বাস স্থাপনের চতুর্থ শর্ত হলো, তাঁর হুকুম ও আহ্কামের প্রতি তথা তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি আনুগত্য করতে হবে। তিনি যা আদেশ করেছেন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে সন্তুষ্টির সাথে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর গুণাবলীসহ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার পরে মানুষের জন্য এ অবকাশ আর থাকে না যে, সে অন্য কারো আইন-কানুন, বিধানের সামনে মাথানত করবে। আল্লাহর বিধানসমূহ সে বোঝা বলে মনে করবে। তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। ঈমানের অনিবার্য দাবিই হলো ঈমান আনয়নকারী পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, শ্রদ্ধার সাথে মহান প্রভু আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করবে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরে একজন মানুষ কোনক্রমেই অন্য কারো বিধানের সামনে, অন্য কোন শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। নিজে স্বয়ং কোন বিধি-বিধান রচনা করতে পারে না। যাবতীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে সে হয়ে পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষী। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও জড়-অজড় পদার্থ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁরা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

একটি পশু কোন বিধি-বিধান রচনা করে অন্য পশুর ওপরে চাপিয়ে দেয়নি। একটি পশু আরেকটি পশুর সামনে মাথানত করে না। একটি পাথর আরেকটি পাথরের সামনে নিজেকে সোপর্দ করেনি। একটি বৃক্ষ আরেকটি বৃক্ষের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। চন্দ্র কখনও সূর্যের নির্দেশিত পথে চলে না। রাত কোনদিনই দিনের ইচ্ছানুসারে আবর্তিত হয় না। নদী মুহূর্তের জন্যও সাগরের বশ্যতা স্বীকার করেনি।

যেহেতু তারা আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত পথ ব্যতীত এসব সৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও বিপরীত পথে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না। মানুষের জন্যও মহান আল্লাহর একই বিধান প্রযোজ্য যে, তাঁরা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলীসহ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তখন তারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَفَغَيْرَدِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَه اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًاوَّ كَرْهًاوَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

এসব লোক কি আল্লাহর বিধি-বিধানের আনুগত্য ত্যাগ করে অন্য কোন বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য করতে আগ্রহী ? অথচ ঐ বিশাল আকাশ আর এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর বিধি-বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আর পরিশেষে তাঁরই দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা ইমরান-৮৩)

ঐ বিশাল অগ্নিগোলক সূর্য, নিকটস্থ গ্রহ-চন্দ্র, বিশাল আকৃতির নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃক্ষ-তরুলতাসহ সমস্ত কিছুই আল্লাহর বিধানের সামনে নত হয়ে রয়েছে। এসব কিছুই আল্লাহর বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ-وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ -

সূর্য ও চন্দ্র একটা হিসাব অনুসরণে বাধ্য, এবং তারকা ও বৃক্ষ-তরুলতা সেজদায় অবনত। (সূরা আর রাহ্মান-৫-৬)

পবিত্র কোরআনের এমন বহুস্থানে বলা হয়েছে, তোমরা যাকে প্রকৃতি নামে অবহিত করছো, তা আল্লাহর সামনে সেজদায় অবনত হয়ে রয়েছে। গোটা মহাবিশ্ব, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান

প্রকৃতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান অনুসরণ করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّموتِ وَالاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ-وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ ۢ بَعْدِه-اِنَّه كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যেন একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। যদি বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে তাহলে আল্লাহ ব্যতিত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই যে, সে শক্তি তা ধরে রাখবে। অবশ্যই আল্লাহ অসীম ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির-৪১)

অর্থাৎ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছুই রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির অধীন। এই পৃথিবী থেকে সূর্যের আকৃতি অনেকগুণ বড়। বিজ্ঞানীগণ বলে থাকেন যে, এই সূর্য পৃথিবী থেকে তের লক্ষগুণ বড়। এই সূর্য থেকে আকাশের তারকাগুলো আরো অনেক বড়। এই তারকা থেকেও বহুগুণে বড় হলো ব্লাকহোল। এই ব্লাকহোল যে কতটা বড়, তা বিজ্ঞানীগণ নির্ধারণ করতে বর্তমান সময় পর্যন্তও সক্ষম হননি। এসব বিশাল আকৃতির গ্রহ-উপগ্রহগুলো একটির সাথে আরেকটি এমনভাবে অবস্থান করছে যে, একটির পথ অন্যটি অতিক্রম করে না। আল্লাহ পাক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানী আল বেরুণী ১১ শতকে Gravitation and centrifugal force সম্পর্কিত তত্ত্বের নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে মানব জাতিকে অবহিত করলেন। পক্ষান্তরে আইজ্যাক নিউটনের জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের ভেতরে ঘোষণা করালেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّموتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا-

তিনি আল্লাহ যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ মন্ডলীকে সুউচ্চ করেছেন তোমরা তো তা দেখতে পারছো। (আল কোরআন)

নিরক্ষর সেই নবীর মুখ থেকে মহান আল্লাহ বিজ্ঞানের এই কথাগুলো ঘোষণা করালেন–

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِه اِنَّ فِىْ ذلِكَ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত–দিন ও চন্দ্র-সূর্যকে। তারকাসমূহ সেই আল্লাহরই বিধানের প্রতি আনুগত্য করছে। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। (সূরা নাহল-১২)

অথচ তিনি পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানাগারে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। তিনি মহাবিজ্ঞানী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়েই সৌর জগতের চন্দ্র, সূর্য, যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ, তারকারাজি, নক্ষত্রপূঞ্জে শৃংখলা দান করেছেন। এগুলো কখনও আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে অগ্রসর হতে পারে না।

এই মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তু একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। যে শক্তি এভাবে আকর্ষণ করে তার নাম হলো মহাকর্ষ শক্তি। এ আকর্ষণ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে বস্তুর ওজনের গুণফলের উপর এবং পরোক্ষভাবে বস্তুর দূরত্বের বর্গের উপর নির্ভর করে। দুটো বস্তুর মধ্যে যে বস্তুটির ওজন বেশী সেটি কম ওজনের বস্তুকে আকর্ষণ করে। এভাবে বস্তুর সাথে বস্তুর দূরত্ব কম হলে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে এবং দূরত্ব বেশী হলে আকর্ষণ শক্তি হ্রাস পায়। ঐ বিশাল মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে একটা ব্যালেন্স পজিশনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেছেন যে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষীয় আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে প্রবলভাবে আগ্রহী। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ আরেকটি শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার নাম হলো সম্প্রসারণ গতি। এই সম্প্রসারণ গতির কারণে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা একত্রিত হতে পারে না। যদি একত্রিত হবার সুযোগ থাকতো তাহলে মুহূর্তে একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ বেধে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ এভাবে মহাশূন্যে অদৃশ্য স্তম্ভ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا-

তিনি স্তম্ভ ব্যতীত নভোমন্ডলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তোমরা তো তা দেখছো। (সূরা লোকমান-১০)

মহাশূন্যে নক্ষত্রগুলোর অবিরাম ঘূর্ণনের ফলে তাদের কক্ষীয় গতি থেকে উত্থিত হয় প্রচন্ড এক শক্তি-যার নাম হলো কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal force)। এ শক্তি বস্তুর ওজনের গুণফলের আনুপাতিক এবং বিপরীতভাবে বস্তু থেকে আরেক বস্তুর পৃথক হয়ে থাকার দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। এ কারণে নক্ষত্রগুলো খসে পড়ে না, একটির সাথে আরেকটির কোন সংঘর্ষ ঘটে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا-وَلَئِنْ زَالَتَا-

নিশ্চয় আল্লাহ নভোমন্ডল এবং ভূ-মন্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন যার ফলে ওগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায় না। (সূরা ফাতির-৪১)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি বৃক্ষ রোপন করে তাহলে সে সদ্‌কার সওয়াব পাবে।' রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, প্রয়োজন ব্যতীত বৃক্ষ নিধন করবে না এমনকি বৃক্ষের একটি পাতাও ছিন্ন করবে না। কারণ গাছের পাতাগুলো ঐ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিক্‌র করে।' পবিত্র কোরআনে সূরা জুম্‌আ-এর ১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ–

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে, তার সবকিছুই আল্লাহর তস্‌বিহ্ করছে।

গাছ হলো মানুষের বন্ধু। মানুষের নিশ্বাস থেকে যা নির্গত হয় তাহলো কার্বন্‌ডাই অক্সাইড। এভাবে মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করে দেয়। এই কার্বন্‌ডাই অক্সাইড হলো প্রাণী জগতের জন্য বিষ। কিন্তু এই বিষই হলো গাছের জন্য খাদ্য। আমরা নির্মল অক্সিজেন গ্রহণ করে তা কার্বনডাই অক্সাইডে পরিণত করে ছেড়ে দিয়ে থাকি। গাছের পাতার সবুজ রং আর সূর্যের তাপ মিশ্রিত হয়ে এক প্রকারের রন্ধনক্রিয়া সম্পাদন করে ফলে কার্বনডাই অক্সাইড পুনরায় অক্সিজেনে পরিণত হয় এবং প্রাণীজগৎ তা গ্রহণ করে। এভাবে গাছ আল্লাহর আদেশে মানুষের বিরাট উপকার করে।

কিন্তু এই বৃক্ষসমূহ নির্বিচারে নিধন করা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীতে মরু অঞ্চল বৃদ্ধি লাভ করছে। বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র ব্যবহার করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, মিল-কল-কারখানা, যান-বাহন থেকে যে ধোঁয়া এবং গ্যাস নির্গত হচ্ছে, তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। এভাবে নানা প্রক্রিয়ায় পরিবেশ দূষিত করা হয়েছে। ফলে ওজন স্তরে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। মানুষ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ–

তোমাদের ওপরে যে বিপদ আগমন করে, এসব বিপদ তোমাদেরই অর্জিত। এবং তোমাদের এমন বহু অপরাধ রয়েছে যা তিনি এমনতিই ক্ষমা করে দেন। (সূরা আস্ শূরা-৩০)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করেছেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ–

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে, তা মানুষের হাতের অর্জিত।

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যেখানে যে অশান্তি এবং বিশৃংখলা মানুষ দেখছে, অশান্তি ভোগ করছে, এসব কিছু মানুষ স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছে। আল্লাহ তা'য়ালা যে আদেশ করেছেন, মানুষ

তা পালন করেনি। যা নিষেধ করেছেন–সে নিষেধ থেকে মানুষ বিরত থাকেনি। আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের পেছনেই বিদ্যমান রয়েছে মানুষেরই কল্যাণ। আদেশ পালন করলে মানুষ কল্যাণ লাভ করবে আর নিষেধ অমান্য করলে অকল্যাণ হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টি ঘটছেও তাই। মানুষের প্রতি আদেশ ছিল পৃথিবীর ভারসাম্য, পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য আল্লাহ যে ব্যবস্থা করেছেন, সে ব্যবস্থা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। এ আদেশ পালনে মানুষ উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। মানুষের প্রতি নিষেধ ছিল, পৃথিবীর পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মানুষ সে নিষেধ অমান্য করেছে। এই আদেশ নিষেধ অমান্য করার ফলাফল মানুষ ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

ঈমান মানব জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত করে

ঈমানের অর্থ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তাদের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত ঈমান মানুষের চরিত্রে এক শুভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তার ভেতরে এক অভাবনীয় আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে এবং যাবতীয় সংশয়, সন্দেহ ও কুসংস্কার থেকে সে মুক্ত থাকে। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শুধুমাত্র মৌখিক দাবির নাম ঈমান নয়। একজন মানুষ নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করবে আর ইসলাম অমনি তাকে ঈমানদার হিসাবে গণ্য করবে, এই অবকাশ ইসলামে নেই। কারণ ঈমান নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়।

আল্লাহর রাসূলের যুগে যারা এভাবে ঈমানের ব্যাপারে মৌখিক দাবি পেশ করেছে, নিজেদেরকে মুমিন হিসাবে পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু তাদের ঈমান স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং ইসলামী সমাজে তারা মুমিন হিসাবেও বরিত হয়নি। মুনাফিক হিসাবে তারা মুসলমানদের কাছে পরিচিত ছিল। কারণ তারা মুখে ঈমানের দাবি করলেও ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করেনি এবং তাদের বাস্তব জীবনে ঈমানের কোন ক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়নি।

এ কথা স্পষ্টভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈমান আনার অর্থই হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর রাসূল, পরকাল ও আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন এবং মানুষের গোলামীর জিঞ্জির চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মহান আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার, পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতার পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার বিশাল ক্ষেত্রে উত্তরণ এবং মনগড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ, মতাদর্শ, নিয়ম-প্রথা ও পদ্ধতি পরিহার করে সত্য-সনাতন অভ্রান্ত দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা। ঈমান আনার শুভ পরিণতি ও প্রভাব যা দেখা গিয়েছে তা হলো, ঈমান নিষ্প্রাণ-নির্বীর্য মানুষের মধ্যে নব জীবনের সূচনা করেছে, মৃতকে পুনর্জীবন দান করেছে।

শোষিতের হৃদয়ে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি-সাহস যুগিয়েছে। জালিমের মুখের ওপরে সত্য কথা বলার হিম্মত যুগিয়েছে ঈমান। ভীতগ্রস্তকে করেছে অসীম সাহসী বীর, হতাশাবাদীকে করেছে আশাবাদী। শঙ্কিত ব্যক্তিকে করেছে শঙ্কা মুক্ত। লোভীকে করেছে নির্লোভ আর কৃপণকে করেছে দানবীর। চরিত্রহীনকে করেছে চরিত্রবান, নীতিহীনকে করেছে নীতিবান। মূর্খকে করেছে উচ্চ শিক্ষিত, বিবেকহীনকে করেছে বিবেকবান। খুনী-ডাকাতকে করেছে মানুষের জান-মালের অতন্দ্র প্রহরী। ঈমান মানুষের ভেতরে নবতর প্রাণের উদ্বোধন করেছে, মানুষের ভেতরে নিহিত স্বভাবগত সুপ্তশক্তি ও সামর্থ নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবলভাবে সক্রিয় করে দিয়েছে–ইতিহাসই এ কথার সাক্ষী।

ঈমান মানুষের সমগ্র চরিত্রের ওপর তার আলো ও চাকচিক্য সঞ্জীবতার আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তীব্র সচেতন হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্ব ঈমানদার লোকদের বিস্ময়কর ও অতি আশ্চর্যজনক কর্মকান্ড অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। ঈমানদারের কর্মক্ষেত্র জীবনের বিশেষ একটি দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে-দিকে ও বিভাগে ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। কোনো একজন সাহাবাও ঈমান এনে বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, বিশেষ পোষাকে নিজেকে আবৃত করে, মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি দিয়ে হাতে তস্‌বীহ নিয়ে মসজিদ বা খান্‌কার বিশেষ কোণে মুদিত নয়নে ধ্যানস্থ হননি। নিজেকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়ার কঠোর অনুশীলন করেছেন এবং হাতে অস্ত্র ধারণ করে আল্লাহ বিরোধী শক্তির মূলোৎপাটন করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাঁরা ঈমান আনার পূর্বে ছিলেন নিষ্প্রাণ-নিষ্পন্দ প্রস্তর বা আবর্জনা পরিবেষ্টিত বৃক্ষ বিশেষ। ঈমান আনার সাথে সাথেই ঈমানের আলোয়, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রচন্ডতায় তারা সহসাই যেন ক্রমবৃদ্ধিমান এক বিশাল উদ্ভিদে পরিণত হয়েছেন। ঈমান তাদেরকে দায়িত্ব সচেতন ও পরিণামদর্শী সজাগ মানুষে পরিণত করেছে। বর্ববরতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পাশবিকতার প্রবল চাপে যারা ছিল মৃতপ্রায়, ঈমান তাদেরকে মুহূর্তে ইচ্ছা ও তৎপরতাপূর্ণ এক জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছে। যারা ছিল পথভ্রষ্ট অন্ধ, সত্য পথের সন্ধান যাদের জানা ছিল না, ঈমান তাদেরকে মুহূর্তে শুধু দৃষ্টিমানই বানায়নি, চোখের পলকে তাদেরকে বানিয়েছে পথপ্রদর্শক, পথভ্রান্তদেরকে প্রকৃত সত্য পথের দিকে পরিচালনাকারী। তাদের জীবন ও কর্ম কিয়ামত পর্যন্ত শত কোটি মানুষকে পথপ্রদর্শন করতে থাকবে–পৃথিবীর মানুষকে সজাগ ও সচেতন হিসাবে গড়তে থাকবে।

ঈমান আরবের ঐ বর্বর লোকগুলোকে পরশ মণিতে পরিণত করেছিল। মানুষ হিসাবে নিজের পরিচয় কি–ঈমান তা তাদের কাছে তুলে ধরেছিল। অপরের প্রতি নির্ভরতা ত্যাগ করে তারা এক আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁরই ওপরে নির্ভর করতে শিখিয়েছিল। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন, ব্যক্তি তখনই ব্যক্তি হয় যখন সে নিজেকে চিনতে শেখে, জাতি

তখনই জাতি হয় যখন পরের ওপর নির্ভর করা ছেড়ে দেয়। মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রভুর আনুগত্য থেকে মুক্ত হও।'

ঈমানের প্রভাবে তারা নিজেদের পরিচয় জেনে ছিল যে, তারা মহান আল্লাহর গোলাম এবং মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠপোষক, তিনিই তাদের সাহায্যকারী। এই ঈমানের গুণেই তারা গোটা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল। ইতিহাসের ধারায় তারা এক বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত করেছিল–যা ছিল অভূতপূর্ব-অদৃষ্টপূর্ব ও সম্পূর্ণ অভিনব। ঈমানের প্রভাবে তারা ইতিহাসের ধারাকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

ঈমান আনার পূর্বে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তৎকালিন সমাজে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন উটের রাখাল এবং কুরাইশদের মধ্যে মধ্যম মানের একজন ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে মানুষের মনে এমন ধারণা ছিল না যে, তিনি দেশ ও জাতির জন্য বড় ধরনের কোনো অবদান রাখতে সক্ষম। কিন্তু ঈমান আনার পরে তাঁর ভেতরে ঈমান কি ধরনের অনুপম গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল, পৃথিবীবাসী তা অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্তও তাঁকে নিয়ে গবেষকগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন। ঈমান তাঁর সুপ্ত প্রতিভা, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক যোগ্যতাকে এমনভাবে বিকশিত করেছে যে, গোটা দুনিয়াবাসীকে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

ঈমান তাঁর ভেতরে এমন ধরনের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং অতুলনীয় ন্যায়, পরায়ণতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়েও তিনি সর্বত্যাগী জীবন-যাপন করেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে পারস্য ও রোম সম্রাট থর থর করে কেঁপেছে–পরিশেষে রোম ও পারস্যের সিংহাসন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পবিত্র কোরআনের রাজ। শোষিত নিপীড়িত জনগণ লাভ করেছিল ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র। ঈমান হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে এমন এক স্তরে উপনীত করেছিল যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন–'আমার পরে আর কেউ নবী হবে না, যদি কেউ নবী হতো, তাহলে উমর অবশ্যই আল্লাহর নবী হয়ে যেতো।' ঈমান তাঁকে এমন এক ন্যায়-পরায়ণ ও সুদক্ষ শাসকে পরিণত করেছিল যে, আল্লাহর নবীর অবর্তমানে তাঁর মতো দক্ষ শাসক আকাশের নীচে যমীনের বুকে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে সমাসীন হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও হবে না।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মদীনার উকায বাজারে দাস হিসাবে বিক্রি করা হয়েছিল। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁকে কিনে আল্লাহর রাসূলকে উপহার দিয়েছিলেন। এই দাস যখন ঈমানের নে'মাত লাভ করেছিলেন, তখন ঈমান তাকে এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। মুতার যুদ্ধে তিনি এমন এক বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, যে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল্লাহর

নবীর চাচাত ভাই হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতো বিখ্যাত সামরিক বিশেষজ্ঞগণ। বিশ্বনবীর সেবক হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, যে বাহিনীতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতো মহাসম্মানিত-মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন।

আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ, হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবুযার গিফারী, হযরত উবাই ইবনে কায়াব, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন প্রমুখ সাহাবাগণকে ঈমান এমন ধরনের জ্ঞানী, পন্ডিত ও পথপ্রদর্শনের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে পরিণত করেছিল যে, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালেও তাঁদের অনুরূপ একজন মানুষও গড়তে সক্ষম হবে না। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতো একজন হাবশী গোলামকেও ঈমান এমন এক স্তরে উপনীত করেছিল যে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতো পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও তাঁকে 'সাইয়েদ' বা নেতা হিসাবে সম্বোধন করতেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন কোনো কারণ বশতঃ হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে 'কালো মায়ের সন্তান' বলেছিলেন। হযরত বিলাল এতে মনোক্ষুন্ন হলেন। হযরত উমরের ভেতরেও অনুশোচনা এলো। তিনি মসজিদে নববীর প্রবেশ পথে চিৎ হয়ে শুয়ে বললেন, 'আমি যে মুখ দিয়ে বিলালকে ঐ কথা বলেছি, সেই মুখের উপরে পা দিয়ে বিলাল মসজিদে প্রবেশ করবে, তারপর আমি উঠবো।'

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কুরাইশদের মধ্যে একজন অশ্বারোহী যুবক ছিলেন মাত্র। সঙ্কীর্ণ গোত্রীয় কোন্দলে তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা। গোত্রীয় যুদ্ধের সময় গোত্রপতিরা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতো। কারণ তিনি সাহসিকতা ও বীরত্বের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতেন। গোটা পৃথিবী দূরে থাক, আরব উপদ্বীপের লোকজন তাঁর নামও জানতো না। কিন্তু ঈমানই তাঁকে এমন এক স্তরে উপনীত করেছিল যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর তরবারী'। ঈমান তাঁকে সাধারণ মানুষদের ভেতরে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেল-এ পরিণত করেছে। তাঁর ন্যায় সমরবিশারদ বর্তমান সময় পর্যন্তও কোনো মা জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম ইতিহাসে দেদীপ্যমান থাকবে।

হযরত আবু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আযাদকৃত গোলাম সালেম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ঈমান এমন সম্মান-মর্যাদা ও যোগ্যতার আসনে আসীন করেছিল যে, তাঁর ইন্তেকালের পরে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁকে আমি রাষ্ট্রের খলীফা বানাতাম।' পারস্যের অজপাড়া গাঁয়ের মুবিযান-এর সন্তান ছিলেন হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আরব উপদ্বীপে তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। প্রায় দশজন মনিবের দাসত্ব করার শেষ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন। ঈমান তাঁর ভেতরে এমন এক যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিল যে, পরবর্তী কালে তাঁকেই পারস্য সম্রাটের রাজধানী মাদায়েনের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল। যিনি ছিলেন দাস, অবর্ণনীয় কষ্টে যাঁর জীবন গড়ে উঠেছে, কখনো বিলাসিতা বা সুখ-সম্ভোগের মুখ দর্শন করেননি। তিনিই পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পরও নিজের হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং সেই অর্থে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাস করতেন সামান্য একটি কুঁড়ে ঘরে, অন্যের বোঝা তিনি মাথায় বহন করে গন্তব্যে পৌছে দিতেন।

হযরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরব সমাজে একজন বিচক্ষণ আমানতদার, জনদরদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। গোত্র ভিত্তিক খন্ড যুদ্ধে ছোট্ট ছোট্ট বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন তিনি। কিন্তু ঈমান তাঁকেই শ্রেষ্ঠ জেনারেল-এ, অতুলনীয় সমরবিশারদ-এ পরিণত করে দিল। তিনিই হেরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেখানে কায়েম করেছিলেন আল্লাহর দেয়া কোরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু ঈমান তাঁকে বিশ্বের স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে দিল। ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপের কৃতিত্বের তিনিই দাবিদার। পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তাঁর হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল মাদায়েনের চাবিকাঠি এবং কিসরার দরবার কক্ষ তাঁর জন্য মহান আল্লাহকে সিজ্দা দেয়ার স্থান-মসজিদে পরিণত হয়েছিল।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কুরাইশ সমাজে একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ঈমান তাঁকে ঈমানদারদের সেনাপতি বানিয়েছিল এবং তিনিই মিশর বিজয় করেন। পরবর্তীকালে তিনিই ছিলেন মিশরের শাসনকর্তা। এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই মানব জাতির পথপ্রদর্শক হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। ঈমান তাদের মুখ ও কর্ম থেকে জ্ঞানের সমুদ্র সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা যে জ্ঞান সমৃদ্ধ বাণী মানব জাতির জন্য রেখে গিয়েছেন, সেই বাণীর অনুরূপ একটি বাণীও কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না। তাঁরা যখন কোনো কথা বলতেন, তা শোনার জন্য সময়ের স্রোত যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো। তাঁদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজই ইতিহাস রচনা

করার জন্য যথেষ্ট। তাঁরা যখন পথ চলতেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন তাঁদেরকে আপন করে নেয়ার জন্য তাদের দিকে ঝুঁকে পড়তো। অরণ্যের হিংস্র প্রাণীও তাদের আনুগত্য করতো।

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে তাওহীদের বাহিনী কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছুটে গেলেন আফ্রিকার দিকে। শ্বাপদ সঙ্কুল হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ আফ্রিকার ঘন অরণ্যের সন্নিকটে তাওহীদের বাহিনী শিবির স্থাপন করলো। সে এলাকার বিশাল দেহী কালো মানুষগুলো অবাক বিস্ময়ে মুসলমানদেরকে এই বিপজ্জনক এলাকায় শিবির স্থাপন করতে দেখে ভাবলো, আগত রাতেই এই লোকগুলো হিংস্র জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হবে।

সেনাপতি হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিষয়টি অনুধাবন করলেন। তিনি জঙ্গলের পাশে একটি উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করে সে মঞ্চের ওপরে আরোহণ করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হিংস্র পশু-প্রাণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

يَاَيُّهَاالْحَشَرَتُ وَالسِّبَاعُ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَارْجِعُوْا فَاِنَّ نَازِلُوْنَ فَمَنْ وَجَدْنَا بَعْدَه قَتَلْنَاه–

হে হিংস্র প্রাণীর দল! আমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী, আমরা এসেছি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। এই রাতের জন্য আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তোমরা এখান থেকে সরে যাও। আর যদি না যাও তাহলে আমাদের তরবারীসমূহ তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

আফ্রিকার কালো মানুষগুলো হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কান্ড দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। কিন্তু তারা বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে দেখলো, প্রত্যেকটি পশু সুশৃংখলভাবে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলো। ঈমান তাঁদেরকে এই স্তরেই উপনীত করেছিল। ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়েই তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন ইস্পাত-কঠিন, দুর্দমনীয় অজেয়। যা ছিল অসম্ভব এবং মানুষের কল্পনার অতীত, ঈমান তাই করেছিল সম্ভব এবং বাস্তব। অসাধ্যকে তাঁরা সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে চির অম্লান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। পরশ মণির স্পর্শে জরাজীর্ণ লোহাও যেমন খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমনি আল্লাহর রাসূলের স্পর্শে তারা ঈমান নামক নে'মাত গ্রহণ করে অনুপম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূলের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তাঁরা সুসংবদ্ধ আত্ম প্রত্যয়ী শক্তি হিসাবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মস্তক উন্নত করে চারদিকের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানতা, পাশবিকতা, মূর্খতা আর বর্বরতার ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছিলেন। ঈমান তাঁদেরকে এমন কঠিন আত্মসম্মান

দান করেছিল যে, রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনে তাঁরা ঘৃণাভরে পদাঘাত করেছেন, প্রয়োজনে নিজের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। কবির ভাষায়–

পুশতে পাজান তাকতে কায়কাউসরা
সার বেদেহ আজ কাফ মাদেহ নামুস-রা।

কায়কাউসের সিংহাসনে পদাঘাত করো, নিজের মস্তক দান করো কিন্তু আত্মসম্মান কখনও বর্জন করো না।

ঈমান তাঁদের ভেতরে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁরা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ক্ষুধায় জর্জরিত মানবতার ওপর শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধির পর্দা বিস্তার করেছিলেন। মানব সমাজের সর্বত্র তাঁরা প্রেম-ভালোবাসা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ঈমান তাঁদেরকে বিশ্ব মানবতার জন্য করুণার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিল। এই ঈমানের কারণেই তাঁরা যে কোনো ধরনের বিপরীত প্রতিরোধক শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা জয় করেছেন দেশের পর দেশ, জনপদের পর বিস্তীর্ণ জনপদ। অগণিত মানুষকে মুক্ত করেছেন শক্তিমান মানুষের গোলামী থেকে। চূর্ণ করেছেন দাসত্বের ঘৃণ্য শৃঙ্খল। ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন অসাম্য আর শোষণের কূটজাল। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁদের অগ্রযাত্রাকে সামান্যতম ব্যাহত করতে সক্ষম হয়নি।

যে শক্তিই তাদের সামনে বাধার বিন্ধ্যাচল খাড়া করেছে, প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে, সে-ই তৃণ খন্ডের মতোই উড়ে গিয়েছে। ঈমান তাদের ভেতরে এমনই এক সর্বপ্লাবী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, গোটা পৃথিবীই সে প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ঈমান আনার পরে তারা বর্তমানের মুসলমানদের অনুরূপ মাটির গর্তে পোকার মতো লুকিয়ে থাকেননি। মহাশূন্যে উড্ডিন পাখির মতোই তারা পক্ষ বিস্তার করেছেন। নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য বর্তমানের মুসলমানদের অনুরূপ তারা কোরআন ত্যাগ করে ভিন্ন জাতির পদচুম্বন করেননি, তাঁরা কোরআনকে চুম্বন করে যাবতীয় কর্মের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে একমাত্র কোরআনকেই গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানের এই লাঞ্ছিত, অপমানিত, ক্লান্ত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–তুমি ওড়ার জন্য কখনো পক্ষ বিস্তার করোনি। পোকার অনুরূপ তুমি মাটিতেই পড়ে আছো। কোরআন ত্যাগ করেই তুমি এতা নীচে নেমেছো, আর তোমার দুঃখ-দুর্দশার জন্য ভাগ্যকে অপবাদ দিচ্ছো। হে মানব! শিশির বিন্দুর মতো তুমি মাটিতে পড়ে আছো বটে কিন্তু তোমার হাতে আছে জীবন সুধা মহাগ্রন্থ আল কোরআন। কতকাল আর এই মাটিতে পড়ে থাকবে? এবার সব ছেড়ে আকাশের পথের পথিক হও–জীবন তোমার স্বার্থক হবে।'

সে যুগের প্রতিটি ঈমানদারই হয়েছিল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক, মহান আল্লাহর অকৃত্রিম আনুগত্যের বাস্তব প্রতীক। ঈমান তাঁদের মাথা করেছিল উন্নত আর বাতিল শক্তির সামনে করেছিল দুর্বিনীত, দুর্জয় ও অজেয়। বাতিল শক্তির সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে ঈমানই তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, মলিনতা ও কলুষতা বিদূরিত করেছিল।

সৃষ্টি করেছিল তাদের ভেতরে শক্তির অফুরন্ত ভান্ডার। কারণ ঈমানই ছিল তাদের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রেরণার একমাত্র মৌল উৎস। ঈমানের দাবি অনুসারেই তাঁরা নিজেদের জীবনকে গড়েছিলেন। ফলে তাদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিল একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথানত না করার মতো অদম্য সাহস, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কারো রচিত আইন মেনে না নেয়ার মতো দুর্জয় মানসিক শক্তি ও মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করার মতো দুর্বিনীত মনোবল। ঈমান তাদেরকে আল্লাহর অপছন্দনীয় যাবতীয় শক্তির প্রতি বিপ্লবী, বিদ্রোহী করে গড়েছিল। দিবারাত্রি অহর্নিশি তাদের ভেতরে আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এমন এক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকতো, যে আগুন তাদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল।

তাঁরা ঈমান এনে ঈমানের দাবি অনুসারে নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে ছিলেন যে, তাদের ভয়ে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ ও আইন-কানুনের ধারক-বাহকেরা ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। ঈমানদারের এই দল যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মানব সভ্যতা এক নতুন রূপে সজ্জিত হয়েছিল। গোটা বিশ্ব জুড়ে মহান আল্লাহর বিধানের এক ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-জুলুম, নিপীড়ন-নির্যাতন, মিথ্যা, অসততা, নীতিহীনতা, কুসংস্কার, বাতুলতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা ইত্যাদি যমীন ছেড়ে অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্ধকার গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

ঈমানদারদের শক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করার লক্ষ্যে যেসব শক্তি মাথা উঁচু করার চেষ্টা করেছে, সেসব শক্তির মস্তক নিমিষেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত শক্তি অবনত হয়ে দাঁড়িয়েছে ঈমানের শক্তির সামনে। তাদের এই অগ্রগতির মূলে নিহিত ছিল ঈমান নামক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। ঈমানদাররা সংখ্যায় কখনোই প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক ছিল না। কিন্তু তাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ঈমানী শক্তির সামনে বাতিলের সংখ্যাধিক্য তৃণ খন্ডের মতোই উড়ে যায়। এই ঈমানই তাদেরকে বানিয়েছিল বীর ও অসীম সাহসী দুর্জয় দুঃসাহসী। ফলে তাঁরা তদানীন্তন গণমানুষের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঈমানই তাঁদেরকে সুসংবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল এবং সক্ষম করেছিল বিশ্বের বুকে এক নবতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে।

ধূষর রুক্ষ মরুপ্রান্তর থেকে শুরু করে বিশাল বিস্তীর্ণ জনপদের ওপর মহাসত্যের বিজয় কেতন উড্ডিন করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন একমাত্র ঈমানের কারণেই। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে ঈমানই তাদেরকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সঞ্চিত বর্ণবাদী প্রথা, মানুষে মানুষে পার্থক্যবোধ, গোত্রে-বংশে বিরোধ ও পার্থক্যের ঘন পর্দা ছিন্ন করে দিয়েছিল ঈমান। নির্বিশেষে সমস্ত মানব সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানবীয় ঐক্য ও একত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে। সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্যের মানদন্ড হিসাবে নির্ণিত হয়েছিল একমাত্র আল্লাহভীতি ও যোগ্যতা। যাদের আপাদ-মস্তক পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত, হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা যাদের রক্ত-মজ্জায় প্রবাহিত, পরসম্পদ লুণ্ঠন আর শোষণের চিন্তায় যাদের মন-মস্তিষ্ক আবৃত, সভ্যতার দাবিদার সেই পশ্চিমা জগতে বর্তমানেও বর্ণবাদী প্রথা উৎকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কালো মানুষদেরকে আজো সেখানে ঘৃণা করা হয় এবং মানবীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ইতিহাস কথা বলে, একমাত্র ঈমানই মানুষের ভেতর থেকে বর্ণবাদের পার্থক্যের দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন-তোমরা জাতি, বর্ণের উর্ধ্বে এবং গোত্রের উর্ধ্বে। তার মধ্যে এক যোগ্য কৃষ্ণকায়ের মূল্য শত শ্বেতকায়ের মূল্যের চেয়ে বেশী। কামবরের (একজন কৃষ্ণকায় ঈমানদার মুসলিমের নাম ছিল কামবর) একবিন্দু ওযুর পানির মূল্য এক রোম সম্রাটের রক্তের চেয়ে বেশী। তুমি বংশের উর্ধ্বে ওঠো, গোত্রের উর্ধ্বে ওঠো, সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতো তুমিও বলো, আমি ইসলামের সন্তান।'

ঈমানদার মধুচক্রের দিকে তাকিয়ে দেখে, মৌমাছি নানা রঙের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে কিন্তু মধুর মধ্যে কোনো বর্ণভেদ নেই। আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন আফ্রিকার একজন ঘন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। ঘোর অন্ধকারের অনুরূপ ছিল তাঁর দেহের রঙ এবং দেহ ছিল বিশাল আকৃতির। তাঁর গায়ের রঙ এবং বিশাল আকৃতির দেহের কারণে প্রথম দর্শনেই ভয়ে আতঙ্কে হৃদয় চমকে উঠতো। ঈমান তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল। তিনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের দুত। আরবের বাইরে প্রেরিত অধিকাংশ প্রতিনিধি দলে তাঁকেই নেতা নির্বাচিত করা হতো। মিশর সম্রাট মুকাউকাসের দরবারে যে মুসলিম প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল, হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সেই দলের নেতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মিশর সম্রাট মুকাউকাস আল্লাহর রাসূলের সেই বিশাল দেহী কৃষ্ণবর্ণের সাহাবীকে দেখে এতই আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, তিনি থর থর করে কাঁপতে ছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে তিনি

আর্তচিৎকার করে বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তিকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে এসো।' আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সঙ্গী-সাথীগণ সম্রাট মুকাউকাসকে জানিয়ে দিলেন, 'আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে পেশ করতে পারি না। কারণ তিনিই আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম অভিমত দানকারী। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিতে তিনিই আমাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, অগ্রবর্তী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।'

মিশর সম্রাট তখন বাধ্য হয়ে তাঁর বক্তব্যই শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন। হযরত উবাদা দাঁড়িয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রশংসা করে বক্তব্য পেশ করতে থাকলেন। তিনি বললেন, হে মিশরের শাসক! আমি আপনার কথা শুনেছি এবং আপনার সামনে আমি আমার এক সহস্র সঙ্গী-সাথীর প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলছি। যাঁরা আমার পশ্চাতে রয়ে গিয়েছে তাঁরা আমার থেকেও বিশাল দেহী এবং কালো। দেখতে আমার থেকেও অধিক ভয়াবহ। আপনি তাদেরকে দেখলে আমাকে দেখে যতোটা আতঙ্কিত হয়েছেন, তার থেকেও বেশী আতঙ্কিত হবেন। আপনার সাথে কথা বলার ব্যাপারে আমাকেই মুখপাত্র বানানো হয়েছে। আমার সাথে যারা রয়েছেন, তাদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমার শত্রু পক্ষের এক শতজনকেও আমি বিন্দুমাত্রও ভয় পাইনা। আমার সাথীগণও আমার অনুরূপই নির্ভীক। এর কারণ হলো আমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করি এবং ঈমানের দাবি হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, তাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো শত্রুতা অনুভব করি না। পৃথিবীর কোনো বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যেও আমরা যুদ্ধ করি না। দেশের সীমানা বৃদ্ধির জন্যও আমরা যুদ্ধ করি না। আমরা ততটুকুই করি যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য বৈধ করেছেন। আমরা যদি স্বর্ণের অসংখ্য স্তুপও লাভ করি, তা সবই আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করে থাকি।

হযরত উবাদার জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রাণস্পর্শী ভাষণ শুনে মিশর সম্রাট মুকাউকাস থর থর করে কেঁপে উঠলেন। তিনি তার মনের ভীতি গোপন করতে সক্ষম হলেন না। দরবারের লোকদেরকে উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, এই লোকটি যা বললো, এমন কথা কি তোমরা কখনো শুনেছো ? আমি তো এই লোকটির বিশাল দেহ আর শরীরের ঘনকালো রঙ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর কথাগুলো তো তাঁর চেহরার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর! আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই লোকগুলো অতিদ্রুত গোটা পৃথিবী পদানত করবে।

এ কথা বলে মিশর সম্রাট মুকাউকাস সিংহাসন থেকে নেমে হযরত উবাদার দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মহান ব্যক্তি! আমি আপনার কথা যেমন শুনেছি এবং আপনি আপনার সাথীদের সম্পর্কে যা বললেন, সে সম্পর্কেও শুনেছি। আমি শপথ করে বলছি! আপনারা যতোটা অগ্রসর হয়েছেন, তা শুধু এ জন্য যে, আপনি যাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। আর আপনারা যাদের ওপরে বিজয়ী হয়েছেন তা এই জন্য যে, তারা ছিল পৃথিবী পূজারী। কিন্তু আমি আপনাদের ব্যাপারে এ জন্য আতঙ্ক অনুভব করছি যে, আপনারা রোমানদের মতো এক বিশাল শক্তির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন। কারণ তারা সংখ্যায় অগণিত, তাদের বীরত্ব, সাহসীকতা ও শক্তিমত্তা আপনাদের তুলনায় অনেক বেশী। আমার বিশ্বাস, আপনারা তাদের ওপরে কোনোক্রমেই বিজয়ী হতে সক্ষম হবেন না। আপনারা নিজেদের দুর্বলতা ও সংখ্যাল্পতার কারণে তাদের কাছে পরাজিত হবেন। আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আপনাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুইটি করে স্বর্ণ মুদ্রা দেবো এবং আপনাদের খলীফার জন্য সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করবো। আপনারা আমাদের শর্ত মেনে নিন এবং যে শক্তির মোকাবেলা করতে আপনারা সক্ষম হবেন না, সেই শক্তির কবলে নিপতীত হবার পূর্বেই এখানে থেকে নিজের দেশে চলে যান।

মিশর সম্রাটের এই অর্থহীন বক্তৃতা শোনার মতো মানসিকতা হযরত উবাদার ছিল না। তবুও তিনি সৌজন্যতার খাতিরে ধৈর্য ধরে তার কথা শুনে বললেন, হে শাসক আপনি শুনুন! আপনি এবং আপনার দরবারের লোকগুলো আত্মপ্রতারিত। রোমানদের বিশাল বাহিনীর কথা শুনিয়ে আপনি আমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করলেন। আপনি বললেন, তারা আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। আমি ঐ আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যাঁর মুষ্ঠিতে আমাদের প্রাণ! এসব কথা বলে আপনি আমাদের মধ্যে যেমন ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না, তেমনি আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের লোভও জাগাতে পারবেন না।

আপনি রোমানদের সম্পর্কে যা বললেন, তা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা যুদ্ধ করতে আরো অধিক আগ্রহী। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে যদি নিহত হই, তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবো, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি আমাদেরকে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তুলনায় আমাদের কাছে অধিক প্রিয় আর কিছু নেই। আপনাদের সাথে যুদ্ধে দুইটির যে কোনো একটি পরিণতিই সম্ভব। হয় আমরা বিজয়ী হবো নতুবা শাহাদাত বরণ করবো। এই উভয় পরিণতিই আমাদের জন্য সর্বাধিক উত্তম। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে পৃথিবীর বিশাল ধন-ভান্ডার আমাদের হস্তগত হবে। আর যদি আপনারা বিজয়ী হন, আমরা শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আদালতে আখিরাতে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত আমরা লাভ করবো।

এই দুটোর যে কোনো একটি লাভ করার জন্য আমরা মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি। আমরা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের জন্য ফরিয়াদ করি। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের দেশ ও পরিবারের কাছ থেকে বের হয়েছি। আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে পুনরায় তাদের মধ্যে ফিরিয়ে না নেন। আমরা আমাদের পরিবারের সকল সদস্যকে মহান আল্লাহর কাছে আমানত রেখে এসেছি। আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো, আমরা কিভাবে আল্লাহর পথে সামনের দিকে অগ্রসর হবো। আমাদের মন-মানসিকতা যে ধরনের, আপনাদের বর্তমান অবস্থার কারণে কখনো আপনাদের মন-মানসিকতা আমাদের অনুরূপ হবে না।

এর নাম ঈমান এবং এই ঈমানই মানুষকে অজেয় করতে সক্ষম। আর ঈমানই মানুষের চরিত্রে নিহিত অপরিসীম শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান দেখিয়ে দিয়েছে এই অপরিসীম শক্তি মানুষের দেহে নয়, মানুষের আত্মায় নিহিত রয়েছে। শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে মানুষ যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, সংখ্যায় অধিক একটি সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হতে পারে না। পক্ষান্তরে সংখ্যায় অল্প লোকজন যদি ঈমানী শক্তিতে শক্তিশালী হতে পারে, তাহলে গোটা পৃথিবীকে পদানত করা তাদের জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন−

টল্‌না ছাকতে থে আগার জং মে আড় যাতে থে
পাওঁ শোরোঁ কি ভি ময়দান ছে উখাড় যাতে থে।
তুঝছে ছরকাশ হুয়া কোই তো বিগাড় যাতে থে
তেগ কেয়া চীজ হ্যায়? হাম তোপছে লড় যাতে থে।
নকশে তাওহীদকা হর দিল পা বয়ঠায়া হাম নে
জেরে খঞ্জর ভি ইয়ে পায়গাম ছুনায়া হাম নে।

সমরাঙ্গনে আমরা (ঈমানদারগণ) প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছি, তখন কোনো অবস্থাতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি। সিংহসম প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুও আমাদের ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছে। হে আল্লাহ! তোমার প্রতি কাউকে বিমুখ হতে দেখলে আমরা উন্মাদ হয়ে যেতাম, তখন তরবারী তো তুচ্ছ কথা, ভীষণ তোপের মুখেও আমরা নিজের বক্ষদেশকে উপস্থাপন করেছি। তারপর সবার বুকে তোমার তাওহীদের পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করে দিয়েছি। তাদেরকে নির্ভয়ে আমরা তোমার একত্বের বাণীতে দীক্ষা দিয়েছি।

আত্মমর্যাদা গড়ে তোলা ঈমানের দাবি

একজন মানুষ যখন আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীসহ তাঁর অস্তিত্বে ঈমান আনে, তখন তার মধ্যে আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হয়, প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব (Personality) গড়ে ওঠে। ঈমানদার কখনও ব্যক্তিত্বহীন হয় না। ঈমানদার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে। ঈমানদার ব্যক্তির জীবনধারা হয় গঠনমূলক। তাঁর কথায়, ব্যবহারে, ওঠা-বসায়, পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ ভুল ধারণা বিদ্যমান রয়েছে যে, ঈমানদার-পরহেযগার ব্যক্তি মানেই হলো আল্লাহর প্রেমে বিভোর দুনিয়া ত্যাগী মানুষ। দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতি তার কোনো দৃষ্টি থাকবে না। দুনিয়ার ব্যাপারে সে হবে উদাসীন। তার মাথার চুল, মুখের দাড়ি, পরিধেয় পোষাক থাকবে অবিন্যস্ত।

প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি এমন নয়। ঈমানদার-মুত্তাকী ব্যক্তি কখনও কোন বিষয়ে ব্যক্তিত্বহীনের মতো কোনো আচরণ করতে পারেন না। সে কোনো পাগল শ্রেণীর মানুষ হয় না। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে থাকে। এই ব্যক্তিত্ব কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে বিশ্বকবি ডঃ আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেছেনঃ-

খুদী কো কর ইত্‌না বুলন্দ্‌, কে হার তাক্‌দীর লিখ্‌নে কি প্যাহ্‌লে
খোদা পুছে বান্দেকো, বাতা তেরি রেজা কিয়া হ্যায়।

'নিজের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন এভাবে গড়ে তোল, যেন আল্লাহ তোমার তাক্‌দীর লেখার সময় তোমার কাছে জানতে চায়, বান্দা তুমিই বলো-তোমার তক্‌দীর কিভাবে লেখা হবে।'

অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনে, তার ভেতরে আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হয়। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করার পূর্বে তার ভেতরে ব্যক্তিত্ব ছিল অনুপস্থিত। পৃথিবীতে দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান যা কিছু সে দেখেছে, অনুভব করেছে, কোন বস্তুর মধ্যে সামান্যতম কোন শক্তির স্ফুরণ ঘটতে দেখেছে, তাকেই সে ভয় করে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা মনে করে তার পূজা শুরু করেছে, তার সামনেই সে মাথানত করেছে।

সর্পকে সে দেখে অনুভব করেছে, এটা একটি বিষধর শক্তি। এই সাপ দংশন করলে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। অতএব সে সাপকে একটি বিরাট স্বয়ং সম্পূর্ণ শক্তি মনে করে তার পূজা আরাধনা করেছে। একটি বিরাট বৃক্ষ সে দেখেছে, বিশালাকৃতির বৃক্ষ দেখার পর তার মনে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, এই বৃক্ষ আমার অনেক উপকার করতে সক্ষম। সুতরাং এই বৃক্ষের পূজা করে বৃক্ষকে সন্তুষ্ট করতে হবে। মনে এই চিন্তার উদ্রেক হবার সাথে সাথে বৃক্ষের সামনে নিজের মাথানত করে দিয়েছে।

প্রস্তর খন্ডটি আকারে বিশাল, সুতরাং তার ভেতরে অবশ্যই শক্তি নিহিত রয়েছে। অতএব সেই জড় পদার্থ পাথরের পূজা সে করেছে। বিশাল ঐ জলধি, যে কোন সময় বিস্তীর্ণ

এলাকা প্লাবিত করে দিতে পারে। ক্ষেত-খামার, বাড়ি-ঘর ডুবিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। অতএব পূজা অর্চনার মাধ্যমে এই জলধিকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। সেখানেও সে গড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মাথানত করেছে।

বিশালাকৃতির ষাঁড়, অসম্ভব তার শক্তি। তীক্ষ্ণ শিং দিয়ে আঘাত করলে মৃত্যু অনিবার্য। বাঘ ও সিংহ প্রচন্ড শক্তির অধিকারী, বিশাল তাদের থাবা। এদের কবলে একবার পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। অতএব এদের পূজা অর্চনা না করলে অরণ্য অভ্যন্তরে প্রয়োজনে চলাচলা করা যাবে না। শুরু করা হয়েছে বাঘ আর সিংহের পূজা।

নদীতে কুমির বাস করে। পানির অধিশ্বর সে। পূজার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট না করলে নদীর পানি ব্যবহার করা যাবে না। নদীকেও প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার পূজা সে করেছে। ঈমান আনার পূর্বে তার ভেতরে আত্মমর্যাদা ছিল না বলে সে চন্দ্র-সূর্যকে শক্তির অধিকারী মনে করে তার সামনে মাথানত করেছে। আগুনের ভেতরে দহন ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং আগুন স্বয়ং সম্পূর্ণ শক্তি এবং দাসত্ব লাভের অধিকারী। ঈমানহীন ব্যক্তি সে আগুনের দাসত্ব করেছে।

একজন তাকে পরামর্শ দিয়েছে, মাটি, পাথর দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে মাথানত করো, তার কাছে প্রার্থনা জানাও, এই মূর্তি তোমার মনের আশা পূরণ করতে সক্ষম, সে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এ কথা শুনে কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করেই সে মূর্তির সামনে মাথানত করেছে। বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

হামছে প্যাহ্‌লে থা আজব তেরা জাহাঁ কা মন্‌জর
কাহি কাহি মাছ্‌জুদ থে পাথার কাহি মাআবুদ শাজর।

আমাদের পূর্বে অর্থাৎ বিশ্বনবীর মাধ্যমে হেদায়াত আসার পূর্বে এই পৃথিবী এক আশ্চর্য ধরনের স্থান ছিল। কেউ পাথরকে মাবুদ বলে সিজ্‌দা করতো আর কেউ বৃক্ষ তরুলতাকেই মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে তার সামনে মাথানত করে দিতো।

মানুষ যখন এক আল্লাহর দাসত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তখন সে অগণিত বস্তুর দাসে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ-

তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে আর যাদেরকে আহ্বান করো, তারা তো তোমাদের মতই দাসানুদাস মাত্র। (সূরা আরাফ-১৯৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মানুষ আমাকে ত্যাগ করে, আমাকে বাদ দিয়ে যেসব শক্তির সামনে মাথানত করছে, মানুষ কি চিন্তা করে দেখছে না, এসব শক্তির স্রষ্টা আমি এবং সেগুলো

আমারই দাসত্ব করছে। সুতরাং কোন সৃষ্টির দাসত্ব না করে স্বয়ং স্রষ্টার দাসত্ব করো। ঐ বিশাল আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, অগাধ জলধির সামনে মাথানত করে কোন লাভ নেই, তাদের কোন ক্ষমতা নেই–তারা আমার মুখাপেক্ষী। অতএব, আমার দাসত্ব করো।

আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন, জড় পদার্থের সামনে তোমরা মাথানত করো, মূর্তির সামনে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করো, তাদের কাছে তোমরা প্রার্থনা করো, তাদের কাছে তোমরা সন্তান কামনা করো, ধন-দৌলত কামনা করো, বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাও, রোগ থেকে মুক্তি চাও, তারা কি তোমাদের ডাক শোনে ? তাদের সামনে তোমরা নানা ধরনের মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজিয়ে রেখেছো, সেসব খাবার তারা খেতে পারে না, এমনি সেসব খাবারে যদি একটা মাছি বসে, সে মাছিকেও তারা তাড়িয়ে দিতে সক্ষম নয়, তাহলে তোমরা কেন এমন অথর্ব, অক্ষম মূর্তিকে ডাকো ?

তোমাদের কি চোখ নেই ? তোমাদের কি কান নেই ? তোমাদের কি চিন্তা করার মত মগজ নেই ? তোমরা কি চিন্তা করে দেখো না ? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَه اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সব শক্তিকে ডাকে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে, যারা তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্তও উত্তর দিতে সক্ষম নয় আর তারা তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর লোকজনদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ? (আহ্কাফ-৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব শক্তির পূজা অর্চনা করে, তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, এসব মূর্তি তাদের প্রার্থনা শোনে না, শোনার ক্ষমতা তাদের নেই। প্রার্থনাকারী কি প্রার্থনা করছে, সে সম্পর্কে এসব শক্তির কোন চেতনা নেই। এরা মানুষের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আরশে আযীমের অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোন শক্তিকে ডাকবে না, যারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, তোমার কোনো ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়। তুমি যদি তাদেরকে ডাকো, তাহলে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুছ-১০৬)

তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে, যিনি প্রার্থনা শোনেন, যিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। যিনি মানুষের প্রতিপালক। যিনি কখনও ধ্বংস হতে পারেন না। যিনি চিরঞ্জীব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الْحَىُّ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা ডাক কেবল তাঁকেই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। আর সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যাদেরকে ডাকছো, যাদের কাছে দোয়া করছো, তারা কোনো জিনিসের মালিক নয়–নয় কোনো বস্তুর স্রষ্টা। তারা স্বয়ং আমারই সৃষ্টি। তারা তোমার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه مَايَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ-اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَاءَ كُمْ-وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوْا لَكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের কাছে দোয়া করো, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তারপরও যদি তোমরা তাদেরকেই ডাকো, তাদের কাছে দোয়া করো, তবে তারা তো তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া। (সূরা ফাতির-১৩-১৪)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন, আফালা তা'কিলুন–আফালা তুবছিরুন–তোমরা কি বোঝ না? তোমরা কি চিন্তা করো না? তোমাদের কি জ্ঞান নেই? আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি, চোখের যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছি, তা কাজে ব্যবহার করো, প্রয়োগ করো তোমার চিন্তাশক্তি। তাহলেই তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা করছো, তাদের বিন্দুমাত্র কোনো শক্তি নেই। মাছির মতো ক্ষুদ্র এটা প্রাণীর পাখাও নির্মাণ করার শক্তিও তারা সংরক্ষণ করে না।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে রয়েছেন। দরবারে নববীর গোটা পরিবেশ নবুয়তের জান্নাতি আলোয় আলোকিত। চারদিকে কোরআনের দ্যুতি বিকিরণ হচ্ছে। আল্লাহর নবী সে পরিবেশে অবস্থান করছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে আগমন করলো।

লোকটির হাতে ছিল মাটির একটি ভাঙ্গা মূর্তি। চেহারায় তার মহাসত্য গ্রহণের দ্যুতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি তার মহাসত্যের কেন্দ্রবিন্দু মানবতার মহান মুক্তির দুত মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিবদ্ধ। আল্লাহর নবী লোকটির দিকে তাঁর পবিত্র দৃষ্টি তুলে ধরলেন। লোকটির হাতের ভাঙ্গা মূর্তি তিনি দেখলেন। পবিত্র ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর হাসি। লোকটির অবয়বের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার হাতে ভাঙ্গা মূর্তি কেন ?

লোকটি বিমর্ষ কণ্ঠে জানালো, হে আল্লাহর রাসূল ! এটি আমার উপাস্য, আমি যেখানেই গমন করি না কেন, এটা আমার সাথেই থাকে। আমার ধারণা ছিল, এই মৃত্তিকা নির্মিত উপাস্য আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আমার কঠিন কাজ সহজ করে দেবে। যাবতীয় কাজে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। কিন্তু আজ এমনই এক ঘটনা ঘটলো যে, আমার সমস্ত ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল এবং আমার অন্তরের দৃষ্টি উন্মোচিত হলো।

আজ এই মৃত্তিকা নির্মিত উপাস্যকে সাথে নিয়ে আমি একটি কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। পথিমধ্যে আমার মল-মূত্র ত্যাগের বেগ এসে গেল। আমি চিন্তা করলাম, উপাস্যকে সাথে নিয়ে এমন একটি অপবিত্র কাজ করা ঠিক হবে না। এ চিন্তা করে আমি এই মূর্তিকে পথের একস্থানে রেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলাম। ফিরে এসে উপাস্যর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম, মৃত্তিকা নির্মিত আমার ধাবণার সেই উপাস্যর গোটা শরীর সিক্ত।

আমার ধারণা হলো যে পানি দ্বারা স্বয়ং উপাস্যর শরীর সিক্ত হয়েছে, এটা কোন সাধারণ পানি নয়। নিশ্চয়ই এই পানির মধ্যে বরকত নিহিত রয়েছে। আমি এই ধারণার বশীভূত হয়ে উপাস্যর শরীর আমার জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করে সে পানির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকলাম। কিন্তু সে পানির স্বাদ আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না। ঝাঁযযুক্ত স্বাদ ও বিশ্রী গন্ধ পেলাম সে পানি থেকে। আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো, উপাস্যর শরীর যে পানি দ্বারা সিক্ত হয়েছে, তাতে কটু স্বাদ এবং দুর্গন্ধ থাকবে কোন্ কারণে ? সন্দেহ আর সংশয় আমার চিত্ত অস্থির করে তুললো। আমি পথের এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আমি দেখলাম, অদূরে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার নিম্নাঙ্গ দিয়ে ফোটায় ফোটায় মূত্র ঝরে পড়ছে। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম, আমি যখন এই মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তিকে এখানে রেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলাম, তখন কুকুর এসে এই মূর্তির ওপরে মূত্র ত্যাগ করেছে আর পবিত্র পানি মনে করে আমি সেই কুকুরের মূত্রে জিহ্বা স্পর্শ করিয়েছি। রাগে ক্ষোভে দুঃখে আমি এই মূর্তিটিকে সজোরে নিক্ষেপ করে বললাম, এই মূর্তি আমার উপাস্য হতে পারে না। যে বস্তু নিজেকে কুকুরের মূত্র ত্যাগের পাত্রে পরিণত হয়, তা কখনও আমার ইলাহ্ হতে পারে না। এ কারণেই আমি এই মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেছি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচরাচর এমনভাবে মুচ্‌কী হাসতেন না যে, তাঁর দাঁত কেউ দেখতে পেত না। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ঘটনা শোনার পরে

আল্লাহর নবী এমনভাবে হেসেছিলেন যে, তাঁর পবিত্র দন্ত মোবারক বিকশিত হয়েছিল। তিনি লোকটির কাছে জানতে চাইলেন, তুমি আমার কাছে কেন এসেছো ?

লোকটি আক্ষেপের সুরে জানালো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আজ স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছি, আমার বিগত জীবন ছিল ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। এতদিন আমি অমূলক ধারণাকে কেন্দ্র করে এই মাটির মূর্তিকে নিজের ইলাহ্ মনে তার পূজা করেছি। আমি ভূল করেছি। আমাকে এই ভূল থেকে উদ্ধার করুন। আমি ইসলাম কবুল করে মহাসত্যের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই।

লোকটি আল্লাহর রসূলের হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করলো। ক্ষণপূর্বে এই লোকটির কোন আত্মমর্যাদা বা ব্যক্তিত্ব ছিল না বলেই সে তার উচ্চ মাথা মাটির একটি মূর্তির সামনে নত করেছে। অথর্ব জড় পদার্থের কাছে সে তার মনের কামনা বাসনা, প্রার্থনা পেশ করেছে। এখন সে মহাসত্য গ্রহণ করে আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীসহ এক আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনার পরেই তাঁর আত্মমর্যাদা এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে, তার সমস্ত প্রয়োজনের ব্যাপারে সে আল্লাহকেই একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে।

পৃথিবীর মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা এ কথার প্রমাণ পাই যে, একজন সাধারণ মানুষের সাথে যদি বিশাল কোন ধনী ব্যক্তির বা ক্ষমতাধর কোন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন হয়, তাহলে সেই সাধারণ মানুষটির চলাফেরায়, আচার ব্যবহারে পরিবর্তন আসে। বেশ গাম্ভীর্যতা নিয়ে সে ব্যক্তি চলাফেরা করে। তেমনি একজন মানুষ যখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর, রাজাধিরাজ আল্লাহর তা'য়ালার অস্তিত্বে তাঁর পূর্ণগুণাবলীসহ বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় লিপ্ত হয়, তাহলে সে ব্যক্তির আত্মমর্যাদা-ব্যক্তিত্ব হবে সবার ওপরে। আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা-ব্যক্তিত্ব তখনই মানুষের ভেতরে জেগে ওঠে, যখন মানুষ একটা বিশাল শক্তিধরের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। আর আল্লাহই হলেন সমস্ত শক্তির অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

পবিত্র কোরআন বলছে- إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا-

নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তির অধিকারী হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা কেনো বুঝতে পারো না, তোমরা যাদেরকে দেখে ভয় করো, তাদের কোনো শক্তি নেই। পানির ভেতরে অবশ্যই শক্তি রয়েছে, আগুনের মধ্যে শক্তি রয়েছে, সুর্যের ভেতরে শক্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে তারা স্বাধীন নয়। এসব শক্তি আমার আদেশ ব্যতীত নিজেকে কোথাও প্রয়োগ করে না।

মহান আল্লাহই হলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ 'আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার উৎস' এটা স্বীকার করতে চায় না।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র একটি মুখরোচক শ্লোগান আবিষ্কার করেছে, 'সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।' এই কথাটি আসলে প্রতারণামূলক। এই শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারণা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়। জনগণের নাম ভাঙ্গিয়ে একশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবর্গ নিজের স্বার্থে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের শ্লোগান দেয়া বা এ কথা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথা যারা বিশ্বাস করবে এবং প্রচার করবে, তারা অবশ্যই শিরক্ করবে। আর শিরক্ হলো সবচেয়ে বড় গোনাহ্। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

নিশ্চয়ই শিরক্ সবচেয়ে বড় জুলুম।

আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে সব ধরনের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

আল্লাহর সাথে শিরক্ করা হলে তিনি তা ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ্ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা নেছা-১১৬)

'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথাটি বিশ্বাস করা শির্ক তথা কুফ্রী। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِا اللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ–

যারা শিরক্ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত হারাম করেছেন।

সুতরাং মানুষ যখন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তাঁর আত্মসম্মান-মর্যাদাবোধ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, সে কাউকে ভয় পায় না। সত্য প্রকাশে ও প্রচারে সে কখনও কোনো শক্তির সামনে মাথানত করে না। সত্য প্রকাশে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সে যদি ভয়ই পায়, তাহলে তো তার আত্মমর্যাদায় আঘাত আসে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি কখনও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ বিরোধী শক্তির ভয়ে অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে জানে না।

রাষ্ট্রশক্তি যখন দেশ ও জাতির উপরে অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়, সমাজের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি যখন সমাজে নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডের প্রসার ঘটায়, ঈমানদার ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সে কোন পরোয়া করে না। ঈমানদার সত্য কথনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর কোন শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তার দৃষ্টি থাকে আরশে আযীমের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দিকে নিবদ্ধ।

ঈমান আনয়ন করার কারণে ব্যক্তির ভেতরে যে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয় এ কারণে সত্য কথনে, সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর মনে এ চিন্তার উদ্রেক হয় না, 'সত্য কথা বললে

আমার চাকরি থাকবে না, সত্য কথা বললে আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্রোধান্বিত হয়ে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে, পরিণামে আমাকে অনাহারে দিন অতিবাহিত করতে হবে।'

ঈমানের বিপরীত এই ধরনের চিন্তা কোনো আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির মনে উঁকি দেয় না। কারণ সে এ কথা ভালো করেই অবগত রয়েছে যে, তাঁর জীবন-মৃত্যু, রিয্কের মালিক পৃথিবীর কোনো মানুষ নয়-তাঁর রিয্কের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَه-اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-

আল্লাহই তো নিজের বান্দাদের মধ্যে হতে যার ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করে দেন, আর যার ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন। (সূরা আন্কাবুত-৬২)

মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহই হলেন রিযিক দাতা। সুতরাং মুমীন বান্দা, আল্লাহর গোলাম আত্মমর্যাদার বিপরীত কোনো চিন্তা কখনও করে না। কারণ আল্লাহ তাঁকে নিশ্চয়তা দান করেছেন-

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ-وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ-

অতএব তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের মালিক আল্লাহর গোলামী করা। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে আহার দান করেছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন। (সূরা কুরাইশ-৩-৪)

এই ঘর বলতে মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ শরীফকে বুঝানো হয়েছে। কুরাইশরা যখন নানা ধরনের ভীতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তখন তাদেরকে বলা হলো, এই ঘরের যিনি মালিক, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো। তাঁর দাসত্ব করলে তিনি তোমাদেরকে হেফাজত করবেন, বিপদের সময় নিরাপত্তা দেবেন এবং ক্ষুধার সময়ে আহারের ব্যবস্থা করবেন। ঈমানদার ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করবে এবং জাতীয় জীবেন দুর্যোগের ঘনঘটা দেখে সে নিরবতা পালন করবে না। সে যে স্থানে অবস্থান করছে, সেখান থেকেই সে তাঁর সাধ্যানুসারে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। অতএব এ কথা উল্লেখিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর ওপরে ঈমান আনার বাস্তব যে উপকারিতা লাভ হয়, তাহলো ঈমানদার ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং আত্মমর্যাদার অধিকারী হয়।

একমাত্র কা'বা ঘরের উপলক্ষ্যেই কুরাইশদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা ধরনের নে'মাত দানে ধন্য করা হয়েছিল, এ কথা স্বয়ং কুরাইশরা যেমন অবতগত ছিল, তেমনি অবগত ছিল গোটা আরববাসী। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত দান করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্বের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি করেছেন, এই কথাটি তখন পর্যন্তও তারা অনুভব করতে সক্ষম হয়নি। আর সেই নে'মাতটি ছিল, স্বয়ং কুরাইশদের মধ্যে থেকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আখেরী জামানার পয়গম্বর বিশ্বনেতা, শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মহান মুক্তির দুত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্বাচিত করেছেন। সেই অভ্রান্ত জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনও সেই কুরাইশদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নবী-রাসূলের ওপরেই অবতীর্ণ করেছেন।

সমস্ত নে'মাতের তুলনায় এই নে'মাতটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত, এ কথা তারা তখন পর্যন্তও অনুধাবন করতে পারেনি। এ কারণেই তারাই সর্বপ্রথম কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতকে তারা অস্বীকার করে আসছিল। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা কুরাইশ-এ তাদেরকে সেই নে'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, তোমাদের আচরণ তো বড়ই বিস্ময়কর! শুধু তোমরাই নও, গোটা আরববাসী এ কথা জানে যে, এই ঘরটি স্বয়ং আল্লাহর। আর এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদার কারণেই তোমরা সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, উচ্চ আসন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, অভাবমুক্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা, নেতৃত্ব ও শাসকের পদ লাভ করেছো। এ কথা তোমরা জানো এবং জানো বলেই আবরাহা যখন আক্রমণ করতে এসেছিল, তখন তোমরা তোমাদের পূজিত দেব-দেবীর কাছে আশ্রয় বা সাহায্য কামনা না করে একমাত্র আমারই কাছেই আশ্রয় এবং কাতর কণ্ঠে সাহায্য কামনা করেছিলে। তাহলে জেনে শুনে সেই আল্লাহর দাসত্ব না করে, তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত না করে কিভাবে তোমরা কল্পিত দেব-দেবীর পূজা আরধনা করছো? এটা তো বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার!

একটির পর একটি নে'মাত আমি তোমাদেরকে দান করলাম। পৃথিবী ও আখিরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল ও কোরআন তোমাদের ভেতরে দিলাম সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাতের সাথে তোমরা কি বিস্ময়কর আচরণ করছো? তোমাদের আপনজন, তোমাদেরই কল্যাণকামী আমার রাসূল তো তোমাদেরকে নতুন কোন আদর্শের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে না। তিনি তোমাদেরকে সেই পুরনো পাঠ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। যে আল্লাহ তোমাদেরকে অসংখ্য নে'মাত দানে ধন্য করেছেন, সেই আল্লাহর দাসত্ব করা তোমাদের কর্তব্য, সেই কর্তব্য পালনের দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

গ্রীষ্মকালে মক্কায় প্রচন্ড গরম অনুভূত হতো কিন্তু সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে সে সময় গরমের অতটা তীব্রতা অনুভূত হতো না। এ জন্য মক্কার কুরাইশরা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো। আর ঠান্ডার মৌসুমে মক্কা এলাকায় তীব্র শীত নেমে আসতো। কিন্তু সে সময় দক্ষিণ আরবের দিকটায় উষ্ণতা বিরাজ করতো। এ কারণে মক্কার কুরাইশরা শীতের মৌসুমে দক্ষিণ আরবের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো। মৌসুম অনুকূলে হওয়ার কারণে তারা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করতো। এটাও ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এক বিরাট নে'মাত। এই নে'মাতের কথাও আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যাতায়াতের পথে যেখানে অন্যান্য বাণিজ্য বহর দস্যু-তস্করদের হাতে পড়ে লুণ্ঠিত হতো, সেখানে কুরাইশরা কা'বা ঘরের সেবক হওয়ার কারণে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে বাণিজ্য করে মাতৃভূমিতে ফিরে আসতো।

এসব নে'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বলছেন, তোমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, সেই ঘরের মালিকের দাসত্ব করা এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করা, যে ঘরের কারণে তোমরা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করছো, তোমাদের বাণিজ্য বহরে দুস্য-তস্করেরা আক্রমণ করছে না, তোমরা নিরাপত্তা পাচ্ছো এবং বিপুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হচ্ছো।

কা'বা ঘরে তারা ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং প্রতিদিন ঘটা করে এসব মূর্তির পূজা করা হতো। কিন্তু তারা এ কথারও স্বীকৃতি দিতো যে, এই মূর্তিগুলো তাদের রব নয়। তাদের রব হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা এবং তিনিই আবরাহার হামলা থেকে তাদেরকে হেফাজত করেছেন। এই কুরাশরা-যারা আল্লাহর রাসূলের আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করছিল, তারা এ কথাও জানতো যে, এই ঘরের সেবক হওয়ার পূর্বে বা এই ঘরের আশ্রয়ে আসার পূর্বে তারা ছিল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত এবং হতদরিদ্র। কোথাও তাদের সম্মান-মর্যাদা ছিল না। অভাব ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। অন্যান্য গোত্রের মতোই তারাও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতো।

কিন্তু তারা যখন এই ঘরের আশ্রয়ে এলো এবং কা'বাঘরের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, তখনই তাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। নেতৃত্বের আসন তারা লাভ করলো এবং সম্মান ও মর্যাদা তাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। অভাব দূরিভূত হয়ে স্বচ্ছলতার সোনালী সূর্য উদিত হলো। ঐ ঘরের মালিকের অনুগ্রহেই যে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে, এ কথা তারা উত্তমভাবেই আবগত ছিল।

আল্লাহ তা'য়ালা সেই কথাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, চরম বিপদের সময় তোমরা মূর্তি ত্যাগ করে আমারই কাছে প্রার্থনা করেছিলে। সেই বিপদ দূর হবার পরেও দীর্ঘ সাত আট বছর আমারই বন্দেগী করেছিলে। তারপর তোমাদের এমন কি হলো যে, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে মূর্তিপূজা শুরু করলে? যা ছিল তোমাদের কর্তব্য, সেই কর্তব্যের

দিকেই তোমাদেরই আল আমীন তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তোমরা কেন তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁর সাথে বিরোধিতা করছো?

এই মক্কা অতীতে কতটা দৈন্য দশায় নিপতিত ছিল, জনমানবহীন ভয়াবহ এক রুক্ষ প্রান্তর ছিল, আল্লাহর কোরআন থেকেই তা অবগত হওয়া যায়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর শিশু সন্তান ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে সেই কা'বা ঘরের কাছেই রেখে গিয়েছিলেন, যখন কা'বা মাটির নিচের চাপা পড়েছিল। তিনি তখন দোয়া করেছিলেন-

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ-رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْ اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ-

হে আমার রব! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য এক মহাপ্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে এনে পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার রব! আমি এই কাজ এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামাজ কায়েম করবে। অতএব লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে দাও এবং খাওয়ার জন্য তাদেরকে ফল দান করো। (সূরা ইবরাহীম-৩৭)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এই দোয়া থেকেই এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মক্কা এলাকা কি ধরনের বিরান ভূমি ছিল। কুরাইশরা এই এলাকায় আসার পূর্বে দারিদ্র পীড়িত বিক্ষিপ্ত ছিল। যখনই তারা এই এলাকায় আগমন করলো, তখনই তাদের পূর্বের অবস্থা ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকলো। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বরকতে ঐ এলাকাকে আল্লাহ তা'য়ালা গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে সম্মানিত এলাকায় পরিণত করলেন। যে সময় আরব ভূমির কোন একটি এলাকাও নিরাপদ ছিল না। দিন রাতের কোন একটি মুহূর্তও মানুষের জন্য নিরাপদ ছিল না। যে কোন মুহূর্তে দুস্যু তস্করের দল আক্রমণ করে নির্বিচারে হত্যা-লুন্ঠন-ধর্ষন চালাতো। কোন মানুষ নিজের গোত্রের বাইরে গেলেই জীবিত ফিরে আসবে বা তাকে ধরে দাস হিসাবে বিক্রি করা হবে না, এই নিশ্চয়তা ছিল না। এমন কোন কাফেলা ছিল না, যারা নিরাপদে পথ চলতে পারতো। যেসব বাণিজ্য কাফেলা যে পথে যাতায়াত করতো, সেই পথে যেন তারা আক্রান্ত না হয়, এ জন্য তারা এলাকার গোত্রপতিকে ঘুষ দিতে বাধ্য হতো।

পক্ষান্তরে মক্কার লোকগুলো ছিল এর ব্যতিক্রম। সর্বত্র তাদের জন্য ছিল নিরাপত্তা এবং সম্মান ও মর্যাদা। তারা যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারতো।

ঘাতক যদি তাদের মাথার ওপরে তরবারি উঁচু করে তুলতো আর সেই মুহূর্তে সে যদি জানতো পারতো, লোকটি মক্কার, তখনই তার উঁচু তরবারি নিচে নেমে আসতো। 'লোকটি মক্কী এলাকার' নিরাপত্তা ও সম্মান-মর্যাদা লাভের জন্য তার ঐ পরিচয়টিই যথেষ্ট ছিল। আলোচ্য সূরায় এসব নে'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাদেরকে বলা হয়েছে, যে ঘরের কারণে তোমরা আজ নেয়ামতে পরিপূর্ণ, তোমাদের উচিত হলো সেই ঘরের যিনি মালিক, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। তিনি যে রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সেই রাসূলের আনুগত্য করা এবং কোরআনের বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা। তাহলে তোমরা বর্তমানে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, এর থেকেও শত গুণ বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে সক্ষম হবে।

কা'বা স্বয়ং আল্লাহ নয় বা আল্লাহর সত্তা এমনও নয় যে, তিনি কা'বাঘরে অবস্থান করবেন। ঐ ঘরটিকে স্বয়ং আল্লাহ নির্বাচন করেছেন যেন সমস্ত মুসলমান ঐ ঘরকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয় এবং ঐক্যবদ্ধ থাকে। ঐ কেন্দ্র থেকেই তাওহীদের আলোর মশাল গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করে। আল্লাহ তা'য়ালা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেই বিধান কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত যেন ঐ কেন্দ্রে বসেই মুসলমানরা গ্রহণ করে। ঘরটিকে স্বয়ং আল্লাহ মুসলমানদের সামগ্রিক কাজের ব্যাপারে নির্বাচিত করেছেন বলেই তাকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়েছে। সেই ঘরের কারণে যদি মানুষ সম্মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, নেতৃত্ব ও শাসকের পদ লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহলে যারা ঐ ঘরের মালিকের দাসত্ব করবে, তাঁর রাসূলকে একমাত্র অনুসরণযোগ্য নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব এবং ধন-সম্পদ তো তারাই লাভ করবে–এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এই ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা-ই সব থেকে সত্য। কোরআনের এই থিউরি কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। বাস্তবে তা প্রমাণও করে দিয়েছে আল্লাহর কোরআন। দরিদ্র, অভাবী উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যহীন একটি জাতি যখন ঐ ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহর গোলামী করেছে, তখন তারা এই পৃথিবীর শাসকের আসনসহ যাবতীয় কিছু লাভ করেছিল। পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে পৃথিবী ইতিপূর্বে কখনো সেই সোনালী রাষ্ট্র দেখেনি, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের অবর্তমানেও আকাশের নিচে ও যমীনের বুকে সেই সোনালী দিন আর ফিরে আসেনি। বর্তমানেও মুসলমানদের ললাটে সেই সৌভাগ্য শশীর উদয় পুনরায় হতে পারে, যদি তারা সেই ঘরের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব করে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলকেই একমাত্র অনুসরণীয় নেতা হিসাবে মেনে নেয়।

চরিত্রে বিনয় সৃষ্টি করা ঈমানের দাবি

আল্লাহর গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপরে ঈমান আনে, সে ব্যক্তি হয় বিনয়ী। ঈমানদার হয় বিনম্র। তাঁর ব্যবহারে কখনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। কথায় এবং আচরণে অহংকারের ছোঁয়া থাকে না। মন-মানসিকতায় স্বৈরাচারী চিন্তাধারার উদ্রেক হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا-

আল্লাহর প্রকৃত দাস যারা তাঁরা এই পৃথিবীতে হয় বিনয়ী।

ঈমানদার ব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয়, বিশাল বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয় তবুও তাঁর ভেতরে অহংকারের চিহ্নমাত্র থাকে না। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, তাঁর এই সম্পদ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে এ সম্পদ ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ তিনি দেশের ধনীদের কাতারের একজন আছেন, দেশে-বিদেশে তাকে বিশিষ্ট নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা দান করা হচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছে করলেই মুহূর্ত কাল পরেই তাকে কপর্দক শূন্য করে দেশের ভিখারীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম।

মৃত্যু যদি এই মুহূর্তে তার দিকে হীম শীতল থাবা বিস্তার করে, তাহলে তার এই বিশাল সম্পদ মূহূর্তে অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। এসব সম্পদ তাঁর কোনো কাজেই আসবে না। তাঁর কাছে যে ধন-সম্পদ রয়েছে, এসব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে কিছুই নয়। কারণ তাঁর সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, খরচ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তা কখনও হারাবে না, ছিনতাই হবে না, বিনষ্ট হবে না, তিনি দান করেন, কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। আল্লাহ বলেন-

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَا-

আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি সম্পদশালী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী, অভাবী।

আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তাঁর ভান্ডার কখনও শূন্য হয় না। তাঁর সম্পদের ভান্ডার প্রতি মুহূর্তে পরিপূর্ণ থাকে। গোটা পৃথিবীবাসীকে তিনি এক মুহূর্তে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী বানিয়ে দিতে সক্ষম। ঈমানদার তাঁর আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখেন, এ কারণে অহংকারের পরিবর্তে তাঁর গোটা দেহ বিনম্রতার বর্মে আবৃত থাকে। তাঁর কথামালায় নম্রতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সম্পদের অহংকার সে করে না।

ঈমানদারের চেতনা এ ব্যাপারে শানিত থাকে যে, আল্লাহ যদি এই মুহূর্তে তাঁর দেহে এমন কোনো রোগ প্রবেশের নির্দেশ দেন, যে রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে তার অর্জিত ধন-সম্পদের এই বিশাল স্তুপ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও তিনি রোগ যন্ত্রণা থেকে

মুক্তি লাভ করবেন না। আল্লাহর নির্দেশে তার মস্তিষ্কের একটি নার্ভ যদি একটির সাথে আরেকটি অর্থাৎ পরস্পরে জড়িয়ে যায়, তাহলে মুহূর্তে তার স্বাভাবিক চেতনা লোপ পাবে, ঘনিষ্ঠ মহল, পরিচিত মহলের কাছে তিনি উন্মাদ নামে আখ্যায়িত হবেন। ভোগ-বিলাসের উপকরণে সজ্জিত বিশাল বালাখানা থেকে তাকে বের করে পাগলা গারদে প্রেরণ করা হবে।

সুতরাং অহংকার শোভনীয় নয়। অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। মুমিন ব্যক্তির কথা বলার মধ্যেও নম্রতা প্রকাশ পায়। কথা বলার সময় সে তার প্রতিপক্ষের প্রতি কোনো ধরনের অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। কারণ তাঁর স্মরণে থাকে যে, তাঁর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন- وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ-

মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। (সূরা লোকমান-১৮)

ঈমানদার ব্যক্তির চাল-চলন হয় বিনম্রতার মাধুর্য মন্ডিত। সে অহংকারের পদভারে পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দিতে পারবে না। কারণ সে তাঁর মালিক আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ জেনেছে- وَلاَتَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا-اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

যমীনের ওপরে অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না। আল্লাহ কোন অহংকারী, দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান-১৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলেছেন-

وَلاَتَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًاانَّكَ لَنْ تَخْرِقَا الاَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُوْلاً -

খবরদার ! আমার যমীনের ওপরে অহংকারের পদভারে চলাফেরা করো না। তুমি এই যমীনকে পদাঘাতে ধ্বসিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না। তুমি ঐ পাহাড়ের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারো না।

আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালার গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে মুমীনে পরিণত হয়, সে তাঁর চাল-চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে সে কথা বলে না। কারণ তাঁর চেতানায় একথা জাগ্রত থাকে যে-

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ-اِنَّ اَنْكَرَا لاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

নিজের চাল-চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং নিজের কণ্ঠস্বর নমনীয় রাখো। জেনে রেখো, সব আওয়াজের মধ্যে গর্দভের আওয়াজই হচ্ছে সবচেয়ে কর্কশ। (সূরা লোকমান-১৯)

ঈমানদার ব্যক্তি শক্তির অহংকার করে না। কারণ সে জানে যে, আল্লাহর শক্তিই সবচেয়ে বেশী। কোনো মানুষের এ শক্তি নেই যে, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও চলে যাবে। যারা অহংকার করে, দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, শক্তিতে মদমত্ত হয়ে জাতির ওপরে জুলুম করে, তাদেরকে সাবধান করে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন-

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ-

হে জ্বিন ও মানুষ ! যদি তোমাদের এমন ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা এই আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে যাবে, তাহলে চলে যাও। কিন্তু কোথায় যাবে, সমস্ত জায়গার সার্বভৌমত্ব আমার। (সূরা আর রাহ্মান)

যাবার স্থান কোথাও নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে, এই সৌর মন্ডলে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান যেখানে যা কিছুই রয়েছে, এসব কিছুর মহান অধিপতি হলেন আল্লাহ। এই অনুভূতি ঈমানদার বান্দার মন-মস্তিষ্কে সক্রিয় থাকে, এ জন্য মুমীন ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে না। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করলে সে বারবার আল্লাহর দরবারে শোকর গুজার করতে থাকে।

দৈহিক শক্তির অধিাকারী কোন ব্যক্তি যখন ঈমান আনে তখন সে তাঁর শৌর্য-বীর্য শক্তির কারণে অহংকার করে না। কারণ সে জানে, তাঁর এই দৈহিক শক্তি যে কোনো মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। আল্লাহর আদেশে তাঁর দেহের সমস্ত নার্ভগুলো অবশ হয়ে যেতে পারে। তাঁর চলৎশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্বে প্রচন্ড দৈহিক শক্তি দিয়ে বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মূছে গিয়েছে। এভাবে ঈমান মানুষকে অহংকার মুক্ত করে তার স্বভাবে বিনয় ও নম্রতার আবরণে অচ্ছাদিত করে।

ঈমানদার ব্যক্তি প্রখ্যাত জ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও সে জ্ঞানের অহংকার করে না। কারণ আল্লাহর কোরআনে সে পাঠ করেছে যে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার রয়ে গিয়েছে আল্লাহর কাছে। মানুষ সে-তার জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় এবং নির্ভূলও নয়। যে সামান্য জ্ঞান সে অর্জন করেছে, মস্তিষ্কে কোন ত্রুটি ঘটলে, স্মৃতিশক্তির কেন্দ্রস্থল বিকল হয়ে গেলে মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান থাকে সব সময় সঠিক তথ্য দান করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাঁর জ্ঞান তাকে কোন

অজেয় ক্ষমতা দান করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান তাকে চিরঞ্জীব করতে পারে না। জ্ঞানের মাধ্যমে সে রোগ-ব্যধি-জরাকে জয় করতে পারেনি। মহান আল্লাহই হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

এভাবে ঈমান মানুষকে তাঁর জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে অহংকারের আবর্জনা দূরীভূত করে বিনয় আর নম্রতার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ঈমান এনেছি, এ দাবি করার পরে যদি তার ভেতরে এসব গুণাবলীর সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বাতিলের মোকাবেলায় উত্তপ্ত ময়দানে টিকে থাকাও সম্ভব হয় না। চরিত্রে বিনয় এবং নম্রতা না থাকলে অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। আর নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ইসলামের দাওয়াতও কারো কাছে আকর্ষণীয়ভাবে পৌছানো যায় না।

ঈমান মানুষের ভেতর থেকে দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারের শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে বিনয় সৃষ্টি করে। ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-বিশাল মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি পারস্য বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য কাদেসিয়ার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেছেন। যুদ্ধের কোনো সংবাদ না পেয়ে খলীফা অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে আছেন। প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় করে তিনি মদীনা নগরীর বাইরে মরুপ্রান্তরে এসে কোনো এক খেজুর গাছের নিচে সংবাদ বাহকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান তিনি, সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমর শক্তির অধিকারী পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে। কাদেসিয়ার প্রান্তরে রক্তক্ষয়ি যুদ্ধ চলছে। সমরাঙ্গনের কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা বড়ই অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করছেন।

সংবাদ সংগ্রহকারীদেরকে তিনি মদীনায় প্রবেশের পথে বসিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তা না করে স্বয়ং নির্বাহী প্রধান সংবাদ জানার জন্য মদীনার প্রবেশ পথে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন-ঈমান এ ধরনের অপূর্ব বিনয় সৃষ্টি করেছিল বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ভেতরে। বর্তমানে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান তো দূরে থাক, একজন থানা ইনচার্জও পদের অহঙ্কারে এক গ্লাস পানিও ঢেলে পান করেন না-আত্মসম্মানে বাধে।

যাঁর নাম শুনলে তদানীন্তন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিদের হৃদকম্পন শুরু হতো, সেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনার বাইরে এসে মরুভূমির খেজুর গাছের নিচে ক্লান্ত আঁখি মেলে মরুপথের দিকে চেয়ে আছেন। অনেক দূরে তিনি লক্ষ্য করলেন, উষ্ট্রারোহী একজন লোক মরুপথ ধরে মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে। খলীফা নিজেকে আর স্থির রাখতে

পারলেন না। তিনি উত্তপ্ত বালুকার ওপর দিয়ে ছুটে গেলেন উষ্ট্রারোহীর কাছে এবং ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রেরিত দুত কিনা। খলীফার চেহারা দুত চিনে না। চলন্ত অবস্থাতেই সে জানালো, খলীফাকে সে যুদ্ধের সংবাদ জানানোর জন্য যাচ্ছে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা উষ্ট্রারোহী দুতের পাশে পাশে দৌড়াচ্ছেন আর যুদ্ধের সংবাদ শুনছেন। উষ্ট্রারোহী দুত মদীনায় যখন প্রবেশ করলো, তখন জনগণ উটের পাশে যে লোকটি দৌড়িয়ে আসছে তাঁকে আমিরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করে সালাম জানালো। দুত উটের লাগাম টেনে ধরে লজ্জিত দৃষ্টিতে খলীফার দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললো, 'হে আমিরুল মুমেনীন! প্রথমেই আপনি আপনার পরিচয় দিলে আমি এই বেয়াদবি থেকে রক্ষা পেতাম।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, 'ওসব কথা বলে সময় নষ্ট করো না। ইসলামের বাহিনীর অবস্থা কি, একে একে বলে যাও।' দুতকে তিনি উটের পিঠ থেকে নামতে দিলেন না, উটের পিঠে বসিয়েই তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করলেন। জেরুজালেম সফরকালে তিনি নিজের ভৃত্যকে উটের পিঠে বসিয়েই জেরুজালেম নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। এর নাম বিনয়-প্রকৃত ঈমান এই ধরনের বিনয়ই ঈমানদারের ভেতরে সৃষ্টি করে।

দুর্জয় সাহস সৃষ্টি করা ঈমানের দাবি

মহান আল্লাহর ওপরে ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির ভেতর থেকে মৃত্যুর ভয় তিরোহিত হয়ে যায়। সত্য কথা বললে, সত্য প্রচার করলে বিরোধী শক্তি তাকে হত্যা করতে পারে, এ ধরনের ভয় তার ভেতরে থাকে না। ঈমানদার ব্যক্তি বীর মুজাহিদে পরিণত হয়-সে কাপুরুষ হয় না। তার আচার-ব্যবহারে নির্ভীকতা প্রকাশ পায়।

কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় হলো মৃত্যুকে। যে জিনিস ভীতি সৃষ্টি করে তা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব। গভীর অরণ্যে হিংস্র জানোয়ার বাস করে। মানুষ এসব হিংস্র জানোয়ার অধ্যুষিত এলাকা এড়িয়ে চলে। বিদ্যুৎ যেন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে না পারে, প্রাণহানি যেন না ঘটে-এ জন্য মানুষ বিদ্যুত ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন করলে যা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা থেকে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে এ কথা জাগ্রত থাকে যে, জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। এ দুটো জিনিস আল্লাহর গোলাম। মৃত্যুকে তিনি যখন আদেশ দেবেন, তখনই সে তার কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসবে। মৃত্যু থেকে কোনো ক্রমেই নিজেকে রক্ষা করা যাবে না।

ঈমানদার যে কোন অবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে এবং এই বিশ্বাস তার থাকবে যে, তার জীবন, মৃত্যু একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত সে মৃত্যুর

কবলে পতিত হবে না। আবার আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যু যখন আসবে, তখন পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, তা রোধ করতে পারে। ঈমানদার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং ময়দানে আন্দোলন করবে। ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহকরা ঈমানদারদের জন্য ময়দান ছেড়ে দেবে না, তারা অবশ্যই প্রতিরোধ করবে। এই অবস্থায় ঈমানদার যদি বাতিল শক্তির হাতে শাহাদাত বরণ করে, তাহলে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, ঐ ব্যক্তি যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ না দিতো, তাহলে সে এভাবে নিহত হতো না।

অথবা কেউ কোনো প্রয়োজনে বিভিন্ন যান-বাহনে আরোহণ করে ভ্রমণে বের হলো। পথিমধ্যে সেই বাহন দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মৃত্যু বরণ করলো। এখানেও এ কথা বলার বা বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই যে, লোকটি যদি ঐ বাস, ট্রেন বা প্লেনে না উঠতো, তাহলে তাকে এভাবে মরতে হতো না। এ ধরনের কথা বলা কুফ্রী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لاِخْوَانِهِمْ اِذَاضَرَبُوْا فِى الاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَامَا مَاتُوْا وَمَاقُتِلُوْا-لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ-وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ-

হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের ন্যায় কথাবার্তা বলো না, যাদের আত্মীয়-স্বজন কখনো ভ্রমণে গেলে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে (সেখানে কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে) তারা বলে যে, তারা যদি আমাদের কাছে অবস্থান করতো, তাহলে মারা যেতো না এবং নিহত হতো না। আল্লাহ এই ধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনের দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন। এতে মৃত্যু ও জীবন দানকারী হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ। (সূরা ইমরান-১৫৬)

মহান আল্লাহ যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তা সবই একদিন মৃত্যু বরণ করবে। পৃথিবীতে একজন নাস্তিকও এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। চোখের সামনে যা কিছুই দেখা যাচ্ছে, তা সবই একদিন মৃত্যু বরণ করবে তথা শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ-وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ

الْقِيمَةِ-فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ-وَمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ-

অবশেষে প্রত্যক প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এবং তোমরা সবাই নিজ নিজ কাজের প্রতিফল পুরোমাত্রায় কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি, যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে ও জান্নাতে দাখিল হবে। বস্তুত এ পৃথিবীটা নিছক একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় স্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা ইমরান-১৮৫)

মৃত্যুও মহান আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আসে না। মহান আল্লাহ যখন এ কাজে নিয়োজিত ফেরেশতার প্রতি অর্থাৎ মালাকুল মাউতের প্রতি নির্দেশ দেন, তখন তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً-

কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। (সূরা ইমরান-১৪৫)

মৃত্যুর ক্ষেত্রে শুধু প্রাণীই নয়-পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই একদিন মৃত্যু বরণ করবে তথা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ-وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ-

সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, টিকে থাকবে শুধু তোমার মহীয়ান গরীয়ান রব-এর সত্তা। (সূরা রাহমান-২৬-২৭)

ঈমানদার ব্যক্তি জানে, মৃত্যু আল্লাহর নির্দেশেই আগমন করবে। আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ব্যতীত মৃত্যু কারো ওপর হামলা করতে পারে না। মৃত্যু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারিত করে রেখেছেন। এর সময় ও স্থানও পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَيَسْتَقْدِمُوْنَ-

মৃত্যুর সময় পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বেও নয় এবং এক মুহূর্ত পরেও কেউ মৃত্যু বরণ করবে না।

এই মৃত্যু কাউকে ক্ষমা করবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

মৃত্যু সে তো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে গ্রেফতার করবে, তোমরা যত মজবুত দুর্গের মধ্যেই আত্মগোপন করো না কেন। (সূরা নিছা-৭৮)

জীবের প্রাণ হরণের জন্য মহান আল্লাহ যে ফেরেশ্‌তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নির্দেশ লাভ করার পর তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ-

যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে তারা একবিন্দু ত্রুটি করে না। (সূরা আন'আম-৬১)

মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে কোথাও অপ্রকাশিত রাখা যাবে না। আল্লাহ ছুব্‌হানাহু তা'য়ালা সূরা জুমু'আর ৮ নম্বর আয়াতে বলেন–

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلاَقِيْكُمْ-

মরণ থেকে পালাও তুমি, মরণ তোমায় লইবে ঘিরি
যদিও সুদূর আকাশ পানে, লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি
এ মহারোগের চিকিৎসক নাই, নাই সে ঔষধ জগতে
খুঁজিয়া কাতর হইলে কি হবে, পারিবে না তারে ফিরাতে।

মৃত্যু যখন আসবেই তখন তাকে ভয় করে কি হবে। এ জন্য ঈমানদার মৃত্যুকে ভয় করে না। সে শুধু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পুজি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যু কোথায় হবে, কি অবস্থায় হবে, সেটাও কেউ বলতে পারে না। মহান আল্লাহ মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ-

কোথায় কোন অবস্থায় কে মৃত্যুবরণ করবে, তা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জানা নেই।

গত ২০০০ সনের নভেম্বর মাসে আমি লন্ডনে অবস্থানের সময় একটি ঘটনার কথা শুনলাম। পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল। একজন লোক আট তলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, লোকটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। তার দেহের কোন অস্থি ভাঙ্গেনি। কোন রক্তপাত হয়নি। শুধুমাত্র দেহের ওপরে কয়েক স্থানে চামড়ায় সামান্য আঘাত লেগেছিল। এ অবস্থায় দ্রুত এ্যাম্বুলেন্স ডেকে লোকটিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো হাসপাতালে চেকআপের জন্য। এ্যাম্বুলেন্সে লোকটিকে উঠিয়ে শুইয়ে দিয়ে দরোজা

এমন অসতর্কভাবে লাগানো হয়েছিল যে, তা যথাযথভাবে বন্ধ হয়নি। পথিমধ্যে প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্সের চালক ব্রেক চাপলো। ফলে একটা ঝাকুনির সৃষ্টি হলো। আর তখনই অসতর্কভাবে লাগানো দরজা খুলে গেল। সেই সাথে আটতলা থেকে পতিত অক্ষত লোকটি, যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো চেকআপের জন্য-সে ছিট্‌কে গিয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি গাড়ি এসে লোকটিকে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেল। ঘটনাস্থলেই লোকটি মৃত্যুবরণ করলো। আটতলার ছাদের ওপর থেকে লোকটি নিচে পড়ে গেল। চামড়ায় সামান্য আঘাত ব্যতীত লোকটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। সেখানে লোকটির মৃত্যু হলো না। দেহে তার অন্য কোনো স্থানে কোন্ ক্ষতি হলো কিনা তা চেকআপের জন্য নিয়ে যাবার পথে ঐ অবস্থায় নিপতিত হয়ে লোকটির মৃত্যু হলো।

মৃত্যুর জন্য দুটো জিনিসের যোগাসূত্রের-সংযোগের অবশ্য প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময় আর দ্বিতীয়টি হলো নির্ধারিত স্থান। এসব বিষয়ের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় থাকে। আর এ কারণেই সে দুর্জয় মনোবলের অধিকারী হয়। ঈমান তার ভেতরে এক অজেয় মানসিক শক্তি সৃষ্টি করে দেয়। কোন ভয় তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। মুমীনের হৃদয় হয় মৃত্যুভীতি শূন্য। পৃথিবীর কোন শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার মৃত্যু ঘটাতে পারে-এ কথা সে বিশ্বাস করে না।

ঈমানদার জানে, মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না, তাহলে কেন সে মৃত্যুকে ভয় করবে। ঈমানদার শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে অবমাননাকর মনে করে। সে শহিদী মৃত্যু অনুসন্ধান করে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাতিল শক্তির সাথে লড়াই করে সে মৃত্যুকে বরণ করতে চায়। সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শৃগালের মতো কয়েক শত বছর জীবিত থাকার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। সিংহের মতো বীরত্বের সাথে পাঁচ মিনিট জীবিত থাকার মধ্যে গৌরব নিহিত। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের মতো পঞ্চাশ বছর জীবিত থাকার মধ্যে লাঞ্ছনাই নিহিত থাকে, সিরাজ-উদ্দৌলার মতো কয়েক ঘন্টা জীবিত থাকাই হলো আত্মমর্যাদার বিষয়।

ঈমান আনার পরে মানুষের ভেতরে এ ধরনের আত্মমর্যাদা আর বীরত্ব, অজেয় মনোবল, নির্ভীকতা সৃষ্টি হয় বলে সে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সেই অনন্ত সুখের জীবনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। ঈমানদার সব সময় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়, 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে কাপুরুষের মতো মৃত্যু দিও না। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো।'

ঈমানদার শয়নে স্বপনে জাগরণে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। শাহাদাত বরণ করার ভেতরেই সে তার জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। ঈমান মানুষের

ভেতরে দুর্বিনীত সাহস আর প্রচন্ড বীরত্ব সৃষ্টি করে দেয় বলে সে বাতিল শক্তির আধিক্য দেখে বিচলিত হয় না। কারণ তাঁর আল্লাহ তাকে বলে দিয়েছেন-

اِنَّ كَيْدَا لِشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا-

নিশ্চয় শয়তানের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা নেছা)

ঈমানদার জানে, ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তি দেখতে বিশাল হলেও তাদের কোন মনোবল নেই, সাহস নেই। এরা সেই অগণিত পাখির ঝাঁকের মতো। শুধু একটি মাত্র শব্দেই সব পালিয়ে যায়। ঈমানদার জানেদ্দ তাঁর শক্তির উৎস হলো ঐ আল্লাহ-যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী শক্তি। আল্লাহ হলেন তাঁর অভিভাবক। আর বাতিল শক্তির অভিভাবক হলো শয়তান। আর শয়তানের শক্তি হয় মাকড়সার জালের মতই ভঙ্গুর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ-اِتَّخَذَتْ بَيْتًا-وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ-

যেসব লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার মতো। মাকড়সা নিজের জন্য ঘর নির্মাণ করে। আর সব ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল হলো মাকড়সার ঘর। (সূরা আনকাবুত-৪১)

ঈমানদার-মুমীন ব্যক্তি জানে, বাতিলের অভিভাবক হলো শয়তান আর মুমীনের অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ ছুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা। এ কারণে মুমীন বাতিল শক্তির কোনো পরোয়া করে না। আল্লাহর ওপরে ঈমান আনার কারণে মুমীন অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদে পরিণত হয়। পৃথিবীর কোনো শক্তিকে সে ভয় পায় না। ইতিহাসে এর অসংখ্য ঘটনা সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, 'সেই মহান আল্লাহর কসম ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে যুদ্ধ করবে এবং শুধু সামনের দিকেই অগ্রসর হতে থাকবে, কোনো অবস্থাতেই পিছে সরে আসবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।'

কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন-

قُوْمُوْا اِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ-

ওঠো এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলো। যে জান্নাত নির্মিত হয়েছে এবং নির্বাচিত করা হয়েছে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য।'

বনী সালামা গোত্রে উমাইয়া ইবনে হুমাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বয়সে ছিলেন একেবারে তরুণ। তাঁর চেহারায় তারুণ্যের উজ্জ্বলতা পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই যেন দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল বদরের প্রান্তরে। তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে শরীর থেকে তাঁর সুষমার দিপ্তী বদরের প্রান্তর যেন আলোকিত করেছিল। তিনি বসে খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খাচ্ছিলেন। প্রিয় নবীর কথা তাঁর কর্ণকুহরে যেন মধু বর্ষণ করলো। তাঁর মুখ থেকে শব্দ বের হলো, 'বাখ্ বাখ্'।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই তরুণ সাহাবীর মুখে ঐ 'বাখ্ বাখ্' শব্দ শুনে তাঁর দিকে পবিত্র আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বললেন- إِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا - জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে তুমি একজন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুখে এ কথা শুনে তরুণ সাহাবী উমাইয়েরের হৃদয়ে যেন খুশীর প্লাবন প্রবাহিত হলো। তিনি খেজুরগুলো দূরে নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বললেন-হাতে এত খেজুর ! এগুলো খেয়ে শেষ করতে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন ! এত সময় ধরে খেজুর খেতে থাকলে জান্নাতে যেতে দেরী হয়ে যাবে।

এ কথা বলে তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন শত্রুর বুহ্যের দিকে। প্রচন্ড বেগে তরবারী চালিয়ে তারপর এক সময় নিজে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেলেন। যুদ্ধাবসানে আল্লাহর রাসূল তাঁর এই তরুণ সাহাবীর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পবিত্র আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে বললেন-তুমি আল্লাহর জান্নাতে যাবার জন্য খোরমা খাবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা ব্যয় করোনি, হাতের খোরমা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়েছো, আমি আল্লাহর রাসূল সাক্ষী দিচ্ছি, অবশ্যই সে জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত।

সুতরাং মুমীন ব্যক্তি কখনও মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। সে এ কথা বিশ্বাস করে, কোনো বুলেটের ওপরে যদি তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোটা পৃথিবীর জনবল তাকে প্রহরা দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে ঐ বুলেট থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি কোনো বুলেটে তার নাম লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষ তার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো বুলেট বর্ষণ করলেও একটি বুলেটও তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। এই বিশ্বাসই ঈমানদারকে দুর্বার. দুর্বিনীত দুর্জেয় করে তোলে। আর এই ধরনের দুর্জেয় শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হতে পারে না।

একজন মুমীন এই দুর্জেয় ঈমানের অধিকারী হয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা শুনে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ عَهْدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত বান্দার কোন ক্ষতি সাধন কেউ করতে সক্ষম নয়।

মুমীন ব্যক্তি কোন ক্ষতির ভয় করবে না। কোন ক্ষতি যদি তার হয়ই তাহলে সে এ কথাই বিশ্বাস করবে, স্বয়ং আল্লাহ তার তক্দীরে এটা নির্ধারণ করেছিলেন। বাহ্যিক কোন ক্ষতি দেখেও সে তার লক্ষ্য পথ থেকে একবিন্দু সরে আসবে না। Do or die-হয় সে প্রাণ দান করে শাহাদাত বরণ করবে না হয় সে বিজয়ী হয়ে গাজীর মতই ফিরে আসবে।

ঈমানদার ব্যক্তি জানে তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তার কাছ থেকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেনঃ–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুমীনের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং তাদের ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি জান্নাত দানের যথার্থ ওয়াদা করা হয়েছে। (সূরা তওবা-১১১)

মুমীনের প্রাণ, ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, এসব দান করেছেন আল্লাহ এবং ক্রয়ও করে নিয়েছেন আল্লাহ। বিনিময়ে তাকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাত দান করা হবে। একজন মানুষ যখন ঈমান আনে, তখন সে এই উপকারীতা লাভ করে যে, তার ভেতরে কোনো ভীতি থাকে না। সংগ্রামের ময়দানে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা তার ভেতরে বাসা বাঁধে না। তার আদর্শের ওপরে কেউ আঘাত করলে সে তা সহ্য করতে পারে না, সিংহ গর্জনে রুখে দাঁড়ায়।

ভারতে যখন মুসলমানদের হৃদপিন্ড আল্লাহর কোরআনকে বাতিল করে দেয়ার আবেদন করে কোর্টে মামলা দায়ের করলো অমুসলিমগণ। তখন দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম বোখারী কোন শক্তির রক্তচক্ষু দেখে ভয় করেননি। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেট আমি শুনেছি। তিনি হিন্দু ভারতের কলিজার ওপরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এ ভারত আমার। কুতুব মিনার আমরা বানিয়েছি। তাজমহল আমরা নির্মাণ করেছি। শীশমহল আমরা তৈরী করেছি।

দেওয়ানে আম-দেওয়ানে খাস-আমাদের। আমরা মুসলমানরা এই ভারত দীর্ঘ আটশত বছর শাসন করেছি। শ্রীহীন এই ভারতকে পত্র-পল্লবে ফুলে ফলে আমরাই সজ্জিত করেছি। সুতরাং ভারতের কোনো বিচারক যদি 'কোরআনকে বাতিল করা হলো' বলে রায় ঘোষণা করে, তাহলে আমি সেই বিচারকের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমার বাম হাত দিয়ে তার মুখের জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলবো।'

ঈমান মানুষকে এভাবেই নির্ভীক করে তোলে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার অপরাধে (?) সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রাহঃ)-কে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। তাঁর কক্ষের ভেতরে হিংস্র শিকারী কুকুর প্রেরণ করা হলো। কুকুর তাঁর দেহের গোস্ত ছিন্ন ভিন্ন করে খুব্‌লে তুলে নিবে, এ জন্যই ইসলামের দুশমনরা তাঁর ওপরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কক্ষের বাইরে জালিমের দল অপেক্ষা করছিল সাইয়েদ কুতুবের আর্তচিৎকার শোনার জন্য।

দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হবার পরও যখন সামান্য শব্দ শোনা গেল না, তখন জালিমের দল কক্ষের দরজা উন্মুক্ত করে দেখতে পেল, আল্লাহর মুমীন বান্দা সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ) মহান আল্লাহর দরবারে সিজ্‌দায় অবনত হয়ে রয়েছেন আর প্রেরিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো তাঁর চারদিকে বসে তাঁকে প্রহরা দিচ্ছে। পরবর্তীতে তাঁকে বিচারের নামে প্রহসন করে জালিমের দল ফাঁসীতে ঝুলিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। তাঁকে ফাঁসী দেবার পূর্বে জালিম সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন মাওলানা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তওবা করে কালেমা পাঠ করার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সরকারের বেতনভুক্ত সেই মাওলানাকে নির্ভীক চিত্তে বলেছিলেন, 'মাওলানা সাহেব ! আপনি সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এসেছেন আমাকে কালেমা পড়ানোর জন্য। আপনি আমাকে কালেমা পড়িয়ে অর্থ লাভ করবেন। আর আমি কালেমা পাঠ করে এই কালেমার হক আদায় করবো বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, এ কারণেই আমাকে আজ ফাঁসীর রজ্জু গলায় ধারণ করে এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে।'

ফাঁসীর রজ্জু যখন তাঁর গলায় পরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো তখন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন, 'কোথায় কি অবস্থায় আমি মৃত্যুবরণ করছি এটা আমার চিন্তার বিষয় নয়-আমি যে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারছি, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা।'

এই হলো ঈমানের পরিচয়। ঈমানদার প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করতে জানে না। তাঁর ঈমান এতটা শক্তি তাকে দান করে যে, আপোষের কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালাকে কিভাবে সে সন্তুষ্ট করবে, এই চিন্তাই তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখে।

ঈমানদার ব্যক্তি সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি

পবিত্র কোরআন গোটা পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহকে সাক্ষী রেখে দাবী করে যে, একমাত্র ঈমানদারগণই সঠিক তথ্য লাভে ধন্য। তাঁরা জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, সত্য-সঠিক পথের অনুসারী এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত। যে কোনো ধরনের জাগতিক কল্যাণ ও সফলতা এবং কিয়ামত দিবসের মুক্তি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। পৃথিবীতে পুত ও পবিত্র জীবনধারা একমাত্র তাদের ভাগ্যেই নির্দিষ্ট থাকে। এ কারণে ঈমানদারগণ এমন এক অভঙ্গুর শক্তিশালী অবলম্বন ধারণ করে থাকেন, যা কখনও ভেঙ্গে যাবার নয়। তাদের মালিক ও প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, এ কারণে তিনি তাদেরকে যাবতীয় বাঁকা পথ ও অন্ধকার পথ থেকে বের করে আলোর পথে পরিচালিত করেন।

আর যাদের ঈমান নেই তারা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত, যাবতীয় সত্য জ্ঞান থেকে তারা দূরে অবস্থান করে। এ ধরনের মানব গোষ্ঠী মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। পরকালে এরা কোন ক্রমেই মুক্তি লাভ করবে না। এদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক স্থান জাহান্নাম।

ঈমানদার ব্যক্তি হয় কৃতজ্ঞ, বিনয়াবনত, গোটা পৃথিবীর যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং নিজের দেহ সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন সে শুধু আল্লাহর কুদরতই দেখতে পায়। এ কারণে সে বারবার আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। আল্লাহর এসব কুদরত দেখে সে আল্লাহকে বেশী বেশী সিজ্‌দা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর যেসব লোক আল্লাহর গোলামী করে, খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, তাঁরাই হলো সর্বোত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ-جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا-رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ-ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ-

যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে, চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্ন দেশে ঝর্ণধারা প্রবাহিত সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব নে'মাত ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। (সূরা বাইয়েনা-৭-৮)

ঈমানদারদেরকে কি ধরনের জান্নাত দানে করে ধন্য করা হবে, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা হাদীদ-এর ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

سَابِقُوْا اِلى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ-أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه-

তোমরা একে অপরের সাথে সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রসর হও। তোমার প্রভূর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে।

হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দিবেন তাকেও এ পৃথিবীর মতো দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত দিবেন। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন-

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا-

সেখানে (জান্নাত) যে দিকে তোমরা তাকাবে শুধু নে'মাত আর নে'মাত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সেখানে দেখতে পাবে। (দাহ্‌র-২০)

পৃথিবীতে মানুষ যতো বিত্তশালী হোক এবং যতো সুখ-শান্তিই ভোগ করুক না কেনো তবু তার কোনো না কোনো দুঃখ বা অশান্তি থাকবেই, কোনো মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জান্নাতে কোনো দুঃখই থাকবেনা, এমন কি পৃথিবীতে মাল্টি বিলিয়ন হয়েও আরো বেশী পাওয়ার জন্য এবং ভোগ করার জন্য দুঃখের শেষ থাকে না । পক্ষান্তরে জান্নাতীগণ-যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেয়া হবে তারও কোনো অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না। আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

لاَيَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ-

তারা সেখানে কখনও কোনো দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোনোদিন সেখান থেকে তাদেরকে বের করেও দেয়া হবে না। (সূরা হিজর-৪৮)

যারা ঈমানদার তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবেন, জান্নাতের দ্বার রক্ষীগণ তাদেরকে সালাম জানাতে থাকবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

حَتّى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خلِدِيْنَ-

অতঃপর যখন তারা সেখানে (প্রবেশ করার জন্য) আসবে, তখন দ্বার রক্ষীগণ তাদের জন্য দরজাসমূহ খুলে দিবে এবং জান্নাতীদের সম্বোধন করে বলবে, আপনাদের প্রতি অবারিত শান্তি বর্ষিত হোক। অনন্ত কালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন। (সূরা যুমার-৭৩)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে আরো বলেন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ–

ঐ সমস্ত ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ! যারা আমলে সালেহ (সৎকাজ) করবে, তাদের জন্য এমন সব বাগানসমূহ আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহিত হবে। (বাকারা -২৫)

পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত লাভ করতে হলে অবশ্যই ঈমানদার-মুমীন হতে হবে–আল্লাহর রহমত লাভ করার এটাই হলো শর্ত। আর ঈমান আনয়ন করলে একজন মানুষের ভেতরে অসংখ্য যে সৎগুণাবলী সৃষ্টি হয়, এসবগুণের মাত্র কয়েকটি গুণ আমরা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করলাম। ঈমান আনলে এমন অসংখ্য গুণ ঈমানদারের ভেতরে সৃষ্টি হয় যে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বিশালাকারের গ্রন্থ প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ঈমানদার যখন ময়দানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে, আল্লাহর খলীফা হিসেবে ময়দানে দায়িত্ব পালন শুরু করে, তখন সে কর্মক্ষেত্রে নিজেই অনুভব করে, ঈমান এনে সে কতটা উপকৃত হয়েছে এবং ঈমান আনার উপকারিতা কি। ঈমান ব্যতীত কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হন না এবং ঈমানহীন মানুষ মৃত মানুষের অনুরূপ–আর মৃত মানুষের পক্ষে না নিজের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব আর না অন্য কোনো মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

তান-ই বেরুহ্‌ছে বেজার হ্যায় হক
খুদায়ি জিন্দাহ্‌ জিন্দাকা খুদা হ্যায়।

আত্মাহীন দেহের প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হতে পারেন না–খোদা চির জীবিত সুতরাং তিনি জীবিতদেরই খোদা।

ঈমান নিছক একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের নাম নয়

আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করছে, ঈমানদারকে আল্লাহ তা'য়ালা নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবেন এবং এই লোকগুলোই কিয়ামতের দিন সফলতা অর্জন করবে। ঈমানদার লোক জান্নাত এ জন্য লাভ করবে যে, পৃথিবীর জীবনে তারা সঠিক, নির্ভুল ও অভ্রান্ত পথে চলেছে। জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ও বিভাগে এবং প্রতিটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজে ঈমানদার লোকগুলো ন্যায়-নীতি, সঠিক ও নির্ভুল পন্থা অনুসরণ করেছে এবং যে কোন ব্যাপারেই বাতিল নীতি ও পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলেছে। ঈমানের দাবীদার লোকগুলো জীবনের প্রত্যেক পদে, ক্ষেত্রে ও বিভাগে এবং কর্মকান্ডে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ভুল-নির্ভুলের মধ্যে এই পার্থক্যবোধের সন্ধান কোথা থেকে লাভ করলো?

শুধু তাই নয়, সত্য ও মিথ্যার যে চেতনা তারা লাভ করলো, সেই চেতনা অনুসারে সততার পথে দৃঢ়তা এবং ভ্রান্তপথ থেকে বিরত থাকার শক্তি সামর্থ্য তারা কোথা থেকে লাভ করলো? ঈমানদার লোকগুলো সত্য মিথ্যার পার্থক্যবোধ ও অভ্রান্ত পথে চলার দৃঢ়তা ও শক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক ও অভ্রান্ত কাজের মূল উৎস। ঈমানদারকে আল্লাহ তা'য়ালা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যবোধ, সত্য পথে চলার দৃঢ়তা ও শক্তি সামর্থ্য এ জন্য দান করেছেন যে, তারা ঈমানদার–তাদের ঈমান রয়েছে। ঈমানদারকে আল্লাহ তা'য়ালা অভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবেন, এ কথা পবিত্র কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ–

এ কথা অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া যাবতীয় বিধান সত্য বলে গ্রহণ করেছে) এবং সৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তাদেরকে তাদের রব ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান হবে। (সূরা ইউনুস-৯)

আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াদা করেছেন, যারা তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং সেই অনুসারে জীবন পরিচালিত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে, তিনি তাদেরকে অভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবেন এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবেন। প্রশ্ন হলো, কোন্ ঈমানের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা সত্য পথপ্রদর্শন করবেন এবং জান্নাত দান করবেন? সেটা কি এই ঈমান যে, 'ঈমান এনেছি' এইটুকু কথা বলার কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সত্য পথপ্রদর্শন করবেন এবং মৃত্যুর পরে তাকে জান্নাত দান করবেন? নিশ্চয়ই নয়–বরং সেই ঈমানের কারণে যে ঈমান ব্যক্তির চরিত্র, আচার-আচরণ, ব্যবহার, চলা-বলা, চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রকৃতির প্রাণশক্তি হবে যার শক্তিমত্তায় চরিত্র ও বাস্তব কর্মে সুষ্ঠুতা ও পরিশুদ্ধতার প্রকাশ ঘটতে থাকবে। ব্যক্তির বাস্তব জীবনধারায় ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

মানুষ নিজের দৈহিক জীবনে এ বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারে যে, জীবনের স্থিতি, সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জীবিত থাকার স্বাদ লাভ করা যথার্থ, পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে উল্লেখিত বিষয় শুধুমাত্র আহার্য্য বস্তু খাদ্য নালীতে চালান করে দেয়ারই ফল নয়, বরং সেই ধরনের খাদ্য গ্রহণের ফল, যা হজমযোগ্য এবং হজম হয়ে রক্তে পরিণত হবে এবং দেহের প্রতিটি ধমনী শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে দেহের প্রত্যেক অঙ্গে এমন শক্তির সঞ্চালন করবে, যে শক্তির কারণে দেহের ঐ অংশের কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

নৈতিক জীবনেও ঠিক ঐ নিয়মই কার্যকর রয়েছে। এখানে হেদায়াত লাভ, সত্য অভ্রান্ত পথ চয়ন, সততা, ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন এবং অবশেষে চূড়ান্ত কল্যাণ ও সাফল্য লাভ একান্তভাবে নির্ভর করে নির্ভুল চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের ওপরে। কিন্তু এই ফল লাভ করা শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি অথবা মন-মানসিকতার কোন এক নির্জন কোণে, নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা কোন আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ফল নিশ্চয়ই নয়। বরং তা হতে পারে কেবল সেই ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের, চিন্তা-চেতনার, যা মনের গভীরে প্রতিটি পরতে সংযোজিত হয়ে চিন্তা-পদ্ধতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, জীবনধারা, রুচি-পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বভাব-প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে এবং যা বাস্তব চরিত্র ও জীবনাচরণের রূপ ধারণ করেছে।

যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করেও অনাহার পীড়িত লোকদের অনুরূপ হয়, আহার করে রীতিমতো হযম করার যা সুফল ও পুরস্কার, তা সে কিছুতেই লাভ করতে পারে না। সুতরাং 'ঈমান এনেছি' এ কথা বলার পরও যে ব্যক্তির জীবনধারা, চিন্তা-চেতনা, রুচি-পছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি যদি ঈমান না আনা লোকের অনুরূপ হয়, তাহলে 'ঈমান এনেছি' বলে যে দাবী করছে, তার দাবীর কি মূল্য থাকতে পারে? মূল্য তো সেই ব্যক্তিই লাভ করবে, যে ব্যক্তি 'ঈমান এনেছি' এ কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহর বিধানের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দিয়েছে এবং তার জীবনের সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর কাছে জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের মন-প্রাণ এবং তাদের ধন-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। (সূরা তওবা-১১১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ঈমান সম্পর্কিত বিষয়টিকে ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈমান নিছক একটি ধর্মতাত্ত্বিক আকীদা-বিশ্বাসের নাম নয়। বরং বাস্তবভাবে ঈমান হলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি চুক্তির ব্যাপার। এই চুক্তি অনুসারে বান্দাহ নিজের মন-মানসিকতা, প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বিক্রয় করে দেয়। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর বিনিময়ে এই ওয়াদা করেছেন যে, মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনে তাকে জান্নাত দান করবেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে এক ব্যক্তি কয়েকটি বিষয়কে মুখে স্বীকৃতি দিয়ে কালিমা পড়ার পরে মুসলিম সমাজে সে ব্যক্তি মুসলমান বা ঈমানদার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এরপর এই লোকটিকে মুসলিম সমাজ বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করা হয় না। কিন্তু যে ঈমান মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যে ঈমানের বিনিময়ে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে সত্য

পথপ্রদর্শন করবেন এবং পরকালীন জীবনে জান্নাতের নে'মাত ভোগ করার অধিকার দেবেন, সেই ঈমান হলো মানুষ ঈমান আনার পরে নিজের বিশ্বাস ও বাস্তব কাজ, উভয় ক্ষেত্রেই নিজের স্বাধীনতা মহান আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেবে এবং নিজের মালিকানা অধিকার আল্লাহর স্বপক্ষে বিসর্জন দেবে।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ইসলামকে মেনে নেয়ার স্বীকৃতি দেয় আর নামায-রোযাও যথাযথভাবে পালন করে, অপরদিকে নিজের দেহ ও প্রাণ, নিজের চিন্তাধারা ও দৈহিক শক্তি-যোগ্যতা, নিজের ধন-সম্পদ, যাবতীয় উপায়-উপাদান এবং নিজের মালিকানাধীন যাবতীয় বস্তুর নিরঙ্কুশ মালিক নিজেকে মনে করে এবং নিজের ইচ্ছামতো এসব কিছুতে হস্তক্ষেপ করে তা ব্যয়-ব্যবহার করে, তাহলে পৃথিবীতে এই ব্যক্তি ঈমানদার হিসাবে পরিচিত হলেও আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তির পক্ষে ঈমানদার হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ ঈমানের দাবী অনুসারে আল্লাহর কাছে সে নিজের জান-মাল আদৌ বিক্রি করেনি। পক্ষান্তরে ঈমানের প্রকৃত দাবীই হলো, ঈমানদার ব্যক্তি নিজের যাবতীয় কিছু মহান আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেবে আর এটাই হলো ঈমানের মূল কথা।

ঈমান এনেছি-এ কথা বলার পরে উক্ত ব্যক্তির 'নিজের বা ব্যক্তিগত' বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ যাঁর প্রতি সে ঈমান এনেছে, ঈমানের দাবী অনুসারে ঈমানদার ব্যক্তির ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, দেহ-প্রাণ, দৈহিক যোগ্যতা ও মেধা, সময় সমস্ত কিছুই সে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়। এ অবস্থায় এসব কিছু ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের বিপরীত পথে কোন অবস্থাতেই সে ব্যয় করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার ব্যক্তির জন্য যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, ঈমানদার ব্যক্তি প্রয়োজনে তার যাবতীয় কিছু সেই বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করতে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকে।

দ্বীনি আন্দোলন যখন ঈমানদার ব্যক্তির কাছে অর্থ-সম্পদ, সময়, দৈহিক শক্তি, মেধা ইত্যাদি দাবী করে, তখন ঈমানদার ব্যক্তি দ্বিধাহীনভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে তার সমস্ত কিছু আল্লাহর দ্বীনের জন্য কোরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ঈমান এনেছি-এ কথা বলার পর কোন ব্যক্তির এই অধিকার নেই যে, সে তার ধন-সম্পদ, দৈহিক শক্তি, যোগ্যতা ও মেধা ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করবে বা সেই ধরনের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেবে। ঈমান এনেছি-বলে দাবী করার পর কোন ব্যক্তি যদি অনুরূপ কাজ করে, তাহলে পৃথিবীতে সে ঈমানদার হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও কোরআনের দৃষ্টিতে সে ঈমানদার নয় এবং মহান আল্লাহর কাছেও তার কোন মূল্য নেই।

আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা নিজের জীবন পরিচালিত করেছে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই লোকগুলো সত্যবাদী এবং সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসাবে গণ্য হবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ-وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ-

আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই তাদের আল্লাহর কাছে সত্যবাদী ও সত্যের সাক্ষ্যদাতা রূপে গণ্য। (সূরা হাদীদ-১৯)

অর্থাৎ ঈমান আনার সাথে সাথে ঈমানদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে চুক্তি করে যে, তার নিজের প্রাণসহ যা কিছু রয়েছে, তা সবই সে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ব্যয় করবে এবং প্রয়োজনে সে নিজের প্রাণও দান করবে। সে যে আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে, এভাবে সে ব্যক্তি সেই আদর্শের জন্য সাক্ষ্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এভাবে সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করবে এবং আল্লাহর কাছে সত্যবাদী ও সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসাবে পরিগণিত হবে।

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ যেমন আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তেমনি রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ একমাত্র তাঁকেই অনুসরণযোগ্য নেতা হিসাবে গ্রহণ করা এবং কোরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থও হলো, কোরআনের বিধি-নিষেধ দৃঢ়ভাবে মেনে চলা। আল্লাহ তা'য়ালা মানব মন্ডলীকে এদিকেই তাগিদ দিয়ে বলেছেন-

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا-

অতএব ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি। (সূরা তাগাবুন-৮)

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি

আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি-এ কথাও বলা হলো, অপরদিকে মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীর মধ্য থেকে কোনো কোনো গুণাবলীকে অন্যান্যদের প্রতি আরোপ করে অথবা নিরঙ্কুশ প্রভু হিসাবে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার তাদের মনগড়া বা কল্পিত প্রভু-উপাস্যদেরকে দান করে। যেমন কার্যকারণ পরম্পরার ওপর প্রভুত্ব করা, প্রয়োজন পূরণ করা, বিপদ-আপদ দূর করা, যে কোন ফরিয়াদ শ্রবণ করা, দোয়া মঞ্জুর করা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় জিনিস সম্পর্কে অবহিত হওয়া ইত্যাদি সবই একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই এই অধিকার রয়েছে যে, মানুষ শুধুমাত্র তাঁকেই সার্বভৌম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকার করে মেনে চলবে। নিজেদেরকে একমাত্র তাঁরই গোলাম মনে

করে তাঁরই সামনে মাথানত করবে এবং নিজের যাবতীয় অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছেই বলবে। তাঁর কাছেই সমস্ত কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে, সাহায্যের প্রয়োজনে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করবে, শুধু তাঁর ওপরেই নির্ভর করবে। নীরবে নির্জনে, গোপনে-প্রকাশ্যে, আলোয়-অন্ধকারে একমাত্র মহান আল্লাহকেই ভয় করবে এবং এটাই ঈমানের দাবী। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ-

মানুষের ভেতরে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপর শক্তিকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাকে ঠিক সেইভাবে ভালোবাসে যেভাবে ভালোবাসা উচিত আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। (সূরা বাকারা-১৬৫)

ঈমানের দাবী হলো, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রাজাধিরাজ ও সকল সম্রাটের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হওয়ার সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত এ কথা বিশ্বাস করবে ও বিশ্বাসের অনুরূপ আচরণ করবে। মানব মন্ডলীর জন্য বৈধ-অবৈধ তথা হালাল-হারামের সীমারেখা নির্ধারণ, মানুষের কর্তব্য ও অধিকারের পরিধি ও ক্ষেত্র নিরূপণ এবং কোনো কর্মের আদেশ দেয়া ও কোনো কর্ম থেকে বিরত রাখার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের-এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে তা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা। মহান আল্লাহর দেয়া দেহ-মন, আত্মা, শক্তি-ক্ষমতা, মেধা ও অন্যান্য উপাদানকে কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ পন্থায় ও কোন্ কাজে ব্যবহার করতে হবে, তা নির্দেশ করার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর-এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দেয়া ও অনুসরণ করা ঈমানের দাবি।

ঈমানের দাবী হলো, মানুষ শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে, একমাত্র তাঁর নির্দেশকেই আইনের উৎস হিসাবে বিশ্বাস করবে ও মেনে চলবে, তাঁকেই আদেশ-নিষেধের অধিকারী বলে মানতে হবে। নিজের জীবনের যাবতীয় কাজে একমাত্র আল্লাহর আদেশকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। জীবনের যে কোন কর্মকান্ডে অভ্রান্ত পথনির্দেশের জন্য মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার এসব বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে কোন একটি গুণও কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে রয়েছে বলে মনে করে বা বাস্তব ব্যবহারে প্রকাশ করে, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'য়ালারই সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে আসীন করা হয়।

এভাবে কোন ব্যক্তি, দল, সমাজ বা রাষ্ট্র নিজেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অধিকার লাভের দাবি করে, তাহলে মূলতঃ তারা আল্লাহ তা'য়ালারই সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার দাবি করে।

এরা মৌখিকভাবে আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের দাবি করুক আর না-ই করুক, এতে কিছুই যায় আসে না। কারণ এরা নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা ঐসব গুণাবলীর দাবীদার, যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

ঈমানের দাবিই হলো, ঈমানদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকেই অন্যান্য সকলের সন্তুষ্টির ওপরে স্থান দেবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি নিজের মাতা-পিতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, নিকটাত্মীয়, সমাজপতি, দলের নেতা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিকে অসন্তুষ্ট করতে হয়, ঈমানদার ব্যক্তি তা-ই করে। আল্লাহ তা'য়ালাকে অসন্তুষ্ট করে ঈমানদার ব্যক্তি পৃথিবীর কোন শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও প্রেম-ভালোবাসাকে সে এতটা গুরুত্ব বা মর্যাদা দেবে না, যার ফলে আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা গুরুত্বহীন হয়ে যায়।

ঈমানের দাবি হলো মহান আল্লাহর নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ তা'য়ালা যা হালাল করেছেন তা গ্রহণ করা এবং যা হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব খাদ্যবস্তু হালাল করেছেন তা নিঃসংকোচে গ্রহণ করা এবং মহান আল্লাহর শোকর আদায় করা। কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী এবং সমাজে প্রচলিত বাতিল প্রথা ও বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধকেই প্রাধান্য দেয়াই ঈমানের দাবি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি প্রকৃত অর্থেই একমাত্র আল্লাহরই বান্দাহ্ হয়ে থাকো, তবে যেসব পবিত্র দ্রব্য আমি দান করেছি, তা নিঃসংকোচে খাও ও আল্লাহর শোক্র আদায় করো। (সূরা বাকারা-১৭২)

জিহাদ ঈমানের অনিবার্য দাবি

ঈমান আনার পূর্বে একজন মানুষ থাকে তাগুতের গোলাম। সে তার প্রবৃত্তি অনুসারে জীবন-যাপন করে থাকে। জীবন পরিচালনার ব্যাপারে সে কোন নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। হালাল-হারামের সীমা রেখা অনুসরণের কোন তাগিদ তার ভেতরে সক্রিয় থাকে না এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক জীব মনে করে। কে তাকে সৃষ্টি করেছে এবং কেন করেছে, এই পৃথিবীতে তাকে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এখানে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এসব প্রশ্ন নিয়ে সে চিন্তা-গবেষণা করতে মোটেও ইচ্ছুক থাকে না। পৃথিবীর পশু-প্রাণী আহার করে, জৈবিক

তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়, বংশ বৃদ্ধি করে, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পরস্পরে হিংস্রতায় লিপ্ত হয়, এভাবে এক সময় তার নির্ধারিত জীবন কাল শেষ হয়ে যায় এবং পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

ঈমানহীন মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের জীবনধারার প্রতি লক্ষ্য করলেই উপরোক্ত কথার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হবে। জীবন পরিচালনার ব্যাপারে এদের সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিবর্গ যেসব নিয়ম-বিধান রচনা করে, এরা তা অসহায়ত্বের কারণে অথবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রচিত বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করে। ব্যক্তি জীবনকে যেভাবে খুশী ভোগ করে। সামষ্টিক জীবনে নিজেদের স্বার্থের কারণে ভিন্ন জাতির সাথে যে কোন ধরনের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কোন সত্ত্বার কাছে নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে-এ ধরনের কোন অনুভূতি এদের ভেতরে নেই। অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন সীমারেখা এরা মানে না। জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর ক্ষেত্রে এরা কোন নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে এদের ওপরে কোন বিপদ-মুসিবত আপতিত হলে, রোগে আক্রান্ত হলে অথবা কোন ধরনের অসহায় অবস্থায় নিপতিত হলে নিজেদের কল্পিত কোন সত্তার বেদিমূলে বা পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধারণার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মূর্তি নির্মাণ করে নিষ্প্রাণ মূর্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করে, মৃত মানুষের কবর-মাজারে গিয়ে কাকুতি-মিনতি জানায় অথবা আল্লাহর বিধানের অধীন প্রাকৃতিক কোন শক্তির কাছে সাহায্য কামনা করে থাকে।

পক্ষান্তরে একজন মানুষ যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, তখন সে নিজেকে আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে। পূর্বপুরুষদের যাবতীয় প্রথা সে অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আল্লাহ্ বিরোধী বিধানের প্রতি সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য কোন ধরনের পথ ও মত সে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নয়। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সে প্রতিটি পদক্ষেপে অনুসন্ধান করতে থাকে, তার মালিক, তার প্রভু-তার রব, তার ইলাহ, তার মা'বুদ, তার মুনিব আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে পদ নিক্ষেপ করতে বলেছেন। একজন ঈমানদার মানুষের যখন আহারের প্রয়োজন হয়, তখন সে অনুসন্ধান করে-তার রাসূল তাকে কিভাবে আহার গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন।

সে যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন সে সেই নিয়মই অনুসরণ করে, যে নিয়ম তার নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। জৈবিক তাড়নায় এবং বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে যখন নিজ অর্ধাঙ্গিনীর সাথে মিলিত হতে যায়, তখন সে উন্মত্ত হয়ে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে পশু সুলভ আচরণের লিপ্ত না হয়ে, সেই নিয়মই অনুসরণ করে-যে নিয়ম তাকে রাসুল শিখিয়েছেন। এভাবে একজন ঈমানদার মানুষের জীবন হয় নিয়ন্ত্রিত তথা আল্লাহর আইনের অধীন।

মানুষ হিসাবে ঈমানদার মানুষ ও ঈমানহীন মানুষের ভেতরের প্রবৃত্তির কোন পার্থক্য নেই। ঈমানহীন মানুষের ভেতরে যেমন আবেগ-উচ্ছ্বাস, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, শক্তি রয়েছে, অনুরূপ ঈমানদার মানুষের ভেতরেও রয়েছে। পক্ষান্তরে ঈমানদার মানুষ এসব প্রবৃত্তি ব্যবহার করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে আর ঈমানহীন মানুষ তা ব্যবহার করে তাগুতের পথে।

ঈমানদার মানুষ যখন কারো প্রতি হৃদায়াবেগ অনুভব করে, তখন প্রথমেই অনুসন্ধান করে, এ ব্যাপারে তার আল্লাহ তার প্রতি কি নির্দেশ দান করেছেন। কারো প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হলে সে প্রথমে অনুসন্ধান করে, এই ক্ষোভ প্রকাশের আল্লাহর নির্দেশিত পথ কোনটি। প্রেমানুভূতি সৃষ্টি হলে সে ঐ পথেই তার অনুভূতিকে পরিচালিত করে, যে পথে তাকে তার মুনিব-আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিচালিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কারো প্রতি আঘাত করতে হলে, সর্বপ্রথম সে জানতে চায়-আল্লাহ তাকে কিভাবে আঘাত করতে বলেছেন। উপস্থিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসুল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবা কেরাম কি ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।

এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাকে কোন পথ ও মত, কোন নিয়ম-বিধান অনুসরণ করতে হবে, সে তা অনুসন্ধান করে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে। কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের বিপরীত কোন নিয়ম-নীতি ঈমানদার মানুষ অনুসরণ করে না। এভাবে ঈমানদার মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে জিহাদ করতে হয়। ঈমানদার তথা মুমিন জীবনে এই জিহাদ কোন একটি স্তরে বা সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। তাকে এই জিহাদ করতে হয় পৃথিবীর জীবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। প্রতিটি কাজ ও কথা বলার ক্ষেত্রে তাকে জিহাদ বা মুজাহাদা করতে হয় এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সে সময়ের বিবর্তনে আল্লাহর বান্দায় উন্নীত হয়।

জিহাদ বা মুজাহাদা ব্যতীত ঈমান আনয়নকারী একজন মানুষ কোনক্রমেই আল্লাহর গোলামে পরিণত হতে পারে না বা কল্যাণকর শুভ পরিণতিও সে লাভ করতে পারে না। জিহাদ বা মুজাহাদার কাজ ঈমানদারকে নিজের কল্যাণের জন্যই করতে হবে। এর যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী সে নিজেই হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَنْ جَاهَدَ فَانَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه-

যে ব্যক্তিই জিহাদ করবে, সে নিজের কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যেই করবে। (সূরা আনকাবুত-৬)

যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাকে সর্বপ্রথমে তাগুতকে অস্বীকার করতে হয়। তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই তাগুত শত-সহস্র রূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান। প্রচন্ড ঠান্ডার মৌসুমে আরামের শয্যা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে, কিন্তু নিজের মন আরাম ত্যাগ করে নামাজ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে মনের এই কামনা হলো তাগুত। ব্যক্তি ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে, নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসার কারণে সে নামাজ আদায় করছে না, এই ব্যবসা তখন তাগুতে পরিণত হলো।

ব্যক্তি সুদ পরিহার করতে আগ্রহী, কিন্তু রাষ্ট্র তাকে সুদ দিতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করছে, রাষ্ট্রের এই নিয়ম তাগুত হিসাবে ব্যক্তির সামনে দন্ডায়মান। ব্যক্তি অশ্লীল গান-বাজনা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি পরিহার করে চলতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজ ও দেশের প্রচলিত বিধান তাকে এসবের মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে, দেশের এই প্রচলিত বিধান তাগুত। অর্থাৎ এসব নিয়ম-বিধান ব্যক্তিকে আল্লাহর বিধান অনুসরণে বাধার সৃষ্টি করছে। এসবই তাগুত আর এই তাগুতের বিরুদ্ধেই ঈমানদারকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদ বা মুজাহাদা করতে হয়।

মুজাহাদা আরবী শব্দ এবং এই শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, কোন প্রতিকুল বা বিরোধী নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা শক্তির মোকাবেলায় দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, সাধনা ও প্রচেষ্টা করা। আবার যখন কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট প্রতিকূল অবস্থা বা শক্তিকে চিহ্নিত না করে মুজাহাদা করা হয়, তখন মুজাহাদা শক্তির অর্থ দাঁড়ায় সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একজন ঈমানদার মানুষকে এই পৃথিবীতে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে জীবন পরিচালিত করতে হয় আর এরই নাম হলো মুজাহাদা। ঈমানদার ব্যক্তিকে শয়তানের সাথে জিহাদ বা সংগ্রাম করতে হয়। কারণ ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ একটি দল বিশেষ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তোমরা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। (আল কোরআন)

মুজাহাদার মাধ্যমে ঈমানদার গোষ্ঠী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কারণ শয়তান তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সৎ কাজের মারাত্মক ক্ষতির ভয় প্রদর্শন করে এরং অসৎ কর্মের প্রভূত লাভ ও স্বাদ উপভোগের লালসা প্রদর্শন করতে থাকে। ঈমানদারকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ-সংগ্রাম করতে হয়। কারণ এই কুপ্রবৃত্তিই ঈমানদারকে সর্বক্ষণ নিজের অশুভ ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও আকাংখার গোলামে পরিণত করার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছে।

ঈমানদার গোষ্ঠীকে নিজের আবাসস্থল থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের এমন সব মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যেসব মানুষের চিন্তা-চেতনা, মতবাদ, আদর্শ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি-নৈতিকতা, জীবনধারা, প্রথা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, সাংস্কৃতিক নীতিমালা, অর্থনৈতিক মতবাদ, সামাজিক নীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার বিপরীত। সম্পূর্ণ পরিবেশ তার জীবন বিধান পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

ঈমানদার ব্যক্তিকে এমন সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে নিজেরা মনগড়া বিধান রচনা করে তা জারী করে এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পরিবর্তে অসুন্দর, অকল্যাণ ও অশুভ-অসততাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঈমানদারের এই জিহাদ, এই মুজাহাদা-এই প্রচেষ্টা, এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। বা পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোন ভূ-খন্ডের মধ্যেও আবদ্ধ নয়-আমৃত্যু তাকে এই জিহাদ করতে হয় এবং পৃথিবীর যে কোন ভূ-খন্ডেই সে অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তাকে এই জিহাদে লিপ্ত হতে হয়।

জীবনের বিশেষ কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেও এই জিহাদ বা মুজাহাদা আবদ্ধ থাকে না, বরং জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরেই তাকে জিহাদ করতে হয়। ঈমানদারের জন্য এই জিহাদ বাধ্যতামূলক। ঈমানদারকে এভাবে কোন ধরনের বাহ্যিক অস্ত্র ব্যতিতই জীবনের প্রতিটি ময়দানে জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। এই ধরনের জিহাদ সম্পর্কে হযরত হাসান বাসরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন-

ان الرجل ليجاهدو ما ضرب يوما من الدهر بسيف-

মানুষ এমন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও তরবারী চালনা করতে হয় না।

অর্থাৎ ঈমানদারকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এমন জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয় যে, এই জিহাদে তাকে মাধ্যম হিসাবে কোন অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। অবয়বধারী দৃশ্যমান কোন অস্ত্র ব্যতীতই তাকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। আর সেই বড় অস্ত্রের নামই হলো ঈমান। এ জন্য বলা হয় যে, ঈমান হলো একটি সুদৃঢ় বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষের শিকড় হলো জিহাদ। শিকড় ব্যতীত যেমন কোন বৃক্ষ টিকে থাকতে পারে না, তেমনি জিহাদ ব্যতীত ঈমান টিকে থাকে না।

শিকড় সতেজ থাকলে বৃক্ষের ওপরি ভাগের পত্র-পল্লব সতেজ থাকে, বৃক্ষ ফুল-ফল দান করে। শিকড় সতেজ না থাকলে বৃক্ষ ক্রমশঃ শুকিয়ে জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়। শিকড়

ব্যতীত বৃক্ষের অস্তিত্বই যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি জিহাদ ব্যতীত মুসলমানের জীবন কল্পনা করা যায় না। মুসলমানদের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে তার জিহাদী চেতনার ওপরে। এই চেতনা যতদিন মুসলমানদের মধ্যে শাণিত ছিল, ততদিন পৃথিবীতে এরা নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

মুসলমান জনগোষ্ঠী যেদিন থেকে তার ঈমান নামক বৃক্ষের শিকড় জিহাদের প্রতি উদাসিন হয়ে পড়েছে, মুজাহাদা ত্যাগ করেছে, তখন থেকেই তার ঈমানের মৃত্যু ঘটা শুরু হয়েছে। ফলে গোটা পৃথিবীতে তারা আজ ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অঢেল সম্পদ ও বিপুল জনশক্তির অধিকারী হয়েও তারা অমুসলিমদের গোলামী করতে বাধ্য হচ্ছে। অমুসলিমরা যখন তাদের ওপরে বন্য হায়েনার হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন এরা মৃত লাশের ন্যায় নীরব ভূমিকা পালন করছে। নিজেদের স্বার্থে অমুসলিমরা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অনুসরণ করতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করছে।

বর্তমান পৃথিবীতে শতকোটি মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির একমাত্র কারণ হলো, তারা ঈমান নামক বৃক্ষের শিকড় জিহাদকে নিজেদের জীবন থেকে কেটে ফেলেছে। অমুসলিমরা জিহাদের যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেই ব্যাখ্যাকে তারা একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করে জিহাদের অধ্যায়কে নিজেদের জীবন থেকে মুছে দিয়েছে। অমুসলিমরা এদেরকে বুঝিয়েছে, জিহাদ মানেই হলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং এই জিহাদ নামক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে, এরাও অমুসলিম প্রভুদেরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় শক্তি জিহাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে যেসব ভূ-খন্ড মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত এবং তার শাসকবৃন্দও আদম শুমারীর খাতায় মুসলিম নামে পরিচিত, সেসব দেশে আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যখন আল্লাহর বিধানের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে, তখন মুসলিম নামধারী শাসকবৃন্দ এদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী ও সর্বশেষে সন্ত্রাসী বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের গলায় ফাঁসির রশি পরিয়ে দেয়।

এসব দুনিয়া পূজারী লোকগুলো মুখে নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দাহ্ বলে দাবি করে, আসলে এরা শয়তানের গোলাম এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস। এদের সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

জবাঁছে গারকিয়া তৌহিদকা দাওয়া তু কিয়া হাছেল!
বানায়া হ্যায় বুত পেন্দারকো আপনা খোদ তুনে।

তুমি মুখে যদিও তওহীদের দাবি করে থাকো, কিন্তু তাতে লাভ কি? তুমি তো কল্পনার প্রতিমূর্তিকেই নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছো।

মুমিনের জিন্দেগী ও জিহাদ

জিহাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনের স্পন্দন, প্রাণশক্তি, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়, এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে কোন মুসলমানের পক্ষে ঈমানদার থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। একজন মানুষ যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, সেই মুহূর্ত থেকেই জিহাদ করা তার ওপরে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় তার জিহাদী জীবন।

এই জিহাদ নিরবচ্ছিন্নভাবে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। ঈমান আনার মুহূর্ত থেকে আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা ঘটে, যে সংগ্রামমুখর জীবনের সূত্রপাত হয়, এই সংগ্রামী জীবন থেকে ঈমানদারের অবসর ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই সংঘাত ও সংগ্রাম থেকে মুমিন জীবনে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণ করার সামান্যতম অবকাশ নেই। নেই শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ। কারণ যখনই সে জিহাদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, আল্লাহ বিরোধী তাগুতী শক্তি সেই মুহূর্তেই তার ঈমান হরণ করার লক্ষ্যে চতুরমুখী আক্রমণ শুরু করবে।

ইসলাম গ্রহণ বা ঈমান আনার সাথে সাথেই যে জিহাদ শুরু করতে হবে, এ বিষয়টি আমরা দেখতে পাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনে। নবুয়্যাত লাভ করার সাথে সাথে তিনি আল্লাহর দ্বীন মানুষকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। বিরোধিতার প্রচন্ড তান্ডব সৃষ্টি হলো এবং বিরোধী শক্তি তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিল। তাদের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর রাসুলের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাঁর রাসূলকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন– فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا–

হে রাসূল ! আপনি কোনক্রমেই কাফিরদের আনুগত্য করবেন না; বরং এই কোরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করুন। (সূরা ফুরকান-৫২)

এই আয়াতে **'জিহাদান কাবিরা'** বলতে যা বুঝানো হয়েছে, তাফসীরকারগণ এর তিনটি অর্থ করেছেন। একটি অর্থ হলো, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা–অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেয়ার মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। আরেকটি অর্থ হলো, বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করা। **জিহাদান কাবিরা** তথা বড় ধরনের জিহাদের আরেকটি অর্থ হলো, ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো।

অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন একটি দিকও অপূর্ণ না রাখা এবং প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ময়দান ত্যাগ না করা। প্রতিপক্ষের অনুকূল শক্তি ময়দানে যেসব স্থানে সক্রিয়

রয়েছে, ময়দানের সেসব স্থানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন হয়-সেসব দিকে কাজ করা।

যেখানে নিজের ব্যবহার ও মধুর আচরণ দিয়ে জিহাদ করার প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করা। যেখানে কথা দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জিহাদ করা প্রয়োজন, সেখানে তা করা। যেখানে লেখনী দিয়ে জিহাদ করার ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে লেখনী শক্তি প্রয়োগ করা। যেখানে অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেখানে অস্ত্র ধারণ করা। অর্থাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এখানে এ কথা স্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে যে, সূরা ফোরকানের উল্লেখিত আয়াত রাসূলের মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয় এবং এই আয়াতে যে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা কোনক্রমেই সেই জিহাদ নয়, যে জিহাদে রাসূল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবা কেরাম বদর ও ওহুদের প্রান্তরে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূলের মদীনার জীবনে যে জিহাদের নির্দেশ এসেছিল, মক্কী জীবনের জিহাদ সেই জিহাদ নয়।

মক্কী জীবনের এই জিহাদের অর্থ ছিল, ইসলাম বিরোধী শক্তিকে আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করা। অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ইসলামী আদর্শের যথার্থতা উপস্থাপন করা এবং প্রচলিত আদর্শ ও ভাবধারার অসারতা দেখিয়ে দেয়া। রাসূল উপস্থাপিত আদর্শই যে মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ-এ কথা মানুষের চিন্তার জগতে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজ ও জাতি যে পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে পথ যে ধ্বংস গহ্বরে মিলিত হয়েছে, এ বিষয়টি সমাজ ও জাতির কাছে পরিষ্কার করে দেয়া। এ জন্যই মক্কী সূরাসমূহে দেখতে পাওয়া যায় অখন্ডনীয় যুক্তি দিয়ে মানুষকে সত্য বুঝানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। গভীর মমতার সাথে মানুষকে সত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

মক্কী জীবনে জিহাদের ধরণ ছিল সত্যবিরোধীদের সামনে কোন ধরনের অস্পষ্টতা বা জড়তার আশ্রয় গ্রহণ না করে স্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশ করা, সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশ করা, ইসলাম বিরোধীদের সামনে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা। সত্যের শত্রুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও বিরোধীতার প্রবল স্রোতের মুখে ক্লান্ত না হয়ে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকা।

এটাই ছিল রাসূলের মক্কী জীবনের জিহাদ এবং এই জিহাদে অবিচল ও অটল ভূমিকা পালন করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল এবং তাঁর গুটিকতক মজলুম অনুসারীদেরকে নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, লোভ-লালসার গন্ডিতে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, অবশেষে তাদের ওপরে অবর্ণনীয় লোমহর্ষক নির্যাতন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে, তবুও তাঁরা এই জিহাদ থেকে ক্ষণিকের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণের কল্পনাও করেননি বা সামান্য শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। আর এটাই হলো মুমিনের জিন্দেগীর বাস্তব রূপ।

ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করে তার নিজের নফ্ছের বিরুদ্ধে। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, নীতি-পদ্ধতি, বিধি-বিধান, মতবাদ-মতাদর্শ পরিহার করার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এটাই জিহাদের সূচনা। মানুষের ভেতরে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, এই কুপ্রবৃত্তি বা নফছ কোনক্রমেই ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। পক্ষান্তরে এই নফ্ছকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। কেননা এই নফছ্ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তি।

মানুষের ভেতরের এই শক্তি মানুষকে অসৎ কাজে প্ররোচিত করতে থাকে, এর প্ররোচনা থেকে যে ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম, সে ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। ইসলামের বিপরীত শক্তির সাথে যে ব্যক্তি জিহাদ করে তাকেই হাদীস শরীফে মুজাহিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃত মুজাহিদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ–

যে ব্যক্তি নিজের নফছ্কে আল্লাহর অনুগত বানানোর লক্ষ্যে জিহাদ করলো, সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ। (মুসনাদে আহ্মাদ)

সুতরাং মুমিনের জিন্দেগী শুরুই হয় তার নিজের নফ্ছের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনার মাধ্যমে। একজন মানুষ বাহ্যিক দিক দিয়েই শুধু মুসলিম হবে না, তার সমস্ত হৃদয়-মনকে সে আল্লাহর বিধানের সামনে অনুগত করে দিবে, তার নফছ আল্লাহর বিধানের সামনে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, কিন্তু তাকে নফছের সিদ্ধান্তের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে–আর এভাবেই সে মুমিন শ্রেণীতে উপনীত হবার সোপানে যাত্রা শুরু করবে।

মুমিন হওয়ার শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ–

তোমাদের মধ্যে কোন মানুষই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না–যতক্ষণ তার হৃদয়-মন, সমস্ত অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহর বিধানের অধীন না হবে। (বুখারী-মুসলিম)

শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতিই নয়–গোটা হৃদয়-মনকে আল্লাহর বিধানের সামনে নত করে দিতে হবে তথা নফছের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ পরিচালিত করে নিজেকে মুমিনের স্তরে উপনীত করে জান্নাত লাভের যোগ্য হিসাবে গড়তে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى-فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى-

আর যে ব্যক্তি নিজের রব-এর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে ভয় পাবে এবং নিজের হৃদয়-মনকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, জান্নাতই হবে তার চূড়ান্ত পরিণতির স্থান। (সূরা নাযিয়াত-৪০-৪১)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জান্নাত লাভের শর্তই হলো নিজের হৃদয়-মন-মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়া। নফছ প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথ অতিক্রম করা। সুতরাং একজন মানুষকে মুমিনের স্তরে উপনীত হতে হলে সর্বপ্রথমে তাকে নিজের নফছের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। এরপর তাকে জিহাদ করতে হবে সে যে পরিবেশে অবস্থান করে, সেই পরিবেশের সাথে। মনে রাখতে হবে, মানুষের ভেতরে আল্লাহদ্রোহী যে শক্তি অবস্থান করছে সে শক্তির নামই হলো কুপ্রবৃত্তি বা নাফছ এবং মানুষের দেহের বাইরে আল্লাহদ্রোহী যে শক্তি রয়েছে, তার নাম হলো শয়তান। ঈমানদারকে এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়।

শয়তান অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য। এই শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে নফছের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে এবং মানুষের বাইরের পরিবেশকে নিজের অনুকূলে এনে তার আধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে জিহাদের মাধ্যমে নিজের নফছকে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব উৎখাত করতে হবে। তারপর বাইরের আল্লাহ বিরোধী পরিবেশের সাথে জিহাদ করে শয়তানের সাম্রাজ্যে ধ্বস নামিয়ে দিতে হবে।

মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের মুরিদ হয়ে তার গোলামী করে, শয়তান এদের মাধ্যমেই তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই মানবরূপী শয়তানদের সাথেও মুমিনকে প্রতি নিয়ত জিহাদ করতে হয়। এই জিহাদ করার পূর্বে একজন ঈমানদারকে সর্বপ্রথমে সেই অবস্থান থেকে হিজরত করতে হয়, ঈমান আনার পূর্বে সে যে অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ ঈমান আনার পূর্বে তাকে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হয়। আল্লাহ বলেন-

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ م بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لَا انْفِصَامَ لَهَا-

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে যে, যা কখনই ছিঁড়ে যায় না। (সূরা বাকারা-২৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী শক্তি তথা তাগুতের সাম্রাজ্য থেকে মানুষকে প্রথমে হিজরত করে ঈমান আনতে হয় বা ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। এরপরই শুরু হয় জিহাদের পর্যায়। আর মুমিনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে হিজরত তখনই করতে হয়, যখন তার নিজের দেশে অবস্থান করে আল্লাহর গোলামী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে যারা প্রথমবার কুফরীর জগৎ থেকে হিজরত করে ঈমান এনেছে এবং নিজের নাফছের বিরুদ্ধে, তার অবস্থানের পরিবেশের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে এবং সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে আল্লাহর নির্দেশিত পথে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভ করবে। এদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ-وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে অর্থাৎ আল্লাহর জন্য নিজের দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভের ন্যায়-সংগত প্রত্যাশী। আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধন্য করবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা বাকারা-২১৮)

মুমিন যে কোন অবস্থায় সত্য অবলম্বন করবে এবং এটাই তার জিহাদ। সত্য বলার ক্ষেত্রে সে কোন বিপদেরই তোয়াক্কা করবে না। আল্লাহর রাসূল বলেন–

اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ-

অত্যাচারী শাসকের সামনে ইনসাফ ও সুবিচারের কথা বলা বড় ধরনের জিহাদের শামিল। (তিরমিজী)

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে জেলে যেতে হবে, তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের খড়গ নেমে আসবে, এসবের কোন পরোয়া মুমিন করবে না। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ-

অত্যাচারী জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা অতীব উত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ)

মুমিনের জিন্দেগীতে আপোষ বলে কোন কথা নেই। বাতিল শক্তির সাথে সে বিন্দুমাত্র আপোষও করবে না, তাদেরকে ভয়ও করবে না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে। মুমিনের এই দুর্লভ গুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ-

তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এমনভাবে যে, তারা এই পথে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে একবিন্দু ভয় করে না। (সূরা মায়িদা-৫৪)

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র কোন বিষয় নয়। পৃথিবীর যে কোন ভূ-খন্ডে মুমিন যাক না কেন, সেখানে যদি সত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, অবশ্যই সে তা করবে। আল্লাহর রাসুলের সাহাবী হযরত উবাদা ইবনুস সামেত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ–

আল্লাহর রাসূলের হাতে আমরা বায়'আত করে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যেখানেই এবং যে অবস্থায়ই থাকি না কেনো, সত্য কথা, ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলবো এবং এ ব্যাপারে আমরা কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করবো না। (বুখারী)

ইসলামী বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে মুমিন কোন প্রতিকূল পরিবেশের পরোয়া করবে না। সর্বাবস্থায় সে সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলতেই থাকবে। এ ব্যাপারে সে কারো রক্তচক্ষু, কারো অভিযোগ-আপত্তি, কারো বিদ্রুপের কোন পরোয়া করবে না। পরিবেশ ও দেশের জনমত ইসলামের বিরোধী হলেও মুমিন সামান্য বিচলিত হবে না, সেই প্রতিকূল পরিবেশেই সে ঐ পথেই জিহাদ করতে থাকবে, যে পথ তাকে ইসলাম প্রদর্শন করেছে।

জিহাদই ঈমানের কষ্টি পাথর

মুসলিম হিসাবে দাবীদার একজন মানুষ ঈমানদার কি না, তা যাচাই করার একমাত্র মাধ্যম হলো জিহাদ। কারণ কুফর আর ইসলামের জিহাদ বা দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সংঘাত হচ্ছে এমন একটি বিশেষ কষ্টি পাথর, এমনই এক মানদন্ড, যা প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় যেমন প্রকাশ করে দেয় তেমনি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে কারা ভূয়া-মেকি, কৃত্রিম, তাদের পরিচয়ও সুস্পষ্ট করে দেয়। যে ব্যক্তি এই জিহাদ তথা ইসলামী বিরোধী শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মন প্রাণ দিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করবে এবং যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ, সমগ্র উপায়-উপকরণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও পালন করার কাজে নিয়োজিত করবে এবং কোন প্রকার আত্মদানেই কুণ্ঠিত হবে না, সেই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত ঈমানদার।

আর যে ব্যক্তি বাতিল শক্তির সাথে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইসলামের পক্ষ সমর্থন করবে না, ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের জৌলুশ ও শক্তিমত্তা দেখে ভীতগ্রস্থ হয়ে ময়দান ত্যাগ করবে, ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে জান-মাল উৎসর্গ করাকে বৃথা মনে করে কুণ্ঠিত হবে, তার এই আচরণই প্রমাণ করে দিবে যে, সে ব্যক্তি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যা–সে মুনাফিক।

তাবুক অভিযানের সময় এই কৃত্রিম ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের পরিচয় রাসুল ও তাঁর সাহাবাদের সামনে আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ঈমানের ব্যাপারে যারা মেকী, তারা তাবুক অভিযানের কথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর রাসুল যখন এই অভিযানে জান-মাল দিয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোষণা দিলেন, তখন মেকি ঈমানদার তথা মুনাফিকী রোগে যারা আক্রান্ত ছিল, তাদের রোগ প্রকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাদের নফছ ও শয়তান তাদেরকে বুঝালো, 'এই জিহাদে অংশগ্রহণ করলে মারাত্মক ক্ষতির মোকাবিলা করতে হবে। সুতরাং এই ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য রাসূলের কাছে অজুহাত পেশ করতে হবে যে, আমাকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, বর্তমানে আমার পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

এরা রাসুলের আহ্বানের মোকাবিলায় শয়তানের পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূলের কাছে কাকুতি-মিনতি করে আবেদন পেশ করেছিল, তাদেরকে যেন এই জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। এদের মেকি ঈমান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন-

لَايَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ-وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ-اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ-

যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনই তোমার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। এ ধরনের কোন আবেদন শুধুমাত্র তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার নয়, তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে আর তারা নিজেদেরই সন্দেহের আবর্তে পড়ে আবর্তিত হচ্ছে। (সূরা তওবা-৪৪-৪৫)

যারা প্রকৃতই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে, তারা যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে হলেও আল্লাহর পথে জিহাদ করে। দ্বীনি আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাদের ওপরে যখন কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন তারা কোন ধরনের অজুহাত প্রদর্শন করে না। কোন ধরনের ওজর-আপত্তি ছাড়াই সে দায়িত্ব আন্তরিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আর তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যাদের বিশ্বাস ঠুনকো, এসব ব্যাপারে যারা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে, তারা

পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে দ্বীনি আন্দোলনে শামিল হলেও, এই আন্দোলন যখন বিপদের মোকাবিলা করতে থাকে বা এই আন্দোলনের ওপরে বাতিল গোষ্ঠী হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপরে নির্যাতন নেমে আসে, তখন এই মেকি ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়ে। এরা পথ খুঁজতে থাকে, কিভাবে আন্দোলনের কাজ থেকে দূরে অবস্থান করা যায়। আন্দোলন বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করার সময় যারা দৃঢ় প্রত্যয়ে আন্দোলনের কাজে সক্রিয় থাকে, তারাই প্রকৃত ঈমানদার। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ ۢ بَعْدِ مَافُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا-اِنَّ رَبَّكَ مِنْ ۢ بَعْدِ هَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, ঈমান আনার কারণে যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব্ব ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা নাহ্‌ল-১১০)

এসব লোকদের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। এই শ্রেণীর লোকদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

اَلَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ-وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ-خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

আল্লাহর কাছে তো সেই লোকদের অতি বড় মর্যাদা, যারা ঈমান এনেছে, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদের রব্ব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিফল দেয়ার অফুরন্ত সামগ্রী রয়েছে। (সূরা তওবা-২০-২২)

ঈমান এনেছি-এ কথা বললেই ঈমানদারের দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, তাকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই

পরীক্ষা শুধু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদেরকেই করা হয়নি বা হবে না, অতীতেও যারা কুফরী ত্যাগ করে ঈমান এনেছে, তাদেরকেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই পরীক্ষা তথা জিহাদের ময়দানেই প্রমাণিত হয়, কে ঈমানের দাবির ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। আল্লাহ বলেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا امَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُوْنَ-وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ-

লোকেরা কি এ ধারণা করেছে নাকি, 'ঈমান এনেছি' কেবলমাত্র এ কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত-২-৩)

আল্লাহ বলেন, পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিকেই অনিবার্যভাবে কঠিন পরীক্ষার স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে হবে।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ-مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَه مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ-اَلاَ اِنَّ نَصْرَ اللّٰه قَرِيْبٌ-

তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে এমনিতেই প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও কঠিন যন্ত্রণার, তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসুল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ? তখনই তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে, জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা বাকারা-২১৪)

আল্লাহ বলেন, ঈমানের দাবীদারকে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এতটা মূল্যহীন নয় এবং পৃথিবীতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত সহজ লভ্য নয় যে, তোমরা শুধু মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি

তোমাদেরকে সেসব নে'মাত দান করবো। আমার এসব নে'মাত লাভ করতে হলে অবশ্যই পরীক্ষার ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে পরীক্ষা দেয়া যায় না, পরীক্ষা দিতে হলে অবশ্যই পরীক্ষার ক্ষেত্র তথা আন্দোলনের ময়দানে নামতে হবে। তখন আমি দেখবো, কে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ধরনের ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সূরা ইমরান-এর ১৪২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ-

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে ধৈর্যশীল ?

আল্লাহ বলেন, আমার নে'মাত লাভ করতে হলে অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট মুসিবত সহ্য করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, জেলে যেতে হবে, ফাঁসির রশি গলায় পরতে হবে, অর্থ-সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশঙ্কা দিয়ে এবং লোভ-লালসা দিয়েও তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এমন প্রতিটি জিনিস যা তোমরা প্রিয় মনে করো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তা কোরবান করতে হবে। আর এমন প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট যা তোমরা কামনা করো না, তোমাদের কাছে যা অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত, তা আমার জন্য অবশ্যই সহ্য করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমার প্রতি ঈমানের যে দাবী করেছিলে, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে। এভাবে জিহাদের কষ্টি পাথরে ঈমান যাচাই করে নেয়া হবে।

ইতোপূর্বে আমরা মুমিন জীবনে জিহাদের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। জিহাদের বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ঈমান ও জিহাদ মুমিন জীবনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ ব্যতীত একজন মানুষ মুমিনের স্তরে উপনীত হতে পারে না এবং ঈমানও টিকে থাকে না। জিহাদ ব্যতীত ঈমানের দাবীর ব্যাপারে নিশ্চিতও হওয়া যায় না। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান তথা মহান আল্লাহর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর, রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজেকে এই মূল কাজ তথা জিহাদের জন্যই প্রস্তুত করে। ব্যক্তিকে সৎ চরিত্রবান বানানোর লক্ষ্যে ইসলাম যত বিধান দান করেছে, অর্থাৎ নামায আদায়, রোজা পালন, যাকাত আদায়, হজ্জ আদায়, নিজেকে শয়তানী কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা ইত্যাদী যে কাজগুলো একজন মানুষকে করতে হবে এবং এ কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হতে পারে, যেমন-সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীতে লোক রিক্রুট করার পর বিশেষ সময় পর্যন্ত তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাবতীয়

ট্রেনিং সম্পন্ন হবার পরই তাকে নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তেমনি একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এবং নবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরে মুসলিম দলে শামিল হলো তখন নামায,রোজা, হজ্জ ইত্যাদীর মাধ্যমে তাঁর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভেতরে ক্রমশঃ সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হতে থাকে, যে যোগ্যতা থাকলে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। সৈনিককে যেমন ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তেমনি নামায রোজার মাধ্যমেও ট্রেনিং দিয়ে মানুষকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত করা হয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূলের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস-এবং এই বিশ্বাস অনুসারে জীবন পরিচালিত করার পর মানুষ আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় তৃতীয় স্তরে উপনীত হতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদেরকে সুদক্ষ সুসংগঠিত যোগ্যতাসম্পন্ন একটি বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই আল্লাহর ওপরে ঈমান আনতে বলা হয়েছে এবং রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মূল কাজই হলো মানুষকে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির গোলামী থেকে মুক্ত করে, যাবতীয় শক্তির নেতৃত্ব-প্রভুত্ব, শাসন উৎখাত করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, এক আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, সমস্ত মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করা-এটার নামই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। আর জিহাদই হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাণশক্তি, ঈমানের মৌলিকভাবধারা, কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এই জিহাদই হওয়া উচিত মুমিনদের একমাত্র সাধনা।

ঈমানের দাবিদারগণ বর্তমানে জিহাদ বিমুখ আরাম-আয়েশের জীবন বেছে নিয়েছে। জিহাদে নিবেদিত উত্তরসুরীদের জীবন কাহিনী তারা শোনে, কিন্তু তাদের মতো নিজেদেরকে জিহাদে নিবেদিত করে না। কোরআন প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করে বর্তমানে তারা লাঞ্ছনার জীবনকে স্বাগত জানিয়ে তা স্থায়ী করার পথেই এগিয়ে চলেছে। এদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন-

হারকোই মস্তেমায়ে জওকে তন আছানী হ্যায়
তুম মুছলমাঁ হো? ইয়ে আন্দাজে মুছলমানী হ্যায়?
হায়দারী ফকর নেহি হ্যায় না দৌলতে উসমানী হ্যায়
তুমকো আছলাফছে কিয়া নিছবতে রুহানী হ্যায়?
উ-ও জামানে মে মুআজ্‌জায থে মুছলমাঁ হো কার
আওর তুম খার হুয়ে তারেকে কোরআঁ হো কার।

আজ তোমরা প্রত্যেকেই শরীরের আরাম-আয়েশকেই নেশার মতোই গ্রহণ করেছো। সত্যিই কি তুমি মুসলমান-মুসলমানের এটাই কি চিহ্ন? তোমার না আছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর অনুরূপ দারিদ্র, আর না আছে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনন্তের মতো ধন-দৌলত। তোমার পূর্ব-পুরুষদের সাথে তোমার কোনো সাদৃশ্য যেমন নেই, তেমনই নেই কোনো সম্পর্ক। তাঁরা মুসলমান হয়ে গোটা পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন, আর তোমরা কোরআনের বিধান ত্যাগ করে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছো।

ঈমানের দাবী–আল্লাহভীরু নেতৃত্ব

ঈমান আনার পরে কোন ঈমানদারের পক্ষে আল্লাহ-রাসূল বিরোধী কোন ব্যক্তির অনুসরণ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি আল্লাহ ভীতিহীন কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, রুচি-পছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও অসম্ভব। পৃথিবীর জীবনে এটাই স্বাভাবিক যে, ঈমানদার ভিন্ন চিন্তা-চেতনা তাড়িত লোকদের সাথে একত্রে মিলে-মিশে একই সমাজে পরস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করবে। কিন্তু ইসলামের বিপরীত প্রভাবে সে প্রভাবিত হবে না এবং ভিন্ন আদর্শের অনুসারী কোন লোককে সে নিজের অকৃত্রিম বন্ধু ও ইসলামী সমাজের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনেও ঈমানদার এমন কোন রাষ্ট্রকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করবে না, যারা ইসলামের শত্রু এবং এটাই ঈমানের দাবী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রী হিসাবে গ্রহণ না করে। (সূরা ইমরাণ-২৮)

সমাজ দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্তরে নেতা বা পরিচালক নির্বাচিত করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে ঈমানের দাবি হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহভীরু, ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে, তাকেই নির্বাচিত করতে হবে। এর বিপরীত যারা করবে তারা ঈমানের দাবি পূরণ করলো এবং তার পক্ষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনও সম্ভব নয়। এ জন্য ঈমানদারকে তার যাবতীয় কাজে সে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। আমৃত্যু সে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের ওপরে অবিচল থাকবে। যে লোকগুলো ঈমানের দাবিদার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقتِه وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-وَاعْتَصِمُوْابِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতোটা ভয় তাঁকে করা উচিত। তোমাদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সেই অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা হবে মুসলিম। সবাই একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ করো এবং দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ো না। (ইমরাণ-১০২-১০৩)

উল্লেখিত আয়াতে 'মুসলিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো আল্লাহর বিধানের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার পূর্বেই তোমরা যেন মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে না যাও। অর্থাৎ সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে। কে কোন্ মুহূর্তে মৃত্যুর কবলে পতিত হবে তা কেউ জানে না। সুতরাং সময় থাকতেই মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে। আর ঈমানদাররা কখনো দলে দলে বিভক্ত হবে না, তারা আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে আঁক্‌ড়ে ধরবে। এরা কখনো দল-উপদলে বিভক্ত হবে না। ঈমানদার লোকগুলো একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী দল, সমাজ-সংগঠন সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমেই তারা সমাজ ও দেশ থেকে অন্যায়-অত্যাচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, দুর্নীতি, অসৎ কর্ম, সুদ-ঘুষ, অনিয়ম, অবিচার, জুলুম, চুরি-ডাকাতি, ছিন্‌তাই, রাহাজানি, হত্যা-সন্ত্রাস দূর করার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করবে।

উল্লেখিত দুষ্কর্মসমূহ কোন একক ব্যক্তির পক্ষে দেশ ও সমাজ থেকে দূর যেমন সম্ভব হয় না তেমনি এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এ জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি দল বা সংগঠন তৈরী করে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে। এরপর সেই দল বা সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতিকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টা-সংগ্রাম করে। এটাই ঈমানের দাবি এবং এই দাবি অনুসারে যারা কাজ করবে এরাই সফলতা অর্জন করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ م بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنٰتِ-وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে। তোমরা যেন সেসব লোকদের মতো না হয়ে যাও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ লাভের পরও মত-বিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা এমন আচরণ অবলম্বন করেছে, তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। (সূরা ইমরাণ-১০৪-১০৫)

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উম্মতগণ যেমন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তেমনি যেন ঈমানদাররা বিভক্ত হয়ে না পড়ে সেই নির্দেশ উল্লেখিত আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং মহান

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে দলবদ্ধভাবে জীবন পরিচালিত করা ঈমানের দাবি। মুসলমান কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। মুসলমানদের জীবন হলো সাংগঠনিক জীবন। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىْ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ-

হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-ভ্রমণে এক সঙ্গে তিনজন থাকলেও তাদের মধ্যে থেকে একজনকে তারা যেন অবশ্যই নেতা বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

ঈমানের দাবিদারকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হবে। কেবল একটি সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং নিজ ঘরে ও জনপদে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ই নয়, এমনকি ঘর ও নিজ জনপদের বাইরে বিদেশে ভ্রমণে থাকাকালেও এই সাংগঠনিকতাকে উপেক্ষা করা ঈমানের দাবির বিপরীত। এই অবস্থাতেও নিজেদের মধ্য থেকে একজন লোককে আমীর বা নেতা বানিয়ে নিতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لاَيُحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ بِفَلاَةٍ مِّنَ الاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ-

তিনজন লোক যখন কোনো এলাকার কোনো মরুভূমির মধ্যে থাকবে, তখনও তাদের অসংগঠিত ও অসংবদ্ধ থাকা বৈধ নয়। তখনো তাদের মধ্যে থেকে একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে নেয়া কর্তব্য। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন আল্লাহর রাসূল বলেন-

اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْاعَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ-

তিনজন লোক যখন সফরে বের হবে, তখন অবশ্যই তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেবে। (আবু দাউদ)

অন্য আরেকটি হাদীসে বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَبُدٌّ وَلاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدْ

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ-

হযরত আবূদ্ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, কোনো জঙ্গল অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি তখন (একতাবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধভাবে) নামায আদায়ের ব্যবস্থা না করে, তাহলে তাদের ওপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে বাঘ সহজেই খেয়ে ফেলে। (আবূ দাউদ)

ঈমানের দাবিদার লোকগুলো যদি দলবদ্ধভাবে বসবাস না করে ও নামাযসহ আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান সম্মিলিতভাবে পালন না করে, তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর প্রভুত্বের পরিবর্তে শয়তানের প্রভুত্ব স্থাপিত হবে। উল্লেখিত হাদীসে সাংগঠনিক তথা দলবদ্ধ জীবন-যাপনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। নিম্নস্তরের জীব হওয়া সত্ত্বেও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার ও শত্রুর মোকাবেলা করার স্বাভাবিক প্রবণতা বিদ্যমান। এ জন্য দলবদ্ধ ছাগল-পাল থেকে কোনো ছাগল হরণ করে নেয়া কোন নেকড়ে বাঘের পক্ষে সহজ হয়না। নেকড়ে বাঘ সেই ছাগলকেই সহজে সংহার করতে পারে, যে ছাগল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ঠিক একইভাবে ঈমানের দাবিদার ইসলামী আদর্শবাদী লোকদেরকেও সম্মিলিত ও দলবদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবি। তাহলে মানবতার আজন্ম শত্রু শয়তানের পক্ষে তাদের কাউকে পথভ্রষ্ট করার অধিক আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যখনই ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি দল বা সংগঠন ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন ও একক জীবন-যাপন করতে শুরু করে, তখন তার পক্ষে যে কোনো মুহূর্তে পথভ্রষ্ট হওয়া অতি সহজ। শুধু তাই নয়, ইসলাম বিরোধী বাতিল ও কুফ্‌রী শক্তি যেখানে সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত, সেখানে এসব বাতিল শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য ও আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠিত করে মহাসত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্য ঈমানের দাবিদার ইসলামী আদর্শবাদী লোকদের দলবদ্ধ তথা সাংগঠনিক জীবন-যাপন করা ও কোরআনের সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম, আন্দোলন করা একান্তভাবেই জরুরী।

এ জন্যই কোরআন ও হাদীসে দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করার ব্যাপারে বার বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরা একতাবদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করবে। যারা ঈমানের দাবি করে তারা একমাত্র মহান আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে। মহান আল্লাহ বলেন—

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ-اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَغَالِبَ لَكُمْ-وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ م بَعْدِه-وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে কাজ করে। আল্লাহই যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কোন শক্তিই তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে, তবে এরপর আর কোন্ শক্তি রয়েছে, যে শক্তি তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম? সুতরাং প্রকৃত মুমিন যারা, তাদের আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা উচিত। (সূরা ইমরাণ-১৫৯-১৬০)

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঐক্যবদ্ধ শক্তি ব্যতীত মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সমাজ ও দেশের বুকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সমাজ ও দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অনাচার, অবিচার, নগ্নতা-বেহায়াপনারও গতিরোধ করা যায় না। তেমনি মহান আল্লাহর বিধানও পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা যায় না। এ জন্য কোরআন ও হাদীসে দলবদ্ধভাবে ঈমানদারদেকে জীবন পরিচালনার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَشِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَمِنْ جُثَئِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ-

হযরত হারেসুল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন-আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ করছি। সে পাঁচটি কাজ হলো, দলবদ্ধভাবে জীবন, নেতৃ আদেশ শ্রবণ করা, নেতার আনুগত্য করা, হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে লোক ইসলামী দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ বাইরে চলে গেলো, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো-যতক্ষণ না সে পুনরায় দলের মধ্যে শামিল হবে। আর যে লোক জাহিলিয়াতের

সময়কার কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

উল্লেখিত হাদীসে ঈমানের দাবি অনুসারে ইসলামী জীবনের পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে দল বা সংগঠন করা, দলবদ্ধভাবে বা সাংগঠনিকভাবে জীবন পরিচালিত করা। এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইসলামী দলের নিয়ম-কানুন জানার চেষ্টা করা। তারপর বলা হয়েছে, দলের নেতার পক্ষ থেকে যখন যে কাজের নির্দেশ আসবে, তা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং যথাযথভাবে পালন করতে প্রস্তুত থাকা। দলের লোকদের মধ্যে এ ধরনের মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে দল যেমন গঠিত হতে পারে না, তেমনি দলীয় জীবনের নিহিত কল্যাণ লাভ করাও সম্ভব হয়না।

এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, দলবদ্ধ জীবনের অর্থ বর্তমান কালের মানুষের বানানো গঠনতন্ত্র ভিত্তিক দল নয়, কোরআন ও হাদীসের আলোকে যে দল পরিচালিত হয়, সেই দলকেই বুঝানো হয়েছে। যে দল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের আওতায় নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত করে, সেই দলেই কেবলমাত্র মুসলমানরা যোগ দিয়ে দলবদ্ধভাবে জীবন পরিচালিত করবে এবং এটাই ঈমানের দাবি।

তৃতীয় যে কাজের আদেশ দেয়া হয়েছে তাহলো, দলীয় নেতার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করা। দলের লোকদের মধ্যে যদি নেতার আদেশের প্রতি আনুগত্য না থাকে, তাহলে দল গঠন অর্থহীন হয়ে যায় এবং দল গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সেই দল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। সুতরাং কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে গঠিত দলের নেতার আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করা একান্ত অপরিহার্য।

এরপর চতুর্থ পর্যায়ে আদেশ করা হয়েছে হিজরত করার জন্য। সাধারণভাবে দেশ ত্যাগ করাকেই হিজরত বলে মনে করা হয় এবং ঈমানদার মুসলিম কুফ্রী শাসন ব্যবস্থার অধীন দেশ থেকে যখন ইসলামী শাসনের অধীন কোন দেশে চলে আসে, এ অবস্থাকেই হিজরত হিসাবে গণ্য করা হয়। ঈমানের দাবিদার কোন মুসলমান যখন কোন দেশে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা-সাধনা করেও ব্যর্থ হয়, তখন চূড়ান্ত নৈরাশ্য ও একান্ত অসহায় অবস্থায় হিজরত করা তার জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে ইসলামে হিজরতের এটা একটি পারিভাষিক অর্থ এবং শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'ত্যাগ করা'-এই শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই 'ত্যাগ করা' অর্থেই উল্লেখিত হাদীসে হিজরত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাহাবাদের জিজ্ঞাসার জবাবে আল্লাহর রাসূল বলেছেন-

أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ-

হিজরত অর্থ আল্লাহর ঘৃণিত, অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করা।

অর্থাৎ হিজরত হলো এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ, যার ফলে ঈমানের দাবিদার লোকের মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, স্বভাব-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রুচি-পছন্দ তথা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত যাবতীয় কিছু দূর হয়ে যাবে। এই ধরনের হিজরত করার জন্য ইসলামী দলের সমস্ত লোকদেরকে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে। একজন লোক ঈমান আনার পূর্বে, মদ পান করতো, চুরি করতো, সন্ত্রাস করতো, দুর্নীতি করতো, মিথ্যা কথা বলতো, ঈমান আনার পরে সে এসব দুষ্কর্ম থেকে বিরত হলো অর্থাৎ এসব অপকর্ম পরিত্যাগ করলো বা হিজরত করলো। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের হিজরত হলো, আল্লাহর বিধান নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে অনুসরণ করার লক্ষ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করে এমন কোন দেশে চলে যাওয়া, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

সর্বশেষ বিষয় বলা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। উল্লেখিত হাদীসে জিহাদের বিষয়টি সর্বশেষে উল্লেখ করার কারণ হলো, জিহাদের যোগ্য হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য দলবদ্ধ জীবন, নেতার আদেশ শ্রবণ, নেতার আনুগত্য ও হিজরত করা তথা আল্লাহর অপছন্দীয় কর্ম ত্যাগ করা একান্ত জরুরী। এই চারটি কাজ পরিপূর্ণভাবে করতে অক্ষম হলে নিজেকে জিহাদের উপযুক্ত হিসাবে গড়া যায় না এবং আল্লাহর পথে জিহাদও করা যায় না।

আরবী জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করা। ঈমান আনার পরে ইসলামী জীবনধারায় জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কিন্তু এই জিহাদ শুধুমাত্র জিহাদ নয়-এটা আল্লাহর পথে জিহাদ। কোরআন ও হাদীসে যেখানেই জিহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই 'আল্লাহর পথে' ধ্যাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এবং শর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং শুধু জিহাদ করলেই ঈমানের দাবি পূরণ করা যাবে না, সেই জিহাদ হতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

আল্লাহর পথে জিহাদ করার অর্থ হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা-সাধনা করা। এই জিহাদ করা ঈমানের দাবিদার প্রত্যেক মানুষের প্রতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের ওপর অর্পিত হলেও তা পালন করার জন্য দল গঠন ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহর পথে জিহাদের যে চরম লক্ষ্য তা একক চেষ্টা-সাধনার ভিত্তিতে কোনক্রমেই লাভ করা যায় না। এ জন্যই কোরআন-হাদীসে অত্যন্ত তাগিদ দিয়ে দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এরপর হাদীসে শেষাংশে মারাত্মক দুটো বিপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কোন লোক যদি দলীয় নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা ভেঙে একবিন্দু পরিমাণও বাইরে চলে যায়, তাহলে সে

কেবলমাত্র দল থেকেই বের হয় না, মূলত ইসলামের বন্ধনও তার গলদেশ থেকে ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে যতক্ষণ পর্যন্ত দলের বাইরে থাকবে, ততক্ষণ সে ইসলাম থেকেও বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ কুফরী জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবে। সুতরাং এ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, ঈমান আনার পরে দলবদ্ধ জীবন ও ইসলামী জীবন একই বিষয়। যেখানে দল নেই সেখানে ইসলামও নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন- لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ-

জামা'আত বা দল ব্যতীত ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, দলীয় জীবনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মাচরণের ওপরে। কোন ব্যক্তি যদি দলের মধ্যে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-পদ্ধতি, পথ-মত সুকৌশলে প্রচার বা চালু করতে থাকে, তাহলে তার পরিণাম জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা সে ব্যক্তি এসব কাজের মাধ্যমে যেমন ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা করে অনুরূপভাবে তার এই কাজের ফলে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত দল মুসলমানদের জীবনধারা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। উল্লেখিত হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে, এই ধরনের কাজ করার পরও সে ব্যক্তি যদি নামায, রোযা যথাযথভাবে পালন করতে থাকে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণাও করে, তবুও তার পক্ষে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

আল্লাহভীরু নেতৃত্বের আনুগত্য করা ঈমানের দাবি

ঈমানের দাবি হলো মুসলিম সমাজে, দলে, সংগঠনে ও রাষ্ট্রে দলাদলি সৃষ্টি না করে একতাবদ্ধ থেকে নেতার আনুগত্য করা। ঈমানদার সর্বপ্রথমে আনুগত্য করবে মহান আল্লাহর। একজন মুসলমান সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহর বান্দাহ এবং তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ও বিভাগেই সে একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, তাঁরই একান্ত বাধ্য হয়ে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করবে। অন্য কারো আনুগত্য শুধুমাত্র তখনই করা যেতে পারে, যখন তা আল্লাহর আনুগত্য তথা মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত হবে না। বরং অন্য কারো আনুগত্য হতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের অনুকূলে এবং আল্লাহর নির্দেশের অধীন।

এর বিপরীত কোন একটি দিক ও বিভাগেও অন্য কারো সামান্যতম আনুগত্য করা যাবে না। কোন পীর, বুযুর্গ, মাওলানা, ওলী, নেতা বা যে কোন পর্যায়ের লোকই হোক না কেন, আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত পন্থায় কারোই আনুগত্য করা যাবে না, কারো আদেশ-নিষেধ মানা যাবে না। ঈমানদার যখন কোন আদেশ-নিষেধের সম্মুখীন হবে, তখনই সেই আদেশ-নিষেধকে মহান আল্লাহর দেয়া মানদন্ডে যাচাই-বাছাই করে সে আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করবে।

পীর বা মাওলানা সাহেব যখন তার অনুসারীদেরকে কোন আদেশ দেবেন বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলবেন, অনুসারীর এটা অবশ্যই কর্তব্য যে, তার প্রতি যে আদেশ-নিষেধ দেয়া হলো, তা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুকূল বা অধীন কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা। কোন দলের নেতা যখন কর্মীদের প্রতি কোন আদেশ পালন করতে বলবে, সেই কর্মীদের প্রতি এটা ফরজ হয়ে যায় যে, সে অনুসন্ধান করে দেখবে, তার প্রতি নেতার পক্ষ থেকে যে আদেশ এলো, তা মহান আল্লাহর আদেশের বিপরীত কিনা। সুতরাং একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। এই মৌলিক আনুগত্যের বিপরীত যে কোন ধরনের আনুগত্য করার আদেশ এলে তা অবশ্যই অমান্য করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালাকে অসন্তুষ্ট করে অন্য কারো আনুগত্য করা সম্পূর্ণ হারাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ-

স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যেতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য করার সাথে সাথে আনুগত্য করতে হবে তাঁর প্রেরিত রাসূলের। রাসূলের আনুগত্যই হলো আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের একমাত্র বাস্তব পথ। রাসূলকে মানতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এই জন্য যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব মন্ডলীর কল্যাণের জন্য যে আদেশ-নিষেধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে বিধান মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানোর ছিল, এ ব্যাপারে রাসূলই হচ্ছেন একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ও সূত্র। শুধুমাত্র রাসূলের আনুগত্য করলেই মানুষ মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ-وَاللّٰهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ-قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ-فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ-

হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান। তাদেরকে বলো, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। এরপর তারা যদি তোমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে সেসব লোকদের-যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে-আল্লাহ কিছুতেই ভালোবাসতে পারেন না। (সূরা ইমরাণ-৩১-৩২)

সুতরাং রাসূলের আনুগত্য করলেই মানুষ কেবল আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। রাসূল নির্দেশিত পন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় আল্লাহর আনুগত্য করা যাবে না। আর রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করার অর্থই হলো মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ–

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো আর যে আমার নাফরমানী করলো, সে আল্লাহরই নাফরমানী করলো।

মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কিভাবে করা যাবে, সে পথও আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূলের থেকে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে কখনো ছিল না এবং কিয়ামত পর্যন্তও দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আসবে না। সুতরাং কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে, সে পথ ও পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসূল প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথ যদি কেউ প্রদর্শন করে, তাহলে তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোনক্রমেই তা অনুসরণ করা যাবে না।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য যদি কোন পীর, মাওলানা বা বুযুর্গ কোন পদ্ধতি প্রদর্শন করে, অনুসারীদেরকে কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেয় বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে, তাহলে তাদের দেখানো সেই পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের অবলম্বিত পদ্ধতি, নিয়ম-নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা, তা কোরআন-হাদীসে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। যদি পীর বা মাওলানা সাহেবের দেখানো পথ কোরআন-হাদীসের সাথে অসামঞ্জস্যশীল হয়, তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

ঈমান আনার পরে ঈমানের দাবি হলো ব্যক্তি সর্বপ্রথমে আল্লাহর আনুগত্য করবে, তারপর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং এরপর আনুগত্য ইসলামী সমাজ, দল ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল বা নেতৃবৃন্দের। কোরআনের পরিভাষায় এসব দায়িত্বশীল বা নেতৃবৃন্দকে 'উলিল আম্‌র' বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজ, দল রাষ্ট্রের যে স্তরে যে বিষয়ে যারা মুসলমানদের যে বিষয়ের দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত, তারাই আনুগত্য লাভের অধিকারী এবং তাদের সাথে মতবৈষম্য বা কলহ-বিবাদ করে মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনে কোন প্রকার অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা কোনভাবেই বৈধ নয়।

তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য যেমন শর্তহীনভাবে করতে হবে, কিন্তু কোন দায়িত্বশীলের আনুগত্য শর্তহীনভাবে করা যাবে না। দায়িত্বশীলদেরকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং এসব দায়িত্বশীল মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একান্ত অনুগত হবেন। দায়িত্বশীল বা নেতৃবৃন্দ অবশ্যই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবেন, এরপরই কেবলমাত্র তারা মুসলমানদের আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। আনুগত্যের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে–

اَلسَّمْعَ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِمِ فِىْ مَااَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرُ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَسَمْعَ وَلاَ طَاعَةُ–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেন–মুসলিম ব্যক্তির ওপর কর্তব্য হচ্ছে শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এমন সব ব্যাপারেই যা সে পছন্দ করে আর যা তার মনোপুত নয়। কিন্তু যদি কোন না-ফরমানী ও গুনাহের কাজের আদেশ করা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যদি কোন গুনাহের কাজের আদেশ করা হয়, তবে তা যেমন শ্রবণ করতে প্রস্তুত হবে না, তেমনি তার আনুগত্য করতে ও মেনে চলতেও পারবে না। (বুখারী-মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

لاَطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّ مَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ–

আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূলের নাফরমানীর কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য করতে হবে শুধু মা'রূফ বা বৈধ কাজে।

ইসলামী সমাজ, দল ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের প্রতি আনুগত্য করা মুসলমানদের কর্তব্য। অনেক বিষয় হয়ত কোনো ব্যক্তির পছন্দ হবে আবার অনেক বিষয় পছন্দ হবে না। আনুগত্য করা না করা ব্যক্তিগত পছন্দ–অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং কোরআন-হাদীসের নির্দেশের ভিত্তিতে আনুগত্য করে যাওয়াই ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু যদি এমন কোন কাজের আদেশ করা হয়, যা করলে আল্লাহর না-ফরমানী হয়, যা করলে গুনাহ্ হয়, তাহলে সেই কাজ করে সমাজ, দল ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কোনক্রমেই করা যাবে না। এ ধরনের কোন কাজে সমাজ, দল ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল আনুগত্য দাবি করতে পারবে না। মুসলমানও পারে না এই ধরনের কাজ করে আনুগত্য প্রদর্শন করতে। বরং ঈমানের দাবি হলো, ঐ ধরনের কোন আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করা।

সত্যের বিপরীত পন্থা পরিত্যাগ করা ঈমানের দাবি

ঈমানের দাবি হলো সত্যের বিপরীত যা কিছু রয়েছে, তা চরিত্র থেকে সে মুছে দেবে। ঈমান আনার পরে কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে অন্যায়ভাবে-অবৈধ পথে কোন কিছু অর্জন করবে। সত্যের বিপরীত পন্থা সেটাই যা শরীয়াত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই অবৈধ বা হারাম। ঈমানদার সত্যের বিপরীত পথে অন্যের সম্পদ ভোগ-দখল করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاْكُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। (সূরা নিসা-২৯)

নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই স্বার্থপরতা পরিহার করতে হবে এবং তার মনে অন্যান্য মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণ কামনা সক্রিয় থাকতে হবে। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)

অন্যের ক্ষতি না করে তার কল্যাণ কামনা করার কথা বুঝানোর জন্য হাদীসে 'অপরের জন্য তাই পছন্দ করা যা নিজের জন্য পছন্দ করা হয়' কথাটি বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত এই নীতি নিঃস্বার্থপরতা যাচাই করার জন্য একটি অভ্রান্ত মানদন্ড। প্রত্যেক মানুষই নিজের কল্যাণ চায়, যাবতীয় উত্তম বস্তুসমূহ তারই নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, এটা কামনা করে। অধিকাংশ মানুষই অপরকে বঞ্চিত করে, অপরের অধিকার খর্ব করে এমনভাবে সবকিছু পেতে চায় যে, যেন সমস্ত উত্তম জিনিস একমাত্র সে-ই পায়, অন্য কেউ যেন তা না পায়। পক্ষান্তরে যত প্রকার ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর জিনিস রয়েছে, তার কোন কিছুই যেন তাকে স্পর্শ না করে এবং অন্য কাউকে তা স্পর্শ করলে তার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, এটাই অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-চেতনা।

ঈমানের দাবি হলো, এই ধরনের মনোভাব পোষণ না করা। ইসলাম এ ধরনের মনোভাবকে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা হিসাবে চিত্রিত করেছে এবং ঈমানের দাবিদারকে এই অবস্থা থেকে

দূরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। ঈমানের দাবি হলো, যা নিজের জন্য ভালো মনে করবে, নিজের পছন্দ করবে, তা অপরের জন্যও ভালো মনে করবে এবং অপরের জন্য পছন্দ করবে। পক্ষান্তরে যা নিজের অপছন্দ ও ক্ষতিকর মনে করবে, অপরের জন্যও তা ক্ষতিকর ও অপছন্দ করবে এবং এটাই ঈমানের দাবি। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمَنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের কটুক্তি ও হাতের অনিষ্টকারিতা থেকে অন্যান্য মুসলমান সুরক্ষিত থাকে, আর মুমিন সেই ব্যক্তি, যার নিকট লোকেরা জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। (তিরমিযী, নাসায়ী)

যে ব্যক্তি নিজেকে ঈমানের অধিকারী বলে দাবি করবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই গোলামী করবে এবং গোলামীর ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করবে না। নামায-রোযা আদায় করবে যে আল্লাহর নির্দেশে, পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিতজন, সাহায্য প্রার্থী, অভাবী, অধীনস্থ লোকজন, প্রতিবেশীসহ সকলের সাথে সেই আল্লাহরই নির্দেশিত পন্থায় আচরণ করবে। সত্যের বিপরীত আচরণ কারো সাথেই সে করবে না।

যে আল্লাহর নির্দেশে সে চৈত্র-বৈশাখ মাসের প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা পালন করবে, সেই আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় সে নিজ পরিবার, সমাজ, দল ও রাষ্ট্র পরিচালিত করবে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে নামায আদায় করবে আর রাজনীতি করবে ভিন্ন কারো আদর্শ অনুসারে, এই অধিকার ঈমান কাউকে দেয় না। সর্বাবস্থায় ঈমানদার সত্যের বিপরীত পথ ত্যাগ করে আপন প্রভু মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করবে। আল্লাহর নির্দেশেই সে নিজ মাতা-পিতার খেদমত করবে, নিকটাত্মীয়দের অধিকার বুঝিয়ে দেবে। ইয়াতীম ও অভাবীদের প্রতি সৎ ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

আত্মীয়-অনাত্মীয়সহ সকল মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করবে। ঈমানদার যখন ভ্রমণে বের হবে বা পথ চলবে, এ সময় যদি কেউ তার পাশে থাকে, সে পরিচিত হোক আর অপরিচিতই হোক, তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। এমন আচরণ সে করবে না, যে আচরণে তার সহযাত্রী মনে কষ্টানুভব করে। নিজের অধীনস্থ দাস-দাসী,

শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং তাদের সাথে কোনক্রমেই সত্যের বিপরীত আচরণ করবে না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশ্বাসীকে সর্বোত্তম ব্যবহার এভাবে শেখাচ্ছেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

আর তোমরা সকলে আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর সাথে কারো শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতি, পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। (সূরা নিসা-৩৬)

অধীনস্থদের প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা ঈমানের দাবি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন খেলাফতে আসীন। তিনি দেশের সাধারণ জনগণ ও নিজের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্যই সহ্য করতেন না। জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান এবং বাজারে দ্রব্যমূল্য যথাযথ রয়েছে কিনা, তা জানার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংগ্রহকারীদের ওপরে নির্ভর না করে স্বয়ং নিজে অনুসন্ধান করতেন। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একজন লোক খলীফাকে দেখে থেমে গেলো এবং তাঁর পেছনে পেছনে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো। বিষয়টি খলীফার দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি লোকটিকে বললেন, 'আপনি আমার পাশে পাশে না হেঁটে পেছনে কেনো হেঁটে আসছেন?'

লোকটি জবাব দিলো, 'হে আমিরুল মুমেনীন! আপনি খলীফা, আপনার সম্মান ও মর্যাদার কারণেই আমি আপনার পেছনে পেছনে হাঁটছি।' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটিকে বললেন, 'উচ্চ পদে আসীন কোনো ব্যক্তিকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের এই পদ্ধতি ঠিক নয়। এই পদ্ধতি শাসকদের মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে এবং মুমিনদের জন্য চরম অপমানকর। এসো, আমার পাশে পাশে হাঁটবে।' এ কথা বলে তিনি লোকটিকে নিজের পাশে পাশে হাঁটতে বাধ্য করলেন। ঈমানের আলোয় যাদের হৃদয় আলোকিত, তারা উচ্চ পদে আসীন হলেও অধীনস্থদেরকে এভাবেই সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকেন।

তাগূতের বিরুদ্ধে লড়াই করা ঈমানের দাবি

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ব্যক্তি ঈমান আনলো, তার জন্য এটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মানব মন্ডলীর কল্যাণের লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সে চেষ্টা-সংগ্রাম করবে এবং এটা ঈমানের দাবি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ-اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا-

যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কুফ্রীর পথ অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো, শয়তানের ষড়যন্ত্র মূলতই দুর্বল। (সূরা নিসা-৭৬)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা ঈমানের ব্যাপারে দাবিদার তারা অবশ্যই পৃথিবীতে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন করবে। কোরআন ও সুন্নাহর বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা-সংগ্রাম করবে এবং এই কাজ থেকে ঈমানদার কখনো বিরত থাকতে পারে না। ঈমান আনার পরে কেউ যদি এই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি ঈমানের দাবি অনুসারে কাজ করলো না।

ঈমানের দাবিদার কোন ব্যক্তি ইসলামী আদর্শ ব্যতীত ভিন্ন কোন আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করতে পারে না এবং যেসব দল মানুষের বানানো আদর্শ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করে, সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়া দূরে থাক-সমর্থনও করতে পারে না। কেউ যদি তা করে, তাহলে বুঝতে হবে, সে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজ করলো এবং ঈমানের দাবি আদায় করলো না।

ঈমানের দাবি অনুসারে নামায আদায় করলো, রোযা পালন করলো, হজ্জ আদায় করলো কিন্তু রাজনীতি করলো মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সমর্থন দিলো এমন রাজনৈতিক দলকে, যারা মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, এদের নামায, রোযা ও হজ্জ কোনটিই মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এদের ঈমানের দাবির কোনই মূল্য নেই।

অপরদিকে কাফিরদের সুস্পষ্ট পরিচয় এটাই যে, তারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধানের বিপরীত আদর্শ-মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজনীতি করে এবং তাদের যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রাম তাগূতের পথেই পরিচালিত হয়। এখন কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলমান দাবি করে, মুসলমানের অনুরূপ নাম ধারণ করে, নামায-রোযা আদায় করে, হজ্জ করে আলহাজ্জ নাম ধারণ করে মাথায় টুপি দিয়ে এবং মুখে পশ্চিমা ষ্টাইলে দাড়ি রেখে এমন মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল করে, যে মতবাদ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাবে। এসব লোককে ঈমানদার-পরহেজগার বলার অর্থ হলো, হারাম প্রাণী শূকরকে ছাগলের সাথে তুলনা করা।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, ঈমান আনার পূর্বেই তাগূতকে অস্বীকার করতে হবে তারপর ঈমান আনতে হবে। সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সর্বপ্রথমে তাগূতকে অস্বীকার করতে হবে তারপর ঈমান আনতে হবে। তাগূতকে অস্বীকার না করে আল্লাহর ইবাদাত করলে সে ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহর গোলাম আর তাগূতের গোলামী একসাথে চলতে পারে না।

ঈমানের দাবিদার অধিকাংশ মুসলমানের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে–রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাগূতের গোলামী বহাল রেখে আল্লাহর ইবাদাত করার যে আনুষ্ঠানিকতা চলছে, এগুলো শিরক মিশ্রিত ইবাদাত–যা মহান আল্লাহর কাছে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের সাথে এসব তথাকথিত ইবাদাত-বন্দেগীর দূরতম সম্পর্ক নেই।

এই তাগূতকে পরাভূত করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই সমস্ত নবী-রাসূল সারা জীবনব্যাপী আন্দোলন করেছেন। এই তাগূতী শক্তিই নবী-রাসূলদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, আগুনের কুন্ডে নিক্ষেপ করেছে, করাত দিয়ে চিরেছে, তরবারী দিয়ে শিরচ্ছেদ করেছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক থেকে রক্ত ঝরিয়েছে, তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ করেছে। প্রতিটি যুগেই দ্বীনের দা'য়ীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, এই তাগূতের পরিচয় কি, তা বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের কাছ থেকে মুছে গিয়েছে।

তাগূতের পরিচিতি সাধারণ মুসলমানদের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব যাদের ছিল, তারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। এ কথা মনে রাখতে হবে, সমস্ত কাফিররাই তাগূত নয় এবং সমস্ত মুসলমান-ঈমানের দাবিদার, তারাও তাগূতী কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারেনি। ঈমানের দাবিদারদের মধ্যে একটি শ্রেণী যারা নামায-রোযা-হজ্জ আদায় করে, মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং নিজেদেরকে সেই সব মহান ব্যক্তি, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাহঃ), শাহ্ জালাল (রাহঃ), মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ), শাহ্

মাখদুম দৌলা (রাহঃ), খান-জাহান আলী (রাহঃ), সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন দেহ্লভী (রাহঃ) ও সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী (রাহঃ)-এর ভক্ত বলে দাবি করেন, যাঁরা নিজেদের গোটা জীবনকাল ব্যয় করেছেন তাগূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ করে।

এসব মহান ব্যক্তিদের সংগ্রামী জীবন সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখার জন্য ফারসী অভিধান থেকে 'পীর' শব্দটিকে চয়ন করে তাদের নামের পূর্বে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এই 'পীর' নামক শব্দটি মুসলিম মিল্লাতের যেসব মহান বুযুর্গ ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের নামের সাথে জড়িত রয়েছে, তাঁদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এই 'পীর' নামক শব্দটি মুসলিম মিল্লাতের সামনে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এই শব্দটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে শ্রোতার মানস পটে এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে, যে চিত্রে শ্রোতা দেখতে পায় একজন সৌম্য দর্শন মহান পুরুষ সফেদ পোষাকে আবৃত, মাথায় পাগড়ী, অবিন্যস্ত শ্মশ্রু-মন্ডিত চেহারা, ধ্যানস্থ অর্ধ নির্মিলিত আঁখি, জিহাদের হাতিয়ারের পরিবর্তে হাতে তস্‌বীহ্।

একশ্রেণীর পীরদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন, পৃথিবীর প্রতি তার এমনই ঘৃণা যে, তিনি জুলুমের প্লাবনে প্লাবিত পৃথিবীটাকে দৃষ্টিমেলে দেখতে চান না। শ্রবণ শক্তি তার রয়েছে কিন্তু সেই শ্রবণ শক্তি দিয়ে তিনি বাতিল শক্তির হুঙ্কার শুনতে পান না এবং মজলুম মানবতার করুণ আর্তনাদ তার কানে পৌছে না। তিনি খান্‌কার দরোজায় অর্গল তুলে দিয়ে ভক্তবৃন্দ সাথে নিয়ে যিক্‌র-এ এমনভাবে মশগুল হয়ে পড়েছেন যে, ইসলাম বিরোধী তাগূতী শক্তি সেই খান্‌কার বদ্ধ দরোজায় আঘাতের পরে আঘাত করছে, কিন্তু সে আঘাতের শব্দ তার কানে প্রবেশ করছে না। যে জিহ্বা দিয়ে তিনি আল্লাহর নামের যিক্‌র করছেন, সেই আল্লাহর বিধান যমীন থেকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে তাগূতী শক্তি শৃগালের ন্যায় চিৎকার করছে, সেই চিৎকারের বিরুদ্ধে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করতে পারছেন না। তিনি তার জিহ্বাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহ্বাকে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে বিরত রাখছেন।

এরা মনে করে থাকেন, বর্তমানে জিহাদের আর প্রয়োজন নেই এবং সে কারণেই তারা জিহাদ থেকে অবসর গ্রহণ করে নিজেদেরকে খান্‌কার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। তারা নিজেদের অনুসারীদেরকে দুনিয়াদারী তথা রাজনীতি থেকে মুক্ত থেকে কালিমার যিক্‌র করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই কালিমাই রাজনীতির মূল উৎস, এ কথা তারা অনুসারীদেরকে বলেন না এবং নিজেরাও অনুভব করতে আগ্রহী নন। যিক্‌র করা হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি ব্যতীত কোন আদেশদাতা, বিধানদাতা নেই, একমাত্র তাঁর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কারো নির্দেশ মানেন না, এ কথার যিক্‌র আরবী ভাষায় করা হচ্ছে, তিনি স্বয়ং এবং তার অনুসারীগণ তাগূতের আদেশ-নিষেধ প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণ করছেন। তারা অনুসারীদের কাছ থেকে জিহাদ করার বাইয়াত গ্রহণ করেন না, বরং জিহাদ থেকে বিরত থাকার বাইয়াত গ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, এমন অনেক পীরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ময়দানে এনেছেন, যাঁরা তাঁদের অনুসারীদের কাছ থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে নিজে স্বয়ং যেমন জিহাদ করেন এবং অনুসারীদেরকেও জিহাদের ময়দানে সক্রিয় থাকার আদেশ দেন। আল্লাহর রহমতে এই ধরনের পীরের সংখ্যা বর্তমানে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাঁরা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদন করেছেন। উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে, চেষ্টা-সংগ্রাম-আন্দোলন করে তাগূতের পথে।' এই 'তাগূত' শব্দটি এসেছে 'তুগ্ইয়ান' শব্দ থেকে এবং এর অর্থ হলো সীমা লংঘন করা। আভিধানিক অর্থে তাগূত প্রত্যেক নির্দিষ্ট সীমালংঘনকারী ব্যক্তিকেই বলা হয়।

এক কথায় তাগূতের পরিচয় এভাবে দেয়া যায় যে, 'যে শক্তি মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে, সেই শক্তিকেই তাগূত বলা হয়।' ঈমানের দাবি করতে হলে এই তাগূতকেই সর্বপ্রথমে অস্বীকার করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ-فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لَا انْفِصَامَ لَهَا-

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত সত্য ও অভ্রান্ত কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছে। এখন যে কেউ তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

কোরআনের পরিভাষায় তাগূত সেই বান্দাহকে বলা হয়, যে বান্দাহ্ বন্দেগী, দাসত্ব, গোলামী, ইবাদাত, উপাসনার সীমা লংঘন করে নিজেই প্রভু ও মনিব হওয়ার ন্যায় আচরণ করে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের গোলামী করতে বাধ্য করে। একজন মানুষের পক্ষে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো, এক ব্যক্তি নীতিগতভাবেই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ পালন করাকেই সত্য-সঠিক ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলো এবং মানলো। কিন্তু সেই ব্যক্তির আচার-আচরণ, ব্যবহার, কর্মকান্ড ইত্যাদির মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট দেখা গেলো যে, সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত পথেই যাবতীয় কিছু করছে। এই অবস্থাকেই ইসলামী শরীয়াতে 'ফিস্ক' বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর হলো, এক ব্যক্তি নীতিগতভাবেই মহান আল্লাহর আনুগত্য লংঘন করে স্বেচ্ছাধীন হয়ে গেলো এবং সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মনগড়া উপাস্যের বা কল্পিত

শক্তির গোলামী করলো। এই অবস্থাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফ্র' বলা হয়েছে। তৃতীয় স্তর হলো, এক ব্যক্তি তার প্রকৃত রব, মালিক, ইলাহ, স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে তাঁরই সৃষ্ট জগতে বা পৃথিবীর কোন একটি এলাকায়, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রে আল্লাহর বান্দাদের ওপর নিজের মনগড়া আইন বা অন্য কোন মানুষের বানানো আইন জারী করলো। অর্থাৎ মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান, নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি, আইন-কানুন অনুসারে অধীনস্থ লোকদেরকে চলতে বাধ্য করলো। যে ব্যক্তি, দল বা পরিষদ এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান সাধারণ মানুষের ওপরে চাপিয়ে দিলো, এরাই আল্লাহর কোরআনের ভাষায় 'তাগূত।'

এই তাগূতী শক্তির সাথেই নবী-রাসূলদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে এবং তারাই নবী-রাসূলদের ওপরে চরম নির্যাতন চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই তাগূতী শক্তিই প্রতিটি যুগেই ঐ লোকগুলোর ওপরে নির্যাতন চালিয়েছে, কারারুদ্ধ করেছে, ফাঁসির রশি গলায় পরিয়ে দিয়েছে, মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী নামে আখ্যায়িত করেছে, যে লোকগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করছে।

একজন মানুষ যখন তার আপন রব আল্লাহ তা'য়ালার গোলামী করা থেকে বিরত থাকে, তখন সে একটি মাত্র তাগূতের গোলামী করতে বাধ্য হয় না, বরং অগণিত তাগূতের গোলামী করতে বাধ্য হয়। শয়তান নামক তাগূত এসে তার সামনে নিত্য-নতুন লোভ-লালসার দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। এরপর মানুষের নিজের নফ্স আরেকটি তাগূত–এই তাগূত তাকে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও লোভ-লালসার দাস বানিয়ে জীবনকে সোজা-সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্ত পথের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে সে অসংখ্য তাগূতের গোলামী করতে বাধ্য হয়। নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, নেতা-নেত্রী, বন্ধু-বান্ধব, ধর্মীয় নেতা, প্রশাসন, রাষ্ট্র ইত্যাদী একযোগে তার বিরুদ্ধে তাগূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এসব তাগূতের প্রত্যেকটিই তার মাধ্যমে নিজের স্বার্থের দাসত্ব করিয়ে থাকে এবং সেই ব্যক্তি তখন অসংখ্য তাগূতের গোলাম হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর যে দেশেই এবং যে ভূ-খন্ডেই মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান দিয়ে সমাজ, দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করা হচ্ছে এবং যারা পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত তারাই তাগূত। যারা আল্লাহর আইন ও বিধানকে ধর্মীয় বিধান বলে একে মসজিদ, মাদ্রসার চার দেয়ালে আবদ্ধ রেখে সমাজ, দেশ ও জাতিকে মানুষের বানানো আইন-বিধান দিয়ে পরিচালনা করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে এবং নিজেদের তৈরী আইন-কানুনের শিকলে আল্লাহর বান্দাদেরকে বন্দী করেছে, এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রেখেছে মানুষ যেন তাদেরই আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়, এরাই তাগূত।

এই তাগূতী শক্তি সারা পৃথিবীতে নিজেদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা-সংগ্রাম করছে। অর্থবল, জনবল, অস্ত্রশক্তি, প্রচার মাধ্যমসহ তাদের যাবতীয়

উপায়-উপকরণ তারা তাদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই নিয়োজিত করেছে। যখনই তারা অনুভব করছে, পৃথিবীর অমুক ভূ-খন্ডে অমুক ব্যক্তি বা দল সাধারণ মানুষের ওপরে তাদের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর বিধান কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে চেষ্টা-সংগ্রাম শুরু করেছে, তখনই তারা সেই ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় উপায়-উপকরণ একযোগে নিয়োজিত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সেই চেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এভাবে দ্বীনি ব্যক্তিত্ব বা দলকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, পশ্চাৎপদ, প্রগতি বিরোধী, অনগ্রসর, উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক, রক্ষণশীল, ভাববাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিধায় বিশেষিত করে তাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে তাগূতী শক্তি। এই তাগূতী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা ও টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যারা সামান্যতম সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তাদের প্রতি নূন্যতম সমর্থন দেবে, তারা ঈমানের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী নয়।

প্রথম তাগূতী শক্তি হলো খোদ ইবলিস শয়তান এবং মানব মন্ডলীর ভেতর থেকে যারা শয়তানের গোলামী করছে এবং সেই গোলামীর দিকে সাধারণ মানুষদেরকে অগ্রসর করানোর চেষ্টা করছে তারাও তাগূত। ফেরাউন, নমরুদ ও সাদ্দাদও যেমন তাগূত ছিল, প্রত্যেক যুগে যারা তাদের অনুরূপ কর্মকান্ড করেছে এবং বর্তমানেও করছে, তারাও তাগূত। একজন নবী আগমন করবে এবং সেই নবী তার প্রভুত্ব খতম করে দেবে, এই সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে ফেরাউন অসংখ্য মানব শিশুকে হত্যা করেছিল। ফেরাউনের ধারণা ছিল, এসব নবজাতকের মধ্যে কোন একজন আল্লাহর নবী হবে এবং সেই নবী তার প্রভুত্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেবে। এই ভয়ে অগণিত মানব শিশুকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছিল মিসরের ফেরাউন।

ঠিক একই পদ্ধতিতে মিসরের জালিম শাসক মুসলিম নামধারী জামাল আবদুন নাসেরও তার প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকামী অগণিত মানব সন্তানকে লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছিল। কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান হাসান আল বান্নাকে ১৯৪৯ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী গুলী করে শহীদ করা হলো, ১৯৫৪ সনের ৭ই ডিসেম্বর আইন অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র আব্দুল কাদের আওদাহর কণ্ঠে ফাঁসীর রশি পরিয়ে দেয়া হলো। একই দিনে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে শায়খ ফরগালী, ইউসুফ তেলওয়াত, ইবরাহীম তাইয়্যেব ও হিন্দাভী দুয়াইরের কণ্ঠেও ফাঁসীর রশি পরিয়ে দেয়া হলো। ১৯৬৬ সনের ২৫শে আগষ্ট বিশ্ব বিখ্যাত মুফাস্সীরে কোরআন, ফী যিলালিল কোরআনের রচয়িতা সাইয়েদ কুতুবকেও ফাঁসী দেয়া হলো। ৪০ হাজারেরও অধিক মানব সন্তানকে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়া হলো। অগণিত মানুষের সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো, অসংখ্য মানুষকে কারাগারে বন্দী করা হলো। তাদের একটিই অপরাধ ছিল যে, তারা মিসরের বুক থেকে তাগূতী ব্যবস্থা উৎখাত করে কোরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছিলেন।

অতীতের ফেরাউন ও বিংশ শতাব্দীর জামাল আবদুন নাসের–এ দুয়ের মধ্যে নামের ও সময়ের বিশাল পার্থক্য থাকলেও তারা ছিল একই চিন্তাধারার অধিকারী। ফেরাউন যেমন আল্লাহর বিধান বরদাশ্‌ত করতে পারেনি, ঠিক তেমনি মিশরের শাসকবর্গও আল্লাহর বিধান সহ্য করতে পারেনি। নামের পার্থক্য থাকলেও এরা ছিল ভয়ঙ্কর তাগূত–আল্লাহর দ্বীনের প্রকাশ্য দুশমন।

আরেক তাগূতী শক্তি তুরস্কের কামাল পাশা। নিজের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এই ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের নামে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতা চালু করেছিল। লোকটি এতটাই ইসলাম বিদ্বেষী ছিল যে, তুরস্ক থেকে আরবী বর্ণমালা উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল এবং আরবীতে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করেছিল। পর্দা প্রথা উঠিয়ে দিয়ে মুসলিম নারীদেরকে পর্দাহীন হতে বাধ্য করেছিল। বিবাহিতা নারীকে অনত্র বিয়ে দেয়ার আইন চালু করেছিল এই লোকটি। আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী মোড়লদের নির্দেশে কামাল পাশা গোটা দেশে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী নগ্ন সভ্যতা আমদানী করে, গোটা তুরস্কের মুসলমানদেরকে আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় কামাল পাশার উত্তরসুরীরা তুরস্কের পার্লামেন্টের এক মহিলা সদস্যাকে চেহারায় নেকাব ব্যবহারের কারণে পার্লামেন্ট থেকে বের করে দিয়ে তার সদস্য পদ বাতিল করে দিয়েছে।

মানবীয় প্রভুত্বের পরিবর্তে তুরস্কে যেসব ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনায়রত ছিলেন, এসব লোকদের ওপরে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে কামাল পাশা। ইসলামের মর্দে মুজাহিদ আল্লামা বদিউজ্জামান নুরসীর ওপরে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে কামাল পাশা এবং পরিশেষে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। স্পার্টাতে নির্বাসিত অবস্থায় আল্লাহর দ্বীনের এই মুজাহিদ ইন্তেকাল করেছিলেন। বিচারের নামে প্রহসন করে তুরস্কে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত অসংখ্য লোকদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে জালিম বিচারক কোরআনের সিপাহ্‌সালার আল্লামা বদিউজ্জামান নুরসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনিও কি তুরস্কে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চান?' নির্ভীক কণ্ঠে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'অবশ্য অবশ্যই চাই। আমার যদি ১০০০ মাথা থাকতো তাহলে প্রতিটি মাথার বিনিময়ে হলেও তুরস্কের মাটিতে আমি ইসলামের পূর্ণ রূপ দেখতে চাইতাম।'

বিংশ শতাব্দীর ঘৃণ্য তাগূত কামাল পাশা ঘুমিয়ে আছে। রাত শেষে মুয়াজ্জিন আল্লাহর বান্দাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান জানিয়ে আযান দিলেন। তাওহীদের সমুধর আওয়াজে কামাল পাশার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাওহীদের আওয়াজ বরদাশ্‌ত করতে পারলো না জালিম কামাল পাশা। ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলো, 'আমার ঘুম ভাঙলো কিসের শব্দে?' তাকে জানানো হলো, 'মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য আযান দিয়েছে, সেই আযানের শব্দেই আপনার ঘুম

ভেঙ্গেছে।' জালিম কামাল পাশা আদেশ দিলো, 'ধরে আনো সেই মুয়াজ্জিনকে, যে আযান দিয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে।' মুয়াজ্জিনকে ধরে আনা হলো এবং তাগূত কামাল পাশার নির্দেশে তারই সামনে মুয়াজ্জিনকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হলো।

এই তাগূতী শক্তিই ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-কে কারাগারে নিক্ষেপ করে তার ওপরে নির্যাতন চালিয়ে কারাগারেই তাঁকে শহীদ করেছে। ইমাম শাফীয়ি (রাহঃ), ইমাম মালিক (রাহঃ) ও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ)-এর ওপরে অমানবিক নির্যাতন করেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ)-কে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করেছে, অবশেষে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সাইয়েদ ইসমাঈল হোসেন দেহলবী, সাইয়েদ আহ্মদ ব্রেলভী ও নিসার আলী তীতুমীরকে সেই তাগূতী শক্তিই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আল্লামা জাফর থানেশ্বরীসহ অসংখ্য আলেমদেরকে নির্বাসন দিয়েছে এবং হত্যা করেছে ঐ তাগূতী শক্তিই। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীকে যারা কারাগারে ফাঁসির আদেশ শুনিয়েছিল, তারাও ছিল তাগূত। বর্তমান যুগের আলেমদের ওপরেও যারা নির্যাতন করছে, তারাও ঐ একই তাগূতী শক্তি।

হাতে গোনা দুই একটি দেশ ব্যতীত গোটা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই বর্তমানে তাগূতের কূট জালে বন্দী। অমুসলিম দেশের অমুসলিম শাসক যেমন তাগূত, তেমনি তাগূত মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী শাসক। কারণ এসব শাসক গোষ্ঠী কোনক্রমেই আল্লাহর বিধান সহ্য করতে রাজী নয় এবং তার শাসনাধীন এলাকায় আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরও বরদাশ্ত করতে রাজী নয়। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে যদি আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাহলে পৃথিবীর আরেক প্রান্ত থেকে তাগূতী শক্তি সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সদলবলে উড়ে এসে সে উদ্যোগকে যখন ব্যর্থ করে দিচ্ছে, অগণিত মুসলমানের রক্তে যমীন লাল করে দিচ্ছে, তখন মুসলিম নামধারী তাগূতী শাসকবৃন্দ অমুসলিম সেই তাগূতী শাসকদেরকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন দিচ্ছে।

প্রতিষ্ঠিত এই তাগূতী চক্রকে সমর্থন করা, এর জন্যে জীবনকালের একটি সেকেন্ড ব্যয় করা, এর সমর্থনে একটি শব্দ উচ্চারণ করা, সংবাদপত্রে একটি শব্দ লিখা ও প্রচার মিডিয়ায় একটি শব্দ বলা, সম্পদের একটি কপর্দক ব্যয় করা, এদের নির্যাতনের ভয়ে নিরপেক্ষতার নামে নীরবে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা, এমনকি এদের সাহায্য-সহানুভূতির একটি দানাও গ্রহণ করা শুধু হারামই নয়—বরং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শামিল।

মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে, ক্ষেত্রে ও বিভাগে এই তাগূতী শক্তি বর্তমানে আসন গেড়ে বসেছে। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিক্ষানীতিতে, শ্রমনীতিতে, বিচার বিভাগে, প্রশাসনে, বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রে, উত্তরাধিকার আইনে, ব্যবসা-বাণিজ্য নীতিতে, লেখনীতে, শিল্প-সাংস্কৃতিতে, চারুকলায়, সাংবাদিকতায় তথা সর্বক্ষেত্রে এই তাগূতী শক্তি আসন পাকাপোক্ত করেছে।

বর্তমানে মুসলমানদের ধর্মীয় অঙ্গনে ভয়ঙ্কর একটি তাগূতী শক্তি আসন গেড়ে বসেছে। এরা নিজেদেরকে পীর-বুযুর্গ হিসাবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে পরিচয় দেয়। অথচ হক্কানী পীর-বুযুর্গের কোন একটি নিদর্শনও এদের মধ্যে উপস্থিত নেই। বরং এদের কারণে হক্কানী পীর-বুযুর্গ সমাজে অপবাদের মুখোমুখী হয়েছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এসব তাগূত নিজেদেরকে পীর-বুযুর্গ বলে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে মুরীদ বানাচ্ছে। এরা আল্লাহ কিতাবের আয়াত গোপন করছে। প্রতিষ্ঠিত তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে এরা একটি বাক্যও ব্যয় করে না বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তাগূতী শক্তি এদের পৃষ্ঠপোষক। তাগূতী শক্তিকে উৎখাত করে যারা আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে, এরা সেই সংগ্রামের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছে। হক্কানী পীর, বুযুর্গ, আলেম, মাওলানার বিরুদ্ধে এরা কুরুচি পূর্ণ মন্তব্য করে থাকে।

এরা নিজেদের অনুসারীদেরকে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা না দিয়ে তাস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল শিক্ষা দেয় এবং এসবকে তারা কোরআনের নির্দেশের ওপরে অধিক গুরুত্ব দেয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কোরআন ও হাদীসের জ্ঞানশূন্য অথচ নামের পূর্বে এরা জামানার ওলী, যুগের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামেল, আশেকে রাসূল, যুগের শ্রেষ্ঠ পীর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। ইসলামের জ্ঞান বিবর্জিত এসব লোক পূর্বপুরুষের খান্দানী গদি দখল করে বসে, যেভাবে ব্যবসায়ীর সন্তান পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার গদিতে আসীন হয়। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দ্বীনি আন্দোলন করা ফরজ, অথচ তারা এই ফরজ ত্যাগ করে একটি নির্দিষ্ট দিনে ওরশ নামক এক জাঁকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিদায়াতের চর্চা করে।

ধর্মীয় অঙ্গনে এই তাগূতী শক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার ময়দানে বাধার বিন্ধ্যাচল খাড়া করে দিয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক তাগূতী শক্তি এদের পেটের সুস্বাদু আহারের যোগান দেয়, পরিধানের জৌলুশপূর্ণ পোষাকের আঞ্জাম দেয়। উড়োজাহাজে বিদেশ ভ্রমণসহ বিলাস-বহুল জীবন-যাপনের যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করে। দুনিয়া পূজারী এসব লোকগুলো এ কারণেই বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে কোন শব্দ করে না। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তাদের পীর-পুরোহিতদের অনেকে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখে। (সূরা তওবা-৩৪)

এই তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা ঈমানের দাবি। বাহ্যিক দিক থেকে তাগূতী শক্তিকে দেখতে অত্যন্ত শক্তিশালী বিশাল বড় একটা কিছু মনে হয়। মনে হতে পারে যে, এই শক্তি অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু এরা মাকড়শার জালের চেয়েও ভঙ্গুর। এই তাগূতী শক্তির পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গী-সাথী, সাহায্যকারী এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মহান আল্লাহর আদেশ এবং এই আদেশ পালন করা ঈমানের দাবি। বর্তমান পৃথিবীতে এই তাগূতী শক্তির যারা সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকরা মসজিদেও আসে, নামায-রোযাও আদায় করে। এ জন্য সব সময় এদেরকে চেনা যায় না যে, এরা আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের প্রতিষ্ঠাকামীদের সহযোগী। কিন্তু নির্বাচনের সময় এদের চেহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে মানুষের বানানো মতবাদ, মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যারা নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়-এরা তাগূত এবং এই তাগূতদেরকে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করে, এদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, এরাও তাগূতী শক্তি। হতে পারে এরা নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন।

মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঈমানের দাবি হলো এদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা এবং আল্লাহর বিধানের পক্ষের শক্তির পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। আল্লাহর বিধানের পক্ষের শক্তি নির্বাচনে বিজয়ী হলেও ঈমানদারের লাভ এবং না হলেও ঈমানদারে লাভ। বিজয়ী না হলে ঈমানদারের লাভ এ জন্য যে, কিয়ামতের ময়দানে সে আল্লাহর আদালতে বলতে পারবে, 'হে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! আমি জানতাম, যে লোকটি ক্ষমতায় গিয়ে তোমার বিধানের পক্ষে ভূমিকা রাখবে বলে ওয়াদা করেছিল, সে বিজয়ী হতে পারবে না। তবুও আমি তোমার দ্বীনের মহব্বতের কারণে তার দিকেই আমার রায় দিয়েছিলাম।' আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নিশ্চয়ই উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন।

মনে রাখতে হবে, বদর, ওহুদ ও খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধের ময়দানে উভয়দিকে যেসব সৈন্যবাহিনী দন্ডায়মান ছিল, যাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তারা কেউ কারো অপরিচিত ছিলো না। তারা ছিলো পরস্পরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং একান্ত আপনজন। একদিকে ছিলো সন্তান-অপরদিকে ছিলো পিতা। পিতার সাথে সন্তানের, চাচার সাথে ভাতিজার, মামার সাথে ভাগ্নের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যুদ্ধ হয়েছিল। তারা একে অপরের প্রতি অস্ত্রের আঘাত হেনেছিল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধু ঈমানের। পিতা যুদ্ধ করছিল তাগূতের পথে আর সন্তান যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে-মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অতএব সন্তান বা পিতা যদি মানুষের বানানো আদর্শের পক্ষাবলম্বন করে, তাহলে তার বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবি। এই দাবিতে যারা দুর্বলতার পরিচয় দেবে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ

اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ-وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরনের লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিমদের অন্তর্গত হবে। (সূরা তওবা-২৩)

সুতরাং সকল পর্যায়ের তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং এদেরকে পরাভূত করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে হবে। এদের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। ঈমানের দাবিদার লোকগুলো যখন একমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে 'আল্লাহু আকবার' বলে ঐ তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আল্লাহর ওয়াদানুসারে তাগূতী শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাগূতী শক্তির চক্রান্ত দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

প্রকৃত ঈমানদার কখনো হতাশ হয় না। ভয়ঙ্কর বিপদের সময়েও তারা মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে শঙ্কামুক্ত মনে নিজের কর্তব্য স্থির করেন। সে সময়ে স্পেন ছিল মুসলিম শাসক হাকামের শাসনের অধীনে। অমুসলিম শক্তির উস্কানিতে কর্ডোভায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতোই রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছিল। হাকাম ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে আদেশ দিলেন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করার জন্য। তাঁর প্রেরিত বাহিনী বিদ্রোহীদের প্রবল আক্রমণের মুখে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে রাজধানীতে ফিরে এলো। তাদের পেছনে বিদ্রোহী দলও রাজধানী দখল করার জন্য ছুটে আসছে। হাকামের দেহরক্ষী দল আতঙ্কিত হয়ে পড়লো-কিন্তু আতঙ্ক নেই স্বয়ং হাকামের চেহারায়। চারদিকে প্রচন্ড আতঙ্ক আর ভীতি কিন্তু তিনি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ওপর নির্ভর করে স্থির চিত্তে নিজের কর্তব্য কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি তার মন্ত্রী পরিষদের সামনেই নিজেকে ভিন্ন পোষাকে সজ্জিত করে পোষাক ও দাড়ি-চুলে সুগন্ধি মাখছেন। মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য প্রবল আতঙ্কের মধ্যে শাসক হাকামের এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না। সে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো, 'জাহাঁপনা! আমার বেয়াদবি আপনি ক্ষমা করবেন। নিজেকে সজ্জিত করার আর সুগন্ধচর্চিত করার এক আশ্চর্য সময় আপনি বেছে নিয়েছেন। চারদিকে বিপদের ঘনঘটা, শত্রুপক্ষ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছুটে আসছে। একটু পরেই আমরা সবাই নিহত হবো, আমাদের প্রাসাদসমূহ লুণ্ঠিত হবে। আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে সজ্জিত করছেন?'

শাসক হাকামের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলো। তিনি শান্ত কণ্ঠে তার সহচরকে বললেন, 'তুমি একটি বোকা, আমি যদি নিজেকে ভিন্ন পোষাকে সজ্জিত না করি এবং আমার দেহ থেকে সুগন্ধ না ছড়ায়, তাহলে বিদ্রোহীরা অগণিত মানুষের ভেতর থেকে আমাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবে কেমন করে?'

এরপর তিনি ধির স্থিরভাবে নিজেকে অস্ত্রে সজ্জিত করে নিজের সেনাবাহিনী পরিদর্শন করে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে গোটা বাহিনী সাথে নিয়ে বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করলেন। মহান আল্লাহর অসীম রহমতে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো–মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার বাস্তব ফলাফল স্পেন শাসক হাকাম নগদ লাভ করলেন। সুতরাং যে কোনো অবস্থাতেই হতাশ না হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করাই ঈমানের দাবি।

ইনসাফের ধারক হওয়া ঈমানের দাবি

ঈমানদার নিজেই শুধু সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ করবে না, সমাজ ও রাষ্ট্রেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করবে। সে যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই ইনসাফের পতাকা উড্ডীন করবে। ঈমানদারের সর্বপ্রথম কাজ হলো, সে নিজের আত্মা, দেহ এবং দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি ইনসাফ করবে–অর্থাৎ এগুলোকে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করবে, এটাই হলো নিজের প্রতি নিজে ইনসাফ করা। এরপর সে ি্জ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি ইনসাফ করবে। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী সকলের প্রতি সে ইনসাফ করবে এবং অন্যকে ইনসাফ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

সে যে সমাজে অবস্থান করবে, সেই সমাজের সবাই যেন ইনসাফমূলক কর্মকান্ড করে, সে ব্যাপারে সাধ্যানুসারে প্রচেষ্টা চালাবে। জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, প্রহসন, সন্ত্রাস ইত্যাদি নির্মূল করে তদস্থলে ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনা করা ঈমানের দাবি। ইনসাফ করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, ভাইবোন, নিজের সন্তান, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কারো প্রতিই সে পক্ষপাতিত্ব করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ-اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا-فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا-وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর অথবা তোমাদের পিতা-মাতা ও

আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন। আর পক্ষদ্বয় ধনী অথবা গরীব যা-ই হোক না কেন, তাদের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তারই বেশী পরোয়া করবে। অতএব নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি রেখে ঢেকে কথা বলো অথবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (সূরা নিসা-১৩৫)

এই আয়াতে ঈমানদারকে শুধু ইনসাফ করতেই আদেশ করা হয়নি, ইনসাফের ধারক হতে বলা হয়েছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত ইনসাফের মূর্ত প্রতীক হতে বলা হয়েছে। ইনসাফের পরিবর্তে যেখানেই জুলুম অত্যাচার চলছে, সেখানেই ঈমানদার ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করবে, এটাই তার ঈমানের দাবি। ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথেই ঈমানদারকে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই সত্যের সাক্ষ্য দাতা হতে হবে।

পৃথিবীতে একমাত্র মহান আল্লাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন কোন আদর্শ বা মতবাদ-মতাদর্শ মানুষের প্রতি ইনসাফ এবং সুবিচার করতে পারে না, এ কথা প্রমাণিত সত্য। কারণ কোন মানুষ যখন আইন-কানুন রচনা করে তখন মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না বিধায় তার রচিত আইন-কানুন নিরপেক্ষ হয় না। আর আল্লাহ তা'য়ালা হলেন সমস্ত মানুষের স্রষ্টা এবং তিনি মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ কারণে একমাত্র আল্লাহর বিধানই সমস্ত মানুষের পক্ষে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।

ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যাঁকে দেখে খোদ শয়তানও ভয় পেতো। তাঁরই সন্তান আবু শাহমা মদ পানের অভিযোগে গ্রেফতার হলো। প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতির সন্তানকে একজন সাধারণ আসামীর মতোই গ্রেফতার করা হলো। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতির প্রয়োজন বা রাষ্ট্রপতির অনুমতিরও প্রয়োজন হলো না। সাধারণ আসামীর অনুরূপ তাকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। আদালতে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পরে তার ওপরে দন্ড আরোপ করা হলো ৮০ টি বেত্রাঘাত।

এই দন্ড প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট লোক ছিল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা চিন্তা করলেন, দন্ড কার্যকর সময় দন্ড প্রয়োগকারী ব্যক্তির মনে এই চিন্তার উদ্রেক হতে পারে যে, আসামী স্বয়ং খলীফার সন্তান। এ কারণে সে দন্ড প্রদানে শিথিলতার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ আসামীদের প্রতি যতোটা শক্তি প্রয়োগ করে বেত্রাঘাত করা হয়, আসামী খলীফার সন্তান সে জন্য ততোটা শক্তি লোকটি প্রয়োগ না-ও করতে পারে। এই আশঙ্কায় খলীফা স্বয়ং দন্ডকার্যকর করলেন। নিজের হাতে বেত্রাঘাত করতে থাকলেন কলিজার টুকরা সন্তানের দেহে। প্রতিটি আঘাতে দেহ থেকে রক্ত আর গোস্ত ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে,

আদরের সন্তান 'আব্বা-আব্বা' বলে করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে। পিতা খলীফার কর্ণ কুহরে সন্তানের সে আর্তনাদ প্রবেশ করছে না। কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ভয়ে পিতা নিষ্ঠুর নির্মম হাতে সন্তানের দেহে একের পর এক আঘাত হেনেই যাচ্ছেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এ কথা বলার কারো সাহস হচ্ছে না যে, 'অনেক হয়েছে, আর মারবেন না।'

নির্মম আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক সময় আপন কলিজার টুকরা সন্তানের করুণ আর্তনাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। পিতা দন্ড পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হলেন না। চোখের সামনে সন্তান নেতিয়ে পড়লো। আদরের সন্তান অপরাধের দন্ড সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। এরই নাম সুবিচার এবং ইনসাফ।

একজন ঈমানদার যখন ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে তখন চরিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি, রুচি-পছন্দ, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা জীবনের প্রতিটি দিকেই অনুপম সৌন্দর্য সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঈমানদারের এই চারিত্রিক সৌন্দর্য ও ইনসাফ দেখে ভিন্ন জাতি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহর দ্বীন কবুল করবে-আর এটাকেই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও।' অর্থাৎ একজন মুসলমানের রুচিবোধ, চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং মানুষের প্রতি তার সুন্দর আচরণ দেখেই ভিন্ন জাতির লোকেরা যেন অনুভব করতে পারে, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা কতটা কল্যাণকর। এ জন্য প্রতিটি মুসলমানকেই ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামী সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বর্ম সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় হারিয়ে গেল। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরে সেই বর্ম রাজধানীর জনৈক ইয়াহুদীর কাছে পাওয়া গেল। তিনি সেই ইয়াহুদীর কাছে সেই বর্ম ফেরৎ চাইলেন। লোকটি জানালো এ বর্ম তারই। খলীফা নিশ্চিত যে, ইয়াহুদী মিথ্যা কথা বলছে এবং সেটিই তার হারানো বর্ম। তিনি বিচারপতি শোরাইহের আদালতে সেই ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে যিনি আসীন, তিনি মামলা দায়েরের পরিবর্তে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেই ইয়াহুদীর কাছ থেকে ঢালটি আদায় করতে পারতেন এবং ইয়াহুদীকেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইসলামের ইনসাফমূলক নীতি অনুসারে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি আদালতে উপস্থিত হলেন। অভিযুক্ত ইয়াহুদীও আদালতে উপস্থিত হলো।

আদালত কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিসাবে মামলার বাদী হযরত আলীর প্রতি সামান্যতম অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন না। রাষ্ট্রের সামান্য একজন নাগরিক হিসাবে আসামী ইয়াহুদীর প্রতিও আদালত কর্তৃপক্ষ যে আচরণ করলো, হযরত আলীর প্রতিও সেই একই আচরণ করা হলো। বাদী স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতাপশালী খলীফা এ কারণে আদালত প্রাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতির সাথে সাথে বিচারক তার আসন ত্যাগ করে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন না। বসার জন্য সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ কোন আসনও তাঁর দিকে এগিয়ে দেয়া হলো না। অভিযুক্ত ইয়াহুদী যেভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো, বাদী রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানও সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারক দেখারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না, কে বাদী আর কে আসামী। এর নামই হলো ইনসাফ।

বিচারক হযরত আলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বভাব সুলভ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যার বিরুদ্ধে বর্ম চুরির অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিই যে আপনার বর্ম চুরি করেছে এবং বর্মটি যে আপনার তার কি প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিনয়ের সাথে বললেন, 'আমার ভৃত্য এবং সন্তান হাসান এর সাক্ষী।' আদালত ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার মামলা এ কথা বলে খারিজ করে দিলেন যে, 'পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।'

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে যে ব্যক্তি আসীন, সেই ব্যক্তি বিচারকের রায় মেনে নিয়ে নীরবে আদালত প্রাঙ্গন ত্যাগ করলেন। অভিযুক্ত ইয়াহুদী ইসলামের এই ইনসাফমূলক নীতি এবং ইসলামের অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য অবলোকন করে ছুটে গিয়ে হযরত আলীর সামনে কান্না ভেজা কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার করে বললো, 'যে ইসলামের বিধান এতটা ইনসাফমূলক এবং যে ইসলাম এমন সোনার মানুষ তৈরী করেছে, আমি সেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমিই আপনার বর্ম চুরি করেছি।'

ঈমানদারকে এভাবেই সত্যের সাক্ষী হতে হবে এবং ইনসাফ করতে হবে। বিচারকের আসনে বসে ঈমানদার বিচারক ইনসাফ করবে। অর্থের বিনিময়ে অথবা স্বজন প্রীতি করে পক্ষপাতমূলক রায় দেবে না। বিচারকের রায় যদি তার সন্তান, ভাই, মাতা-পিতা বা অন্য কোন প্রিয়জনের বিরুদ্ধেও যায়, তবুও সে সঠিক রায় দেবে, ইনসাফ করবে। থানার যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তিনি গরীব আসামীর প্রতি এক ধরনের আচরণ করবেন আর আসামী যদি ধনী হয়, তাহলে তার সাথে ভিন্ন আচরণ করবেন, ঈমান এই সুযোগ কোন মুসলমানকে দেয়নি।

বনী মাখজুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ফাতিমা বিনতে আছাদ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনীত হলো। লোকজন মহিলার আভিজাত্য আর সম্ভ্রান্তের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এ কারণে যে, সাধারণ লোকদের মতো এই সম্ভ্রান্ত নারীরও হাতকাটার নির্দেশ দেয়া হয় কিনা। হযরত উসামা ইবনে জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আল্লাহর রাসূলের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র কোল মোবারকে। লোকজন তাঁকেই গিয়ে ধরলো তিনি যেন আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে সেই সম্ভ্রান্ত নারীর জন্য সুপারিশ করেন।

হযরত উসামা ইবনে জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে সুপারিশ করলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃপ্তকণ্ঠে তাঁরই স্নেহাস্পদ উসামার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন-তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ওপরে শাস্তি প্রয়োগ করতো আর সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে অভিযোগ থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখতো এ কারণেই তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমার প্রাণ যাঁর হাতে, সেই আল্লাহর শপথ! আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো তাহলে তাঁরও হাত আমি কেটে দিতাম। (বুখারী, ইবনে মাযা)

পিতা মন্ত্রী বা রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, এই ক্ষমতার বলে সন্তান অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ধরা পড়লো। পিতা তার ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করে সন্তানকে থানা থেকে অথবা আদালত থেকে ছাড়িয়ে আনলো। অথবা মন্ত্রীর সন্তান বা আত্মীয় হওয়ার কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন তাকে স্পর্শও করলো না। কিন্তু তার থেকে লঘু অপরাধকারীকে থানা কর্তৃপক্ষ ধরে তার ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন করলো এবং আদালতও তাকে জেল-জরিমানা করলো। ক্ষমতাসীন দলের লোকজন নির্বিঘ্নে অপরাধমূলক কর্ম করে যাবে আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের প্রতি আদেশ দেয়া হবে, তারা যেন ক্ষমতাসীন দলের লোকদের অপরাধের দিকে দৃষ্টি না দেয়। এর নাম ইনসাফ নয়-এর নাম জুলুম। এই জুলম থেকে মুক্ত থাকাই ঈমানের দাবি।

মিশরের গভর্ণর হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে অভিযোগ এলো, তিনি এক ব্যক্তিকে প্রহার করেছেন। খলীফা সেই প্রহৃত ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, 'তোমাকে তোমার দেহের যেখানে যতোটা শক্তি প্রয়োগ করে যতো বার আঘাত করা হয়েছে, এই চাবুক দিয়ে তুমিও গভর্ণরের সন্তান প্রহারকারী আব্দুল্লাহর দেহে সেই শক্তি প্রয়োগ করে আঘাত করো।' তাঁর আদেশ বাস্তবায়িত হলো। শুধু তাই নয়, স্বয়ং গভর্ণর হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো যে, তিনি প্রভুত সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছেন।

খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গভর্ণরের কাছে পত্রে লিখলেন, 'গভর্ণর হবার পূর্বে তো তোমার এত ধন-সম্পদ ছিল না। বর্তমানে এত সম্পদ কোত্থেকে এলো?' গভর্ণর পত্রের জবাবে খলীফাকে জানালেন, 'আমার এলাকা স্বর্ণপ্রসবিনী। আমি যা বেতন পাই তা থেকে অনেক উদ্বৃত্ত থাকে।' গভর্ণরের জবাবে খলীফা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমাকে মিশরে প্রেরণ করলেন, তিনি যেন গভর্ণরের সম্পদ পরীক্ষা করে দেখেন। সমস্ত সম্পদ হিসাবে করে গভর্ণর হবার পূর্বে তার যা সম্পদ ছিল, তার অতিরিক্ত সম্পদ তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করলেন, আর ইসলামী বিরাট একটি প্রদেশের প্রতাপশালী গভর্ণর তা নীরবে অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করলেন, প্রতিবাদের কোন শব্দ তাঁর কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হলো না।

ইরাকের বসরার শাসনকর্তা হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বিরুদ্ধে খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালার কাছে অভিযোগ এলো, মুগিরার সাথে বসরার একজন নারীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি অভিযোগ শোনামাত্র তদন্ত দলের প্রধান হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে নির্দেশ দিলেন, 'এই মুহূর্তে বসরায় চলে যাও, সেখানে নাকি শয়তানের মজলিশ বসেছে। সেখানের শাসনকার্য কেমন চলছে দেখে এসো এবং শাসনকর্তা মুগিরাকে সাক্ষীসহ আমার কাছে নিয়ে এসো।' যথারীতি তাঁর আদেশ পালিত হলো। বিচারে বসরার শাসনকর্তা নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। খলীফা হযরত উমর বসরার শাসনকর্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ দিতাম।'

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন আল্লাহর রাসূলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী। তিনি নীতি নির্ধারকদের একজন ছিলেন। সে সময়ে যে চারজন দক্ষ ও খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন, হযরত মুগিরা ছিলেন তাদেরই একজন। শুধু তাই নয়, তিনি একজন খ্যাতিমান সমরবিদ-জেনারেলও ছিলেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এসব কৃতিত্ব, বড় দায়িত্ব, পদমর্যাদা ও খ্যাতি কোনটিই তাঁকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে পারেনি। এরই নাম ইনসাফ এবং সুবিচার। একজন সাধারণ আসামীর অনুরূপ তাঁকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল।

ইতিহাসে দেখা যায়, আল্লাহভীরু মুসলিম শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে অমুসলিম সুধী ব্যক্তিদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে মুসলমানদের উদার অকৃত্রিম ব্যবহারে, ইনসাফমূলক নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারণ মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সমাজে বাস করেও কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকেননি। তাদের সাথে ব্যাপকভাবে মেলামেশা করেছেন। পারস্পরিক লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে তারা অতি ঘনিষ্ঠভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের সুযোগ লাভ করেছিল। আইনের দৃষ্টিতে সামাজিক মৌলিক অধিকারের দিক দিয়ে শাসক ও শাসিত জনগণের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে কোনো ধরনের তারতম্য করা হয়নি কখনোই।

এমন কি বিবদমান দুই পক্ষের একটি উচ্চ মর্যাদার মুসলিম এবং অপর পক্ষ অমুসলিম, ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হওয়ার পরও সেই অমুসলিম পক্ষ একবিন্দু পক্ষপাতিত্ব বা অবিচারের সম্মুখীন হয়নি। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলে একজন ইয়াহুদী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে ফরিয়াদ করেছিল। ফরিয়াদীর বক্তব্য শোনার সময় খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তাঁর নাম ধরে আহ্বান না জানিয়ে তাঁর ছেলের নাম জড়িত করে তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে আবুল হাসান! (হে হাসানের পিতা) আপনি আপনার প্রতিপক্ষের পাশে আসন গ্রহণ করুন।'

খলীফার কথা মতো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাই করলেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় কেমন যেন এক অস্বস্তি ও সংকোচের ভাব ফুটে উঠলো। বিচার শেষে খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দিকে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের সমান আসনে বসতে বলায় আপনি মনোক্ষুণ্ন হনতি তো?'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাবে বললেন, 'না, বিষয়টি সেটা নয়। কিন্তু আপনি আমাকে আমার নাম ধরে আহ্বান না করে আমার ছেলের নামের সাথে জড়িত করে আমাকে আহ্বান করলেন। এতে করে আমার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে আপনি আমার ও আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদকারীর মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করেননি। এ কারণে আমার মনে এই আশঙ্কাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইয়াহুদী লোকটি হয়ত ধারণা করবে যে, মুসলমানদের নিরপেক্ষ সুবিচার, ইনসাফ, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে।' ইনসাফের ব্যাপারে তাদের চেতনা কতটা শাণিত ছিল, এ ঘটনা তারই প্রমাণ পেশ করে।

বর্তমানে কে না জানে, বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ নির্বাহী প্রধান, মন্ত্রী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রের সম্মানিত-মর্যাদাবান নাগরিক বলে পরিচিত লোকগুলোই দেশ ও জাতির মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ওঠে না আর যদিও কোনো অভিযোগ ওঠে, তাহলে তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার লক্ষ্যে তাদেরই সহযোগী আপাদ-মস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত লোকগুলোর কণ্ঠে বিবৃতির খই ফোটে এবং পত্রিকায় ঝড় তোলা হয়। ঘটনাক্রমে যদি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে আদালতও তাদেরকে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া থেকে রেহাই দেয়। আর যদি দেশ ও জাতির এসব ভয়ঙ্কর দুশমন আদালতে উপস্থিত হয়, তাহলে তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার আসন দেয়া হয় এবং আদালত জনমতের চাপে জেলে প্রেরণ করতে বাধ্য হলেও সেখানে তাদের রাজকীয় জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই জুলুমের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা ঈমানের দাবি।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে অযোগ্য হওয়ার পরও ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী, বিভিন্ন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি, বিদেশ গমন, প্রমোশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দলীয় লোক, নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। অপরদিকে যোগ্যতা ও মেধা থাকার পরও অনেকে সুযোগ পায় না। এরই নাম স্পষ্ট জুলুম ও অবিচার। এই জুলুমের অবসান ঘটানোর জন্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারকে আদেশ করেছেন, তোমরা ইনসাফের ধারক হও। প্রচার মাধ্যমগুলো পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচার করে দেশের জনগণের কাছ থেকে সত্য আড়াল করে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে। যে দল ও মতবাদের প্রতি তারা দুর্বল, সেই দলের জনসভা ও মিছিলে যদি মাত্র ২০ জন লোক জমায়েত হয়, তাহলে তারা লেখে বিশাল মিছিল। পত্রিকায় ছবি এমন কৌশলে ছাপা হয়

যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এমনভাবে সেসব সংবাদ পরিবেশন করা হয়, যেন সাধারণ মানুষ স্পষ্টভাবে সত্য অনুধাবন করতে না পারে।

অপরদিকে তাদের অপছন্দের দলের জনসভায় যদি লক্ষাধিক লোকও জমায়েত হয়, মিছিলে অংশ গ্রহণ করে, এসব জনসভা ও মিছিলের ছবি পত্রিকায় ছাপা হবে না আর ছাপা হলেও এমন আকারে ছাপা হবে, সাধারণ লোক যেন বুঝে, সামান্য কয়েকজন লোক জমায়েত হয়েছিলো। পছন্দনীয় দলের লোকজন রাস্তায় নেমে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি করে, মারণাস্ত্র ব্যবহার করে মানুষের প্রাণ হরণ করে, তাহলে পত্রিকায় সে সংবাদ এমনভাবে পরিবেশন করা হবে, পাঠক যেন এটাই অনুভব করে, ঐ দলের লোকগুলো অত্যন্ত শান্তি প্রিয় এবং একান্ত বাধ্য হয়েই তারা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ পছন্দনীয় দলের লোকদের যাবতীয় দোষক্রটি আড়াল করাই ঐসব প্রচার মাধ্যমের প্রধান কাজ।

আর অপছন্দনীয় দলের লোকগুলো যদি নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য, আত্মরক্ষার খাতিরে একটি ঢিলও ছুড়ে, সেই ঢিলকে প্রচার মাধ্যম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলী হিসাবে সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করে। এভাবে সর্বত্র ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনার লোকগুলো সত্যের অপলাপ করে যাচ্ছে এবং সত্যের প্রতি জুলুম করছে। এই জুলুমের অবসান কল্পে নিজেদেরকে সংগঠিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ঈমানের দাবি। ঈমানদার কোথাও বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করবে না, নিজের মাতা-পিতা, সন্তান, ভাইবোন, আপন আত্মীয়-স্বজন, ধনী-গরীব, নিজের স্বজাতি সে যে-ই হোক না কেন, সর্বত্র সে ইনসাফ ও সুবিচার করবে। এসব ক্ষেত্রে তার অন্তর কোন দিকে আকর্ষণ অনুভব করছে, সেদিকে সে দৃষ্টি দেবে না। সে আকর্ষণ অনুভব করবে একমাত্র আল্লাহর বিধানের প্রতি। ঈমানদার কোন অবস্থাতেই সত্যের বিপরীত পথ অবলম্বন করবে না এবং সত্য গোপন করবে না। তার ভেতরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখবে যে, সে যা কিছুই করছে, মহান আল্লাহ সে সম্পর্ক পূর্ণ অবহিত রয়েছেন।

সম্রাট মাহমুদের দরবারে একজন লোক এসে সম্রাটের আপন ভাইয়ের যুবক ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, সম্রাটের ভাতিজা প্রায় রাতেই তার বাড়িতে গিয়ে তাকে প্রহার করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তার সুন্দরী স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালায়। অভিযোগ শোনা মাত্র সম্রাট চমকে উঠলেন। অশ্রুধারায় তার চোখ ঝাপ্সা হয়ে এলো। তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, 'আমার ভাতিজা আবার যখন তোমার বাড়িতে যাবে, তখনই তুমি এসে আমাকে জানাবে।' লোকটি চলে গেলো এবং তিনদিন পরে সে এক রাতে ছুটে এসে সম্রাটকে জানালো, তাঁর ভাতিজা হীন উদ্দেশ্যে পুনরায় তার বাড়িতে প্রবেশ করেছে।

সম্রাট একাই দ্রুত লোকটির সাথে সেখানে পৌছালেন। তিনি দেখলেন, একজন যুবক অভিযোগকারী লোকটির স্ত্রীর বিছানায় শায়িত। সম্রাট লোকটিকে বললেন আলো নিভিয়ে

দেয়ার জন্য। লোকটি আলো নিভিয়ে দেয়ার সাথে সাথে সম্রাট স্বয়ং ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় শায়িত যুবকটির মাথা তরবারীর আঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর তিনি পুনরায় আলো জ্বালাতে বললেন-লোকটি আলো জ্বালানোর পরে সম্রাট আল্লাহর শোকর আদায় করে লোকটির কাছে পান করার জন্য পানি চাইলেন। লোকটি অবাক বিস্ময়ে সম্রাটের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার সে জানতে চাইলো, সম্রাট কেনোই বা আলো নিভিয়ে দিতে বললেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে পানি পান করলেন কেনো।

সম্রাট মাহমুদ বললেন, 'আমার ভাতিজাকে আমি অত্যধিক স্নেহ করতাম। আমার ভয় হচ্ছিলো, আলো জ্বালানো থাকলে তার চেহারার ওপরে আমার দৃষ্টি পড়লে মমতার কারণে আমি বোধহয় অপরাধীকে শাস্তি দিতে অপারগ হতাম এবং তোমার সাথে ইনসাফ করতে পারতাম না। এ কারণে আমি তোমাকে আলো নিভিয়ে দিতে বলেছিলাম। আর তুমি যেদিন আমার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে, আমি প্রতীজ্ঞা করেছিলাম অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে কোনো কিছু আহার করবো না। তিনদিন যাবৎ আমি অনাহারে রয়েছি। এ কারণে আমি শাস্তি দিয়েই তোমার কাছে পান করার জন্য পানি চেয়েছিলাম।' তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর ঈমানই সম্রাট মাহমুদকে এভাবে স্বজন প্রীতির উর্ধ্বে উঠিয়ে দেশের একজন সাধারণ প্রজার প্রতি ইনসাফ করতে বাধ্য করেছিল।

আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া ঈমানের দাবি

ঈমানের দাবিদার লোকগুলো প্রত্যেক পদে এবং প্রতিটি কাজে আপন রব মহান আল্লাহকে ভয় করবে। এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সে স্মরণ রাখবে যে, তার কোন কথা, কোন কাজ, কোন আচরণ এবং কোন পদক্ষেপ যেন আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দের বিপরীত না হয়। প্রত্যেকটি কাজে ঈমানদার মহান আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং এটাই ঈমানের দাবি। ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক, সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে তাঁর নাম শোনামাত্র অপরাধীর কলিজা থর থর করে কেঁপে ওঠে। তাঁর শাসনাধীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি নাগরিক রাতে গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অভাবহীন অবস্থায় নিরাপত্তার সাথে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। আর স্বয়ং খলীফা নির্ঘুম যামিনী অতিবাহিত করেন।

কোনো একটি নাগরিকও যদি সামান্যতম অসুবিধা অনুভব করে, তাহলে তাঁকেই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। তিনি দেশের অবস্থা জানার জন্য শুধু পর্যবেক্ষণ দলের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করেন না। স্বয়ং তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে দেশের নাগরিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে থাকেন। গভীর রাতে তিনি মদীনার এক এলাকা অতিক্রম করছিলেন। একটি বাড়ি থেকে গভীর রাতে কথাবার্তার মৃদু শব্দ তাঁর কানে প্রবেশ করলো। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তিনি শুনতে

পেলেন, মা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, 'মা, দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করো, তাহলে অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে।' মেয়ে জবাবে বললো, এটা সম্ভব নয় মা। কারণ খলীফা আদেশ দিয়েছেন, দুধে কেউ পানি মেশাতে পারবে না।'

মা বললেন, 'খলীফা আদেশ দিয়েছে তো কি হয়েছে? এখানে তো আর কেউ দেখতে আসছে না।' মেয়ে মায়ের কথার প্রতিবাদ করে বললো, ' একজন মুসলমান হিসাবে খলীফার আদেশ অনুসরণ করা অবশ্যই উচিত মা। তা ছাড়া এখানে কেউ না দেখলেও তো মহান আল্লাহ দেখছেন। তাঁর চোখে কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। আমি দুধে পানি মেশাতে পারবো না।' খলীফা স্বয়ং মা ও মেয়ের এসব কথোপকথন নিজ কানে শুনলেন এবং চিন্তা করতে থাকলেন, আল্লাহভীরু ঐ মেয়েটিকে কি দিয়ে পুরস্কার দেয়া যায়। এরপর তিনি মেয়েটিকে পুরস্কৃত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন সেই মা ও মেয়েকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তারা ভয়কম্পিত পদে এসে খলীফার দরবারে উপস্থিত হলো। খলীফা নিজ সন্তানদেরকে ডেকে তাঁর নিজের কানে শোনা মা ও মেয়ের কথোপকথন ছেলেদেরকে শুনিয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছো এই মেয়েকে বধু হিসাবে বরণ করে নেয়ার জন্য। কারণ আমি এই মেয়ের তুলনায় তোমাদের জন্য আর উপযুক্ত পাত্রী দেখছি না।' খলীফার ছেলের সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলো।

এরই নাম আল্লাহর ভয় এবং তাক্বওয়াদারী, পরহেজগারী। গোপনে, প্রকাশ্যে, নীরবে, নির্জনে, মানব চক্ষুর অন্তরালেও ঈমানদারের কলিজা মহান আল্লাহর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। যেসব অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত, শয়তানের প্রতারণায় বা নফসের ধোকায় পড়ে তারা যদি কখনো অপরাধে জড়িয়েও পড়ে, সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র তারা অনুতাপ, অনুশোচনা আর বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকে। বিবেকের দংশনে দংশিত অপরাধিকে ধরার জন্য কোনো বাহিনীর প্রয়োজন হয় না বা তাদের কাছ থেকে অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদেরও প্রয়োজন হয় না। অপরাধের দন্ড প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে এরা নিজেরা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে দন্ড কামনা করে, যেন আখিরাতে তাদেরকে শাস্তি পেতে না হয়।

হযরত মাগির ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে অনুতাপ মিশ্রিত কণ্ঠে জানালেন, 'আমি অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছি, আমার প্রতি দন্ড প্রয়োগ করুন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।' লোকটি চলে গেলো কিন্তু মনে স্বস্তি পেলো না। তাঁর জীবনের সমস্ত শান্তি যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। বিবেক তাঁকে ভর্ৎসনা করছে, কিয়ামতের দিনের সেই আযাব তো সে সহ্য করতে পারবে না। পুনরায় লোকটি রাসূলের কাছে সেই পূর্বের অনুরূপ আবেদন জানালো। রাসূল তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনবার লোকটিকে ফিরিয়ে দেয়ার পরে চতুর্থবার লোকটি এসে যখন সেই একই আবেদন জানালো, আল্লাহর রাসূল উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটি উন্মাদ নয় তো?'

লোকেরা বললো, 'না, লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ।' রাসূল আবার জানতে চাইলেন, 'লোকটি কোনো ধরনের নেশা করেনি তো?' লোকজন জানালো, 'না, লোকটি কোনো নেশা করেনি।' এরপর লোকটির ওপর দন্ড প্রয়োগ করা হলো অর্থাৎ লোকটিকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা মাগির ইবনে মালিকের জন্য মাগফিরাত কামনা করো। কারণ সে এমন তাওবা করেছে যে, তাঁর তাওবা সমস্ত মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাই যথেষ্ট হতো।'

ইজ্‌দ গোত্রের একজন ঈমানদার নারী নফসের ধোকায় পড়ে অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছিল। সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র আল্লাহর ভয়ে সেই নারী থর থর করে কেঁপে উঠলো। আহার নিদ্রা সব তার বন্ধ হয়ে গেলো। কিয়ামতের ময়দানে আপন রব আল্লাহর সামনে সে কোন মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াবে? ছুটে এলো আল্লাহর রাসূলের কাছে। অকপটে সে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিলো। রাসূল তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সেই নারী তাঁর প্রতি দন্ড প্রয়োগ করার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে বার বার আবেদন জানাতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহর রাসূল সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি কি গর্ভবতী হয়েছো?' অনুতাপের সাথে নারী জানালো সে গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুতাপের অনলে নিঃশেষে জ্বলে জ্বলে খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া সেই নারীকে জানালেন, 'গর্ভের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

আক্ষেপ করতে করতে সেই নারী চলে গেলো। তাঁকে প্রহরা দেয়ার জন্য কোনো প্রহরাদার বা গোয়েন্দা নিয়োগ করা হলো না। দশমাস পরে সন্তান প্রসব হলো কিন্তু সেই নারীর মন থেকে অনুতাপের আগুন একটুও নির্বাপিত হয়নি বা অনুশোচনার তাপের মাত্রা হ্রাস হয়নি। সন্তান কোলে করে সেই নারী পুনরায় আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে দন্ড প্রয়োগের দাবি জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে জানালেন, 'তোমার দুধে ঐ সন্তানের দুই বছর হক রয়েছে। সেই হক তুমি আদায় করবে এবং সন্তান অন্য কিছু আহার না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

সেই নারীর দুই গন্ড বেয়ে অনুতাপের অশ্রু বেয়ে পড়ছে। চলে গেলো সেই নারী এবং নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানকে রুটি খাওয়া অবস্থায় এনে রাসূলকে দেখিয়ে আবেদন জানালো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তান দুধ খাওয়া ত্যাগ করেছে, এই দেখুন সে রুটি খাচ্ছে।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই সন্তানকে লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে? একজন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। রাসূল ঐ লোকটির দায়িত্বে সন্তানকে দিয়ে আবক্ষ মাটিতে সেই নারীকে গেড়ে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

মহিলার প্রতি দন্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় একটি পাথরের আঘাত করলেন। মস্তক ফেটে মগজ আর রক্ত ছিটকে এসে হযরত খালিদের দেহ স্পর্শ করলো। তিনি মহিলার প্রতি ভর্ৎসনা করলেন। আল্লাহর রাসূল তা শুনে উপস্থিত সাহাবাদেরকে বললেন, 'তোমরা যদি পৃথিবীতে কোন জান্নাতী নারী দেখতে চাও, তাহলে এই নারীকে দেখে নাও। কারণ সে এমনভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছে যে, মহান আল্লাহর তাঁর উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন।' ঈমানদার এভাবেই আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে এবং এভাবে ভয় করাই ঈমানের দাবি।

মহিলা দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের দুষ্কর্মের কথা অকপটে স্বীকৃতি দিয়ে দন্ড গ্রহণের জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করলো। অপরাধ সে করেছিল নির্জনে গোপনে। যে অপরাধ সম্পর্কে একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ-ই অবগত ছিলো না। সে জানতো সেই দন্ড কতটা কঠোর তবুও তাঁর ঈমান তাঁকে অপরাধের কারণে মুহূর্তকাল স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। এমন কোন্ শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে সেই নিশ্চিত এবং নির্মম মৃত্যুর দিকে নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্য তারা এমন ব্যাকুল হয়েছিল? একমাত্র আল্লাহর ভয়-ই তাকে অপরাধ থেকে পবিত্র হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অপরাধ গোপন করা এক দুঃসহ লজ্জার ব্যাপার এই লজ্জা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সামনে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় দাঁড়ানোর অনুভূতিই তাঁকে দন্ড গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

ইউনিয়ন পরিষদের সামান্য একটি সদস্যের পদে, চেয়ারম্যানের পদে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদে আসীন হয়ে,অহঙ্কারের পদভারে মাটি কাঁপাতে চায়। সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে নানা অপকর্মে নিজেকে জড়িত করে। একটি বারের জন্যও চিন্তা করে না, তার যাবতীয় কাজের হিসাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। অথচ বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজে পানির পাত্র বহন করে আনতেন। তিনি নিজ পরিবারের জন্য পানির পাত্র বহন করে আনছেন, পথিমধ্যে তাঁর সন্তান এই দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, 'আপনি এ কি করছেন?'

স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত ইসলামী সাম্রাজ্যের কর্ণধার সন্তানকে বললেন, 'আমার নফস আমার ভেতরে আত্মগৌরব ও অহঙ্কার সৃষ্টির লক্ষ্যে ধোকা দিতে চাচ্ছিলো। তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যই আমি এমন করছি।'

আল্লাহর ভয় তাদের ভেতরে কতটা জাগ্রত ছিল যে, মনের কোণায় যদি কখনো খিলাফত, রাজ্য বিজয় এবং ভবিষ্যতের সম্মান-মর্যাদার জন্য সামান্যতম পরিমাণ আত্মম্ভরিতা ও গৌরব অনুভূত হতো, সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁরা নিজের মনের কোণ থেকে আত্মম্ভরিতার সুপ্ত বীজ উপ্‌ড়ে ফেলার জন্য বাস্তব পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে এই চেতনাই থাকতো না যে, তিনি একটি বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের স্বাধীন খলীফা, রাষ্ট্রের প্রতাপশালী নির্বাহী প্রধান। ঈমানদারদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا-لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ কালে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, নামায কায়েম করে। এসব লোকেরাই সত্যকারের মুমিন। তাদের জন্য তাদের রব-এর কাছে খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, রয়েছে অপরাধের ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। (সূরা আনফাল-২-৩-৪)

ঈমানদারের সামনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন আদেশ-নিষেধ শোনালে তার ঈমান বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ঈমান শক্তিশালী হয়। ঈমানদার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পালনীয় সত্য হিসাবে মেনে নিয়ে তার সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয়, তখনই তার ঈমান পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তি সঞ্চয় করে। যে সময়ে মানুষ তার মর্জির, ইচ্ছা, অভিমত, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, বিবেক-বুদ্ধি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বাদ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস, মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের নির্দেশ শোনে এবং সেই নির্দেশ অনুসারে নিজের যাবতীয় কিছু সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে সেই বিধান অনুসারে পরিবর্তিত করে নেয় এবং পরিবর্তিত করার কষ্ট সহ্য করে, তখনই তার ঈমান তেজদীপ্ত হয়ে ওঠে। ঈমানের শিরা-উপশিরায় তথা প্রতিটি স্নায়ুতে প্রবল বেগে তারুণ্যের রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে।

আর ঈমানের দাবিদার কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ শোনার পরে তা পালন না করে নিজ মত ও পথের ওপর অবিচল-অটল থাকে, তাহলে ক্রমশ তার ঈমান মৃত্যুবরণ করে এবং সেই ঈমান মহান আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভে যেমন সমর্থ হয় না, তেমনি পৃথিবীতেও শয়তানের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমানদার একমাত্র মহান আল্লাহর ওপরই যাবতীয় কাজে নির্ভর করে এবং নামায আদায় করে। নামায হলো আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না, সে ব্যক্তি এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, সে আপন রব মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে রাজী নয়। ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর গোলাম এবং সে যে আল্লাহর গোলামী করছে তার বড় প্রমাণ হলো সে যথারীতি এবং রাসূল প্রদর্শিত পন্থায় নামায আদায় করছে এবং যাবতীয় কাজে একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করছে।

ঈমানদার ব্যক্তিও মানুষ, তার ভেতরেও মানবীয় দুর্বলতা রয়েছে সে ব্যক্তিও নিজের নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়তে পারে। বড় বড় অপরাধ ঈমানদার মানুষের মাধ্যমেও সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছে, হাদীস ও ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের কৃত অপরাধের ওপরে অটল না থেকে সম্বিত ফিরে পাওয়া মাত্র শাস্তি গ্রহণ করেছেন এবং নিজেকে সংশোধন করেছেন। নবী-রাসূল ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, সে কেবল আমলে সালেহ্ দিয়েই তার আমলনামা পরিপূর্ণ করবে, সেখানে কোন পদস্খলন, ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে না। কিন্তু সেই মানুষই যখন মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁরই গোলাম হওয়ার অপরিহার্য শর্তসমূহ পূর্ণ করে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে ঈমানদারের ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার কাজ-কর্ম যে ফলই লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হয়, তিনি অনুগ্রহ করে তা অপেক্ষা অনেক বেশী দিয়ে থাকেন।

আসলে এটা মহান আল্লাহর অসংখ্য ও অসীম রহমতের মধ্যে অতি বড় একটি রহমত। নতুবা প্রত্যেক অপরাধের শাস্তি আর প্রত্যেক আমলে সালেহ্-এর পুরস্কার যদি পৃথক পৃথকভাবে দেয়ার নিয়ম আল্লাহ তা'য়ালা করতেন, তাহলে তাহলে বড় বড় ঈমানদার ব্যক্তিও কিয়ামতের দিনে আদালতে আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ পেতো না। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এ কথা বার বার বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তিদের ভুল-ভ্রান্তি তিনি ক্ষমা করে তাদেরকে পবিত্র করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاْ اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ-وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে মানদন্ড দান করবেন। তোমাদের দোষ-ত্রুটি তোমাদের কাছ থেকে দূর করে দেবেন, আর তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা আনফাল-২৯)

মহান আল্লাহকে যারা ভয় করে জীবন পরিচালিত করবে, আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াদা করছেন, তাদেরকে তিনি 'মানদন্ড' দান করবেন। ইসলামে 'মানদন্ড' বলা হয় এমন জিনিসকে যা ভালো ও মন্দ, সত্য-মিথ্যা, প্রকৃত ও অপ্রকৃত, কৃত্রিম ও খাঁটি ইত্যাদির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে। ঈমানদার যদি ঈমানের দাবি অনুসারে আল্লাহকে ভয় করে জীবন পরিচালিত করতে থাকে এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে না বলে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কে একটা পার্থক্যকারী শক্তির উদ্ভব করে দেবেন।

ঈমানদার ব্যক্তির ভেতরের এই শক্তিই তাকে প্রতি পদে দিক নির্দেশনা দিতে থাকে, কোনটি ভুল কোনটি নির্ভুল, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোন ধরনের নীতি ও আচরণ সঠিক এবং কোনটি ভ্রান্ত। কোনটি ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ আর কোনটি নির্মল-স্বচ্ছ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোন কাজে সন্তুষ্ট আর কোন কাজে অসন্তুষ্ট। জীবনের প্রতিটি বাঁকে কি করা উচিত আর কোন পথ পরিহার করা উচিত, পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কোন নীতি অবলম্বন করা উচিত আর কোন নীতি ত্যাগ করা উচিত। কোন পথ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবমান আর কোন পথ শয়তানের দিকে ধাবমান। মহান আল্লাহ ঈমানদারের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দেন এবং এটা ঈমানদারের জন্য মহান আল্লাহর অসীম রহমত।

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই রহমত ও ক্ষমা লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে কাজ করতে হবে। ঈমানদারের সামনে যখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো আদেশ-নিষেধ শোনানো হবে, তখনই সে তার সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেবে। হৃদয়ে আল্লাহ তা'য়ালার ভয় সদাজাগ্রত রাখতে হবে। আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের জীবন সঙ্গিনী হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, দুই জন লোক মীরাসী সম্পত্তি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। উভয়ই সেই সম্পদ নিজের দাবিতে অটল রইলো। অবশেষে তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে বিষয়টি মীমাংসার জন্য পেশ করলো।

আল্লাহর রাসূল উভয়ের বক্তব্য শুনে বললেন, শোনো, আমিও তোমাদের অনুরূপ একজন মানুষ বৈকি। তোমরা যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছো, তা মীমাংসার ব্যাপারে আমার কাছে এসেছো। তোমাদের একজন হয়ত অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু এবং যুক্তি প্রদর্শনের ব্যাপারে দক্ষতাসম্পন্ন। আমি যদি তার বাকপটুতা ও যুক্তি প্রদর্শনের কারণে তার ভাইয়ের অধিকার তাকেই দিয়ে দেই, সে যেন তার একবিন্দুও গ্রহণ না করে। কারণ সে তা গ্রহণ করলে জাহান্নামেরই একটি টুকরা গ্রহণ করা হবে।

বিতর্কে লিপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো। দুই জনের চোখ থেকে অশ্রুধারা ঝরতে থাকলো। কান্না জড়িত কণ্ঠে তারা উভয়ে একে অপরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো, আমার সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার হকও আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।

তাদের অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, তোমরা যা করলে তা যখন করেই ফেললে তখন তোমরা দুইজনে পরস্পর সম্পদ ভাগ করে নাও এবং প্রত্যেকের পাওনার পরিমাণ অনুমান করো, এভাবে তোমরা একে অপরের হক হালাল করে নাও।

এর নামই ঈমান, এই ঈমানই উভয়ের হৃদয়-মন ও বিবেককে জাগ্রত করে দিয়েছিল। মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবীদের একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখন্ড জমি ক্রয় করেছিল। জমি

ক্রয়কারী ব্যক্তি জমির দখল নিয়ে যখন তা ব্যবহার করতে থাকলো, তখন সেই জমির তলদেশ থেকে স্বর্ণ ভর্তি একটি পাত্র পেয়ে গেলো। জমি ক্রয়কারী ব্যক্তি তখন স্বর্ণ ভর্তি সেই পাত্র নিয়ে উপস্থিত হলো, যার কাছ থেকে সে জমি ক্রয় করেছিল। তাকে সে বললো-ভাই, আমি তোমার কাছ থেকে যে জমি কিনে ছিলাম, সেই জমির মাটি খনন করার সময় এটা পেয়েছি। আমি তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছি, কিন্তু জমির ভেতরে অবস্থিত এই স্বর্ণ পাত্র কিনিনি। সুতরাং এটা তোমার, তুমি এটা গ্রহণ করো।

জমি বিক্রেতা বিনয়ের সাথে জানালো-ভাই, আমি তোমার কাছে শুধু জমিই বিক্রি করিনি, জমির ভেতরে যা কিছু রয়েছে তা সবই বিক্রি করে দিয়েছি। সুতরাং এখন তুমি জমির ভেতরে যা কিছুই পাবে, তা তোমারই হবে এবং ঐ স্বর্ণ ভর্তি পাত্রের ওপর আমার কোন অধিকার নেই।

জমি ক্রয়কারী ব্যক্তি স্বর্ণ ভর্তি পাত্র গ্রহণ করতে রাজী নয়, সে তা জমির পূর্বতন মালিককে ফেরৎ দেবেই। উক্ত লোকটিও তা গ্রহণ করবে না। এভাবেই তারা উভয়ে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়লো। অবশেষে তারা বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়ার জন্য একজনকে বিচারক নিযুক্ত করলো। বিচারক উভয়ের কথা শুনে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমাদের কি ছেলে মেয়ে আছে?' একজন বললো, 'আমার একটি ছেলে আছে।' অন্যজন বললো, 'আমার একটি মেয়ে আছে।' এবার বিচারক রায় দিলো, 'তাহলে তো বিষয়টি মীমাংসা করা খুবই সহজ। তোমরা পরস্পরে একের ছেলের সাথে অন্যের মেয়ের বিয়ে দাও এবং এই স্বর্ণ ভর্তি পাত্র উভয়ের জন্য ব্যয় করো ও ভাগ করে দাও।'

এর নাম ঈমান এবং এই ঈমানের দাবি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা লোভ-লালসাকে বিসর্জন দিয়েছিল। মুখে ঈমানের দাবি করা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে ঈমানের দাবি অনুসারে কাজ করা হচ্ছে না, ফলে সামান্য সম্পদ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, রক্তারক্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং একে অপরকে হত্যা করছে।

ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকের ঘটনা। মুজাফ্ফর নগর জেলার কান্দেহালা নামক এক স্থানে একটি ছোট্ট ভূ-খন্ড নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হলো। হিন্দুদের দাবি হলো, স্থানটি তাদের মন্দিরের। আর মুসলমানদের দাবি হলো, স্থানটি তাদের মসজিদের। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালো। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর কয়েকজন মুসলমানকে একান্তে ডেকে নিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, হিন্দুদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি কি রয়েছে, যে ব্যক্তি আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, যার সত্যবাদিতার প্রতি আপনাদের আস্থা রয়েছে এবং তিনি যা সিদ্ধান্ত দেবেন তা আপনারা মেনে নেবেন?

মুসলমানরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, হিন্দুদের মধ্যে তাদের দৃষ্টিতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার সত্যবাদিতার প্রতি তারা আস্থা রাখতে পারে। এরপর ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকজন

হিন্দু নেতৃবৃন্দকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, বিষয়টি সাম্প্রদায়ীক স্বার্থের সাথে জড়িত। সিদ্ধান্তে সামান্য ভুল হলেই সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি কি রয়েছে, যার প্রতি তোমরা আস্থা রাখতে পারো এবং তিনি সত্য কথা বলবেন বলে তোমরা মনে করো?

হিন্দুরা জানালো, এমন একজন ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তিনি তো কোনো ইংরেজের মুখ দর্শন করেন না। সুতরাং তিনি আপনার সামনে এসে কোনো সিদ্ধান্ত দেবেন বলে মনে হয় না।

এই ঈমানদার লোকটি ছিলেন হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী (রাহঃ)-এর অন্যতম অনুসারী বালাকোটের শহীদ দ্বীনি আন্দোলনের সিপাহ্সালার সাইয়েদ আহ্মদ ব্রেলভী শহীদ (রাহঃ)-এর খলীফা হযরত মুফতী ইলাহী বখ্শ (রাহঃ)-এর বংশের একজন। তাঁকে ইংরেজ বিচারক ডেকে পাঠালেন কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যে ইংরেজরা মুসলমানদের সর্বনাশ করেছে, আমি তাদের মুখ দর্শন করবো না বলে শপথ করেছি।

ইংরেজ বিচারক খবর পাঠালো, আমাদের মুখ দেখার প্রয়োজন নেই। আপনি এসে শুধু একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন। আপনার সিদ্ধান্তের ওপরে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতি নির্ভর করছে। আপনি অনুগ্রহ করে আসুন।

অবশেষে তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে ইংরেজ বিচারকের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারক তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, অমুক জায়গা সম্পর্কে মুসলমানরা দাবি করছে যে, সেটা তাদের মসজিদের স্থান আর হিন্দুরা দাবি করছে যে, সেটা তাদের মন্দিরের স্থান। আমি শুনেছি, উক্ত স্থানটির প্রকৃত মালিকানা কার, সে সম্পর্কে আপনি অবগত রয়েছেন। এখন আপনি সিদ্ধান্ত দিন, স্থানটি হিন্দুদের না মুসলমানদের।

হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনের দৃষ্টি সেই ঈমানদার ব্যক্তিটির প্রতি নিবদ্ধ। তিনি কি বলেন, তা জানার জন্য সবাই উদ্গ্রীব। তিনি পিন্ পতন নীরবতার মধ্যে ঘোষণা করলেন, প্রকৃতপক্ষে স্থানটি হিন্দুদের। এই স্থানের সাথে মুসলমানদের দূরতম সম্পর্কও নেই। স্থানটি হিন্দুরেই প্রাপ্য।

তাঁর কথার ওপরে নির্ভর করে বিচারক হিন্দুদের পক্ষে রায় দিয়ে দিলো। মুসলমানরা মনোক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গেলো আর হিন্দুদের মধ্যে আনন্দেরে বন্যা বয়ে গেলো। মামলায় মুসলমানরা পরাজিত হলো বটে, কিন্তু সেখানে ইসলামের নৈতিক বিজয় সূচিত হলো। ইসলামী চরিত্র হিন্দুদের মন-মস্তিষ্ক জয় করে নিলো। তাঁর সত্যবাদিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেদিনই বহু হিন্দু সেই ঈমানদার ব্যক্তির হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলো। সামান্য কয়েক হাত মাটি হারিয়ে ইসলাম অসংখ্য অমুসলিমের হৃদয়-মন এভাবেই জয় করেছিলো। ঈমান এভাবেই নিজের স্বার্থের মোকাবেলায় সত্যবাদিতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো।

একমাত্র ঈমানই মানুষকে সমৃদ্ধিশালী ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন দান করতে সক্ষম এবং ঈমানদারের প্রথম দায়িত্বও হলো, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ শোনামাত্র আনুগত্যের মস্তক নত করে দেবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ-وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ-اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ-

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না। তাদের মতো হোয়ো না, যারা বলে, 'আমরা শুনলাম।' কিন্তু আসলে তারা শোনে না। নিশ্চিতই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেসব বধির ও বোবা লোক যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। (সূরা আনফাল-২০-২২)

এই আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, তারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনে কিন্তু তা পালন করে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ শোনার পরেও যারা তা পালন করে না, নিজের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা 'নিকৃষ্টতম জন্তু' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ একটি কুকুরও তার মনিবের কথা শোনে, কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবিদার একশ্রেণীর মানুষ আপন মনিব আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসারে জীবন পরিচালিত করে না। এ কারণেই তারা নিকৃষ্টতম জন্তুর থেকেও নিম্নস্তরের।

সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হওয়া ঈমানের দাবি

মহান আল্লাহ তা'য়ালার স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিধান হলো, যে যেমন চরিত্রের তার সঙ্গী-সাথীও তেমনই জুটিয়ে দেন। যার মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা অসৎ, উদ্দেশ্য খারাপ, কামনা-বাসনা সবই ভ্রান্ত দিকেই পরিচালিত হয়, এ ধরনের ব্যক্তি কখনো ভালো ও উত্তম সঙ্গী-সাথী লাভ করতে পারে না। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক-প্রবণতা এবং আগ্রহ অনুসারেই তার সঙ্গী জোটে। ব্যক্তি যতোই দুষ্কর্মের নিকৃষ্টতার কালো গহ্বরে নিমজ্জিত হতে থাকে, ততোই সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর, জঘন্য থেকে জঘন্যতর মানুষ ও শয়তান তার বন্ধু, সহচর, পরামর্শদাতা, সহযোগী ও সঙ্গী-সাথী এবং কর্মসহযোগী জুটে যায়।

একশ্রেণীর লোকজন এ রকম মন্তব্য করে থাকে যে, 'লোকটি ভালো কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধব এবং সঙ্গী-সাথী খুবই খারাপ অথবা সে এতো ভালো লোক হয়ে খারাপ লোকদের সাথে মিশে কি করে?' প্রকৃতপক্ষে এসব কথা বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং প্রকৃত সত্যেরও বিপরীত। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, রুচি-পছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতি ইত্যাদির অধিকারী, তার বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীও অনুরূপই জুটে যায়।

একজন সৎ প্রবণতাসম্পন্ন নেককার লোকের সাহচর্যে অসৎ প্রবণতাসম্পন্ন খারাপ চিন্তা-চেতনার অধিকারী লোক এলেও বেশী সময় এই সৎ লোকটির সাথে সে থাকতে পারে না এবং সৎ লোকের সঙ্গ তার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। অনুরূপভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে কর্মরত একজন দুষ্কর্মশীল মানুষের সাথে হঠাৎ সৎ ও সম্ভ্রান্ত মানুষের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হলেও তা বেশী সময় টিকে পারে না। অসৎ লোকের সঙ্গ বা পরিবেশে সৎ মানুষের জীবন খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতোই মনে হবে। প্রাণ তার চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই পরিবেশ নিজেকে মুক্ত করার জন্য।

অসৎ মানুষ তার স্বভাব ও প্রকৃতিগতভাবেই অসৎ মানুষদেরকেই তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি অসৎ লোকরাই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন নোংরা, ময়লা-আবর্জনা মাছিকে প্রবল বেগে আকৃষ্ট করে থাকে, তেমনিভাবে অসৎ লোক-অসৎ লোকদেরই তীব্রভাবে আকৃষ্ট করে। ক্ষমতা লোভী কোন ব্যক্তি যখন হঠাৎ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিজের যাবতীয় অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করে, তখন সেই দলে গোটা দেশের অসৎ রাজনীতিতে অভ্যস্থ লোকগুলো যোগ দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা মূলকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশে যে দল, সংগঠন গড়া হয়, সেই দলে কোন অসৎ লোক যোগ দেয় না বা দিলেও তারা বেশী দিন সেই দলে অবস্থান করতে পারে না। তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীতমুখী স্রোতে সাঁতার দিতে ব্যর্থ হয়ে দল ত্যাগ করে। আবার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে দল গড়া হয়, সেই দলেও কোন সৎ লোক যোগ দিলেও তার চিন্তা-চেতনার বিপরীত স্রোতে সে নিজেকে ভাসাতে না পেরে বাধ্য হয়ে দল ত্যাগ করে।

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, ঈমানদার হয়-ঈমানদারের বন্ধু আর কাফির হয়-কাফিরের বন্ধু। ঈমানদারের হৃদয়ের বন্ধন থাকে আরেকজন ঈমানদারের হৃদয়ের সাথে। সে একাকী অবস্থান করলেও মানসিক দিক দিয়ে কখনো একাকিত্ব বোধ করে না এবং নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না। সে নিজেকে যেমন আল্লাহর গোলাম মনে করে, একমাত্র আল্লাহকেই তার একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মনে করে, অনুরূপ অন্যান্য ঈমানদারকেও নিজের একান্ত আপনজন মনে করে। কারণ তার আপন রব আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা তওবা-১১৯)

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যে ঈমানদার বাস করে সে দক্ষিণ গোলার্ধে বসবাসকারী ঈমানদারকে একান্ত আপনজন মনে করে শুধুমাত্র ঈমানের কারণে। শুধু আপনজনই মনে

করে না, তার জন্য দোয়াও করে। ঈমানদার ব্যক্তি শুধুমাত্র জীবিত ঈমানদারদের সাথেই সম্পর্ক রাখে না, এই পৃথিবী থেকে যেসব ঈমানদার অতীত হয়েছেন, তাঁদেরকেও সে একান্ত আপন মনে করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকারী সেসব ঈমানদারদের জন্য এভাবে দোয়া করতে শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

হে রব! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আমাদের সেসব ভাইদেরও, যারা ঈমান আনার ব্যাপারে আমাদের অগ্রগামী ছিল। আর আমাদের হৃদয়ে ঈমানদার লোকদের জন্য কোনো হিংসা ও শত্রুতার প্রবণতা রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি বড়ই অনুগ্রহশীল এবং করুণাময়। (সূরা হাশর-১০)

ঈমান আনার পরে ঈমানদার যখন ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করে, তখন সত্যনিষ্ঠ লোকগুলো তার ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, নবী-রাসূল ও প্রত্যেক যুগের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং শহীদ-সিদ্দীকগণ তার সহচরে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّلِحِيْنَ-وَحَسُنَ اُولئِكَ رَفِيْقًا-

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেসব লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নে'মাত দান করেছেন। তারা হচ্ছে নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। যারা এদের সঙ্গী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতই না উত্তম সাথী। (সূরা নিসা-৬৯)

মনে রাখতে হবে, উল্লেখিত আয়াতে যে চার শ্রেণীর লোকদের কথা আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন, তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষের সান্নিধ্য অর্জন করা এবং তাঁদের সহচর হওয়া সব থেকে সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। ঈমানদারের সাথে তাঁদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা দৈহিক বা আঙ্গিক সম্পর্ক নয়, সে সম্পর্ক হয় একান্তভাবেই আত্মিক সম্পর্ক ও চিন্তা-বিশ্বাস ও চেতনার একত্ব। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং বলেছেন, এসব সঙ্গী-সাথী কতই না উত্তম।

ঈমানদার আপন রব-এর সাথে কৃত ওয়াদা পালন করে

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার সময় সৃষ্টিতব্য সমগ্র আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালা একই সময় অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে উপস্থাপন করে তাদের কাছ থেকে নিজের রবুবিয়াত-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তাদের নিজেদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা নিবেদন করেছিল, 'নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব।'

মহান আল্লাহ সে সময় বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের ব্যাপারে আকাশ ও যমীন সব কিছুকেই এবং তোমাদের পিতা স্বয়ং আদমকে সাক্ষী বানাচ্ছি, যেন কিয়ামতের দিনে তোমরা বলতে না পারো যে, আমরা এ বিষয়ে জানতাম না। ভালোভাবে জেনে নাও, আমি ব্যতীত আর কেউ-ই দাসত্ব, গোলামী, ইবাদাত, উপাসনা ও বন্দেগী লাভের অধিকারী নয়। আমি ব্যতীত অন্য কোনো রব নেই। তোমরা আমার সাথে কাউকে অংশীদার বানিও না। আমি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ করবো, তাঁরা আমার সাথে কৃত তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আর তোমাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে কিতাবও অবতীর্ণ করবো।' তখন সমস্ত মানুষ বলেছিল, 'আমরা সাক্ষী হলাম–সাক্ষী থাকলাম। আপনি আমাদের রব, আপনিই আমাদের মাবুদ। আপনি ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই– নেই কোনো মাবুদ।'

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারে যে, সেই অনাদিকালের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ যদি বাস্তবিকই গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা মানুষের চেতনায় ও স্মৃতিপটে সংরক্ষিত নেই কেন? কেন মানুষ সেই আত্মার জগতের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করতে সক্ষম হয় না? যে প্রতিশ্রুতির কথা মানুষের স্মরণ থেকে মুছে গিয়েছে এবং যা সংরক্ষিত নেই, সেই প্রতিশ্রুতির কথা কেন কিয়ামতের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে?

এর জবাব হচ্ছে, সেই প্রতিশ্রুতির কথা মানুষের মনে যদি চির জাগরূক রাখা হতো এবং স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখা হতো, তাহলে পৃথিবীর এই পরীক্ষাগারে মানুষকে প্রেরণ করাই সম্পূর্ণ এক অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হতো। মানুষের স্মৃতিপটে সেই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকট না থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য এবং অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, সৃষ্টিগতভাবেই উচ্চতর কোন শক্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করার ভাবধারা মানুষের ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে। বিপদ-মুসিবতে বা যে কোন প্রয়োজনে মানুষ এমন এক উচ্চতর শক্তির কাছে কাকুতি-মিনতি জানাবে এবং নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে ভারমুক্ত হবে, এই উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। আত্মার

জগতের সেই প্রতিশ্রুতির কথা চেতনা ও স্মৃতির জগতে প্রকট রাখা না হলেও তা মানুষের অননুভবনীয়, অননুভূত, অননুমেয়, অনবগত, অনবচেতন মন ও স্বত্তায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। এই বিষয়টির অবস্থা মানুষের অন্যান্য অনবচেতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরূপ।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের অভ্যন্তরে এক প্রবল সম্ভাবনা শক্তি প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষ কালক্রমেই চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে সেই সুপ্ত শক্তিকে শাণিত হাতিয়ারে পরিণত করে তা প্রকাশ করেছে মাত্র। মানুষের অভ্যন্তরের এই শক্তিই যখন অনুকূল পরিবেশ লাভ করেছে, তখনই তাকে বিভিন্ন অনায়ত্ত্ব বিষয় আয়ত্ত্ব করার জন্য এবং অনাবিষ্কৃত বিষয়সমূহ আবিষ্কারের দিকে ধাবিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। অনুরূপভাবে মানুষের অভ্যন্তরে অননুভবনীয় ও অননুভূত স্মৃতিপটে আদিতে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তা মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, পৃথিবীর প্রতিটি এলাকায়, জনপদে, বংশধারার প্রতিটি স্তরেই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই একে কখনো কোনো অবস্থাতেই মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

এর বাস্তব প্রমাণ হলো, পৃথিবীর যেসব দেশে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, সেখানেই মানুষের স্বভাবজাত চেতনা, 'উচ্চতর শক্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করার অদম্য আগ্রহ' বিপুল শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। চরম দমন নীতি অবলম্বন করেও মানুষের চেতনার জগৎ থেকে সেই প্রতিশ্রুতির বিষয়টি মুছে দেয়া সম্ভব হয়নি।

উন্নত সভ্যতা থেকে দূরে–বহুদূরে অরণ্যে বসবাসরত মানব গোষ্ঠীর ভেতরেও এই চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃত সত্যের অনুপস্থিতির কারণে সেই চেতনা বিকৃত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র। যে পদ্ধতিতে আপন স্রষ্টার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, অজ্ঞতার কারণে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে না, পার্থক্য শুধু এখানেই।

এ কথাও স্মরণে রাখা একান্ত কর্তব্য যে, মানুষের ভেতরের এই চেতনার আত্মপ্রকাশ ও অভিব্যক্তি লাভ এবং বাস্তবরূপ পরিগ্রহের জন্য একান্তভাবেই এক বাহ্যিক আবেদনের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করে, তাদের মাধ্যমে কিতাব অবতীর্ণ করে মানুষের প্রতি সেই আবেদনের কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন, যে আবেদনের মুখাপেক্ষী ছিল তারা। নবী-রাসূল ও দ্বীনের দা'য়ীগণ এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী দল মানুষের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হওয়ার ও সত্যাবলম্বন করার আবেদন করেন, মানুষকে তার ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন। তারা কোনো নতুন জিনিসের সৃষ্টি করেন না, বরং মানব স্বভাবে পূর্ব থেকে নিহিত সুপ্ত ও অস্পষ্ট চেতনাকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলেন। এ কারণে পবিত্র কোরআনে নবী-রাসূলদেরকে 'মুযাক্কির অর্থাৎ স্মারক' এবং কোরআনকে 'যিকর অর্থাৎ স্মরণ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। ঈমানদারকে আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতের সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ-وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ-

আর তাদের কর্মনীতি এই যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদা পূরণ করে থাকে এবং তাকে মজবুত করে বেঁধে নেয়ার পর আর ছিন্ন করে না। তাদের আচরণ এই হয় যে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ককে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা সব বহাল রাখে, নিজেদের রব-কে ভয় করে আর তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত খারাপভাবে হিসাব গ্রহণ করা যেন না হয়, এই ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। (সূরা রা'দ-২০-২১)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই শাশ্বত প্রতিশ্রুতির কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির প্রারম্ভেই সমস্ত মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা একমাত্র আল্লাহকেই রব হিসাবে মানবে এবং তাঁরই দাসত্ব করবে, তাঁরই আইন-বিধান অনুসরণ করবে এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করবে। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই প্রতিশ্রুতির বিষয়টি প্রতিটি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁরই রবুবিয়াতের অধীনে সৃষ্টি করে লালিত-পালিত করতে থাকেন, তখন আল্লাহর সাথে কৃত সেই প্রতিশ্রুতি আরো দৃঢ়তা লাভ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য বসবাস উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দেয়া রিযিকে মানুষের লালিত-পালিত হওয়া, তাঁরই সৃষ্ট বস্তু, দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করা, তাঁরই দেয়া শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো, তাঁর দেয়া মন-মস্তিষ্ক ব্যবহার করে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মহান আল্লাহর সাথে এক দাসত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সম্পন্ন মানুষই একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে—এই চুক্তি কোনক্রমেই ছিন্ন করতে পারে না, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার অপূরণ রাখতে পারে না।

তবে কেউ অবচেতন মনে, অজ্ঞাতসারে কখনো কখনো ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারে বা কারো পদস্খলন ঘটতে পারে, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সেই ভুলকেই অবলম্বন করে অভ্রান্ত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোটা জীবনকালই কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ 'ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে পারে না। যারা থাকে তারাই মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঈমানদারদের আচরণ এটাই হয় যে, পৃথিবীতে আসার পূর্বে মহান আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিল, পৃথিবীতে এসে সেই ওয়াদা মাফিক জীবন পরিচালিত করে সেই ওয়াদাকে বাস্তবে পরিণত করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তা

অনুসরণ করে। হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ তার কাছ থেকে যেন কঠোরভাবে হিসাব গ্রহণ না করেন, এই ভয়ে ঈমানদার আতঙ্কিত থাকে এবং এই ভয়ই তাকে পৃথিবীতে সত্যনিষ্ঠ হতে'ও সত্য অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে।

আল্লাহর পথে ব্যয় করা ঈমানের দাবি

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল বা অস্বচ্ছল হোক না কেন, তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। এই ব্যয় করাকেই পবিত্র কোরআনে 'আল্লাহর পথে ব্যয়' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে সাধ্যানুসারে নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, সাহায্যপ্রার্থী ও অভাবী লোকদেরকে দান করতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবি। আল্লাহর বান্দাহ্দের মধ্যে কারো অর্থের প্রয়োজন হলে ঈমানদার সাধ্যানুসারে কোনো ধরনের স্বার্থ ব্যতীতই তাকে ঋণ দেবে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। এই ধরনের ঋণকেই আল্লাহ 'করযে হাসানা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً-

তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আল্লাহকে 'করযে হাসান' দিতে প্রস্তুত? তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দেবেন। (সূরা বাকারা-২৪৫)

করযে হাসানা-এর শাব্দিক অর্থ হলো, 'ভালো ঋণ' এবং এই শব্দের মাধ্যমে এমন ঋণকে বুঝানো হয়েছে, যা খালেসভাবে একমাত্র সওয়াবের আশায় এবং কোনো ধরনের স্বার্থ ব্যতীতই আল্লাহর কোনো বান্দাহ্কে ঋণ দেয়া। এভাবে আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণ হিসাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই ঘোষণা করেছেন এবং তিনি আসল ঋণই ফেরৎ দেবেন না, বরং এর কয়েকগুণ বেশী পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু শর্ত হলো সেই ঋণ হতে হবে 'করযে হাসানা'-বৈষয়িক কোনো ধরনের স্বার্থমুক্ত। ঋণ দানের পেছনে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই উদ্দেশ্য হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা এর বিনিময়ে আখিরাতে কয়েকগুণ বেশী দেবেন এবং সেই সাথে এই পৃথিবীতেও ঋণদাতার অর্থ-সম্পদে অধিক বরকত দান করবেন। এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অভাবীকে ঋণ দেয়া ঈমানের দাবি এবং এই দাবি অনুসারে ঈমানদার যখন কাজ করে, তখন ঈমানদারদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ-

আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতেই নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। (সূরা বাকারা-১৯৫)

আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ হলো, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়, সেই কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। উল্লেখিত আয়াতে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি আল্লাহর দেয়া বিধানকে সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই অধিকতর প্রিয় বলে মনে করো, তাহলে তোমাদের বৈষয়িক জীবনের পক্ষেও বিষয়টি ধ্বংসের কারণ হবে এবং কিয়ামতের ময়দানেও তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখী দেখতে পাবে।

আল্লাহর অপছন্দনীয় মতবাদ, মতাদর্শ ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুনিয়া পূজারি দলসমূহ অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। আর ঈমানদার যদি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় না করে, তাহলে ঈমানদার যেমন পৃথিবীতে ইসলাম বিরোধী লোকদের দ্বারা পরাজিত হবে, তাদের অধীনে লাঞ্ছনামূলক জীবন-যাপনে বাধ্য হবে, তেমনি আদালতে আখিরাতেও তাদেরকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহর পথে জিহাদ করার ব্যাপারে প্রথমে প্রাণদানের কথা বলা হয়নি, প্রথমেই ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে থাকে এ কথা প্রমাণিত সত্য। কোন বাড়িতে ডাকাত আগমন করলে প্রথম ধমকেই বাড়ির মালিক তার কষ্টার্জিত ধনরাশি ডাকাতের হাতে তুলে দেয় না। ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য দেহের শেষ শক্তি ব্যয় করে। অবশেষে ডাকাত দল বাড়ির মালিককে হত্যা করে তার কাছ থেকে সিন্দুক বা আলমারির চাবী হস্তগত করে। ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অতি প্রিয় জিনিস। একজন মানুষ শারীরিক শ্রম দিয়ে সহজেই অপরের উপকার করতে পারে, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দিয়ে উপকার করাটা বেশ কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে আরেকটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ বলতে শুধু নগদ অর্থ, ভূ-সম্পত্তি, পশু-সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায় না। মানুষের সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা, দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, কৌশল, বাগ্মিতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বুঝায়। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসবের ব্যবহার করতে হবে।

আর প্রাণ বলতেও শুধু রুহ্ বুঝায় না। পৃথিবীতে মানুষের আগমনকাল থেকে শুরু করে শেষ বিদায়ের দিন পর্যন্ত, এই গোটা সময়কালকেই মানুষের জীবন কাল বলা হয়। এই জীবন দিয়েই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ তথা দ্বীনি আন্দোলন করতে হবে। গোটা জীবনকেই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়াক্ফ করে দিতে হবে। ঈমানদারের জীবনের লক্ষ্যই হবে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে এ কাজে জীবনের প্রতিটি স্পন্দন ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা সাধনা করা।

আবেগ হঠাৎ আগুনের মতই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে গুলীর সামনে বুক টান করে দাঁড়ানো অসম্ভবের কিছু নয়। কিন্তু ধীর স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দান করা বড় কঠিন কাজ। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, যে কাজ যতটা কঠিন সে কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হলে তা থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায়। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কাজের বিনিময়ও দিবেন সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়ে এবং তার সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ-وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ-وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ-خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো, বায়তুল্লাহ শরীফের সেবা-যত্ন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করাকেই সেসব ব্যক্তির কাজের সমান বলে ধারণা করো, যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছে আল্লাহর, আখিরাতের প্রতি এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করে ? আল্লাহর কাছে এই দুই ধরনের লোকের সম্মান ও মর্যাদা কখনও এক নয়। আর আল্লাহ জালিমদেরকে কখনো পথ দেখান না। আল্লাহর কাছে তো কেবল তাদেরই বিরাট মর্যাদা রয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করেছে এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করেছে। আসলে এরাই সফলতা অর্জন করেছে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রহমত, তাঁর সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য চিরসুখের উপকরণসমূহ বিদ্যমান। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহর কাছে উত্তম কাজের বিনিময় দেয়ার জন্য অফুরন্ত নিয়ামত রয়েছে। (সূরা তাওবা-১৯-২২)

ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে সাধারণত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথম শ্রেণী হলো, তারা ইসলামী বিধানের আরামদায়ক বিধিগুলো অনুসরণ করে থাকে। এরা নামায আদায় করে, রোজা পালন করে থাকে, সম্ভব হলে হজ্জ আদায় করে, কোরআন তেলওয়াত করে, তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করে অর্থাৎ ইসলামের

সেই দিকগুলো এরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে থাকে, যেদিকগুলো অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের আর্থিক ক্ষতি হবার এবং দৈহিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। মুসলামানের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যাই সর্বাধিক।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা আল্লাহর দেয়া ও রাসুল প্রদর্শিত আরামদায়ক বিধানগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং সেই সাথে ঐ বিধানসমূহও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে পালন করে, যে বিধানসমূহ অনুসরণ করতে গেলে আর্থিক ক্ষতি, দৈহিক ক্ষতি এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দান করতে হয়। কারাবরণ করতে হয়, প্রহৃত হতে হয়, সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, মান-সম্মানের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, অপবাদের মুখোমুখি হতে হয়, প্রয়োজনে শাহাদাতবরণ করতে হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর মুসলমান সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, অসংখ্য নবী-রাসূল এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, এই দুই শ্রেণীর মুসলমান সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহর কাছে কোনক্রমেই সমমানের নয়। তাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদেরকে ইসলাম জালিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর জিহাদের রক্তঝরা ময়দানে জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে যাবতীয় নির্যাতন হাসি মুখে সহ্য করেছে, বাতিল সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার পরোয়া না করে সামনের দিকেই অগ্রসর হয়েছে, তাদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা অনন্ত সুখের স্থান জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছলতাদান করেছেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে তাদেরকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হতে হবে। উন্মুক্ত অবারিত হস্তে দান করতে হবে। অর্থ-সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে জিহাদের কর্মকান্ড যদি ব্যহত হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় সফলতা অর্জন করা যাবে না বরং আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে। তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন আর মদীনার মানুষ তাঁর সামনে নগদ অর্থ ও অলংকার দান করছিলেন। তাঁর সামনে অর্থ এবং অলংকার এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থ ও অলংকারের স্তুপের আড়াল হয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের যে কোন কাজের প্রতিযোগিতায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এগিয়ে থাকতেন। অনেক সাহাবা কেরামই সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এদের ভেতরে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন অন্যতম। তিনি তাবুকের যুদ্ধে তাঁর সমস্ত সম্পদ থেকে দুই শত উট আর দুই শত রৌপ্যমুদ্রা দান করেছিলেন। আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ১০০০ টি উট ৭০টি ঘোড়া ও ১০০০ হাজার

রৌপ্যমুদ্রা দান করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এবার বোধহয় তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সওয়াব অর্জনের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করতে পেরেছেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি পরিমাণ দান করেছেন এই যুদ্ধে। তাঁর দানের কথা তিনি বিনয়ের সাথে জানালেন। আল্লাহর রাসূল এবার জিজ্ঞাসা করলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। তিনি বিনয়ের সাথে জানালেন, ঘরে যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছি। রাসূল জানতে চাইলেন তাঁর ঘরে বর্তমানে আর কি অবশিষ্ট আছে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ঘরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পবিত্র নাম ব্যতীত আর কিছুই নেই। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবারও দানের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলেন। (তিরমিজী)

কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যেমন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব নয়-সংগঠন একান্ত প্রয়োজন, সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্রশিক্ষিত সুশৃঙ্খল জনশক্তির দ্বারা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তেমনি প্রয়োজন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠন বা দল পরিচালনার জন্য অর্থশক্তি। এই অর্থ অদৃশ্য বলয় থেকে আমদানী হবে না, নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকেই তা দান করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, অর্থ হলো আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনের প্রাণশক্তি। শিরা-উপশিরায় ধাবমান রক্ত যেমন মানব দেহকে সচল রাখে, তেমনি অর্থ সচল রাখে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনকে। অর্থই হলো সংগঠনের প্রাণশক্তি। এই অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব হলো আল্লাহর পথের সৈনিকদের।

যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয় করবে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সূরা তওবায় বলেছেন, তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই কল্যাণে আসবে না, বরং এসব সম্পদ জ্বালিয়ে তা দিয়ে তাদের কপালে কিয়ামতের ময়দানে সিল্ মারা হবে। অর্থ-সম্পদকে হিংস্র সরীসৃপের আকৃতি দান করা হবে আর সেই বিষাক্ত সরীসৃপ তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। সে দংশনের যন্ত্রণা অনন্তকাল ধরে তারা ভোগ করবে।

জিহাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সাতশত গুণ বেশী বিনিময় দান করেন। হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَه بِسَبْعِ مِاأَةِ ضِعْفٍ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সামান্য কিছু পরিমাণ ব্যয় করবে তার জন্য সাতশত গুণ বেশী সওয়াব লেখা হবে।' (তিরমিযী)

আল্লাহর এই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার সংগ্রামে যে অর্থ ব্যয় করা হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বিনিময়ে সাতশত গুণ অধিক সওয়াব দানকারীর আমল নামায় লিপিবদ্ধ করাবেন। মুসলিম গোষ্ঠীর ওপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, তারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান এই জমিনে বাস্তবায়ন করার সংগ্রাম করবে। তারা যদি তা না করে, তাহলে তারা কোন জালিম জাতির গোলামী করতে বাধ্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন-

هَانْتُمْ هؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ-فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ-وَمَنْ يَّبْخَلْ فَانَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ-وَاللهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ-وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ-ثُمَّ لاَيَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ-

শোন, তোমরা তো তারাই, যাদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, এরপরও তোমাদের অনেকেই কৃপণতা প্রদর্শন করছো। যারা কৃপণতা প্রদর্শন করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত আর তোমরাই অভাবী-অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য তারা তোমাদের মত হবে না। (সূরা মুহাম্মদ-৩৮)

অর্থাৎ তোমাদেরকে দান করার কথা বলা হচ্ছে তা আল্লাহর কোন কল্যাণের জন্য নয়, বরং দান করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আল্লাহ তোমাদের কোন সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়, তার সম্পদের ভান্ডার কখনও শূণ্য হয় না। তিনিই ধনী আর তোমরা সবাই ফকীর। তোমাদেরকে যে আদর্শ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ যদি তোমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করো, তাহলে তখন তোমরা ভিন্ন জাতির গোলামী করতে বাধ্য হবে। তখন তোমাদের ভাগ্যে অবমাননা আর লাঞ্ছনাই জুটবে। জিহাদ বা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করলে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ-يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ-كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ-وَمَااَدْرَاكَ مَاالْحُطَمَةُ-نَارُاللهِ الْمُوْقَدَةُ-الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الاَفْئِدَةِ-

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অর্থ-ব্যয়ে কৃপণতা প্রদর্শন করে যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে রাখে, সে ধারণা করে তার এই ধন-সম্পদ অনন্তকাল তার কাছে থাকবে।

কক্ষনো নয়। সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি অবগত আছো, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি ? তা হচ্ছে আল্লাহর আগুন। প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা হুমাঝা-২-৭)

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেও না এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো।' জিহাদের ক্ষেত্রে দান করার ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। কারণ কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

যারা অর্থ-সম্পদ দান না করে জমা করে রাখে তাদের সম্পর্কে কোরআনে হাকীমে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ-هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশে ছ্যাকা দেয়া হবে আর বলা হবে, এগুলোতো তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এর স্বাদ আজ গ্রহণ করো। (সূরা তাওবা-৩৫)

কী পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ দান করতে হবে–এ সম্পর্কে বলা যায় অর্থ-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং ভালো জানেন যে, তিনি কি পরিমাণ দান করতে সক্ষম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সক্ষমতা সম্পর্কে অধিক অবগত, সবার চোখকে ধোকা দিলেও আল্লাহর চোখকে তো ধোকা দেয়া যাবে না। এ কথা অনুভূতিতে জাগ্রত রেখেই দান করতে হবে। এক কথায় সাধ্যানুযায়ী অবশ্যই দান করতে হবে। সে দানের পরিমাণ যদি একটি খোরমা খেজুরের সমানও হয় তবুও তা দান করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী ঈমানদার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা দান করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তার উত্তম বিনিময় দিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْىٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ-

তোমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে যা কিছুই ব্যয় করো না কেন, তার যথাযথ বিনিময় তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের ওপরে সামান্যতম বে-ইনসাফ করা হবে না। (সূরা আনফাল-৬০)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মুখর কর্মসূচী বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় করার মানেই হলো একটি লাভজনক বিরাট ব্যবসায় পূঁজি বিনিয়োগ করা। এটা এমনই এক ব্যবসা যে, যেখানে সামান্যতম ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। আর এই বিনিয়োগে লাভের পরিমাণ যে কত, তার নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاَّةُ حَبَّةٍ-وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ-وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো-এমন একটি সজীব বীজ, যা থেকে সাতটি শীষ নির্গত হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা হয়। তবে আল্লাহ যাকে চান এরচেয়েও অধিক বৃদ্ধি করে দেন। কারণ আল্লাহ তো প্রাচুর্য দানকারী-সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা-২৬১)

যারা আল্লাহর পথে দান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহর নবী বলেছেন-

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّرَفَعَهُ اللّٰهُ-

দান-খয়রাতে সম্পদ হ্রাস পায় না বরং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا-لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

সেসব ব্যক্তি-যারা নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল-৪)

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে নিজের রহমতের বর্মে পরিবেষ্টন করে রাখবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ-اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ-سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ-

আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসুলের দু'আ লাভের মাধ্যম বলে মনে করে। জেনে রেখো, অবশ্যই তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল-করুণাময়। (সূরা তাওবা-৯৯)

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য অগণিত বস্তুর সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কোন আলোচনা সভার প্রয়োজন হয়। এই আলোচনা সভার স্থান দান করার মত ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি তা দান করবেন, মাইক দানের ক্ষমতা যার রয়েছে, তিনি তা দান করবেন, খাদ্য দানের ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি তা দান করবেন, মিছিল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মিছিলের উপকরণ দান করবেন, এ ধরনের অসংখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু দানের ক্ষেত্র রয়েছে। এসব যারা দান করবেন, তিরমিযী শরীফের হাদীসে আল্লাহর রাসূল এসব দানকে উত্তম দান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

عن ابى مسعود البدرى قال-جاء رجل بناقة مخطومة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم-افضل الصدقات ظل فسطاط فى سبيل الله ومنيحة خادم فى سبيل الله اوطروقة فحل فى سبيل الله-

বদর যুদ্ধের সৈনিক হযরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে লাগাম পরানো একটি উট নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমি এই উটটি আল্লাহর পথে দান করলাম। রাসুল বললেন, তোমার এই লাগাম পরানো উটনীর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে সাতশ' লাগাম পরানো উটনী দান করবেন। (মুসলিম)

সে সময়ে বর্তমান যুগের মত আধুনিক যান-বাহন থাকলে সাহাবায়ে কেরাম তাই অকাতরে দান করে দিতেন সন্দেহ নেই। সে যুগের সবচেয়ে উন্নত বাহন ছিল উট এবং সে উটের লাগামও অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে হতো। সাহাবাগণ লাগাম ক্রয় করে উটের মুখে পরিয়ে তা দান করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে যার যে বাহন রয়েছে, তাই দিয়ে

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কর্মসূচী সফল করবেন। এই কাজে যারা সহযোগিতা করবেন, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় অবশ্যই দিবেন।

আল্লাহর পথে দান করার অর্থ হলো সেই দানকে নিজের ও জাহান্নামের মাঝে আবরণ টেনে দেয়া। আল্লাহর রাসূল বলেছেন-

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ-

তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করো, যদিও তা খেজুরের একটি টুকরো দিয়েও হয়।' (বুখারী-মুসলিম)

যিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন তার জন্য ফেরেশতাগণ উত্তম বিনিময় দানের দোয়া করে থাকে, আর যিনি সক্ষম হবার পরও দান করেন না, তার ওপরে অভিশাপ বর্ষন করে থাকেন। আল্লাহর নবী বলেন-

مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ الاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا-اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا-وَيَقُوْلُ الاٰخَرُ-اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا-

মানুষের জীবনে প্রতিটি দিনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় ব্যয় করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। আরেকজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! যে ব্যক্তি দান করা থেকে বিরত থাকে তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বোখারী-মুসলিম)

ইবনে মাজাহ্ শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেন অনিবার্য কোন কারণে যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে জিহাদের কাজে অর্থ-সম্পদ প্রেরণ করে সে প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সাতশ' টাকা ব্যয়ের সওয়াব অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদসহ শারীরিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়, তার প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করার সওয়াব দান করা হবে। এ কথা বলে আল্লাহর নবী কোরআনের সেই আয়াত তেলওয়াত করলেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। (ইবনে মাজাহ্)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীতে যে ব্যক্তি প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও বৈধ কোন কারণে নিজে অংশ গ্রহণ করতে পারলো না কিন্তু যারা অংশ গ্রহণ করলো, তাদেরকে সে নানাভাবে সহযোগিতা করলো, জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার সহায়-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে দেখা-শোনা করলো, সে ব্যক্তিও সক্রিয়ভাবে জিহাদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার মতই সওয়াব অর্জন

করবে। আল্লাহর রাসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করলো অথবা জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করলো, তার জন্য ঠিক জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব লিখিত হবে। কিন্তু সে কারণে যে জিহাদে গিয়েছে তার সওয়াব থেকে সামান্যতম হ্রাস করা হবে না।' (মুসনাদে আহমাদ)

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ব্যয় করতে হবে গোপনে ও প্রকাশ্যে। কিয়ামতের দিন কৃপণ ব্যক্তিবর্গ আফসোস করে বলতে থাকবে, আরেকটি বার যদি পৃথিবীতে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহলে যতো ধন-সম্পদ ছিল, তা সবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতাম। সুতরাং মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নেয়ার পূর্বেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। নাম, যশ, খ্যাতি ও প্রশংসা লাভের আশায় যে দান করা হবে অথবা কোন অভাবী ব্যক্তিকে দান করে, কথায় কথায় তাকে দানের কথা স্মরণ করিয়ে খোঁটা দিলে সে দান আল্লাহ কবুল করবেন না। দান হতে হবে নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ-

হে রাসূল! আমার যেসব বান্দাহ্ ঈমান এনেছে, তাদেরকে বলো যে, তারা যেন নামায কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যা কিছুই দান করেছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে-সেই দিন আসার পূর্বেই, যেদিন কোনো বেচা-কেনা হবে না, হবে না বন্ধুত্ব রক্ষা করার মতো কোনো কাজ। (সূরা ইবরাহীম-৩১)

ঈমানদার লোকদের আচরণ কাফির লোকদের আচরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে হবে। কাফিররা হলো মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তারা মহান আল্লাহর নে'মাতসমূহ অস্বীকার করে থাকে। আল্লাহর নে'মাত ভোগ করে তারা আল্লাহর গোলামী করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর সাথে শিরক স্থাপন করে। আর ঈমানদার লোক হয় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং আল্লাহর শোকর আদায়ের বাস্তব পন্থা হলো নামায কায়েম করা এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা।

প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করা ঈমানের দাবি

ঈমানহীন ব্যক্তির মানস জগৎ হয় অন্ধকার এবং সেখানে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক রোগ এসে বাসা বাঁধে। মনস্তাত্বিক রোগের প্রথম প্রকাশই হলো, রোগী নিজেকে সব সময় নিঃসঙ্গ এবং একাকী মনে করে থাকে। কঠিন পীড়াদায়ক নিঃসঙ্গতাবোধ রোগীর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। মহান আল্লাহর প্রতি যাদের ঈমান নেই অথবা ঈমানের দাবি করা

হলেও তা একেবারেই দুর্বল, এই ধরনের লোকগুলোই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গতা ও বিষন্নতায় ভুগে থাকে। এর প্রধান কারণই হলো, এদের মনের জগতে এক অসীম শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। নিঃসঙ্গতার ও একাকীত্বের এই অবষন্নতা দূর করার লক্ষ্যেই এরা নানা ধরনের পার্টি, ক্লাব ও খেলায় মেতে ওঠে।

পরক্ষণেই নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের এসব উপকরণ এদের কাছে বিরক্তির উপাদানে পরিণত হয় এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশায় বুঁদ হয়ে অবষন্নতা দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা করে, অবাধ যৌনাচারে ডুবে যায় কিন্তু মানসিক শূন্যতা কোনো পথেই দূর হয় না। এরপর এরা যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার আশায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে না, সে মনে করে মহান আল্লাহ তার সাথে আছেন এবং আল্লাহই তার বন্ধু। কারণ মহান আল্লাহ তাকে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো। (সূরা আহ্যাব-৪১)

আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী করে স্মরণ করার অর্থ হলো, জীবনের সকল কাজকর্মে এবং যাবতীয় ব্যাপারেই ঈমানদার যেন মুখে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। স্বাভাবিকভাবে যে কোন ব্যাপারে মহান আল্লাহর নাম মুখে এসে যাওয়া মহান আল্লাহর এক অতি বড় নে'মাত। মানুষের মন-মানসিকতায় আল্লাহর চিন্তা পরিপূর্ণভাবে ও সর্বব্যাপী আসন পেয়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগৎ অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীর তলদেশেও আল্লাহ সম্পর্কিত চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোনো কথা বললে বা কোনো কাজ করলে বা কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার কণ্ঠ থেকে আপনা-আপনিই মহান আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়।

ঈমানদার কোনো কাজ যখন শুরু করবে তখনই মহান আল্লাহর নামে অর্থাৎ 'বিস্মিল্লাহ' বলে তা শুরু করবে। কাজটি শেষ করার তাওফিক যে আল্লাহ দিলেন, এ জন্য সে কাজ শেষ করেই সেই আল্লাহর প্রশংসা 'আল হাম্দু লিল্লাহ' বলবে। অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন সে কথা বলবে, তখনও সে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করেই কথা বলবে। বাড়ি থেকে যখন বের হবে এবং কোনো যান-বাহনে আরোহণ করবে, তখনও সে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। ঈমানদার যখন ঘুমাবে এবং যখন ঘুম ভাঙবে, তখনও তার মুখ থেকে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারিত হতে থাকবে।

ঈমানদারের মুখে বিস্মিল্লাহ, আল হাম্দুলিল্লাহ, ইনশা-আল্লাহ, মাশা-আল্লাহ ইত্যাদি শব্দ বার বার উচ্চারিত হতে থাকবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি কাজে যেসব দোয়া পাঠ করতেন, একজন ঈমানদারও অনুরূপভাবে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করবে। প্রতিটি ব্যাপারে ঈমানদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে

এবং প্রত্যেকটি নে'মাত লাভ করার সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। যে কোন বিপদ বা কোনো ধরনের অসুবিধা অনুভব করলেই সে মহান আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হবে। শঙ্কায়, সঙ্কটে, ভয়ে-ত্রাসে ঈমানদার একমাত্র আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হবে।

শয়তানের প্রতারণা অনুভব করলে এবং অবৈধ কোনো কাজের অনুপ্রেরণা অনুভূত হলে সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করে এসব ক্ষতি থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে এবং শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইবে। কখনো কোনো ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ঈমানদার যে কোনো অবস্থায়-পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্মেই মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং এই বিষয়টিই ঈমানের জন্য সঞ্জীবনী সুধার মতো, ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হয়।

নামাযের জন্য যেমন সময় নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক পদে আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। প্রত্যেক কথা ও কর্মে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে স্মরণকারী ব্যক্তির ও আল্লাহর সাথে প্রেমময় সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এই সম্পর্ক সৃষ্টি করা ঈমানের দাবি।

মানুষের মন যখন সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার কণ্ঠ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে, তখনই সেই মানুষের অন্যান্য দ্বীনি কাজে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন মহান আল্লাহকে ডাকে তখন সে ডাকের সাড়া তিনি অবশ্যই দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِذَاسَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ-أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَادَعَانِ-

হে নবী! আমার বান্দাহ্ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তাদের অতি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। (সূরা বাকারা-১৮৬)

সুতরাং ঈমানদার নিজেকে কখনো নিঃসঙ্গ মনে করে না। যখন সে একাকী অবস্থান করে, তখনও সে অনুভব করে মহান আল্লাহ তার সাথে রয়েছেন এবং তাঁকে ডাকলেই তিনি সে ডাক শুনেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেও ঈমানদার নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না। আল্লাহকে সিজ্‌দা দিয়ে, তাঁর কালামে পাক তিলাওয়াত করে এবং তাঁকে স্মরণ করেই ঈমানদারের সময় অতিবাহিত হয়, এ কারণে তাকে কোনো মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না।

ঈমানদারের হৃদয়-মনে এ চেতনা চির জাগ্রত রয়েছে যে, তার নিজের হাত রয়েছে মহান আল্লাহর হাতের মুষ্টিতে। তাঁরই দয়া-অনুগ্রহ সময়ের প্রতি মুহূর্তে তার ওপর বৃষ্টির অনুরূপ বর্ষিত হচ্ছে। সে একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়, সে মহান আল্লাহর দৃষ্টির সম্মুখে চিরবিরাজমান।

এমন এক চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে, যে চোখ কখনো ঘুমের ভারে ভারাক্রান্ত হয় না এবং নিদ্রাচ্ছন্ন হয় না। এমন এক কান তার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য সময়ের প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত রয়েছে, যে কান চিরসজাগ।

ঈমানদার একা নয়, আল্লাহ তা'য়ালা সব সময় তার সাথে রয়েছেন। সে যদি পানির অতল তলদেশেও অবস্থান করে এবং সেখানে কোনো বিপদে যদি সে আক্রান্ত হয়, সেখান থেকে ফরিয়াদ জানালেও তিনি শোনেন এবং যথাসময়ে সাহায্য প্রেরণ করেন। আকাশের ঐ শূন্যমার্গেও অবস্থান করে ঈমানদারের কণ্ঠ থেকে 'আল্লাহ' নামটি উচ্চারিত হয়, তখনও তিনি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনিই ঈমানদারের নিঃসঙ্গতার ভীতি বিহ্বলতা দূর করে দিয়ে থাকেন চিরসঙ্গী হয়ে। ঈমানদার কখনো নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না। কারণ তার আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন-

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ-فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ-اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সবই আল্লাহর। যেদিকেই তুমি মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহর সত্তা বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বিশাল সম্প্রসারণময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা-১১৫)

ঈমানদার ভীতগ্রস্ত হয় না, অসহায়ত্ব অনুভব করে না, বিষন্নতা আর নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হয় না। কারণ তার আপন রব আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলেছেন-

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ-وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

যা কিছু মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, যা কিছু তা থেকে বের হয় আর যা কিছু আকাশমন্ডল থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু তাতে উত্থিত হয়, তা সবই তাঁর জানা রয়েছে। তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম দেখছেন। (সূরা হাদীদ-৪)

মহান আল্লাহর সাহচর্য ও নিকটবর্তিতার চেতনা ঈমানদারকে মহান আল্লাহর সার্বক্ষণিক সংস্পর্শের বন্ধনে জড়িত রাখে। তার মন-মানসিকতা আল্লাহর নৈকট্যের আলোয় থাকে সমুদ্ভাসিত। সে যদি পুঞ্জীভূত সূচীভেদ্য অন্ধকারেও নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তবুও সে অনুভব করে মহান আল্লাহ তার সঙ্গী হিসাবে রয়েছেন। ঈমানদারের সাথে মহান আল্লাহর এই

ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি ঈমানদারের গোটা জীবনকেই প্রভাবিত করে। ঈমানহীন লোকগুলো যে মানসিক প্রশান্তি ও স্থৈর্য থেকে বঞ্চিত থাকে, ঈমানদার লোকগুলো তা লাভ করে সময়ের প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতিটি কাজেকর্মে।

ঈমানদার ব্যক্তি যখন নামাযে মহান আল্লাহ সামনে দন্ডায়মান হয়, তাঁর কাছে হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানায় এবং এর মাধ্যমেই সে লাভ করে হৃদয় জগতে এক অপূর্ব প্রশান্তি ও স্বস্তি–যা থেকে বঞ্চিত থাকে ঈমানহীন লোকগুলো। পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্তা থেকে মুক্ত হয়ে এবং মস্তিষ্ক থেকে যাবতীয় চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করে ঈমানদার যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন আত্মার উৎকর্ষ এমনভাবে বিকশিত হয় যে, তখন বান্দাহ্ আর আল্লাহর মাঝে কোনোই পর্দা থাকে না, থাকে না কোনো প্রাচীর বা প্রতিবন্ধক। সমস্ত ব্যবধান দূরীভূত হয়ে যায় এবং ঈমানদার নিজ সত্তা ও হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখবর্তী হয়ে যায়। এ সময়ে তার মন-মানসিকতায় এক অবর্ণনীয় ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহর সাথে এভাবে ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য লাভের কারণে ঈমানদারের হৃদয় জগতে এক অজেয় শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং সে গভীর প্রশান্তি অনুভব করে। এই নামাযের মাধ্যমেই ঈমানদারের যাবতীয় নিঃসঙ্গতা যেমন দূরিভূত হয়, তেমনি সে যে কোনো বিপদে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে এবং ধৈর্য ধারণ করার শক্তি অনুভব করে। ঈমানদার জীবন সংগ্রামে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি ও সাহায্য লাভ করে নামাযের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ–اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য লাভ করো ধৈর্য-স্থৈর্য ও নামায থেকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা-১৫৩)

নামাযের মাধ্যমে সর্বপ্রথমে অর্জিত হয় দৈহিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং নামাযই ভারাক্রান্ত মনের মহৌষধ, মনের ভার লাঘবের অন্যতম প্রধান বাহন। নামাযে আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং তিলাওয়াতে যে শিক্ষা রয়েছে, তা মানুষের নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দেয়। কঠিন দুঃখ ও বিপদের সময় ঈমানদার নামাযে দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে এবং মনের বোঝা হালকা হয়ে যায়। এই নামায মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অন্যতম প্রধান বাহন এবং নামায আদায়ের সাথে সাথে প্রতিটি কাজকর্মে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা ঈমানের অন্যতম দাবি।

আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দেয়া ঈমানের দাবি

ঈমানদার লোকদের কাছে পৃথিবীর ধন-সম্পদের কোনো মূল্য নেই। কারণ তাদের চেতনায় এ কথা জাগ্রত রয়েছে যে, পৃথিবীর এসব ধন-সম্পদ এমন কোনো মূল্যবান চিরস্থায়ী জিনিস নয় যার জন্য সে গর্ব বা অহঙ্কার অনুভব করতে পারে। সে যে ধন-সম্পদই লাভ করেছে বা অন্য কোনো মানুষই যে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তা অত্যন্ত স্বল্পতম সময়ের জন্যই অধিকারী হয়েছে। পৃথিবীর জীবনে সে সম্পদ কয়েক বছর ভোগ করলেও আখিরাতের সময়ের হিসাবে তা মাত্র এক থেকে দেড় মিনিটের অধিক হবে না।

এরপরেও পৃথিবীতে এই সম্পদ দস্যু-তস্কর কর্তৃক লুণ্ঠিত হতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে বা কোনো শক্তিমান কর্তৃক দখল হতে পারে। আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হতে পারে, ভূমিকম্পে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির অতল তলদেশে প্রোথিত হতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীর সম্পদ নিরাপদ নয়, একে প্রহরা দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করার পরও তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এসব সম্পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কাজেও আসে না। সম্পদের অধিকারী এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে পারে যে, কষ্টার্জিত সমুদয় সম্পদের বিনিময়েও সে রোগ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তার অধীনস্থ লোকগুলো তারই চোখের সামনে তৃপ্তির সাথে আহার করে, আর সে রোগের কারণে উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এক সময় এসব সম্পদ থেকে মৃত্যু তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। একেবারে শূন্য হাতে কম মূল্যের সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে মাটির অন্ধকার গহ্বরে আশ্রয় নিতে হয়। ব্যক্তি যতো সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, প্রকৃত ক্ষেত্রে সেই অঢেল সম্পদের একটি ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যক্তির ব্যবহারে আসে।

এই ধরনের সম্পদের অধিকারী হয়ে ঈমানদার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে কোনো ক্রমেই গর্বিত হতে পারে না। সে আখিরাতের জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজের ধন-সম্পদকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করে থাকে। আর আখিরাতের জীবনকে পৃথিবীর জীবনের তুলনায় যারা প্রাধান্য না দেয় তাদের পক্ষে যেমন ঈমানদার হওয়াও সম্ভব নয় তেমনি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাও সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন–

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ–

আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকদেরই, যারা পরকালের বিনিময়ে পৃথিবীর জীবন বিক্রি করে দেয়। (সূরা নিসা-৭৪)

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, পৃথিবী পূজারী কোনো মানুষের পক্ষে অর্থাৎ পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতি যারা আকৃষ্ট, অর্থ-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নাম-যশ, খ্যাতি-প্রশংসা অর্জনের লক্ষ্যে যারা দিবারাত্রি অহর্নিশি ছুটে বেড়ায়, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে নামায আদায় করার সময়ও জোটে না, এই ধরনের কোনো লোকের পক্ষে ঈমানের দাবি অনুসারে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো ধরনের চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মনিবেদন করা সম্ভব হয় না।

দ্বীনি আন্দোলন করা শুধুমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের জীবনের লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং যারা মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আর পৃথিবীর জীবনে নিজেদের যাবতীয় সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় সম্ভাবনা ও সকল প্রকার বৈষয়িক স্বার্থ এই আশায় ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে যে, তাদের রব তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর পৃথিবীতে না হলেও পরকালের জীবনে তাদের এই ত্যাগসমূহ অবশ্যই কল্যাণকর হবে। সুতরাং যেসব লোকের দৃষ্টিতে পৃথিবীর স্বার্থই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, আখিরাতের জীবনকে যারা পৃথিবীর জীবনের তুলনায় প্রাধান্য দেয়, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ তাদের জন্য নয়।

ঈমানদার জানে পৃথিবীর এই ধন-সম্পদ নশ্বর, চিরস্থায়ী কোনো জিনিস নয়। এ জন্য সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তার কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করে থাকে। কারণ সে জানে, পৃথিবীর এই সম্পদের তুলনায় আখিরাতে মহান আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দান করবেন, তা সর্বাধিক উত্তম এবং কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা যেমন উত্তম, তেমনি চিরস্থায়ী। তা সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রব-এর ওপর নির্ভর করে। (সূরা শূরা-৩৬)

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করা ঈমানের দাবি

সূরা আশ্ শূরার ৩৬ থেকে ৩৯ নম্বর আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে যে রূপ-সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ, সুখ-সমৃদ্ধি, শৌর্য-বীর্য ইত্যাদি দান করা হয়েছে, তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর-ধ্বংসশীল। আর আখিরাতে যা দান করা হবে, তা অধিকতর উত্তম এবং চিরস্থায়ী। এসব লাভ করবে ঐ সমস্ত লোকজন, যারা ঈমান এনেছে, আপন রব আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করেছে, নিজেদেরকে বড় ধরনের গোনাহ্ থেকে মুক্ত রেখেছে,

লজ্জাহীনতার কাজকর্ম থেকে দূরে অবস্থান করেছে, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করেছে, ক্ষমা করেছে, আপন রব-এর নির্দেশ অনুসরণ করেছে, যে ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন, তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে এবং জালিমদের জুলুম করার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী লোকগুলোই কিয়ামতের দিন সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে, ব্যক্তিকে ঈমানদার হতে হবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করতে হবে। ইসলাম মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করাকে ঈমানের অনিবার্য দাবি এবং আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য জরুরী বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে। তাওয়াক্কুলের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর প্রথম দাবি হচ্ছে, মহান আল্লাহর পথনির্দেশনার ওপর ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।

এই বিশ্বাস তার থাকতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে যে জ্ঞান, পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে যে রাজনৈতিক নীতিমালা, অর্থনৈতিক পথনির্দেশনা, নৈতিক চরিত্রের যে নীতিমালা, হালাল ও হারামের যে সীমারেখা এবং অন্যান্য যেসব নিয়ম-কানুন, নীতি-পদ্ধতি ও বিধি-বিধান দান করেছেন তাই একমাত্র সত্য ও অভ্রান্ত এবং এসব অনুসরণের মধ্যেই কেবলমাত্র মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে–এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাও তাওয়াক্কুলের মধ্যে গণ্য।

এরপর ঈমানদার নিজের শক্তি, যোগ্যতা, মেধা, বৈষয়িক উপায়-উপকরণ, মাধ্যম, ব্যবস্থাপনা বা অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হবে না, নির্ভরশীল হবে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপরে। এ কথা সে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করবে যে, পৃথিবী ও আখিরাতের প্রতিটি ব্যাপারে তার সাফল্য প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার তাওফিক ও সাহায্যের ওপরে এবং এর নামই তাওয়াক্কুল। আর সে মহান আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্যের উপযুক্ত শুধুমাত্র তখনই হতে পারে যখন সে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জনকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিজের জীবন পরিচালিত করে।

ঈমান আনার পরে ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর নির্দেশিত সৎপথ অবলম্বন করবে এবং শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি আদর্শ বা মানুষের বানানো আইন-কানুনের পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে কর্মতৎপর বান্দাহ্দেরকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার ওপর পরিপূর্ণভাবে আস্থা রাখতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ঐসব প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়ে ব্যক্তি সেসব লাভ, ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণ, স্বার্থ, নাম-যশ, খ্যাতি-প্রশংসা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মাথায় পদাঘাত করবে, যা সে শয়তান বা মানুষের বানানো আদর্শ, নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করলে সহজে লাভ করতে সক্ষম হতো। শুধু তাই নয়, ঈমান আনার কারণে ব্যক্তি যেসব ক্ষতি;

দুঃখ-কষ্ট, অপবাদ, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নিপীড়ন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সম্মুখীন হবে, তা সে হাসি মুখে বরদাশ্ত করবে এবং এর নামই হলো মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করা।

ঈমানের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক দেহের সাথে আত্মার সম্পর্কের অনুরূপ। আত্মা ব্যতীত দেহের যেমন কোনো মূল্য নেই এবং তা মানব সমাজে রাখার উপযোগী নয়, তেমনি তাওয়াক্কুল ব্যতীত ঈমান যেমন পূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা সে ব্যক্তি লাভ করতে সমর্থ হবে না।

ঈমানদার লোকগুলো পৃথিবীর অন্যান্য লোকদের অনুরূপ কার্যকারণের এই জগতে যাবতীয় কাজে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বটে, কিন্তু সেসবের ওপরে তারা নির্ভর করবে না–নির্ভর করবে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপরে। ঈমানদার এ কথা ভালোভাবেই জানে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া-মেহেরবানী সম্পৃক্ত না হলে তাদের কোনো চেষ্টা-তদবীর ঠিকভাবে শুরু হতে যেমন পারে না, তেমনিভাবে তা অভ্রান্ত পথে চলতেও পারে না এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যও অর্জিত হতে পারে না। কারণ সে জানে, তাঁর আপন রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ–

আর সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের ওপর নির্ভর করো। (সূরা শু'আরা-২১৭)

ঈমানদার পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিরও কোনো পরোয়া করে না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর ওপর নির্ভর করে কাজ করে যায়। মহান আল্লাহর পরাক্রমশালী হওয়াই ঈমানদারের জন্য এ কথার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, যার পেছনে তাঁর সমর্থন আছে তাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। আর তাঁর দয়াময় হওয়া এ নিশ্চিন্ততার জন্য যথেষ্ট যে, তাঁর জন্য যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে জীবন কোরবান করবে তার প্রচেষ্টাকে তিনি কখনো ব্যর্থ হতে দেবেন না। কারণ মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার অর্থই হলো এক মহাশক্তির ওপর তাওয়াক্কুল করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ–

কেউ যদি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তাহলে তিনি বড়ই শক্তিমান ও সকল বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানী। (সূরা আনফাল-৪৯)

এক মাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার ওপর নির্ভর করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। (সূরা তালাক-৩)

মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা অর্থাৎ তাঁর ওপরে নির্ভর করলে সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা আসে, বিপদ-মুসিবতে ভয়-ভীতি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং মনে অসীম সাহস ও বীরত্বের ভাবধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে, মহান আল্লাহ তাকে শয়তানের ফেতনা থেকে মুক্ত রাখেন।

লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানের দাবি

ঈমানদার কখনো লজ্জাহীন হয় না, লজ্জা তার নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ভূষণ। এই লজ্জা সে শুধু অন্য মানুষের ক্ষেত্রেই অনুভব করে না-স্বয়ং নিজের ক্ষেত্রেও যেমন অনুভব করে, তেমনি মহান আল্লাহকে দেখেও লজ্জানুভব করে। গোপনে ও প্রকাশ্যে ঈমানদার লজ্জাশীল হয় এবং লজ্জাহীনতা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَاتَقْرَبُوا الْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ-

নির্লজ্জতার বিষয় ও প্রসঙ্গের ধারে কাছেও যাবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক আর গোপনেই হোক। (সূরা আনআম-১৫১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা 'ফাওয়াহেশ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দ দ্বারা যে কোনো ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন লজ্জাজনক কাজ-কর্ম, কথা, আচার-আচরণ, ব্যবহার, অঙ্গি-ভঙ্গি ও ইশারা-ইঙ্গিতকে বুঝায়। যে কোনো ধরনের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কর্মকান্ড এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত অশ্লীলতা বলা হয় প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলঙ্গতা, সমকামিতা, নিষিদ্ধ আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি করা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা, ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা, গালাগালি করা, কটু বাক্য প্রয়োগ করা ইত্যাদি। এভাবে সর্বসমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার অন্তর্ভুক্ত।

যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা অপবাদ বা দোষারোপ করা, গোপন অপরাধ জনসমক্ষে প্রকাশ করা, অসৎ কাজের প্ররোচক ও যৌন উদ্দীপনামূলক গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, উপন্যাস, নগ্ন চিত্র, মেয়েদেরকে আকর্ষণীয় সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করে জনসমক্ষে নিয়ে আসা, নারী ও পুরুষের প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের দিয়ে নাচ-গান করা এবং তাদের দিয়ে দেহের অঙ্গি-ভঙ্গি প্রদর্শন করা ইত্যাদি। এ ধরনের যাবতীয় কাজই হলো 'ফাওয়াহেশ'-এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ-يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো। (সূরা নাহ্ল-৯০)

ঈমানদারের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পবিত্রতা ও সুস্থতা রক্ষার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পালনীয় নিয়ম হচ্ছে লজ্জার অনুভূতিকে জাগ্রত রাখা। ঈমানদারকে অবশ্যই লজ্জা-শরমের ভূষণে ভূষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ব্যক্তির যদি লজ্জানুভূতি থাকে তাহলে তার নৈতিক চরিত্রের দুর্গ চিরদিনই দুর্ভেদ্যই থাকতে পারে, শয়তানের পক্ষে সম্ভব হবে না তা ভেদ করে তার ঈমানের মধ্যে কলুষ ঢুকিয়ে দেয়া। ঈমানকে অটুট রাখার জন্যে লজ্জার অনুভূতি এক মহামূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ যথাযথভাবে জাগ্রত থাকলে শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ হয়। এ জন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ (بخارى، مسلم)

নিশ্চিতই এটা সত্য যে, লজ্জা ঈমানেরই বিষয়। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামী জীবন বিধানের দৃষ্টিতে লজ্জা-শরম এমন একটি বিশেষ গুণ, যা মানুষকে যাবতীয় গর্হিত ও মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড পরিহার করতে এবং তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلْحَيَاءُ لاَيَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ (بخارى، مسلم)

লজ্জা বিপুল কল্যাণই নিয়ে আসে, তা থেকে কোনো অকল্যাণের কোনো আশঙ্কা নেই। (বুখারী, মুসলিম)

মানুষের প্রত্যেক কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারে, রুচি-পছন্দে, ওঠা-বসায় তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে লজ্জা হলো একটি একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। এই গুণই হচ্ছে মানুষে ও পশুতে পার্থক্যের ভিত্তি। এই গুণ অনুপস্থিত থাকলে মানুষে আর পশুতে কোনো পার্থক্য থাকে না, কার্যত মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। পশুর অনুরূপ নির্লজ্জ হয়ে কাজ করতে শুরু করে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাহীনতার মারাত্মক পরিণতির দিকে ইশারা করে ঘোষণা করেছেন-

اِذْ لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ- (بخارى)

লজ্জাই যদি তোমার না থাকলো, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। (বুখারী)

ঈমানদারের জন্য লজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। এই গুণে ঈমানদারকে অবশ্যই গুণান্বিত হতে হবে। লজ্জা ঈমানকে পরিপূর্ণতা দান করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلْحَيَاءُ مِنَ الاِيْمَانِ وَالاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاُ مِنَ الْجَفَاءُ فِى النَّارِ-(ترمذى، مسند احمد)

লজ্জা নিতান্তই ঈমানের ব্যাপার। আর ঈমান জান্নাতে প্রবেশ করার চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা হচ্ছে জুলুম, আর জুলুমের কারণেই একজনকে জাহান্নামে যেতে হয়। (তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মদ)

লজ্জার অনুভূতি মানুষের ভেতরে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিগতভাবেই দিয়েছেন। একটি শিশু যখন তিন চার বছর বয়সে পদার্পণ করে, তখনই তার ভেতরে লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত হতে থাকে। একান্ত বাধ্য না হলে সে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত কারো সামনে নিজেকে অনাবৃত করে না এবং নানা বিষয়ে সে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। বর্তমানে সভ্যতার দাবিদার দেশসমূহ অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে নগ্ন চলচ্চিত্র, সাহিত্য-উপন্যাস, নাটক, চিত্র কলা, চারুকলা, পত্র-পত্রিকা, ফ্যাশন শো ইত্যাদির মাধ্যমে লজ্জার অনুভূতিকে মানুষের ভেতর থেকে এমনভাবে বিদায় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত পশুর মতোই স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বিপণী কেন্দ্রসমূহে, বিনোদন কেন্দ্রে, ভ্রমণস্থলে, যান-বাহনে, সী-বীচে প্রকাশ্যে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হচ্ছে এবং যৌন-আচরণ করছে।

দেশের নির্বাহী প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা অগণিত মানুষের সম্মুখে যৌন বিষয়ক আলোচনা এবং কামোদ্দীপক আচরণ করতে সামান্যতম লজ্জানুভব করে না। তাদের নৈতিক স্খলনের বিষয় পত্র-পত্রিকার ও প্রচার মাধ্যমের খোরাকে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু তারা বিন্দুপরিমান লজ্জিত হচ্ছে না। ক্রেতা যৌন সামগ্রী ক্রয় করতে এবং বিক্রেতাও তা বিক্রি করতে কোনো লজ্জানুভব করে না। লজ্জা নামক অনুভূতির অনুপস্থিতির কারণেই বিয়ের পূর্বেই নারী-পুরুষ একই সাথে বসবাস করছে, সন্তান জন্ম দিচ্ছে এবং রাষ্ট্রও নির্লজ্জভাবে সেসব সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে লজ্জাহীনতার কাজে উৎসাহ দান করছে।

লজ্জা নামক এই অনুভূতি না থাকার কারণেই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপরে জোরপূর্বক নিজেদের নীতি আদর্শ চাপিয়ে দিচ্ছে এবং সেসব রাষ্ট্রের নানা ধরনের সম্পদ লুণ্ঠনের কাজে নিজের বিবেকের কাছেও লজ্জানুভব করছে না। লজ্জাহীনতার কারণেই তারা নিজেদের স্বগোত্রীয়দেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও জুলুম-অত্যাচারের লাইসেন্স দিয়েছে, স্বগোত্রীয়দের যাবতীয় অপরাধমূলক কর্মকান্ড দেখেও না দেখার ভান করছে এবং নিজেরা অপরাধ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপরে দোষ চাপিয়ে নির্দোষ মানুষের প্রতি নির্মম দন্ড প্রয়োগ করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে মানুষের ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত, প্রত্যেকটি ক্ষেত্র থেকে লজ্জা নামক অনুভূতি বিতাড়িত করা হয়েছে।

এর বিষময় ফল যা হবার তাই হয়েছে। লজ্জার অনুভূতি না থাকার কারণেই একজন আরেক জনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে, শিক্ষাঙ্গনে নকল উৎসব চলছে, প্রচার মাধ্যমে অবলীলাক্রমে মিথ্যাচার চলছে, দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বিধাহীন চিত্তে অসত্য ভাষণ দিচ্ছে, অবৈধ স্বার্থ সংরক্ষণ ও উদ্ধারের জন্য দল পরিবর্তন করে ক্ষমতাসীন দলের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জন করছে, রাস্তা-পথে দিবালোকে প্রকাশ্যে নারীকে উত্যক্ত করা হচ্ছে, বৃহৎ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীর কাছে, বাসগৃহ নির্মাণকারী, জমি বা অন্য কোনো সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়কারী বা কোনো শিল্প-কারখানা স্থাপনকারীর কাছে এসে অর্থ দাবি করা হচ্ছে। অবাধে ঘুষ দেয়া-নেয়া হচ্ছে। এসব গর্হিত কর্ম যারা করছে, লজ্জা নামক অনুভূতি যদি তাদের মধ্যে সক্রিয় থাকতো, তাহলে তাদের পক্ষে কোনোক্রমেই এসব গর্হিত কর্ম করা সম্ভব হতো না। শয়তান এসব পথে ধাবিত করার জন্য অনুপ্রেরণা দিলেও লজ্জা এসে সামনে প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করতো।

ঈমান মানুষের ভেতরে লজ্জা সৃষ্টি করে তাকে যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। ঈমানদার স্বয়ং নিজের কাছে এভাবে লজ্জানুভব করবে যে, সে নিজ স্ত্রীর কাছেও একান্ত বাধ্য না হলে লজ্জাস্থান অনাবৃত করবে না। মহান আল্লাহর নির্দেশে সে যখন স্ত্রীর কাছে গমন করবে, সে সময়েও ঈমানদার নির্লজ্জ হবে না। গোছলখানায় যখন সে একাকী গোছল করে বা মলমূত্র ত্যাগের স্থানে যখন সে একাকী মলমূত্র ত্যাগ করে, তখনও সে লজ্জাহীনতার অনুরূপ কোনো আচরণে লিপ্ত হয় না। কারণ ঈমানদার জানে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ তাকে দেখছেন। এসব নির্জন স্থানে যদি সে অনাবৃত হয়ে পড়ে, তাহলে শয়তান তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে।

ঈমানদার এমন ধরনের পোষাকও ব্যবহার করে না, যে পোষাক হাস্যকর বা ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী এবং এমন পোষাক যা পরিধান করেও লজ্জাস্থানকে যথাযথভাবে অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা যায় না। দেহের সাথে লেপ্টে থাকে বা আঁট্সাট পোষাক-যা পরিধান করলে দেহের কান্তি এবং গাঁথুনি পরিদৃষ্ট হয়, এমন ধরনের পোষাক পরিধান করা লজ্জাহীনতার নামান্তর। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এমন পাতলা পোষাক পরিধান করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়, যা পরিধান করলে দেহের কান্তি বাইরে ফুটে বের হয় অথবা দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ অনাবৃতই রয়ে যায়।

ইসলামী জীবন বিধানে লজ্জাকে এত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, গর্ভধারিণী মাতা যে ঘরে অবস্থান করছেন, সেই ঘরে যুবক সন্তানকেও অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করার অধিকার দেয়া হয়নি। এমনকি নিজ স্ত্রীর ঘরেও স্বামী যখন প্রবেশ করবে, তখন স্ত্রীকে জানিয়ে প্রবেশ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কারণ স্ত্রী নিজ ঘরে এমন অবস্থায় রয়েছে, যে অবস্থায় সে নিজেকে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করা পছন্দ করে না। এভাবে মাতা-পিতার ঘরে উপযুক্ত সন্তানের, পরিণত বয়সের সন্তান-সন্ততির ঘরে মাতা-পিতাকে না জানিয়ে প্রবেশ করার

অধিকার দেয়া হয়নি। ইসলাম এভাবে লজ্জার অনুভূতি তার অনুসারীদের মধ্যে জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং ঈমানদার নিজে যেমন লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং সমাজ ও দেশেও এমন কোন কাজ বা প্রথার প্রচার ও প্রসার বন্ধ করার চেষ্টা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।

অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া ঈমানের দাবি

ঈমানদার কখনো রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না। বরং তারা কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারে বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের এবং স্থির মস্তিষ্কের। এদের স্বভাব প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। ঈমানদার মহান আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কারণে ক্রোধান্বিত হলেও সে ক্রোধকে তারা বিনয়ের আবরণে আড়াল করে। ক্রোধকে হজম করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখার ঈমানদারদের একটি মহৎ গুণ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই গুণের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন-

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ-وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

সেই পথে তীব্র গতিতে অগ্রসর হও, যা তোমাদের রব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যারা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, অস্বচ্ছল অবস্থায়ই হোক বা স্বচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে দমন করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। (সূরা ইমরাণ-১৩৩-১৩৪)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বিনয়, নম্রতা ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার গুণাবলী সর্বাধিক পরিমাণে ছিল বলেই তাঁর প্রতি প্রাণের দুশমনও অতি সহজে আকৃষ্ট হতো এবং একটি সফল বিপ্লব সাধিত করে বর্বর একটি জাতিকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর এই অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ-وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ-

হে নবী! এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র-স্বভাবের লোক হয়েছো। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তাহলে এরা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো। (সূরা ইমরাণ-১৫৯)

আল্লাহর যমীনে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেছে, তাদেরকে অবশ্যই বিনয়ী এবং ক্ষমাশীল হতে হবে। তারা যদি কঠোর আচরণে অভ্যস্থ হয়, তাহলে দ্বীনি আন্দোলন থেকে লোকজন দূরে সরে যাবে। মানুষের প্রতি হতে হবে বিনয়ী এবং মুখে হাসি টেনে সবার সাথে কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কোনো কারণে কারো প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হলেও সে ক্রোধ থেকে মহান আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে এবং তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদারের ক্রোধ ও হিংসার পরিধি হয় খুবই সঙ্কীর্ণ। তার ঘৃণা, ক্রোধ ও বিদ্বেষ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ ঈমানদার কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করলে, ক্রোধান্বিত হলে তা হবে মহান আল্লাহর জন্য। আবার কাউকে আপন করে নিলে বা কাউকে ভালোবাসলেও তা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য।

এ কারণেই ঈমানদার কোনো বৈষয়িক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কখনো ক্রোধান্বিত হবে না এবং ক্রোধকে প্রয়োগও করবে না। কোনো দলের প্রতি, বংশ, গোত্রের প্রতি, কোনো দেশ ও জাতির প্রতিও তার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠবে না এবং হিংসা বা ঈর্ষার বশবর্তী হয়েও সে ক্রোধ প্রকাশ করবে না। হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈমানদারের ক্রোধ কোনোভাবেই ব্যবহৃত হবে না। এসব কিছু সে ব্যবহার করবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ-

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যই হিংসা করে বা ঘৃণা ও শত্রুতা করে, আল্লাহর জন্যই কাউকে দেয় ও আল্লাহর জন্যই দেয়া বন্ধ করে, তার ঈমান পূর্ণত্ব লাভ করেছে মনে করতে হবে। (আবু দাউদ)

ঈমানদারের ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও ঘৃণা-আক্রোশ সীমাবদ্ধ হয় শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিরোধী বাতিলপন্থী, অপরাধী, পাপী, আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী-সীমালংঘনকারীদের প্রতি। কিন্তু এরপরেও এসব ক্ষেত্রে ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাথে দয়া, মায়া-মমতা, সহানুভূতি, ক্ষমা ও সহমর্মিতার সংমিশ্রণ থাকতে হবে। ঐসব লোকদের কার্যকলাপ সে ঘৃণা করবে বটে, সেই সাথে ঈমানদার সহানুভূতি ও মমতা সিক্ত কণ্ঠে লোকগুলোর কল্যাণের ও হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকবে। তাদের ভাগ্যে হেদায়াত নসীব হয়নি বলে সে অন্তরে ব্যথা অনুভব করবে। ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনার অধিকারী লোকগুলোর জন্য মমতা সিক্ত কণ্ঠে এভাবে দোয়া করতেন-হে আমার আল্লাহ! আমার জনগণকে সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শন করো-নির্ভুল পথে পরিচালিত করো। কারণ তারা হেদায়াতের পথ জানে না।

করুণার মূর্ত প্রতীক রাহ্মাতুল্লিল আলামীন ইসলাম বিদ্বেষী লোকগুলোর হেদায়াতের জন্য হৃদয়ে এতটা ব্যথা, মায়া-মমতা পোষণ করতেন, তিনি তাদের জন্য এতই পেরেশান থাকতেন যে, তাদের হেদায়াতের চিন্তায় তিনি যেন অসুস্থ হয়ে না পড়েন, এ মহান আল্লাহ তাঁকে অধিক পেরেশান হতে নিষেধ করেছেন-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

এ লোকেরা ঈমান আনছে না বলে তুমি যেন দুঃখে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করে দিতে বসেছো। (সূরা শুআরা-৩)

জাতি পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত, তারা অতিদ্রুত জাহান্নামের অগ্নি ভর্তি গর্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল অনুভব করছেন, লোকগুলো নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দুঃখভার লাঘব করার জন্য তাঁকে জানালেন-

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا-

হে রাসূল! যদি এরা (কোরআনের) শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে। (সূরা কাহ্ফ-৬)

বাতিলপন্থী লোকগুলোর জন্য আল্লাহর রাসূল কতটা অস্থির থাকতেন, তা তিনি নিজেই এভাবে সাহাবাদের কাছে প্রকাশ করেছেন--আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির অনুরূপ যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতঙ্গ পাল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো পুড়ে মরার জন্য। সে এদেরকে কোনোক্রমে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু এই পতঙ্গ পাল তার কোনো প্রচেষ্টাকেই সফল হতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছো। (বুখারী, মুসলিম)

বাতিল পথ ও মতের লোকগুলো সত্য-সঠিক পথে আগমন করলে তারা কল্যাণ লাভ করতো, কিন্তু তারা মহাসত্যের প্রতি কর্ণপাতই করছে না, বরং নিশ্চিত ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই অবস্থায় আল্লাহর রাসূল এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন-

فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ-

হে নবী! তুমি ওদের জন্য দুঃখে ও শোকে প্রাণপাত করো না। (সূরা ফাতির-৮)

সুতরাং ঈমানদার ইসলামের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেও যে সত্যের সন্ধান পায়নি

বা সত্য গ্রহণ না করে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এ কারণে ঈমানদার তার প্রতি অন্তরে মায়া-মমতা ও সহানুভূতি পোষণ করবে। ব্যক্তিগত কারণে ঈমানদার কারো প্রতি ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করবে না। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন-'আল্লাহর রাসূল ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন হুরমত বা মর্যাদার অবমাননা করা হলে তিনি শাস্তি বিধান করতেন।'

ঈমানদারও ব্যক্তিগত আক্রোশে কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না এবং ক্ষমা প্রদর্শন করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ-

এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করো। (সূরা শূরা-৩৭)

মক্কার লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের প্রতি কত নির্মম এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনই না করেছে। কিন্তু মাত্র আট বছর পরে তিনি যখন বিজয়ীর বেশে মক্কার প্রবেশ করলেন, প্রাণের দুশমনদেরকে তিনি ক্ষমাই উপহার দিয়েছেন। ওমায়ের ইবনে ওয়াহাব ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রাণের দুশমন। তার বেশ কয়েকজন আত্মীয় বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য সে ছিল উন্মাদ। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া অর্থের বিনিময়ে লোকটিকে মদীনায় প্রেরণ করেছিল, যেন সে আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে। তরবারীতে প্রাণ হরণকারী বিষ মাখিয়ে সে মদীনায় উপস্থিত হলো। তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের সতর্ক দৃষ্টিকে লোকটি এড়িয়ে যেতে পারলো না। গ্রেফতার হয়ে লোকটি রাসূলের কাছে আসতে বাধ্য হলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটির প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করার অনুমতি কামনা করলেন।

আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিলেন না, বরং সহানুভূতির সাথে লোকটির সাথে কথা বলতে থাকলেন। কথা প্রসঙ্গে লোকটির গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকটি এই অপ্রত্যাশিত উদারতা, ক্ষমা আর নমনীয়তা দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূলের পবিত্র কদম মোবারকে লোকটি আছড়ে পড়ে ইসলাম কবুল করে ফিরে এলো মক্কায়। মক্কার ঘরে ঘরে সে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলো।

প্রাণের দুশমনরা আল্লাহর রাসূলের প্রতি আঘাত করেছে, আঘাতে আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ করা হলো। পবিত্র চেহারা রক্তে লাল হয়ে উঠলো। আঘাতকারীদের তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এভাবে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি ওদের ওপরে আযাব নাযিল কোরো না। ওরা বুঝে না, ওদেরকে হেদায়াত দান করো।

পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা ঈমানের দাবি

পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা ইসলামী জীবন ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই বিষয়টিকে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলী হিসাবে আল্লাহর কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। পরামর্শ ব্যতীত সামষ্টিক কার্য পরিচালনা করা স্বৈরাচারী নীতির পরিচয়, লজ্জাহীনতার নিকৃষ্ট স্তর এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। কিয়ামতের ময়দানে যারা সফলতা অর্জন করবে, তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

যারা তাদের রব-এর নির্দেশ অনুসরণ করে, নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করে এবং আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে। (সূরা শূরা-৩৮)

ঈমানদার ইসলামী বিধান অনুসরণ করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধভাবে জীবন পরিচালিত করে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালায়। ঈমানদার কোনো অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন থাকে না, তারা আল্লাহভীরু নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করে। কখন কোন্ পরিস্থিতিতে কি অবস্থায় ঈমানদারদেরকে কি ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে, এ ব্যাপারে তারা পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং এটাই ঈমানের দাবি। যে বিষয়টির সাথে দুইজন লোক বা অধিক সংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোনো একক ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত বা মতামতের ভিত্তিতে কোনো কাজ পরিচালনা করা যাবে না।

এসব ক্ষেত্রে অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করা ঈমানদারের পরিচয় এবং পরামর্শ গ্রহণ না করা সুস্পষ্ট জুলুম ও ইনসাফের বিপরীত কাজ। ইসলাম যৌথ ব্যাপারে কোনো একক ব্যক্তিকে যা ইচ্ছা তা করার অধিকার দেয় না। যে বিষয়ে অধিক সংখ্যক লোক জড়িত থাকবে, তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে অথবা সকলের আস্থাভাজন একটি প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করে তার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করা ঈমানের দাবি। মনে রাখতে হবে, ঈমানদার কখনো স্বার্থপর হয় না। এ কারণে সামষ্টিক স্বার্থ যেখানে জড়িত রয়েছে, সেখানে সে কখনো স্বেচ্ছাচারী হবে না। নিজেকে মহাজ্ঞানী মনে করে অন্যদেরকে উপেক্ষা করে কোনো একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঈমানদারের পক্ষে সম্ভব নয়।

যেসব বিষয় ও ক্ষেত্রে একের অধিক লোকের স্বার্থ জড়িত রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটি গুরুতর দায়িত্ব। ঈমানদারের ভেতরে এই অনুভূতি জাগ্রত রয়েছে যে, তার প্রতিটি কাজ, কথা ও দায়িত্বের ব্যাপারে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইনসাফের বিপরীত সামান্যতম কোনো কাজ তার দ্বারা সংঘটিত

হলে আল্লাহর দরবারে সে গ্রেফতার হবে। এই ভয়ে ঈমানদার কখনো সামষ্টিক স্বার্থ জড়িত কোনো কাজের গুরুদায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেয়ার দুঃসাহস প্রদর্শন করবে না। স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করে এই ধরনের দুঃসাহস কেবল তারাই অবলম্বন করতে পারে, যাদের হৃদয় পরকালের ভীতি শূন্য এবং নিজেদের কাজের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ এই ধরনের কাজ কেবলমাত্র ঈমানের নে'মাত থেকে বঞ্চিত লোকগুলোর দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

আল্লাহ ভীরু ও আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি যাদের জাগ্রত রয়েছে, তারা সামষ্টিক কোনো কাজের ব্যাপারে সকলের পরামর্শ গ্রহণ করবে বা লোকদের আস্থাভাজন প্রতিনিধি পরিষদের পরামর্শ ভিত্তিক কার্য পরিচালনা করবে। পরামর্শ দেয়ার অধিকারী ব্যক্তি বা প্রতিনিধি পরিষদের সকল সদস্যের প্রতি ঈমানদার সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কাউকে সে ছোট মনে করবে না বা চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে কারো প্রতি সে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না। সকলের অংশগ্রহণে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, সেটা যদি অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটি মুক্ত না-ও হয়, তাহলে কোনো একক ব্যক্তি যেমন এর জন্য দায়ী হবে না তেমনি আল্লাহর আদালতেও ক্ষমা লাভের পথ তার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সামষ্টিক বিষয়ে ইসলাম এককভাবে কোনো ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না দিয়ে পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ ফরজ করে দিয়ে মানব মন্ডলীর প্রতি যে ইনসাফমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা পৃথিবীর ভিন্ন কোনো আদর্শে পাওয়া যাবে না। ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছে, পরামর্শ তার অনিবার্য দাবি এবং এই দাবি এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় জুলুম, লজ্জাহীনতা এবং চরিত্রহীনতার কাজ। আল্লাহর বিধান কখনো এই ধরনের কোনো কাজের অনুমতি দেয়নি। আল্লাহর বিধান সামষ্টিক কাজে সমাজ ও দেশের ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর প্রত্যেক ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি অবলম্বন করার তাগিদ দিয়েছে।

বিষয়টি যদি পারিবারিক ব্যাপার হয়, তাহলে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং সন্তান-সন্ততি বড় হলে তাদের সাথেও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরে যে পেরেশানী অনুভব করেছিলেন, তিনি ঘরে ফিরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে হৃদয়ের ভার লাঘব করেছিলেন। হযরত খাদিজা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথে আগত ১৪০০ সাহাবীদের পক্ষে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা সম্ভব হলো না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্ধির কিছু অবমাননামূলক শর্ত রাসূল মেনে নিয়েছিলেন, এটাই ছিল সাহাবীদের মনোকষ্টের কারণ।

বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে কোরবানী করা হবে, এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কোরবানীর পশু সাথে করে এনেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি স্থাপন করার পরে হুদায়বিয়া নামক স্থানেই সাহাবীদেরকে কোরবানী করার আদেশ দেন। কিন্তু সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশ পালনে তৎপর না হওয়ার কারণে তিনি বিস্মিত ও মর্মাহত হন। এ অবস্থায়

তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার তাঁবুতে প্রবেশ করে নিজের অন্তরের ব্যথা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেন। রাসূলের স্ত্রী সমস্ত ঘটনা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং রাসূলকে পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তার সূচনা আপনি নিজেই করুন। দেখবেন, আপনাকে সেই কাজ করতে দেখে আপনার সাথীগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে শুরু লেগে যাবেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে সাহাবীদের মনোকষ্টের বিষয়টি যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার পরামর্শ আগুনে পানি দেয়ার মতো অচিন্ত্যপূর্ব কাজ করেছিল। সুতরাং কোনো বংশগত বা গোষ্ঠীগত ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সমস্ত বুদ্ধিমান ও পরামর্শ দেয়ার মতো বয়সের উপযোগী লোকদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। যদি বিষয়টি বিশাল এলাকার জনপদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এমন একটি প্রতিনিধি পরিষদ পালন করবে, যে পরিষদে সর্বসম্মত পন্থানুসারে সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থাভাজন প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবে।

গোটা দেশ ও জাতির ব্যাপার হলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জনগণের ইচ্ছানুসারে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে এবং সেই প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুসারে দেশ ও জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। গোটা জাতি নেতাকে যতক্ষণ নির্ভরযোগ্য মনে করবে বা তার নেতৃত্ব অনুসরণ করবে, ততক্ষণ তিনি নেতা থাকবেন। জাতি তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করলে তিনি নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি ছল-চাতুরি, ষড়যন্ত্র, কৌশল, পেশী শক্তি প্রয়োগ করে, অর্থের বিনিময়ে বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নেতা হওয়ার চেষ্টা করবে না এবং এসব পন্থা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সামরিক ছাউনি থেকে বের হয়ে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে তারপর 'হ্যাঁ-না' ভোটের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে জাতির নেতৃত্বের পদ দখল করার অধিকার ইসলাম দেয়নি।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণের জন্য এমন ধরনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, যে পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পছন্দের লোকগুলোই নির্বাচিত হয়ে এসে তার মর্জি মোতাবেক পরামর্শ দান করবে, এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্পূর্ণ হারাম এবং ঈমানদার নিজেকে কোনো হারাম কাজে জড়িত করতে পারে না। ঈমানদারগণ অবশ্যই পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করবে কিন্তু সেই পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রেও তারা স্বাধীন নয়। অর্থাৎ নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে তারা পরামর্শ দেবে না, তাদের পরামর্শ হতে হবে অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত বা ইসলামী জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, এমন কোনো পরামর্শ তারা দিতে পারবে না এবং সে ধরনের কোনো পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর দেয়া যাবতীয় বিধি-বিধানের প্রতি ঈমান এনেছে, সেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের আলোকেই যে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ দেবে।

জালিমের গতিরোধ করা ঈমানের দাবি

ঈমানদার নিজে যেমন কারো প্রতি জুলুম করবে না, তেমনি কাউকে জুলুম করতেও দেবে না। একজন অত্যাচার করবে আর ঈমানদার অত্যাচারীর পাশবিক তান্ডব লীলা নীরবে দর্শকের মতোই অবলোকন করবে, এই অধিকার ইসলাম কোনো ঈমানদারকে দেয়নি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ-

এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবেলা করে। (সূরা শূরা-৩৯)

ঈমানদার আচার-আচরণে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, ওঠা-বসায় তথা সার্বিক দিক দিয়ে নম্র ও ভদ্র হবে। কিন্তু তার এই নম্রতা ও ভদ্রতাকে কোনোভাবেই দুর্বলতা বলে ধারণা করা মারাত্মক ভুল। ঈমানদারের নম্রতা ও ভদ্রতার সুযোগে তার প্রতি অবিচার এবং জুলুম করা হবে, আর সে তা নীরবে সহ্য করবে, এটা ঈমানের পরিচয় বহন করে না। ঈমানদার জালিম ও নিষ্ঠুরদের জন্য সহজ শিকার হবে না। তাদের কোমল স্বভাব এবং ক্ষমাশীলতা দুর্বলতার কারণে নয়। ইসলাম ঈমানদারদেরকে বৌদ্ধ বা খৃষ্টান পাদ্রীদের মতো অথর্ব হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়নি বরং জালিমের গতিরোধ করার শিক্ষা দিয়েছে। ঈমানদারদের নম্রতা ও ভদ্রতার দাবি হচ্ছে, তারা যখন বিজয়ী হবে তখন বিজিতের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবে। সক্ষম হলে প্রতিশোধ না করে ক্ষমা করে দেবে এবং অধীনস্থ ও দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কোনো ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হলে তা উপেক্ষা করবে।

কিন্তু কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি যদি শক্তির অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে ঈমানদারের প্রতি বাড়াবাড়ি করে তবে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে উচিত শিক্ষা দেবে। ঈমানদার কক্ষনো জালিমের কাছে পরাজিত হবে না এবং কোনো অহঙ্কারীর সামনে মাথানত করবে না। ইয়ারমুকে যুদ্ধের ময়দানে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রধান সেনাপতি মাহানের অধীনে কয়েক লক্ষ সৈন্য সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে মুসলিম শিবিরে সংবাদ প্রেরণ করা হলো, সেনাপতি মাহান মুসলিম দুতের সাথে কথা বলতে আগ্রহী। প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নির্দেশে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিরুদ্বিগ্নে কয়েক লক্ষ রোমক সৈন্যের ভেতর দিয়ে রোম সেনাপতি মাহানের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন।

রোম সেনাপতি মাহান স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে তার দরবার সজ্জিত করেছিল। হযরত খালিদ জৌলুশপূর্ণ দরবার দেখে অনুধাবন করলেন, নিজেদের শান-শওকত প্রদর্শন করে এই লোকটি মুসলমানদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে চায়। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বসার আসনগুলো সরিয়ে রেখে সাথীদের নিয়ে মেঝেয় আসন গ্রহণ করলেন। রোম সেনাপতি মাহান যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত

খালিদকে নানা ধরনের লোভ-লালসা দেখাতে থাকলো। তিনি সমস্ত প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'হয় জিজিয়া দিতে হবে নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

রোম সেনাপতি মাহান অহঙ্কার প্রদর্শন করে বললো, 'আমার প্রস্তাবে যখন তোমরা রাজি না, তাহলে তোমাদের সাথে আমাদের তরবারীই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে।'

হযরত খালিদও অহঙ্কারীর চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'যুদ্ধের আকাংখা তোমাদের থেকে আমাদেরই বেশী। কারণ আমরা নিহত হলে হবো শহীদ আর জীবিত থাকলে হবো গাজী। আমরা আল্লাহর রহমতে অবশ্যই তোমাদেরকে পরাজিত করবো এবং বন্দী করে আমাদের খলীফার দরবারে হাজির করবো।'

হযরত খালিদের কথাগুলো যেন রোম সেনাপতি মাহানের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। লোকটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললো, 'তোমরা তাকিয়ে দেখো, এখনই তোমাদের পাঁচজনকে আমি হত্যার আদেশ দিচ্ছি।'

হযরত খালিদ সিংহ বিক্রমে গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? অথচ শহিদী মৃত্যুকে আমরা খুঁজে বেড়াই। ঈমানদারের জীবন মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়। কিন্তু তুমিও শুনে রাখো, আমাদের কোনো একজন লোকের শরীরেও যদি তুমি হাত উঠাও, তাহলে তোমাকেসহ তোমার প্রতিটি সৈন্যকে আমরা হত্যা করবো। সংখ্যাধিক্যের পরোয়া আমরা করি না।'

হযরত খালিদের নির্ভীক কণ্ঠ শুনে রোম সেনাপতি কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। বিস্ময় ঘোর কেটে যেতেই সে তরবারী বের করার প্রস্তুতি নিতেই হযরত খালিদ চোখের পলকে ছুটে গিয়ে তার বুকে তরবারীর অগ্রভাগ ঠেকিয়ে গর্জন করে উঠলেন, 'সাবধান! তোমার প্রতিটি লোককে অস্ত্র ফেলে দিতে বলো, কেউ যেন বাধা দিতে না আসে সে নির্দেশ দাও। তা না হলে এখানে রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।' অহঙ্কারী জালিম ভীতগ্রস্ত হয়ে নিজ সৈন্যদেরকে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলো। হযরত খালিদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে অগণিত রোমক সৈন্যদের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের শিবিরে ফিরে এলেন। ঈমানদার অহঙ্কারী জালিমদের গর্বিত মস্তক এভাবেই ধূলায় মিশিয়ে দেয়।

দামেস্ক নগরী তখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে। তার প্রধান সেনাপতি ক্লিভাস অগণিত সৈন্য নিয়ে দামেস্কের দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করছে। লোকটি অগণিত সৈন্য সংখ্যার অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। লোকটির ধারণা কয়েক মুহূর্তের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তৃণবৎ উড়ে যাবে। সে সময়ের প্রথানুসারে সেনাপতি ক্লিভাস মুসলিম শিবিরে সংবাদ প্রেরণ করলো, সে মুসলিম সেনাপতির সাথে কথা বলতে আগ্রহী। হযরত খালিদ সাথীদের নিয়ে সেনাপতি ক্লিভাসের সাথে কথা বলতে গেলেন। ক্লিভাস তার দোভাষী জারজিসের মাধ্যমে হযরত খালিদকে ভীতি প্রদর্শন শুরু করলো।

দোভাষীর কথা শুনে পৃথিবীর বিস্ময়কর জেনারেল আল্লাহর তরবারী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সংকোচহীন কণ্ঠে রোম সেনাপতি ক্লিভাসের অহঙ্কারে মদমত্ত চোখে চোখ রেখে দোভাষী জারজিসকে বললেন, 'আমি সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের এই বিশাল বাহিনীকে আমরা সেসব ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের সাথেই তুলনা করি, শিকারীরা যাদেরকে জাল পেতে ধরে খায়। শিকারী কখনো পাখির বিশাল ঝাঁক দেখে ভয় পায় না, বরং আনন্দিত হয় এবং পাখির বিশাল ঝাঁককে চারদিকে জাল বিছিয়ে অতি সহজেই ধরে। হে জারজিস! তুমি শুনে রাখো, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদে নেমেছি। যুদ্ধের ময়দানে নিহত হওয়াকে আমরা আল্লাহর নে'মাত হিসাবে গণ্য করি। সেই নে'মাতের জন্য আমরা কতটা ব্যাকুল তা একটু পরেই তোমরা নিজের চোখে দেখতে পাবে। আমরা শহিদী মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের স্বাদ খুঁজে ফিরি। শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত যারা গ্রহণ করেছে, বেঁচে থাকার তাদের কাছে অর্থহীন। তুমি তোমার সেনাপতি ও সম্রাটকে আমার কথাগুলো জানিয়ে দাও।'

ঈমানদার কখনো জালিমের সামনে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না। জালিমের সামনে সে কখনো নিজের আদর্শে পরিবর্তনও আনে না। মোগল সম্রাট আকবরের সন্তান জাহাঙ্গীর তখন সিংহাসনে। একদিন তিনি আল্লাহর কোরআনের সিপাহ্সালার হযরত শায়খ আহ্মদ সরহিন্দী-যিনি মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ)-তাঁকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। দ্বীনে ইলাহির প্রবর্তক সম্রাট আকবর প্রথা চালু করেছিলো, সম্রাটের সামনে মাথানত করে অর্থাৎ সিজ্দার ভঙ্গিতে কুর্ণিশ জানাতে হবে। সেই প্রথা তখন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী দরবারে আগমন করে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সালাম জানালেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর আল-ফেসানী (রাহঃ)-এর এই আচরণ দেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়? আপনি দরবারের বিধি অনুসারে মাথানত করে কুর্ণিশ করলেন না, সালাম জানালেন। কেন আপনি দরবারের বিধি লংঘন করলেন?'

স্মিতহাস্যে নির্ভীক কণ্ঠে আল্লাহর সৈনিক হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী উত্তর দিলেন, 'হে সম্রাট! যে মাথা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার সমস্ত সম্রাটের সম্রাট আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে নত হয়, সেই মাথা পৃথিবীর কারো সামনে নত হতে পারে না-তা তিনি যতো বড় শক্তিশালীই হোন না কেনো।'

এরই নাম ঈমান এবং ঈমান এভাবেই নির্ভীক কণ্ঠে অন্যায় আর জুলুমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে তারা সত্য প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। সুলতান আলাউদ্দিন খালজী তাঁর প্রধান বিচারপতিকে দরবারে ডেকে আনলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদেরকে হাত-পা কেটে বিকলাঙ্গ করে শাস্তি দেয়া বৈধ কিনা।' বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, 'না, এভাবে শাস্তি দেয়া আল্লাহ হারাম করেছেন।' সুলতান তার প্রধান বিচারপতির ওপরে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন, 'দেবগিরি থেকে আমি যে ধন-সম্পদ পেয়েছি, তা আমার না জনগণের প্রাপ্য?'

প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'মুসলিম সৈন্যবল দিয়ে তা অর্জন করা হয়েছে। সে সম্পদ আপনার প্রাপ্য হতে পারে না। আপনি তা অবিলম্বে জনগণের কোষাগারে জমা দিয়ে দিন।'

সুলতান আলাউদ্দিন খালজী নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলেন, 'জনগণের কোষাগারে আমার ও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকার কি পরিমাণ?'

নির্ভীক কণ্ঠে বিচারপতি জানালেন, 'একজন সাধারণ সৈনিকের যতটুকু অংশ, ঠিক অনুরূপ অংশই আপনার ও আপনার আত্মীয়-স্বজনের। আপনি নিজের ইচ্ছানুসারে জনগণের সম্পদ ব্যয় করতে পারেন না। যদি করেন তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

জবাব শুনে সুলতান গর্জন করে উঠলেন এবং বিচারপতিকে চরম শাস্তি দেবেন বলে হুমকি দিলেন। ভয়হীন চিত্তে মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বিচারপতি সুলতানকে জানিয়ে দিলেন, 'আপনি আমাকে ফাঁসিই দিন বা আপনার ইচ্ছানুসারে যে কোনো শাস্তিই দিন না কেনো, যা সত্য আমি তা প্রকাশ করবোই।'

সুলতান আলাউদ্দিন খালজীর সত্য গ্রহণ ও সত্য শোনার সৎসাহস ছিল, তিনি বিচারপতির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। ঈমানদার এভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্র কঠিন হয়ে থাকে। যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচারের পথে সে অর্গল তুলে দেয়ার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করে থাকে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'তোমরা মজলুমকেও সাহায্য করো এবং জালিমকেও সাহায্য করো।' সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, 'মজলুমকে সাহায্য করবো, এ কথা তো স্পষ্ট বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে সাহায্য করতে হবে, এ কথা তো বুঝলাম না।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জালিম যখন অত্যাচার করার জন্য তার হাত প্রসারিত করবে, তখন তার হাত চেপে ধরে তাকে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ জুলুম করা থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে আর এটাই জালিমকে পাপ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সাহায্য করা।'

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, ইসলাম অশান্তি ও বিশৃংখলার ঘোর বিরোধী। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র যেন শান্তি বিরাজ করে, ইসলাম সে ব্যবস্থার দিকেই মানব মন্ডলীকে আহ্বান করে। কিন্তু কোন অশুভ শক্তি যদি জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালায় ইসলাম তখন ঈমানদারদেরকে সেই অশুভ শক্তিকে কঠোর হাতে দমন করতে নির্দেশ দেয়। সমাজ ও দেশে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করার চক্রান্ত করে, তাদের ব্যাপারে ঈমানদারকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতা, ইসলাম মত প্রকাশের, মত গ্রহণের, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম পালনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক দেশের মানুষের এটা একটি স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার সর্বাবস্থায় স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং কোনো সময়ই মানুষের এই অধিকার হরণ করার অথবা মুলতবী করার অধিকার কারো নেই।

কিন্তু এই অধিকার লাভ করে সমাজ ও দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসকে ইসলাম কোনো অবস্থাতেই বরদাশ্ত করে না। ইসলাম মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানাবে, এই আহ্বান জানানোর ব্যাপারে ঈমানদারকে নিষেধ করা হবে বা তার স্বাধীনতা হরণ করা হবে, এই অধিকার কারো নেই। সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর নির্দেশ ও স্বাধীনতা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারকে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও স্বভাবসম্মত এই অধিকার বহাল রাখা ও তা যথাযথ ভোগ করার এবং শত্রুদের এই অমানবিক আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টায় ঈমানদার অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে শক্তিশালী ও দুর্জয়-সর্বজয়ী হয়ে রুখে দাঁড়াবে।

মনে রাখতে হবে, শক্তি, সম্মান-মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্যই শোভনীয়। লাঞ্ছনা, পরাজয়, গ্লানী, হীনতা-দীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা কোনো অবস্থাতেই ঈমানদারের জন্য শোভনীয় নয়। ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি লাঞ্ছনামূলক জীবন সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নেয়, তাহলে বুঝতে হবে তার ঈমান অপূর্ণ। ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর যে অধিকার প্রত্যেক ঈমানদারের রয়েছে, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে রাজী হওয়া নিজেকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করতে প্রস্তুত থাকারই নামান্তর। সুতরাং ইসলাম যে পথে অগ্রসর হতে আগ্রহী, সেই পথ সর্বপ্রকারের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মহাসত্যের দিকে যারা মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সেসব মহৎ ব্যক্তিদেরকে সাহায্য-সমর্থন এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তের বছর মক্কায় অবস্থান করে দ্বীনে হকের দিকে সুষ্ঠু বুদ্ধিমত্তা ও মহৎ উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন। বিরোধিদের সাথে তিনি অখন্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে কথোপকথন করেছেন অতি উত্তম পন্থায়। এই সময় স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অনুসারীগণ মক্কার জালিমদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করেছেন। সাহাবীগণ জালিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে বার বার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল শান্ত কণ্ঠে সাহাবীদেরকে জানিয়েছেন, 'এখন পর্যন্ত আমাকে অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়নি।'

মক্কায় তখন পর্যন্ত অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি না দেয়ারও যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত মহাসত্যের প্রতি আহ্বান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। এ পর্যায়ে যে শান্তিপূর্ণ কর্ম পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ আল্লাহর রাসূলের আয়ত্বাধীন ছিল, তখন পর্যন্ত তা নিঃশেষ হয়ে

যায়নি এবং সেসব উপকরণের সবগুলো প্রয়োগ করাও হয়নি। অথচ সেসব উপায়-উপকরণও ছিল মহান আল্লাহরই দেয়া এবং তা ব্যবহার করাও ছিল একান্ত জরুরী। যেন বিরোধী গোষ্ঠী এই অজুহাত খাড়া করতে না পারে যে, 'আমরা তো ঈমান গ্রহণ করার কোনো সুযোগই পাইনি।' এই কর্মনীতি অনুসরণের কারণেই রাসূলের মক্কী জীবনে অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। যদিও ঈমানদারদের প্রতি অস্ত্র ব্যবহার করার কোনো সুযোগই বিরোধীপক্ষ হাত ছাড়া করেনি। নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার নেমে আসার পরও রাসূলের মনে এই আশা ছিল যে, মক্কার লোকগুলো সময়ের ব্যবধানে মহাসত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ কারণে তিনি সে সময় জালিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি।

কিন্তু বিরোধী গোষ্ঠী এত সুযোগ লাভ করার পরও তারা মহাসত্যের প্রতি সাড়া না দিয়ে আল্লাহর রাসূলকে পৃথিবী থেকে দৈহিকভাবে চিরতরে বিদায় করে দেয়ার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই অবস্থায় তাঁর প্রতি হিজরতের আদেশ দেয়া হলো এবং তিনি মদীনায় হিজরত করে ঈমানদারদের একটি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু মক্কার নিষ্ঠুর জালিম গোষ্ঠী যেমন হিজরতের সময়ও আল্লাহর রাসূল ও ঈমানদারদের পিছু ধাওয়া করেছিল, ঠিক তেমনি তারা মদীনাতেও ঈমানদারদের শান্তিতে থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা মদীনার সদ্যগঠিত ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই অবস্থায় দ্বীনি দাওয়াতের মাধ্যমে মক্কার জালিমদেরকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার আর কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকলো না। বরং অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়েই দেয়ার চরম মুহূর্ত এসে উপস্থিত হলো।

ঈমানদাররা নির্যাতিত হয়েছে ও অন্যায়ভাবে নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। মহাসত্যের দিকে দাওয়াত দেয়ার পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর অত্যাচারিত ঈমানদারদের ফরিয়াদ জানানোর, অত্যাচারী জালিমদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার অধিকার এক বিশ্বজনীন স্বীকৃত মৌলিক অধিকার বিশেষ। এই অধিকারের ভিত্তিতেই প্রয়োজনে ঈমানদারদের পক্ষে অস্ত্র ব্যবহার করার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতেই ইসলাম সশস্ত্র যুদ্ধকে বিধিবদ্ধ পদক্ষেপ ও ন্যায়-সঙ্গত কার্যক্রম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই যুদ্ধের লক্ষ্য জুলুম ও অত্যাচার প্রতিরোধ করা, শত্রুর শত্রুতামূলক কার্যক্রম বন্ধ করা, জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশের জনগণের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও দ্বীন পালনের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যাঁরা মহাসত্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জালিম গোষ্ঠী যদি সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমাজ ও দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে

এবং সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম অবলম্বন করে অথবা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের পথে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহলে অনিবার্যরূপে ও স্বাভাবিকভাবেই জালিমদের সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা ঈমানদারদেরই দায়িত্ব।

ঈমানের দাবিদার মুসলিম জনগোষ্ঠী এক সময় মানুষের হৃদয় জগতের অন্ধকার দূর করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। অন্যের হৃদয়ে ঈমানের আগুন জালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বর্তমানে ঈমানের দাবিদার মুসলমানদেরকেই ইসলামের দাওয়াত দিতে হয়। অমুসলিমদের বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকেই ইসলাম শিখাতে হয়। এক সময় যাঁরা মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করার কাজে ব্যস্ত, আজ স্বয়ং তাদের হৃদয়ই অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। কবি বড় আফসোস করে বলেছেন–

جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

একদিন যারা হৃদয়ের ওষুধ বিক্রি করতো, তারা বর্তমানে দোকান-পসারী সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সুতরাং ইসলামের দাওয়াত লাভ করা প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক মানবিক ও স্বাভাবিক অধিকার। এই দাওয়াত লাভ করার পথে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া ঈমানদারদেরই কর্তব্য। ঈমানদাররা পৃথিবীতে সত্য ও ইনসাফের ধারক-বাহক। তাদেরই দায়িত্ব হলো সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী শক্তি, দেশ ও জাতি বিরোধী চক্রান্তকারী শক্তি জালিমদেরকে অপকর্ম করা থেকে বিরত রাখা এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বাহিনী ও দলের দাপট চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল থাকার পরও যদি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি তা না করে, তাহলে তার ঈমান অপূর্ণ রয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই ঈমান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে না।

স্বার্থপরতা পরিহার করা ঈমানের দাবি

ঈমানদার কখনো স্বার্থপর হবে না। সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অন্যের জন্যও অনুরূপই পছন্দ করবে। স্বার্থপর মানুষ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নে'মাত লাভ করে তা সে একাই ভোগ করতে চায় এবং অন্যকে তা থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। এই ধরনের মনোবৃত্তির অধিকারী লোকগুলো যখন কোনো বিপদে নিমজ্জিত হয়, তখন সে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। কিন্তু যখন অনুরূপ বিপদে অন্য কোনো ব্যক্তি পতিত হয়, তখন সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায় না।

পক্ষান্তরে একজন ঈমানদার হয় মানব হিতৈষী এবং মানব প্রেমিক। সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসে। ঈমানদার মহান আল্লাহকে ভালোবাসে এবং ঐ কারণে সে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে না। কুকুরের বাচ্চাকে কুকুরের বাচ্চাই বলা হবে, কারণ সৃষ্টিগতভাবেই প্রাণীটি 'কুকুর' এতে সন্দেহ

নেই। কিন্তু তুচ্ছার্থে, তাচ্ছিল্যভরে, ঘৃণার সাথে ঈমানদার কোনো কুকুর শাবককে 'কুকুরের বাচ্চা' বলতে পারে না। কারণ ঐ কুকুরের বাচ্চাকেও সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ-যাঁকে সে ভালোবাসে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সে তার কষ্টার্জিত যাবতীয় ধন-সম্পদ ও নিজের প্রাণটিও দান করতে পারে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ঈমানদার নিজের সুখ-সম্পদে অন্যকেও অংশীদার করে, সাধ্যানুসারে তা অন্যের ভেতরে বন্টন করে দেয়। সে নিজের বিপদে যেমন অস্থির হয়, তেমনি অন্যের বিপদেও সে ব্যথিত ও অস্থিরতা অনুভব করে। একজন ঈমানদার শুধুমাত্র নিজে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে, অসৎ পথ থেকে নিজেকে বিরত রেখে নিজে সৎ হয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে যতক্ষণ অন্য মানুষদেরকে ভ্রান্ত পথ থেকে, অন্যায় ও অসত্যের শৃংখল থেকে মুক্তি দিয়ে মহাসত্যের পথে চালিত করতে না পারবে, ততক্ষণ সে শান্তি লাভ করতে পারে না।

ঈমানদার অন্য মানুষকে জাহান্নামের পথে ধাবিত হতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে, অন্য ভাইকে পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত দেখে, অন্যায় ও অসত্য কাজে লিপ্ত দেখে তার আত্মা অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে। মা যেমন নিজের সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে পারে না, অনুরূপভাবে ঈমানদারও অন্য ভাইকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত হতে দেখে, মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখে, জাহান্নামের পথে এগিয়ে যেতে দেখে বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে।

ঈমানদার যখন কোনো জিনিসের মধ্যে নিশ্চিত মহত্বের-কল্যাণের সন্ধান লাভ করে, তখন তার মন চায় যে, সমস্ত মানুষই এই কল্যাণের অধিকারী হোক। স্বার্থপরের মতো সে একাই ঐ কল্যাণ লাভ করে সন্তুষ্ট হয় না। আর যখন কোনো জিনিসে নিশ্চিত ক্ষতি, ধ্বংস ও অকল্যাণ দেখতে পায়, তখন সে চায় যে, একটি মানুষও যেন এই অকল্যাণে নিমজ্জিত হতে না পারে। ঈমানদার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, কোনো আদর্শ, মতবাদ, মতাদর্শ, প্রথা, নিয়ম-পদ্ধতি এবং জিনিস যদি ভালো ও কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে তা শুধু আমার জন্য কল্যাণকর নয়-সমস্ত মানুষের জন্যই কল্যাণকর এবং সমস্ত মানুষের কাছে এই কল্যাণকর বিষয়ের জ্ঞান ও উপলব্ধির সংবাদ পৌঁছে দেয়া আমারই দায়িত্ব।

আর কোনো আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-পদ্ধতি বা জিনিস যদি খারাপ ও ক্ষতিকর হয়ে থাকে, তা শুধু আমার একার জন্যই ক্ষতিকর বা খারাপ ও অকল্যাণকর নয়-সমস্ত মানুষের জন্যই তা ক্ষতিকর-অনিষ্টকর। নিজের ন্যায় তা অন্যদেরকেও তা থেকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ঈমানদার এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন হাসি মুখে বরদাশ্ত করে। কল্যাণের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে কল্যাণ বিরোধী

শক্তি তাকে নানা অপবাদে অভিযুক্ত করে, প্রচার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মিথ্যা কাহিনী লেখা হয়, অকল্যাণের প্রতিভূ শক্তি তাকে কারারুদ্ধ করে, তার গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে থাকে, কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো থেকে বিরত রাখার জন্য লোভ-লালসা প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু ঈমানদার কোনো কিছুর পরোয়া না করে, যাবতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বমানবতাকে কল্যাণের দিকেই আহ্বান জানাতে থাকে।

স্বার্থপরের মতো সে নিজেই ঈমানের পথে চলে না, অন্যকেও চলার জন্য আহ্বান জানায়। নিজের শুভ ও নিজের কল্যাণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা এবং অন্য মানুষের হিত ও কল্যাণ কামনা না করা, কল্যাণের পথে অন্যকে আহ্বান না জানানো আর পাপ ও অন্যায়কে শুধুমাত্র নিজের থেকে প্রতিহত করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া এবং অন্যদেরকে তা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করা সবচেয়ে বড় স্বার্থপরতা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট আত্মম্ভরিতা। নিজে ঈমানের পথে এসে অপরকে সেই পথে আহ্বান না জানানোকে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতাই শুধু বলে না, একে আত্মহত্যার নামান্তর বলা যায়। কারণ ভ্রান্ত পথে চলার কারণে সমাজ ও দেশের বুকে যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, সেই বিপর্যয় শুধু পথভ্রষ্ট লোককেও গ্রাস করবে না, ঈমানের দাবিদার লোককেও গ্রাস করবে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঈমানদার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন-যাপন করতে পারে না। তার ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ সমস্ত কিছুই সামাজিক ও সমষ্টিগত ব্যাপার। যদি সমাজে ও দেশের নেতৃত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও বিভাগে পাপাচারে নিমজ্জিত চরিত্রহীন লোকগুলোর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রভাব সর্বস্তরে প্রতিভাত হবে এটাই স্বাভাবিক। এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ঈমানদার স্বয়ং নিজেও সুরক্ষিত থাকতে পারবে না। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে যদি ভাগাড়ে আবর্জনা স্তুপিকৃত হয়ে ওঠে আর দুর্গন্ধ এবং রোগ জীবাণু ছড়াতে থাকে, তার থেকে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে তাহলে সেই বিষাক্ত ও সংক্রমণ-দুষ্ট বাতাসের খারাপ ও ক্ষতির প্রভাবে শুধু ভাগাড়ের চারপাশের লোকগুলোই ধ্বংসের কবলে পতিত হবে না, বরং রাজধানীতে বসবাসকারী উঁচুস্তরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণকারী লোকগুলোও এর কবলে নিপতিত হবে।

ঠিক একইভাবে সমাজ ও দেশের প্রতিটি স্তরে অসৎ চরিত্রহীন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের প্রভাবে সমাজ ও দেশে চরিত্র দূষিত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানকার মানুষ সাধারণভাবে অসচ্চরিত্র ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে সেখানে যে ধ্বংসের তান্ডবলীলা সংঘটিত হবে তা শুধু চরিত্রহীন, পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত নেতৃত্ব ও তাদের অনুসারীদের

পর্যন্তই সীমিত থাকবে না বরং যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি ঐ স্থানে বসবাস করে, তারাও সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً-وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ-

এবং দূরে থাকো সেই ফেতনা থেকে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তোমাদের মধ্যে যারা গোনাহ্ করেছে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর শাস্তিদানকারী। (সূরা আনফাল-২৫)

স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে চরিত্রহীনতা আর পাপাচারের গতি যদি রোধ করা না হয়, তাহলে গোটা সমাজ ও দেশ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাজ ও দেশে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, চরিত্রহীনতা আর পাপাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়, তারা একতাবদ্ধ হয়েই তা করে। সুতরাং তাদেরকে মোকাবেলা করতে হলে ঈমানদারদেরকেও ঐক্যবদ্ধভাবেই পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে অশুভ শক্তির গতি রোধ করতে করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ-اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ-

যারা সত্য অমান্যকারী তারা একে অপরকে সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে বড়ই ফিতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

সুতরাং ঈমানদার ঈমানের দাবি অনুসারে যদি স্বার্থপরতা ত্যাগ না করে নিজের ঈমান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সে-ও আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সাধারণ মানুষ যখন এতটা শৈথিল্য প্রদর্শন করে যে, তাদের দৃষ্টির সম্মুখে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে অথচ তারা তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করছে না। এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের অপরাধের কারণে সমাজের সকলে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়। এই ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত আল্লাহ কতিপয় লোকের পাপের ফল সবাইকে ভোগ করান না। (মুসনাদে আহমদ)

নিজে ঈমান এনে নামায-রোযা আদায় করা, সম্ভব হলে হজ্জও পালন করা, তাস্বীহ, যিকর করা, দিনের পর দিন নফল রোযা পালন করা আর মনে মনে এই আত্মতৃপ্তি লাভ করা যে, 'আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথেই অগ্রসর হচ্ছি।' এই ধারণা পোষণ করা স্পষ্টতই

শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। কারণ ঈমানদার নিজের জন্য যা কল্যাণকর মনে করবে, অন্যকেও সেই কল্যাণের দিকেই আহ্বান জানাবে। স্বার্থপরের মতো সে নিজের আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। সে নিজে যেমন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে, তেমনি অন্যকেও সে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। সে নিজেকে যেমন আল্লাহর গোলাম হিসাবে এবং কোরআনের একজন সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলবে, তেমনি অন্যদেরকেও সেই পথ অনুসরণ করার লক্ষ্যে আহ্বান জানাবে।

ঈমানদার সর্বক্ষেত্রে এবং যে কোনো অবস্থায় নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে। ইয়ারমুকের যুদ্ধের ময়দানে আহত ও মুমূর্ষ সৈনিকের দল যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। হযরত আবু জাহিম ইবনে হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আহত-নিহতদের মধ্যে তাঁর চাচাতো ভাইকে অনুসন্ধান করছেন। তাঁর কাছে রয়েছে পানির একটি পাত্র। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে তিনি দেখলেন তাঁর ভাই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন এবং মুমূর্ষ অবস্থায় পানির জন্য কাতরাচ্ছেন। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে পানি দিতে গেলেন। পানির পাত্র হাতে ইসলামের মুজাহিদ পানি পান করে জীবনের শেষ তৃষ্ণা মিটাতে যাবেন এমন সময় শহিদী মিছিলের আরেক যাত্রী পানি পানি বলে আর্তনাদ করে উঠলো।

তাঁর আর পানি পান করা হলো না। তিনি হযরত হুজাইফার কাছে পানি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার থেকে ঐ ব্যক্তির পানি বেশী প্রয়োজন, তাঁকেই প্রথমে দিন।' হযরত হুজাইফা পানি নিয়ে গুরুতর আহত হযরত হিশাম ইবনে আবিল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে গেলেন। তিনিও পানির পাত্র মুখের কাছে তুলে ধরেছেন, এমন সময় পাশ থেকে আরেকজন পানির জন্য আবেদন জানালেন। হযরত হিশামও প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে পানি দিতে বললেন। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা ঐ সাহাবীর কাছে পানি পৌছানোর পূর্বেই তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মহান আল্লাহর কাছে পৌছে গেলেন।

তিনি ছুটে এলেন হযরত হিশামের কাছে পানি পান করানোর জন্য, কিন্তু তিনিও ততক্ষণে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। হযরত হুজাইফা ছুটে গেলেন তাঁর চাচাতো ভাইয়ের কাছে। পানির পাত্র এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তাঁর যে কণ্ঠ ক্ষণপূর্বে পানি পানি বলে আর্তনাদ করছিল এবং পানি হাতের কাছে পেয়েও পাশের ভাইয়ের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে পানির পাত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সে কণ্ঠ চিরদিনের জন্য স্পন্দনহীন হয়ে গিয়েছে। এর নাম স্বার্থ ত্যাগ-আত্ম ত্যাগ। ঈমানদারদেরকে এভাবে অন্য ভাইয়ের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবি।

ইসলামের দুশমনদের আনুগত্য না করা ঈমানের দাবি

সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চিরন্তন। একদল মানুষ ধনসম্পদ ও প্রাণ কোরবানী দিয়ে হলেও মহাসত্য ইসলামী জীবনাদর্শের গর্বিত পতাকা উড্ডীন রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আরেকদল মানুষ মহাসত্যের এ পতাকা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরাম। ইসলামী জীবন আদর্শ যারা কবুল করেছেন এবং এই আদর্শের বিরোধিতা যারা করে যাচ্ছে, তারাই হলো ইসলাম বিরোধী তাগূতি শক্তি।

হতে পারে মাতাপিতা ইসলামের পক্ষের শক্তি। তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করছেন আর সন্তান চেষ্টা করছে তথাকথিত পশ্চিমা ভোগবাদী গণতন্ত্র বা পূজিবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আবার হয়ত সন্তান সংগ্রাম-আন্দোলন করছে পৃথিবীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোর জন্য এবং ইসলামকে বিজয়ী মতবাদ হিসেবে কায়েম করার জন্যে।

এ ধরণের সন্তানের মাতাপিতা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবীও করেন, হয়ত নামাজ রোজা হজ্জও আদায় করেন কিন্তু তারা দ্বীনি আন্দোলন পছন্দ করেন না। ইসলামের বিপরীত আদর্শে পরিচালিত অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কোন দলকে পছন্দ করেন। তাহলে দ্বীনি আন্দোলনে নিয়োজিত যে সন্তান, সে সন্তান এই ধরনের মাতাপিতার সাথে কি ধরনের আচরণ করবে। অথবা সন্তান ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়েছে, মাতাপিতা অসুমলিমই রয়ে গেছে, এ ধরনের মাতাপিতার সাথেই বা মুসলিম সন্তান কি ধরনের আচরণ করবে? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ-فَلاَ تُطِعْهُمَا-

তোমাদের মাতাপিতা যদি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানানোর ব্যাপারে তোমাদের উপরে শক্তি প্রয়োগ করে-যে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই-তাহলে অবশ্যই তাদের কোনো আনুগত্য করবেনা।(সূরা লোকমান-১৫)

ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল, অমুসলিম মাতাপিতা, মুসলিম নামধারী দ্বীনি আন্দোলন অপছন্দকারী মাতাপিতা সন্তানকে যদি এমন কোন আদেশ দেন-যে আদেশ ইসলামী চিন্তা চেতনা ও বিধানের পরিপন্থী, তাহলে সে আদেশ কোন ক্রমেই পালন করা যাবে না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন, 'স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

পিতামাতা হোক আর যে-ই হোক না কেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত কোন আদেশ দিলে তা পালন করা যাবে না, করলে মারাত্মক গোনাহগার হতে হবে। এ ধরনের আদেশ আমান্য করতে যেয়েও পিতামাতার সাথে কোন কঠিন ভাষা বা অশোভন

পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মিষ্টি ভাষায় পিতামাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনাদের কথা বা আদেশ মহান ইসলামের বিপরীত। এ আদেশ পালন করলে আমার রব-আমার আল্লাহ, আমার প্রিয় রাসূল অসন্তুষ্ট হবেন। পরিণামে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ঘটনা অত্যন্ত শিক্ষণীয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামায় জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল যখন নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন, সে সময়ে হযরত সায়াদ প্রাণ উচ্ছল তরুণ। সে সময়ে বয়স ছিল ১৭ মতান্তরে ১৯ বছর। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অতি উত্তম প্রকৃতির। তাওহীদের আওয়াজ তার কানে পৌঁছা মাত্র তিনি ইসলাম কবুল করেন।

প্রথমে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালিন বলা হয়। তিনি ছিলেন সাবিকুনাল আওয়ালিন। পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা তাকে দিয়ে তিনজন হয়েছিল। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। তার মা হামনা ছিলেন একনিষ্ঠ মূর্তি পূজারী। তিনি যখন শুনলেন তার সন্তান সায়াদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনি আন্দোলনে শামিল হয়েছে, তখন তিনি শপথ করলেন, 'সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি কোন খাদ্য গ্রহণ করবো না, পানি পান করবো না। রোদে বসে থাকবো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো মাতাপিতার আদেশ মান্য করতে বলেন। অতএব সায়াদ তাঁর আদেশ অনুযায়ীই মাতা হিসেবে আমার কথা মেনে নিয়ে ইসলাম ত্যাগ করুক।'

সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মা'কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় তিনি নিপতিত হলেন। তাঁর মা তিন দিন যাবৎ খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করলো না। রোদ থেকে উঠলো না, অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লো তাঁর মা।

হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজেই বর্ণনা করেন, 'আমার মা ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। আমার ভাই আমার মায়ের মুখ জোর করে হা করিয়ে মুখে খাবার দিত।' এ অবস্থায় তিনি মা'কে বললেন, 'মা, তুমি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তোমার দেহে যদি এক হাজার প্রাণ থাকে এবং সেই প্রাণ একটা একটা করে বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।'

তিনি তার মায়ের অন্যায় দাবী মেনে নেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি মায়ের সাথে অশোভন আচরণও করেননি। মায়ের সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করেছেন যে, তার মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ দেখে মা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতামাতা অমুসলিম হলেও তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। ইসলাম মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্যের চরম গুরুত্ব দিয়েছে।

এমনকি মাতা-পিতা যদি কুফর ও শিরকের পংকেও নিমজ্জিত থাকে। শুধু নিজেই নয় বরং সন্তানদেরকেও তাতে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য বাধ্য করতে চায় তবুও সন্তানের জন্য প্রয়োজন হলো পার্থিব বিষয়াদিতে তার মর্যাদা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যাবে না।

সবধরনের খিদমত এবং সুন্দর আচরণ তাঁদের সাথে করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্যও দিতে হবে এবং পার্থিব দিক থেকে কোন অভিযোগের সুযোগ তাঁদেরকে দেয়া যাবে না। অবশ্য দ্বীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, ইসলামের পথে রয়েছেন এবং আল্লাহর সত্যিকার অনুগত নেক্‌কার বন্দাদেরকেই অনুসরণ করতে হবে। অমুসলিম মাতাপিতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا-وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ-

এবং পৃথিবীতে তাদের সাথে (মাতাপিতা) অতি উত্তম ব্যবহার করতে থাকো এবং তাদেরকে অনুসরণ করো যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা লোকমান-১৫)

অমুসলিম পিতামাতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। মুশরিক মাতা-পিতার সাথেও তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যেমন মুসলিম মাতা-পিতার সাথে রাখতে হয়। পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মান-সম্মান ও খিদমতের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের আরাম দিতে হবে। কিন্তু একজন ঈমানদার হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মাতা-পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় শুভাকাংখা এবং সুন্দর আচরণ হলো নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং খিদমতের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। তাঁদের হেদায়াতের জন্য মন খুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের ধরণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিশেষ করে ভোট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ জয়ী হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে নিজের আদর্শের কথা বলে। সুতরাং ভোট ব্যবস্থাও এক ধরনের যুদ্ধ। এই ভোট যুদ্ধ মুসলমানদেরকে সুযোগ এনে দেয় ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার। যাদের ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে তারা সবাই ভোট যুদ্ধের সৈনিক। যাকে ভোট প্রদান করবেন সেই ব্যক্তি যদি ইসলামপন্থী না হন, তাহলে তাকে ভোট দেয়া পরিষ্কার হারাম। সে ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, নিজের পিতা, মাতা, ভাই বা অন্য যে কোন আত্মীয় স্বজন হোক না কেন, তারা নামাজী, কালামী, হাজী হোক না কেনো, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি তারা চেষ্টা-সংগ্রাম না করেন, তাহলে তাদেরকে কোনক্রমেই ভোট দেয়া জায়েজ হবে না। যদি কেউ দেয় তাহলে তারা গোনাহগার হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলামী আদর্শের কাছে পিতা পুত্রের সম্পর্ক জিহাদের ময়দানে গুরুত্বের দাবি রাখে না। সেখানে বিবেচনার বিষয় একমাত্র আদর্শ। বর্তমানে দেখা যায় ভোট যুদ্ধে নিজের পিতা বা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি দ্বীনি আন্দোলনের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হয়, তাহলে মুসলমানরা দ্বীনি আন্দোলনের কথা এবং দ্বীনকে বিজয়ী করার কথা ভুলে যায়। তখন রক্তের সম্পর্কই বড় হয়ে দাঁড়ায়। দ্বীনি আন্দোলনের প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে ভোট দেয় নিজের আত্মীয় বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে। যিনি ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামকে উৎখাত করবেন, তাকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায় ঈমানের দাবিদার একশ্রেণীর মুসলমানরা। ইসলামী সংগঠনের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং সাহাবীদের মতো নেতার প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে না পারলে দ্বীনি আন্দোলনকে তার মনজিলে মাকসুদে নিয়ে যাওয়া যাবে না-আন্দোলন সফল হবে না।

বদরের প্রান্তর। পবিত্র রমজান মাসের ১৭ তারিখ। হক বাতিলের প্রথম যুদ্ধ। মক্কার বাতিল শক্তি আনন্দে আত্মহারা। কারণ তারা ইসলামী বাহিনীর তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। অস্ত্রও তাদের বেশী। তাদের ধারণা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামের মুজাহিদরা তৃণ খন্ডের মত উড়ে যাবে। মুসলমানদের একটি প্রাণীকেও তারা আজ বদরের প্রান্তর থেকে জীবিত ছেড়ে দেবে না। আজই তারা ইসলামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবে। বাতিল শক্তির যুদ্ধ শিবিরে এজন্য আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

তাওহীদের মুজাহিদ বাহিনীর যুদ্ধ শিবির। প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের সৈন্য সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অস্ত্রও নেই। সামান্য যে অস্ত্র আছে তা-ও জনপ্রতি একটি করে ভাগে পড়ে না। এদের মধ্যেও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। কারণ তাদের যুদ্ধ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এরা মরলে শহীদ আর বাঁচলে গাজী। তাঁদের আনন্দের বড় কারণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সিপাহসালার। তাঁদের সবার চোখে মুখে শাহাদাতের অদম্য নেশা। তাঁরা যুদ্ধে এসেছেন বাতিল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য। মানুষকে মানুষের তৈরি করা মনগড়া মতবাদ তথা আইন কানুনের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে আল্লাহর রঙে রঙিন করার জন্য। তারা বদরের প্রান্তরে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ওপরে নির্ভর করে যুদ্ধ করতে এসেছেন।

যুদ্ধের আয়োজন সম্পন্ন। গভীর রজনী। গোটা পৃথিবী সুসুপ্তিতে নিমগ্ন। পূর্ব গগণে তরুণ তপন উদিত হয়ে তার কিরণচ্ছটা বদরের প্রান্তর আলোকিত করার সাথে সাথেই রণ দামামা ভয়ংকর শব্দে বেজে উঠবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাননি। তিনি সিজদায় গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলছেন, রাব্বুল আলামীন! আমার পক্ষে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব আমি তা-ই নিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করার জন্য এসেছি। আমি পৃথিবীর কোন শক্তির ওপর নির্ভর করে এখানে আসিনি। একমাত্র তোমার ওপর নির্ভর করে এখানে এসেছি! হে আল্লাহ! আজ তুমি তোমার

অঙ্গীকার পূর্ণ কর। রাব্বুল আলামীন তুমি সাহায্য করো! তুমি যদি সাহায্য না করো, তাহলে তোমার তাওহীদের এই সামান্য কয়েকজন সৈনিক আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এরা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তোমার নাম নেয়ার মত এ যমীনে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আয় আল্লাহ! তুমি তোমার কুদরতী ব্যবস্থা দিয়ে ইসলামের এই বাহিনীকে সাহায্য করো!

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বদরের রণক্ষেত্রে যুদ্ধাস্ত্রগুলো রক্ত পিপাসায় লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করলো। রণ দুন্দুভী একটানা আর্তনাদ করে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের মনে ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। ইসলামী বাহিনীর আল্লাহু আকবর গর্জনে ভয়ে বাতিল শক্তির কলিজার রক্ত হীম হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধের ঘোড়াগুলো বাতিল শক্তির রণবুহ্য ভেদ করে তীর বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে মুসলিম মুজাহিদদের এক একটি তরবারী কয়েক শত তরবারীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। হযরত আবু উবাইদা উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বাতিল শক্তির ওপরে এমনভাবে আঘাত হানছেন, তার আঘাতে বাতিলদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেঙ্গে তছনছ হয়ে পড়ছে। তিনি বার বার তীব্র আক্রমণ করে কাফিরদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। কাফিররা আবু উবাইদার হামলা থেকে বাঁচার জন্যে এমন এক কৌশল অবলম্বন করলো, যে কৌশলের কারণে তিনি ঈমান রক্ষার ভয়ংকর পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন।

বাতিল শক্তির পক্ষে যুদ্ধরত আবু উবাইদার পিতাকে কাফিররা তাঁর সামনে এনে বার বার দাঁড় করিয়ে দিতে লাগলো। পিতা যদিও দ্বীনি আন্দোলনে শামিল হননি, তবুও তো জন্মদাতা পিতা। আবু উবাইদা যখনই ইসলামের শত্রুদের ওপরে আক্রমণ করার জন্যে শত্রু বাহিনীর সামনে এগিয়ে যান তখনই তাঁর পিতা এসে কাফের সৈন্য ও তাঁর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। আবু উবাইদা এক মহাপরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম কবুল করে কাফিরদের লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখেও নিজ আদর্শের উপরে অবিচল অটল ছিলেন। সমস্ত পরীক্ষাতে তিনি মজবুত ঈমানের কারণে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আজ সব পরীক্ষার বড় পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। একদিকে তাঁর ঈমান রক্ষা, অপরদিকে তাঁর পিতার জীবন রক্ষা। আল্লাহর দুশমন পিতাকে যদি তিনি আঘাত না করেন, তাহলে ইসলামী বাহিনী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। অপরদিকে পিতাকে হত্যা করার কথা কল্পনা-ও তো করা যায় না।

পিতার কামনা পৃথিবীর যমীন থেকে ইসলামের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে শিরক, বাতিল ও পৌত্তলিকতার প্রদীপ জ্বালানো। পৃথিবীর বুক থেকে তাওহীদের আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যই কাফির পিতা তাওহীদের পতাকাবাহী আবু উবাইদার সামনে এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আল কোরানের বিপ্লবী সৈনিক আবু উবাইদা চাচ্ছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করে পৃথিবী থেকে সব ধরনের শোষণ নিষ্পেষণ ও জুলুমের

অবসান ঘটাতে। আর তার পিতা চাচ্ছে মানুষের তৈরি করা মতবাদের নিষ্পেষণে আর্ত মানবতার করুণ আর্তনাদকে কবর দিয়ে পৃথিবীতে শোষকের বিজয় কেতন উড়াতে। পুত্র আবু উবাইদা চান পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আল্লাহর রঙে রঙিন করে জান্নাত নামক নে'মাতের দিকে অগ্রসর করাতে। আর তাঁরই পিতা চাচ্ছেন, পৃথিবীর মানুষগুলোর গলায় পৌত্তলিকতার কালো ঘৃণ্য জিঞ্জির লাগিয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বর জাহান্নামের শেষ স্তরে নিক্ষেপ করতে।

হযরত আবু উবাইদা কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবার যদি পিতা এসে তাঁর সামনে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে সে পিতারূপী আল্লাহর দুশমন, কুফুরী শক্তির প্রতিমূর্তি শোষকের প্রতিচ্ছবি পিতাকে আর ছেড়ে দেবেন না। তিনি যদি তার পিতাকে এ অবস্থা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে ইসলামের বিপর্যয় ডেকে আনেন, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যখন প্রশ্ন করবেন, আবু উবাইদা, আমার ইসলামী আদর্শ থেকে কি তোমার পিতা তোমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল? তখন আল্লাহর প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেয়া যাবে না। পরিশেষে জাহান্নামে যেতে হবে।

আল্লাহু আকবর বলে হযরত আবু উবাইদা সিংহের মতো গর্জন করে উল্কার গতিতে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে গেলেন। তার পিতাও পুনরায় তাঁর সামনে এসে তাঁকে কাফিরদের প্রতি হামলা করা থেকে বিরত রাখার জন্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। সঙ্গে সঙ্গে আবু উবাইদা তরবারীর আঘাত দিয়ে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তিনি প্রমাণ করলেন বাতিল শক্তির প্রতিভূ সে যে-ই হোকনা কেন, যত প্রিয়জনই হোক না কেন তার সাথে ইসলামী আদর্শের মোকাবেলায় কোন আপোষ নেই। তাকে হত্যা করে সত্যের জন্য পথ পরিষ্কার করতে হাত কাঁপা উচিত নয়। এই বদর যুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার নিজের মামাকে নিজ হাতে নিহত করে সত্য আদর্শের উজ্জ্বল শিখা চির অনির্বান করেন।

হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তার পিতার মধ্যের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহান আরশে আযিমের অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুশী হয়ে কোরানের সুরায়ে আল মুজাদিলার আয়াত নাজিল করেন-

لاَتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلَوْ كَانُوْا ابَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ-

তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যারা আল্লাহ এবং রাছুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা তাদের পিতাই হোক অথবা তাদের পুত্র-ই হোক, ভাই-ই হোক বা আত্মীয় স্বজন হোক। (সূরা মুজাদিলা-২২)

হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আমীনুল উম্মাত বলা হতো। ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের মাথায় বর্মের কড়া ঢুকার পরে তা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুলতে গেলে আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, আল্লাহর কছম! আমাকে খুলতে দিন। তিনি প্রথমে হাত দিয়ে খুলতে গিয়ে চিন্তা করলেন, এভাবে হাত দিয়ে খুললে আল্লাহর রাসূল ব্যথা পেতে পারেন, তখন তিনি লোহার কড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে খুলে রাসূলকে ব্যথা মুক্ত করেন। তিনি যখন দাঁত দিয়ে কড়া খুলতে চেষ্টা করেন তখন তার দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল।

জিহাদের ময়দানে যদি কেউ সরাসরি অস্ত্র হাতে ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়ায়, নির্বাচনে কেউ যদি ইসলামপন্থী প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়, তাহলে একজন মুসলিম হিসেবে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। কোন ক্রমেই তার পক্ষে কোন ধরনের কার্যক্রম চালানো যাবে না। কেউ যদি তা করে তা হলে সে ব্যক্তি কিছুতেই নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করতে পারে না। একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর প্রেরিত জীবন বিধানের প্রতি ঈমানও আনবে অপরদিকে সেই একই ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের শত্রুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও ভালোবাসা পোষণ করবে, এ দুটো বিষয় সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এ দুটো বিষয় কখনো মুহূর্তের জন্য একত্রিত হবে, এ কথা কল্পনাও করা যায় না। একই ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা থাকবে আবার তাঁর শত্রুদের প্রতিও ভালোবাসা থাকবে, এটা একটি অসম্ভব ব্যাপার। যেমন অসম্ভব নিজেকে ভালোবাসা আবার নিজের প্রাণের শত্রুকেও ভালোবাসা।

পরস্পর বিরোধী এই দুই প্রকারের ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও প্রেম-প্রীতি কোনো মানুষের হৃদয়ে কখনো একত্রিত হতে পারে না। সুতরাং যাদেরকে এমন দেখা যাবে যে, সে ঈমানদার হওয়ার দাবি করে আর সেই সাথে সে ইসলামের শত্রুদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে, তাহলে তাকে তার ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান মনে করা একটা চরম প্রতারিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের ভুল ধারনায় কোনো ঈমানদার নিপতিত হতে পারে না। যেসব ব্যক্তি ইসলামের সাথেও সম্পর্ক রাখছে এবং ইসলামের শত্রুদের নির্দেশ অনুসারে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, দলীয় জীবন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালিত করছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষা করছে, মনে করতে হবে-তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে।

মুখে ইসলামের কথাও বলে, মাঝে মধ্যে বাহ্যিক দিক দিয়ে ইসলামের কিছু বিধি-বিধানও প্রদর্শনীমূলকভাবে অনুসরণ করে, মুখে দাড়ি রেখে মাথায় টুপিও দেয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে। সুযোগ পেলেই সমাজ ও দেশের বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেয়ার চেষ্টা করে। ইসলামের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতির

বিস্তার ঘটায়। বিশ্বের মানচিত্রে ইসলামের দুশমন হিসাবে চিহ্নিত দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সেই দেশ কর্তৃক নিজ দেশ নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে দেশের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না-এমনকি সেই দেশের নীল নকশা অনুসারে নিজ দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই লোকগুলো আসলে যে কি, এ সম্পর্কে তাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারা ঈমানদার না মুনাফিক এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কি হতে ইচ্ছুক, ঈমানদার না মুনাফিক হতে ইচ্ছুক, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে।

এই লোকগুলোর মধ্যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা যদি সামান্যতমও থেকে থাকে, আর নৈতিকতার দৃষ্টিতে মুনাফিকী যে অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির, অত্যন্ত হীন ও নীচ আচরণ, এই বোধটুকুও যদি তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে একই সাথে ঈমান ও কুফরের আনুগত্য তাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। ঈমান তো তাদের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানায়। ঈমানদার থাকতে আগ্রহী হলে এমন সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন করতে হবে যা ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্কের বিপরীত। আর যদি ইসলামকে ভালো না লাগে, তাহলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ঈমানের দাবি ত্যাগ করাই উচিত। আর ঈমানদার থাকতে আগ্রহী হলে, ঈমানের দাবি অনুসারে যাদের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত, তাদের সাথেই সম্পর্ক রাখতে হবে।

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ ঈমানের দাবি বাস্তবে রূপায়ন করেছিলেন। বদর ও ওহুদের রণ প্রান্তরে গোটা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে ঈমানের দাবির বাস্তব রূপ। যেসব সাহাবী মক্কা থেকে নির্যাতিত হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁরই বিধানের জন্য নিজের বংশ, গোত্র ও নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাররাহ্‌কে হত্যা করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর নিজের সন্তান হযরত আব্দুর রহমান (তখনও তিনি অমুসলিম ছিলেন) রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের আপন ভাই উবাইদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে হত্যা করেছিলেন। এভাবে হযরত আলী, হযরত হামজা ও হযরত উবাইদাহ্ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম হত্যা করেছিলেন উতবা, শাইবা ও অলিদকে। এই লোকগুলো সবাই তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদরের যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবি করেছিলেন, বন্দীদেরকে হত্যা করতে হবে এবং প্রত্যেকেই যার যার আত্মীয়কে নিজের হাতে হত্যা করবে। বদরের প্রান্তরে যখন

মুসলমানরা বিজয়ী হলো তখন মদীনার একজন আনসার মুসলমান হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আপন ভাই আবু আযীয ইবনে উমায়েরকে গ্রেফতার করে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে ছিলেন। এই দৃশ্য হযরত মুসআবের চোখে পড়লে তিনি মদীনার আনসারকে উৎসাহিত করে উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ওকে খুবই শক্ত করে বাঁধো, ওর মা বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারিণী। ওকে মুক্ত করার জন্য ওর মা বিরাট অঙ্কের বিনিময় মূল্য দেবে।'

আপন ভাইয়ের মুখে এই ধরনের কথা শুনে আবু আযীয অবাক কণ্ঠে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছিলো, 'তুমি না আমার আপন ভাই, তুমি কেমন করে এই ধরনের কথা বলতে পারছো!' ইসলামের দুশমন ভাইয়ের কথার জবাবে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'বর্তমানে তুমি আমার ভাই নও, এখন আমার ভাই হলো মদীনার ঐ আনসার, যে তোমাকে রশি দিয়ে বাঁধছে।'

এই বদরের যুদ্ধেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের স্বামী হযরত আবুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (তখন পর্যন্ত অমুসলিম ছিলেন) বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলের জামাতা হিসাবে অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় তাঁকে সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি। এভাবে পৃথিবীবাসীকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, ঈমান কি এবং ঈমানের দাবি অনুসারে ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনার অধিকারী লোকদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া ঈমানের দাবি

মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যিনি ঈমান আনলেন, এবং ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে থাকলেন, তিনি ঈমানদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। ঈমানদারের মনে কখনও কোন দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধতে পারে না। কোন দুঃখ-বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ ঈমানদারের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, তাঁর জীবনে লাভ-ক্ষতি যা এসেছে, তা ঐ মহান আর্শে আযীমের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে। তার ভালো মন্দের যাবতীয় চাবি কাঠির বাগডোর আল্লাহ তা'য়ালার হাতেই নিবদ্ধ।

আল্লাহ তা'য়ালার আনুমতি ব্যতীত জাগতিক কোন শক্তি তার ভাগ্যোন্নয়নে কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাঁর আদেশ ব্যতীত জড় জগতের কোন শক্তি তার সামান্যতম কোন ক্ষতিও করতে পারে না। তার কল্যাণ ও অকল্যাণের নির্ধারক হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। তিনি যদি তাকে কোন ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হন, তবুও সে মহান আল্লাহরই প্রশংসা করবে, আর তিনি যদি তাকে এ পৃথিবীতে কোন কিছু দান করে পরীক্ষায় নিমজ্জিত করতে চান, তবুও সে আল্লাহর প্রশংসা করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে থাকে।

ঈমানদার কখনো নিরাশ হয় না, সে হয় আশাবাদী। কারণ আশা-আকাংখা মানব জীবনে এক অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি। আশা এমন একটি আলোকিত মশাল, যা ঘন-অন্ধকারে মানব জীবনে আলোর সঞ্চার করে। পতিত ও জীর্ণ জীবনে আশাবাদই নবজীবনের হিল্লোল প্রবাহত করে। এই আশাবাদ মানুষের হৃদয়কে নিত্য নতুন কর্মোদ্যমে অনুপ্রাণিত করে রাখে এবং মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে। ঈমানদারও আশা পোষণ করে যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালের জীবনে জান্নাত লাভ করবে। এ কারণেই সে তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয় এবং প্রয়োজনে নিজের প্রাণও কোরবান করতে দ্বিধাবোধ করে না।

ঈমানদারের জীবনে আশা-ই হলো এক সঞ্জীবনী সুধা। এই আশাবাদ ঈমানদারের জীবনে ত্যাগ-কোরবানী ও কষ্টের অনুভূতি শাণিত হতে দেয় না এবং সহ্য শক্তির মাত্রা বৃদ্ধিই করে থাকে। দুঃখ-যন্ত্রণার অনুভূতিকে দমন করে জীবনে নিয়ে আসে প্রবল গতিশীলতা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আনন্দ ও উদ্যম। মানুষের মনে এই আশা যদি না থাকতো, তাহলে জীবন হয়ে যেতো সঙ্কীর্ণ এবং দুঃসহ এক বোঝা। এই আশার বিপরীতই হলো হতাশা বা নৈরাশ্য। মানুষের হৃদয় থেকে যখন একে একে আশার প্রতিটি দেউটি নিভে যায়, তখন তার গোটা জীবনই তলিয়ে যায় অন্ধকারের অতল তলদেশে। নৈরাশ্য ও হতাশা মানুষের দেহ-মনকে করে দেয় দুর্বল। পরিণামে যা ধ্বংস ডেকে আনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, 'দুটো জিনিসের ধ্বংস অনিবার্য। তার একটি হলো হতাশা বা নৈরাশ্য এবং অপরটি হলো অহঙ্কার বা অহমিকা।'

এই হতাশা বা নৈরাশ্য যে ব্যক্তির ওপরে বিজয় হয়, তার পক্ষে কোনো কর্মে যেমন অনুপ্রেরণা লাভ করা সম্ভব নয় তেমনি কোনো কাজেও সে সফলতার মুখ দর্শন করতে পারে না। এই নৈরাশ্য বা হতাশা হলো বিকশিত জীবনের হত্যাকারী এক মারাত্মক গরল বিশেষ। ঈমান যতক্ষণ দুর্বল থাকে, ততক্ষণ মানুষকে এই হতাশা বা নৈরাশ্য আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। এই হতাশা আর নৈরাশ্যই মানুষকে কুফরী ও নাস্তিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় হারিয়ে ফেলে, মহান আল্লাহর কর্ম কুশলতা ও সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার প্রতি যার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে না, তাকেই হতাশা আর নৈরাশ্য ঘিরে ধরে। এই ধরনের মানুষই যাবতীয় আশা-আকাংখা থেকে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে। নিজের জীবন ও পৃথিবীর প্রতি তার আর কোনো আকর্ষণ থাকে না এবং নিজের জীবনটা নিজের কাছেই একটি দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। হতাশাবাদী যখন নিজের জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, জীবনকে নিরর্থক বলে মনে করে, তখনই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈমান ও আশাবাদ এ দুটো বিষয় পরস্পর নিবিড়ভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি ঈমানদার সে অবশ্যই আশাবাদী হবে এবং কখনো নিরাশ হবে না।

কারণ ঈমান আনার অর্থই হলো উচ্চতর এক মহান অসীম শক্তির প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস, যে অসীম শক্তি এই বিশ্ব ও এর ভেতরে বাইরে যা কিছু রয়েছে এর স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নন। সমস্ত সৃষ্টির প্রতি এবং সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতি তিনি সর্বক্ষণ তীক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি নিজের অজান্তেই যদি কোনো গোনাহে জড়িয়ে পড়ে তবুও সে নিরাশ হয়না। কারণ তার জানা রয়েছে, যে যে গোনাহ করেছে, এই গোনাহের চেয়েও অনেক গুণ বিশাল হলো তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহর রহমত। আল্লাহর দরবারে তওবা করে কান্নাকাটি করলে তিনি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেবেন, এই আশাবাদ ঈমানদারের হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ يعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوامِنْ رَّحْمَةِ اللّهِ- اِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا-اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

হে নবী বলে দিন, হে আমার সেসব বান্দারা যারা নিজেদের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা যুমার-৫৩)

সুতরাং ঈমান এই আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, মহান আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। ঈমানদার বান্দাহ্ রোগাক্রান্ত হলে সে রোগ থেকে আরোগ্যের ব্যাপারে কখনো হতাশ হয় না। কারণ সে জানে, যে আল্লাহ তাকে রোগ দিয়েছেন, সেই আল্লাহ-ই তাকে রোগ থেকে মুক্ত করবেন। আর তিনি যদি রোগ থেকে মুক্ত না করেন, তাহলেও এর ভেতরে নিশ্চয়ই তিনি কোনো কল্যাণ রেখেছেন। সে পথ হারা, ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হলে সেই আল্লাহই তাকে তার প্রয়োজন পূরণ করবেন, এই আশাবাদ ঈমানদারের হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের জাতি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতের তৈরী করা মূর্তিগুলোকে ইলাহ মনে করতো। এসব মূর্তিই তাদেরকে রিযিক দেয়, রোগ থেকে আরোগ্য করে, পথ দেখায় এবং বিপদে সাহায্য করে বলে ধারণা করতো। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرهِيْمَ-اِذْ قَالَ لاَبِيْهِ وَقَوْمِه مَا تَعْبُدُوْنَ-

আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও, যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা কিসের ইবাদাত, গোলামী, বন্দেগী, দাসত্ব, উপাসনা ও পূজা করো? (সূরা শুআরা-৬৯-৭০)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা নিজের হাতের তৈরী মূর্তিগুলোকে নিজেদের ইলাহ বলে মানতো, তারা জবাব দিয়েছিল- قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ-

আমরা কতিপয় মূর্তির গোলামী, দাসত্ব, পূজা ও উপাসনা করি। (সূরা শুআরা-৭১)

ঐ লোকগুলো কিসের পূজা উপাসনা করছে তা জানার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রশ্ন করেননি। কারণ তিনি মূর্তি পূজার ঐ পরিবেশেই শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্য অতিবাহিত করেছেন এবং দেখে আসছেন, তারা কিসের পূজা করে। আসলে তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেসব জিনিসের পূজা-উপাসনা করছে, তা যে ভিত্তিহীন অথর্ব এবং এভাবে পূজা করা যে সম্পর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার, তা ঐ লোকগুলোর কাছে স্পষ্ট করে দেয়া। এই উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন-

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ-اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ-

সে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? অথবা কি কিছু উপকার বা ক্ষতি করে? (সূরা শুআরা-৭২-৭৩)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের প্রশ্নের ধরণ দেখে এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মূর্তিগুলো কথা শুনতে সক্ষম কিনা বা তারা কোনো ধরনের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা, এ কথা তিনি জানতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্পষ্টতই জানতেন যে, এগুলো সম্পূর্ণ অথর্ব। এই অথর্ব জিনিসগুলো থেকে লোকগুলোকে বিরত রাখার জন্যই তিনি তাদের বিবেকে আঘাত করে প্রশ্নগুলো করছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে লোকগুলো জানালো- قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ-

না, বরং আমরা নিজেদের বাপ-দাদাকে এমনটিই করতে দেখেছি। (সূরা শুআরা-৭৪)

আমরা কয়েকটি মূর্তির পূজা করে থাকি-এ কথা হযরত ইবরাহীমকে জানানো, এটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এগুলো যে অথর্ব এ কথা আমরাও জানি। কিন্তু অথর্ব হোক আর যা-ই হোক, এটা আমাদের চিন্তা-চেতনার সাথে মিশে রয়েছে এবং এটাই আমাদের আকীদা তথা ধর্ম বিশ্বাস। এরা আমাদের প্রার্থনা শোনে বা ফরিয়াদ কবুল করে অথবা আমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ করতে সক্ষম, এ কথা মনে করে আমরা এসবের পূজা করছি না। আমরা এসবের পূজা-উপাসনা এ জন্য করছি যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ তথা বাপ-দাদাদেরকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি। এ জন্য আমরাও এসবের পূজা করছি।

এই কথা বলে তারা একটি মহাসত্যের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, তারা যেসব জিনিসকে ইলাহ মনে করে আসছে, এগুলোর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একমাত্র পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্য ব্যতীত ভিন্ন কোনো প্রমাণই নেই। এবার হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বললেন–

قَالَ اَفَرَءَ يْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ-اَنْتُمْ وَابَ اؤُ كُمُ الْاَقْدَمُوْنَ-فَانَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعلَمِيْنَ-

সে বললো, কখনো কি তোমরা সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষেরা করতে অভ্যস্ত? এরা তো সবাই আমার দুশমন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত। (সূরা শুআরা-৭৫-৭৭)

যে জিনিস কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতি করতেও অক্ষম, সেসব জিনিসের পূজা-উপাসনা করার মধ্যে কোনো অর্থ বা যুক্তি থাকতে পারে কিনা, তা কি তোমার বুঝো না? এ কথা বলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আপন রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় এভাবে তুলে ধরলেন–

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ-وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ-

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনর্বার আমাকে জীবন দান করবেন। তাঁর প্রতিই আমি আশা পোষণ করি, আদালতে আখিরাতে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। (সূরা শুআরা-৭৮-৮২)

সুতরাং ঈমানদারও যাবতীয় ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিই আশাবাদ ব্যক্ত করে। সে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হলে হতাশ হয় না। কারণ সে জানে, এই কষ্টের পরেই রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-

জেনে রাখো, দুঃখ কষ্টের সাথেই রয়েছে সুযোগ-সুবিধা, অসচ্ছলতার সাথেই রয়েছে উদার স্বচ্ছলতা। (সূরা ইনশিরাহ্)

ঈমানদারের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে, তারা বিচলিত হয় না এবং হতাশাগ্রস্তও হয় না। বিপদে তারা ধৈর্য অবলম্বন করে এবং এই ধৈর্যের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা যে উত্তম বিনিময় দেবেন এই আশা পোষণ করে। ঈমানদারদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ-قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ-اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ-وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ-

ঈমানদার লোকেরা এমন যে, কোনো বিপদ যখন তাদেরকে বেষ্টন করে তখন তারা বলে, আমরা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই দিকে ফিরে যাবো। এই লোকেরা এমন যে, এদের ওপর তাদের আল্লাহর কাছ থেকে পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হবে এবং এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত। (সূরা বাকারা-১৫৬-১৫৭)

আল্লাহ বিরোধী মতবাদ-মতাদর্শ যখন প্রবল ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে থাকে, মানুষের বানানো আদর্শ সমস্ত দেশে বিজয়ী হয়, সত্যের পক্ষে কথা বলার তেমন কোনো শক্তি দেখা যায় না, দেশ ও জাতির জীবনে ঘোর অমানিশা বিরাজ করতে থাকে, সাধারণ মানুষ সত্যের চেয়ে মিথ্যাকেই বেশী পছন্দ করে, অন্যায়-অত্যাচারের প্লাবন বয়ে যেতে থাকে, তবুও ঈমান ক্ষণিকের জন্য হলেও হতাশ হয় না। কারণ সে জানে, মিথ্যার এই চাকচিক্য ও বিজয় ক্ষণিকের জন্য মাত্র। মিথ্যা ধ্বংসশীল এবং এক সময় তা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَزَاهِقٌ-

কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আম্বিয়া-১৮)

ঈমানদার জানে, এই পৃথিবী কোনো খেলাঘর নয়, এখানে যা ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে তা মহান আল্লাহর পরিকল্পনার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এই সৃষ্টি জগৎ একটি বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কোনো ধরনের মিথ্যা এখানে চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। মিথ্যা শক্তি যখনই এখানে মাথা উঁচু করার চেষ্টা করেছে, তখনই সত্যের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পরিণামে মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন–

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً-وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ-

যা ফেনা তা এমনিতেই উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, তাই শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে স্থিতিশীল হয়। (সূরা রা'দ-১৭)

ঈমানদার জানে মিথ্যা হলো পানির বুদ্বুদের ন্যায়, পানির বুদ্বুদ এমনিতেই এক সময় মিলিয়ে যাবে। একারণে ঈমানদার হতাশ হয় না। সে জানে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তা সময়ের ব্যবধানে বিজয়ী হবেই হবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণকারী ব্যক্তি এ কথা জানে যে, তার চেহারা যতোই কুৎসিত হোক না কেন, বয়সের ভারে সে যতই নুজ হয়ে পড়ুক না কেন, মৃত্যুর পরে সে এমন এক জীবনে প্রবেশ করবে, যেখানে তার জন্য রয়েছে অফুরন্ত শান্তি আর স্বস্তি। তারপর তাকে যখন পুনর্জীবন দান করা হবে, তখন সে নতুন জীবন-যৌবন লাভ করবে, অপূর্ব সুন্দর চেহারা তাকে দান করা হবে। এরপর তাকে এমন এক জান্নাত দান করা হবে, যেখানে চির শান্তি বিরাজ করবে। এই আশাবাদই ঈমানদারকে পৃথিবীর জীবনে দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে সক্রিয় রাখে।

সকল নবী-রাসূল এবং তাঁদের পরবর্তীতে যাঁরা দ্বীনের মিশন জারি রেখেছেন, তাঁরা সবাই আশাবাদী ছিলেন। কেউ হতাশ হননি। তাদের জীবনে যা কিছুই ঘটেছে, তার ভেতরে কল্যাণ নিহিত থেকেছে। সুতরাং ঈমানদারের জন্য যা-ই ঘটে থাকে, তার ভেতরে কল্যাণ নিহিত থাকে। তবে কল্যাণ কতটা ব্যবধানে অবস্থান করছে, তা জানেন স্বয়ং আল্লাহ। কিন্তু কল্যাণ যে লাভ করা যাবেই এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এভাবে ঈমানদার বান্দাহ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপরে সন্তুষ্ট থাকে এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাও তাঁর ঈমানদার বান্দার ওপরে সন্তুষ্ট থাকেন। ঈমানদার যে কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং সে সন্তুষ্টির ধরনটা কেমন, তা বিভিন্ন নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যেমন দেখা গিয়েছে, তেমনি তাদের আদর্শের অনুসারী দ্বীনি আন্দোলনের সৈনিকদের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম চরম বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলেন। যে বয়সে মানুষের সন্তান হওয়ার কোনোই আশা থাকে না-কিন্তু আল্লাহর দরবারে সন্তান লাভের আশা প্রকাশ করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো সন্তান তিনি লাভ করবেন। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বিস্মিত হলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে কেমন করে তিনি সন্তানের পিতা হবেন। মানবিক দিক থেকে বিষয়টি তাঁর বোধের অগম্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর কাছে ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে সংবাদ জানিয়ে দিলেন। ফেরেশ্‌তারা এসে তাঁকে জানালো-

قَالُوا لاَتَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلمٍ عَلِيْمٍ-قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ-قَالُوْا بَشَّرْنكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ

مِنَ الْقٰنِطِيْنَ-قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلاَّ الضَّالُّوْنَ-

বিচলিত হয়ো না, আমরা তোমাকে এক পরিণত জ্ঞানসম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। ইবরাহীম বললো, তোমরা কি বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছো? একটু ভেবে দেখো তো এ কোন্ ধরনের সুসংবাদ তোমরা আমাকে দিচ্ছো? তারা জবাব দিলো, আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, তুমি নিরাশ হয়ো না। ইবরাহীম বললো, পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তাদের রব-এর রহমত থেকে নিরাশ হয়। (সূরা হিজ্‌র-৫৩-৫৬)

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করলো বাতিল শক্তি। তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরে সন্তুষ্ট চিত্তে অবিচল রইলেন। তাঁর ভেতরে সামান্যতম অসন্তুষ্টির চিহ্ন প্রকাশ পেল না। আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ এসে সাহায্য দানের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিনি সাহায্যের সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে মহান বন্ধু আল্লাহর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। তাঁকে নির্মম অনল কুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো যে মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছলো। মহান আল্লাহ আগুনকে লক্ষ্য করে আদেশ দিলেন- يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ-

হে আগুন, আমার ইবরাহীমের প্রতি আরামদায়ক হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া-৬৯)

মহান আল্লাহর আদেশে আগুনের কুন্ড ফুলবাগানে পরিণত হয়ে গেল। কোরআনের গবেষকগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যদি আগুনকে তাঁর নবীর প্রতি ঠান্ডা হতে বলতেন, তাহলে ঐ আগুন এমন ঠান্ডা হয়ে যেতো যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রচন্ড ঠান্ডায় জমে কষ্ট পেতেন। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আগুনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, হে আগুন! আমার ইবরাহীমের প্রতি তুমি প্রশান্তি দায়ক হয়ে যাও-আরাম দায়ক হয়ে যাও। আল্লামা ইকবাল (রাহ) বলেন-

আজ ভি হো জো বিরাহিম কা ঈমাঁ পয়দা
আগ্ কার ছাক্‌তি হ্যায় এক আন্দাজে গুলিস্তা পয়দা।
ইবরাহীমের ঈমান যদি হয় আজিও কোথাও বিদ্যমান
করতে পারেন অগ্নিকুন্ডে খুব সুরত এক গুলিস্তান।

ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের অনুরূপ ঈমান যদি বর্তমানেও কারো ভেতরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্যও প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ফুলের বাগানে পরিণত হতে পারে। কারণ তিনি হতাশ হননি। মহান আল্লাহর প্রতি তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, তিনি যে আল্লাহর গোলামী করেন, সেই আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন।

এভাবে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম সন্তান হারিয়ে এবং হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও নিরাশ হননি। আল্লাহর নবী হযরত মূছা আলাইহিস্ সালাম যখন বিশাল সাগরের তীরে শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন, আত্মরক্ষার বাহ্যিক কোন পথ দৃষ্টির আওতায় পড়লো না, নির্মম মৃত্যুবরণ করা ব্যতীত কোন পথ খোলা রইলো না, জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপরে গভীর প্রশান্তিতে অবিচল ছিলেন। সঙ্গী-সাথীগণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই ইতিহাস এভাবে শোনাচ্ছেন–

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ–

দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথিরা চিৎকার করে উঠলো, আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম। (সূরা শুআরা-৬১)

হযরত মূছা আলাইহিস্ সালাম পরম নির্ভরতায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন–

قَالَ كَلاَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ–

না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমার আল্লাহ তো আমার সাথেই রয়েছেন। তিনি অবশ্যই আমাদেরকে পথ দেখাবেন। (সূরা শুআরা-৬২)

হযরত মূছা অধৈর্য হননি, নিরাশ হননি। চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ এসেছে–

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ–

আমি মূছাকে ওহীর মাধ্যমে আদেশ দিলাম, তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত হানো সাগরের বুকে। (সূরা শুআরা-৬৩)

মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে হযরত মূছা আলাইহিস্ সালাম হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রের বুকে আঘাত করলেন। আঘাত করার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে সমুদ্রের কি অবস্থা হয়েছিল তা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ–

সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো। (সূরা শুআরা-৬৩)

আল্লাহর আদেশে সাগরের বুক দীর্ণ হয়ে পানি দুই পাশে পাহাড়ের অনুরূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ তৈরী হয়ে গেলো। এরপরের ইতিহাস আল্লাহর কোরআন এভাবে বর্ণনা করছে–

وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الاخَرِيْنَ-وَاَنْجَيْنَا مُوْسى وَمَنْ مَّعَه اَجْمَعِيْنَ-ثُمَّ اَغْرَقْنَا الاخَرِيْنَ-

এই জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও কাছে আনলাম। মূছা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সাথে ছিল আমি উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (শুআরা-৬৪-৬৬)

যথা সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বিজয়ী হয়েছেন, প্রতিপক্ষ লাঞ্ছিত হয়ে পৃথিবী থেকে সদলবলে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম রাতের অন্ধকার, পানির নীচের অন্ধকার ও মাছের পেটে আরেকটি অন্ধকার, এই ত্রিবিধ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েও নিরাশ হননি। হতাশা তাকে গ্রাস করেনি। তিনি কাতর কণ্ঠে মহান আল্লাহকে এভাবে ডেকেছেন-

لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ-اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তুমি মহান ও পবিত্র। আর আমি জালিমদের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া)

জীবনের এই কঠিন মুহূর্তেও হতাশায় নিপতীত হননি। আল্লাহর প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, যে আল্লাহর গোলামী তিনি করছেন, সেই আল্লাহই তাকে উদ্ধার করবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

فَاسْتَجَبْنَا لَه-وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ-وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

আমি তার প্রার্থনা কবুল করলাম এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলাম। এমনিভাবে সমস্ত মুমিনকেই আমি বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া)

নবী-রাসূলগণই বিপদে নিপতীত হলে আল্লাহ তাঁদেরকে উদ্ধার করেছেন বিষয়টি এমন নয়। যারা তাঁর ওপরে নির্ভর করে, তাওয়াক্কুল করে এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়না, তিনি তাদেরকে অবশ্যই যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে ঘটেছে। মক্কায় যখন কোনো একজন ঈমানদারে পক্ষেই অবস্থান করা সম্ভব হলো না। তখন তাঁরা একে একে মদীনায় হিজরত করলেন। জালিমের দল আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করলো। এ সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ এলো। তিনি সাথী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে নিয়ে মদীনার পথ ধরলেন।

পূর্ব দিগন্তে পূর্বাশার ইশারা দেখা দিলো। একটু পরেই ভোরের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। শত্রুপক্ষের চোখে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আল্লাহর রাসূল সঙ্গীকে নিয়ে সওর নামক পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইসলামের শত্রুদল যখন জানতে পারলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পথে এগিয়ে চলেছেন। তারা পিছু ধাওয়া করলো। যে গুহায় আল্লাহর নবী সাথীকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই গুহার চারদিকে শত্রুদল অনুসন্ধান শুরু করলো। অবস্থা এমন হলো যে, তারা নিচের দিকে দৃষ্টি দিলেই আল্লাহর রাসূলকে দেখতে পাবে। আল্লাহর নবী কাফিরদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যাবেন, এই চিন্তায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকলো। আল্লাহর নবী নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সাথীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا-

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তওবা-৪০)

ঈমানদার কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়না, মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না। যে কোনো অবস্থায় সে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যায়। আল্লাহই তাকে রক্ষা করবেন-এই আশাবাদই তাকে নিজের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে। বলখের সুলতান আযীয খানের সাথে মোগল সম্রাট শাহাজানের সাথে ঘটনাক্রমে যুদ্ধ বেধে গেলো। আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে এক পর্বতময় মালভূমি-যা বলখ ও বাদাখশানের সীমান্ত সন্নিহিত একটি স্থান। মুসলমানের সাথে মুসলমানের যুদ্ধ-ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। মোগল বাহিনী পরিচালিত করছেন মোগল শাহজাদা আওরঙ্গজেব। অপরদিকে বলখের সুলতান আযীন খান স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে-যোহরের নামাযের ওয়াক্ত সমাগত। আওরঙ্গজেব যুদ্ধসাজে সজ্জিত। চেহারায় হতাশার কোনো চিহ্ন নেই। মহান আল্লাহর প্রতি আশাবাদের দৃঢ় প্রত্যয় চেহারা থেকে দ্যুতি বিকিরণ করছে। তিনি মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। আপন রব মহান আল্লাহর গোলামীর স্বীকৃতি দানের অপরিহার্য কর্তব্যের চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রস্ফুটিত হলো। সাথে সাথে তিনি হাতের অস্ত্র যমীনের দিকে ছুড়ে দিলেন। ঘোড়া থেকে নির্ভীক চিত্তে অবতরণ করে কমরবন্ধ খুলে যমীনে রেখে দিয়ে কেবলা মুখী হয়ে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সিজদা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

চারদিকে তখন প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। বৃষ্টির মতোই মারণাস্ত্র ছুটে আসছে। যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের অস্ত্র তাঁর বক্ষ ভেদ করে যেতে পারে। তাঁর চেহারায় ভীতির কোনো চিহ্ন নেই। তিনি আল্লাহর গোলাম এবং এই গোলামীর স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে নামায আদায় করতে

হবে। যে আল্লাহকে তিনি সিজ্দা দিচ্ছেন, সেই আল্লাহর প্রতিই তাঁর আশাবাদ। তিনিই তাঁকে হেফাজত করবেন। গভীর মনোযোগের সাথে তিনি যোহরের নামায আদায় করছেন এমন এক স্থানে, যার দিকে প্রাণ সংহারী মারণাস্ত্র বাতাসে শীস কেটে ছুটে যাচ্ছে। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

আগিয়া আয়ন লড়াইমে আগার ওয়াক্তে নামাজ
কেবলা রু হোকে জমিঁ বাছ হুয়ি কাউমে হিজাজ।

ভীষণ যুদ্ধের সময়ও নামাজের সময় হলে হেজাজের বীর সন্তানগণ সবাই কাবামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতো।

প্রতিপক্ষ আব্দুল আযীন খানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে বিনীতভাবে দন্ডায়মান মোগল শাহ্জাদা আওরঙ্গজেবের প্রতি। হৃদয় তার মোচড় দিয়ে উঠলো, তিনি কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন? তিনি এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের ওপর গভীরভাবে আস্থাশীল। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি এতটা আশাবাদী, তার সাথে যুদ্ধ করে কোনোভাবেই বিজয়ী হওয়া যাবে না। সাথে সাথে তিনি চিৎকার করে তার বাহিনীকে আদেশ দিলেন–যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ঈমানদার এভাবেই সর্বাবস্থায় মহান আল্লার প্রতি আশাবাদী হবে, দুশ্চিন্তা মুক্ত থেকে নিজ কর্তব্য পালন করে যাবে এবং এটাই ঈমানের দাবি।

ঈমানদারের অপরিহার্য আটটি বৈশিষ্ট্য

(এক) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ইস্তেগ্ফার করা এবং ক্ষমা চাওয়াও ইবাদাত। এই ইবাদাতের গুরুত্ব অসীম। আল্লাহর রাসূল ছিলেন নিষ্পাপ-মাসুম। তবুও তিনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তওবা করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা খুবই খুশী হন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা নূর-৩১)

বুখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি একদিনে ৭০ ব্যরেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।' মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর রাসূল বলেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করি।' (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে তিনি ভালোবাসেন' শিরোণাম থেকে 'আল্লাহর কাছে খুশীর বিষয় ও প্রিয় জিনিস' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো ক্ষমা চাওয়া। মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত সাহায্য যখন মানুষ লাভ করে, তখন বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক। ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দাহ্ নিজের দীনতা-হীনতাই প্রকাশ করে মহান আল্লাহর অসীমতা ও বিশালতার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে। মানবীয় চেষ্টা-সাধনা যে কোন অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল ও সীমিত। আর মহান আল্লাহর শক্তি, অনুগ্রহ অসীম-এ জন্যও মানুষকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এই ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে বান্দাহ্ তার সকল অহমিকা ও গর্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজের অসহায়ত্ব, দুর্বলতা, দীনতা, সঙ্কীর্ণতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে নিবেদন করে। বিনয় প্রকাশ ও ক্ষমা চাওয়ার কারণে মহাসত্যের বাহক নবী-রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের মন-মানসিকতায় এই বিশ্বাস ও চেতনা দৃঢ়তর এবং স্থায়ী হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই বিরোধিদের ওপরে তাদেরকে বিজয়ী ও আধিপত্য বিস্তারের সম্মান-মর্যাদা দান করেছেন।

এ জন্য সর্বাবস্থায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই বিনয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা মুমীনদের একটি স্থায়ী গুণ। মহান আল্লাহই মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের খেদমত করা সবার তকদীরে জোটে না। মহান আল্লাহ একান্ত অনুগ্রহ করে যাকে কবুল করেন, তার ভাগ্যেই জোটে ইসলামের খেদমত করা এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের আন্দোলনে শামিল হয়ে নিজেকে আল্লাহর

পথে উৎসর্গ করা। সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে এ কথা মনে স্থান দেয়া যাবে না যে, আমি দ্বীনি আন্দোলনের জন্য অনেক কিছুই করেছি। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যত বিরাট ত্যাগ স্বীকারই করা হোক না কেন, এ জন্য এই চিন্তাও করা যাবে না যে, আমি কিছু একটা করতে পেরেছি।

বরং এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে যে, তিনি অনুগ্রহ করে তাকে এই আন্দোলনে শামিল করেছেন। তাঁরই কাছে কাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাইতে হবে দিবারাত্রি অনুক্ষণ। কারণ মুসলিম হিসাবে তার ওপরে যে দায়িত্ব ছিল, সে দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না, বার বার ভুল হচ্ছে, আন্দোলনের কাজে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে, এসব দুর্বলতার জন্য পরকালে আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি যেন করতে না হয়, এ জন্য সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার লক্ষ্যে সে যে কাজটুকু করতে পারছে, এই কাজ যেন আল্লাহ কবুল করেন, এ জন্য বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে। যেমনভাবে আন্দোলনের কাজ আঞ্জাম দেয়া প্রয়োজন ছিল, তা দেয়া যাচ্ছে না, তার ওপরে মহান আল্লাহর যে হক ছিল, সে হক সে আদায় করতে পারছে না, এ জন্য মহান মালিকের দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুমীনের ভুল-ভ্রান্তি তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন-কেননা তিনি পরম ক্ষমাশীল।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, একমাত্র নবী-রাসূল ব্যতীত কোনো মানুষই গুনাহের উর্ধ্বে নয়। নিজের অজান্তেই ঈমানদার ছোট ছোট গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। ঈমানদার ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো বড় গুনাহ্ করে না। আল্লাহর প্রতি যারা বিদ্রোহী, তারা জেনে বুঝে হঠকারিতার সাথে গুনাহ্ করে এবং যে কোনো ধরনের গুনাহ্ করতে তাদের বিবেকে বাধে না। গুনাহ্ করার পরে তাদের ভেতরে অনুতাপও সৃষ্টি হয় না ফলে তারা তওবাও করে না। কিন্তু যারা ঈমানদার, তাদের দ্বারা কোনো ধরনের গুনাহ্ সংঘটিত হলে তাঁরা পেরেশান হয়ে পড়ে। এটি ঈমানদারদের একটি স্থায়ী গুণ। ঈমানদারদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ-وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ-وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -اُولٰئِكَ جَزَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ-

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোনো অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা তারা কোনো গুনাহ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসে, তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং তাঁর কাছে নিজেদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এসব লোক জেনে বুঝে নিজেদের অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের রব-এর কাছে এই নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগানে তাদেরকে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেককাজ যারা করে, তাদের জন্য কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে। (ইমরাণ-১৩৫-১৩৬)

ঈমানদারদের এটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে, যে কোনো ধরনের ভুল তাদের দ্বারা সংঘটিত হবার সাথে সাথে তাদের বিবেক আর্তচিৎকার করে ওঠে। আল্লাহর ভয়ে তাদের হৃদয় কম্পিত হতে থাকে এবং আল্লাহর কাছেই তারা তাদের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারণ তারা জানে যে, আল্লাহ যদি তাদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে। কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান বিবর্জিত অজ্ঞ অথবা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা খৃষ্টানদের অনুরূপ। খৃষ্টানরা যেমন বিশ্বাস করে যে, বেহেশ্তের চাবি হলো তাদের পুরোহিত-যাজক বা পাদ্রীদের হাতে-যাদেরকে তারা 'ফাদার' বলে সম্বোধন করে।

সারা জীবনব্যাপী যে কোনো ধরনের পাপ করলেও স্বয়ং স্রষ্টার কাছে তওবা করার কোনো প্রয়োজন নেই। ফাদারকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হলেই তাদের যাবতীয় পাপ তারাই স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবেন এবং বেহেশ্তের চাবি তাদের হাতে উঠিয়ে দেবেন। তাছাড়া স্বয়ং যীশু তাদের যাবতীয় পাপের কাফ্ফারা আদায় করেছেন, সুতরাং যতো পাপই করা হোক না কেন, যীশুর কারণে স্রষ্টা ক্ষমা করতে বাধ্য। ঐ শ্রেণীর তথাকথিত মুসলমানদেরও ধারণা ও বিশ্বাস হলো, পীর সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, মাজারে কিছু দান করলে অথবা মৃত বা জীবিত পীরের নামে ওরশ করলেই যাবতীয় পাপের ক্ষমা পাওয়া যাবে। পীর সাহেবই কিয়ামতের দিন আল্লাহকে বাধ্য করবেন (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) তার অনুসারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য। মানুষের এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে?'

এ জন্য ঈমানদাররা একমাত্র মহান আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। ঈমানদারদের আরেকটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা জেনে বুঝে একই অন্যায় বা ভুল অথবা পাপের কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। অর্থাৎ তারা যে ভুল একবার করে, দ্বিতীয়বার জেনে বুঝে সে

ভুল আর করে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল বলেন, ঈমানদারদের ভুল-ভ্রান্তি তিনি ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন এক জান্নাত তাদেরকে চিরকালের জন্য দান করবেন, যার নিম্নদেশে সব সময় ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। ঈমানদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ-

(তারা) আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসার বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজ্‌দায় অবনত, ভালো কাজের আদেশ দানকারী, খারাপ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী। (সূরা তওবা-১১২)

ঈমানদারদের প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী।' নেক কাজ হলো মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আর গুনাহের কাজ হলো শয়তানের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হলো শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলতে থাকা। ঈমানদার নিজের অজান্তেই যখন কোনো গুনাহ্ করে-অর্থাৎ শয়তানের ধোকায় পতিত হয়, সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে সে শয়তানের পথ থেকে ফিরে আসে। আল্লাহর দরবারে তওবা করে এবং ঐ ধরনের গুনাহে পুনরায় নিজেকে জড়িত না করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। ঈমানদার একবারই মাত্র তওবা করে না, বার বার তওবা করতে থাকে। তওবা শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা।

ঈমানহীন ব্যক্তি গুনাহ করে এবং সেই গুনাহের ওপর সে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার ভেতরে কোনো ধরনের অনুশোচনা সৃষ্টি হয় না, সে অনুভবও করতে সক্ষম হয় না কত বড় পাপ সে করেছে। এ কারণে ঈমানহীন ব্যক্তি একের পর এক পাপ করতেই থাকে এবং পাপের জগতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। ঐ জগৎ তার কাছে এমনি প্রিয় হয়ে ওঠে যে, পাপের জগৎ থেকে কেউ তাকে বিরত করার চেষ্টা করলে সে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঈমানদারের অবস্থার এর বিপরীত। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ঈমানদারকে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে এমন এক মানদন্ড তথা অনুভূতি শক্তি দান করেন, যে শক্তি তাকে সতর্ক করে দেয়, কোনটি খারাপ কাজ আর কোনটি ভালো কাজ। তার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তার বিবেক আর্তনাদ করে ওঠে। প্রবল অনুশোচনায় সে ভেঙ্গে পড়ে এবং বার বার মহান আল্লাহর দরবারে তওবা করতে থাকে।

কোরআন ও হাদীসে কোথাও ঈমানদার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি যে, তারা কখনোই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় কাজ করে না। বরং এ কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের

দ্বারা কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হলে তারা তওবা করে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। অর্থাৎ ঈমানদারও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে সে নয়। তার ভেতরেও কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি প্রবণতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ঈমানদার এসব প্রবণতার মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়। এগুলো সে ব্যবহার করে বটে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এবং মহান আল্লাহ যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন, সেই ক্ষেত্রেই তারা তা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এরপরও ভুল করে, অনিচ্ছা বশতঃ শয়তানের ধোকায় পড়ে এসব প্রবণতা আল্লাহর অপছন্দনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে সে তওবা করে।

ঈমনাদারের অবস্থা হলো, যখনই মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে তার পদস্খলন ঘটে, তখনই কালক্ষেপণ না করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথভ্রষ্ট হয়ে সেই ভ্রষ্ট পথকে সে স্থায়ীভাবে ধরে থাকে না এবং সে পথে সে অগ্রসরও হয় না। ঈমানদার যখন তওবা করে মহান আল্লাহ তখন খুবই খুশী হন এবং সে তওবা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে কবুল করা হয়। মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ভুল করলেন, কিন্তু তিনি সেই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেন না। অনুতাপ আর অনুশোচনা তাঁকে গ্রাস করলো। কিভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবেন, সেটাও তাঁর জানা ছিল না। মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে ক্ষমা চাওয়ার তথা তওবা করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ-اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

তখন আদম তার রব-এর কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করলো, তার রব তার এই তওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা-৩৭)

ঈমানদারও মানুষ এবং মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু শয়তানের অনুরূপ সেই ভুলের ওপর ঈমানদার প্রতিষ্ঠিত থাকে না। ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত খুশী হয়ে সে বান্দাহ্কে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ-

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাহ্দের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা রয়েছে। (সূরা শূরা-২৫)

তওবার অর্থ হলো, ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে, যে অপরাধ করেছে বা করে এসেছে তা থেকে বিরত হবে এবং ভবিষ্যতে আর তা করবে না। তাছাড়া সত্যিকার তওবার

অনিবার্য দাবি হচ্ছে কোনো ব্যক্তি পূর্বে যে অন্যায় করেছে নিজের সাধ্যানুসারে তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোনো উপায় বের করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজের ওপর যে কলঙ্ক লেপন করেছে তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে তওবার প্রধান শর্ত হলো, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তওবা করতে হবে। বৈষয়িক কোনো স্বার্থে কেউ যদি তওবা করে তাহলে সে তওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করা হবে না এবং সে ক্ষমাও লাভ করবে না।

মহান আল্লাহ্ হলেন গুনাহ্ ক্ষমাকারী ও তওবা কবুলকারী এবং এটা মহান আল্লাহর গুণ। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁর এই গুণ বর্ণনা করেছেন এবং এই গুনটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করে চলেছে তারা যেন নিরাশ না হয় বরং এ কথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এখানে এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, গুনাহ্ মাফ করা আর তওবা কবুল করা একই বিষয়ের দুটো দিক মোটেও নয়।

অনেক সময় মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তওবা ব্যতীতই বান্দার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনো ব্যক্তি ছোট ধরনের গুনাহও করে আবার সৎকাজও করে এবং তার সৎকাজ গুনাহ্ মাফ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এখন সে ব্যক্তির উক্ত গুনাহের জন্য তওবা করার বা ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ হোক আর না হোক। এমনকি সে ব্যক্তি যদি গুনাহের কথা ভুলেও গিয়ে থাকে, তবুও তার সৎকাজের কারণে তার ছোট গুনাহ্ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

অনুরূপভাবে পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির ওপর যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত, রোগ-ব্যাধি, স্বাস্থ্যহানী, মনোকষ্ট, দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, পথ চলতে হোচট্ খাওয়া বা আঘাত পাওয়া ইত্যাদি ধরনের যা কিছুই আসে, তা সবই সেই ব্যক্তির গুনাহ্ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বা এগুলো গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। এ কারণেই গুনাহ্ মাফ করার কথা আর তওবা কবুল করার কথা আল্লাহর কোরআনে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, তওবা ব্যতীতই অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তওবা করার পূর্বেই তিনি সব ধরনের লোকদের গুনাহ ক্ষমা করেন না। এই সুযোগটি শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য প্রযোজ্য। যাঁরা ঈমানদার, তাঁদের দ্বারা যখন কোনো ছোট গুনাহ্ সংঘটিত হয় এবং তারা যদি তওবা করতে ভুলে যায়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। আর ঈমানদারদের মধ্যেও তারাই কেবল এই সুযোগ লাভ করবে, যারা বিদ্রোহ করার মানসিকতা থেকে মুক্ত এবং যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়েছে–অহঙ্কার ও বার বার গুনাহ করার কারণে নয়।

(দুই) ঈমানদারদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাঁরা মহান আল্লাহর দাসত্বকারী।' ঈমানদার একমাত্র আল্লাহর গোলামী করে, আল্লাহর বিধানই অনুসরণ করে। যে কোনো প্রয়োজনে সে মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার চতুর্থ আয়াত–ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্ তাঈন-এর তাফসীর দেখুন।)

(তিন) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাঁরা মহান আল্লাহর প্রশংসার বাণী উচ্চারণকারী।' অর্থাৎ ঈমানদারের স্বভাব হলো, কোনো কাজের সূচনায় এবং সমাপ্তিতে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা। নিজের দেহ থেকে শুরু করে সৃষ্টির যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেদিকেই সে মহান আল্লাহর করুণার প্রকাশ ঘটতে দেখে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তার কণ্ঠ থেকে মহান আল্লাহর প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হতে থাকে। মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নে'মাত ব্যবহার করার ও ভোগ করার সময় সে আল্লাহর প্রশংসা করে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, এ ব্যাপারে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে গিয়েছেন। নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া, নতুন বস্ত্র পরিধান করা, পুরনো বস্ত্র ত্যাগ করা, পাদুকা পরিধান করা, আয়নায় নিজের চেহারা দেখা, কোথাও রওয়ানা করা, বাজারে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া, কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া ইত্যাদি কাজের সময় আল্লাহর রাসূল নানা ধরনের দোয়া পাঠ করতেন। এসব দোয়াসমূহ মহান আল্লাহর প্রশংসা সম্বলিত। ঈমানদারও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে। আল্লাহর প্রশংসা কেন করতে হবে এবং একমাত্র তিনিই কেন প্রশংসা লাভের অধিকারী, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীর দেখুন।

(চার) ঈমানদারের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাঁরা মহান আল্লাহর জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী।' পূত ও পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করাকে আরবী ভাষায় 'ছাইয়িহাত' বলা হয়। ঈমানদারের প্রত্যেকটি কাজের পেছনেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। সে যখন নিজের বাড়িতে অবস্থান করে, সেখানেও আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে এবং নিজ বাড়ি থেকে বা দেশ থেকে অন্যত্র গমন করে, সেখানেও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই গমন করে। মহান আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসার ঘটনোর উদ্দেশ্যে, জিহাদ করার উদ্দেশ্যে, মানুষের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে, দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এবং হালাল রিযিক অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈমানদার গমন করে থাকে।

পৃথিবীর নানা দেশে গমন করলে হালাল পথে অধিক অর্থোপার্জন করা যাবে এবং সেই অর্থে নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করা যাবে এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে তা ব্যয় করা যাবে, ঈমানদার তার অন্তরে এই লক্ষ্যেই বিদেশ গমন করে। মহান আল্লাহ

তা'য়ালা এই গোটা পৃথিবীতে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন, তা দেখে ঈমান দৃঢ়করণের উদ্দেশ্যেও ঈমানদার দেশ ভ্রমণ করে থাকে। যে স্থানে সে রয়েছে, সেখানে অবস্থান করে যদি আল্লাহর বিধান নির্বিঘ্নে পালন করা না যায়, ঈমানদার তখন প্রয়োজনবোধে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে। পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে, সেসব ধ্বংস স্তুপ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার লক্ষ্যেও তারা দেশ ভ্রমণ করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-هذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ-

অতএব তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো, আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। বস্তুত এটা লোকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাদের জন্য তা পথনির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ। (ইমরাণ-১৩৭-১৩৮)

ঈমানহীন লোকগুলো দেশ ভ্রমণ করে নিছক ভোগ-বিলাসের পরিধি বিস্তৃতির লক্ষ্যে অর্থোপার্জন করার উদ্দেশ্যে, আনন্দ-ফূর্তি লাভ, স্বাস্থ্য পরিবর্তন, দেহ ও মনের কামনা-বাসনা পূরণ ইত্যাদি বৈষয়িক উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে থাকে। আরেক শ্রেণীর লোক--যাদের ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, অথবা যে জ্ঞানটুকু অর্জন করেছে তা যথার্থ নয়, তারা সওয়াবের আশায়, মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে কবর যিয়ারতের জন্য দেশ ভ্রমণ করে থাকে। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা ও পীর ওলী বলে কথিত কবরে শায়িত মৃত লোকদের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীস অনুমতি দিয়েছে কিনা, অথবা কোনো নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাহাবাগণ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেছেন কিনা, তা অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করে না।

কবর যিয়ারত করা খুবই ভালো কাজ এবং ইসলামে কবর যিয়ারত করা বৈধ ও সুন্নাত সমর্থিত। পক্ষান্তরে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোরআন ও হাদীসের শিক্ষার অনুপস্থিতির কারণে আল্লাহর ওলী বলে খ্যাত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটছে, তা সম্পূর্ণ শির্‌ক-মারাত্মক ধরনের গুনাহ্। কবর যিয়ারত সম্পর্কিত যতগুলো সহীহ্ হাদীস রয়েছে, তা থেকে এ কথা জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবর যিয়ারতের অনুমতি ছিল না, পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا-(مسلم)

তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি কবর যিয়ারত করতে আগ্রহী হয়, তাহলে সে তা করতে পারে। কারণ কবর যিয়ারত মানুষকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসলিম)

কবর যিয়ারত করলে মন নরম হয় এ কারণে যে, যিয়ারতকারীর মনে মৃত্যু ও পরকালে জবাবদিহির ভয় সৃষ্টি হয়। মানুষের মনে যখন এই ভয় সৃষ্টি হয়, তখন সে মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে বাধ্য হয়। যাবতীয় অপরাধ থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং পরকালের আমল সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। মনে চিন্তা জাগে, কবরে শায়িত এই লোকগুলো একদিন তার মতোই জীবিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই পৃথিবীতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। একদিন তার নিজের পরিণতিও এমনই হবে। এ জন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কবরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো, কবরকে ফুল বা কাপড় দিয়ে সজ্জিত করা, কবরের ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করা, কবরকে সিজ্‌দা করা, কবরকে কিবলা বানিয়ে নামায আদায় করা, স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে।

কবরস্থানে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা বা অশালীন কথা বলার ব্যাপারেও হাদীসে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের নবী-রাসূল ও ধর্মীয় নেতাদের কবরের ওপরে উপাসনা গৃহ বানিয়েছে এবং পূজার স্থানে পরিণত করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম এই বিষয়টি সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে এবং যারা এ ধরনের কর্মকান্ডে লিপ্ত হবে, তাদের ওপরে স্পষ্ট লা'নত করা হয়েছে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেছিলেন-

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرى اتَّخَذُوْا قُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ-(مسند احمد)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অভিসম্পাত করেছেন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ওপর এ জন্য যে, তারা তাদের নবী-রাসূলদের কবরসমূহ মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী)

মুসনাদে আহ্‌মাদ-এ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশম্পাত করেছেন তাদের ওপরে যারা কবরের ওপরে মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করে।' হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল তাঁর উম্মতদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছেন-

اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَاِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ-(مسلم)

সতর্ক হও! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন নবী-রাসূল ও বুযর্গ লোকদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু তোমরা সতর্ক থেকো, কোনো অবস্থাতেই তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। এ ধরনের কর্ম থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি। (মুসলিম)

সুতরাং কবরকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান বা ওরশ করা যাবে না। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَتَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَانَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ-(نسائ-ابوداؤد)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। (অর্থাৎ কবরস্থানে নামায আদায় বৈধ নয় বলে সেখানে যেমন নামায আদায় করা হয় না, তেমনি নিজের ঘরকেও কবরস্থের মতো নামায শূন্য স্থানে পরিণত করো না, ঘরে অবশ্যই নফল নামায আদায় করবে।) আমার কবরকে কেন্দ্র করে মেলা বসাবে না, তোমরা আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে, যেখানে থেকেই তোমরা দরুদ প্রেরণ করো না কেনো, তা অবশ্যই আমার কাছে পৌছবে। (নাছায়ী, আবু দাউদ)

কবরকে কেন্দ্র করে কোনো কিছু নির্মাণ করাও নিষেধ করা হয়েছে। হযরত হাইয়্যাজ আল আমাদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে এক স্থানে প্রেরণের সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল আমাকে যে দায়িত্বের কথা বলেছিলেন, আমিও কি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করবো না? সেই দায়িত্ব হলো, সমস্ত মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে এবং উঁচু কবর ভেঙ্গে মাটির সমান করে দেবে। এ থেকে যেনো কোনো প্রতিকৃতি ও কোনো কবর রক্ষা না পায়।

সুতরাং কবরকে কেন্দ্র করে বর্তমানে যা কিছুই করা হচ্ছে, তা কোনো নবী রাসূল বা তাঁদের সাহাবাদের দ্বারা প্রমাণিত নয়। কবরকে কেন্দ্র করে কোনো অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে যাদের কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে, তারা এমন লোক যে, তাদের কথা বা কাজ শরীয়াতের দলীল হিসাবে গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। কবর যিয়ারতকারী কবরকে জড়িয়ে ধরবে না, সওয়াবের নিয়তে স্পর্শ করবে না বা চুম্বন করবে না। কবরবাসীকে সালাম জানিয়ে তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে-এতটুকুর মধ্যেই কবর যিয়ারত সীমাবদ্ধ রাখবে।

কিন্তু কবরবাসীর কাছে নিজের মনের আশা পূরণের ব্যাপারে বা মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চেয়ে কোনো ধরনের প্রার্থনা করা যাবে না। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোনো

ধরনের সাহায্য চাওয়া যাবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দূর পর্যন্ত বলেছেন, জুতার ফিতার প্রয়োজন হলেও তা আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই চাইতে হবে। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি কোনো কিছু প্রার্থনা করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, আর যদি তুমি কোনো সাহায্য চাও-ই, তাহলে সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে।

নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার মধ্যে এ কথা বলা হচ্ছে যে, 'আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।' অন্য দিকে বুযুর্গ বলে পরিচিত মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। যে সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তি তাদের গোটা জীবনকাল তাওহীদের শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যয় করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা যাবে না এবং তাঁর কাছে ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না-এ কথা শিক্ষা দিয়েছেন, মৃত্যুর পরে তাঁদেরই কবরের কাছে দাঁড়িয়ে এক শ্রেণীর মানুষ তাঁদের কাছে সাহায্য কামনা করছে।

মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য কামনা করা মারাত্মক অপরাধ। পৃথিবীতে জীবিত থাকাবস্থায় পার্থিব কোনো বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার তো একটা বৈষয়িক মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে এবং এ ধরনের সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ নয়-কিন্তু ইন্তেকাল করার পরে তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে সাহায্য চাওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? ইন্তেকালের পরে মানুষের রূহ্ আল্‌মে বরযখ নামক এক অদৃশ্য জগতে অবস্থান করে। সেখানে অবস্থান করে পৃথিবীর কোনো মানুষের কথাবার্তা, কাকুতি-মিনতি, আবেদন-নিবেদন, কোনো ধরনের প্রশংসা তারা শোনেন এবং ভক্তের প্রার্থনা অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন-এই ধারণা বা বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَنْ اَضَلُّ مِـمَّنْ يَّدْعُـوا مِنْ دُوْنِ اللّـهِ مَنْ لاَّ يَسْتَـجِيْبُ لَـه اِلَى يَوْمِ الْقِيمـةِ وَهُـمْ عَنْ دُعَائِـهِمْ غفِـلُوْنَ-

সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে-যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তার জবাব দিতে পারে না। বরং তারা এসব লোকদের দোয়া-প্রার্থনা সম্পর্কে কোনো কিছুই জানে না। (সূরা আহ্কাফ-৫)

আল্লাহর কোরআনে এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, 'তুমি মৃত লোকদের কোনো কথা শোনাতে পারো না।' যারা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্পর্কে যদি কেউ এই ধারণা পোষন করে যে, তারা ইন্তেকাল করার পরও এতটা ক্ষমতাশালী হয়ে থাকেন যে, সেই জগতেও তারা অলৌকিক ক্ষমতা বলে যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। এই ধারণা করার অর্থ হলো তাকে আল্লাহর সমতূল্য এবং আল্লাহর অনুরূপ ক্ষমতাশালী-এই ধারণা

করা যে মারাত্মক গুনাহ্ এবং শির্ক, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ধরনের ধৃষ্টতামূলক কর্মকান্ডে যারা জড়িত, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জালিম হিসাবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ-فَانْ فَعَلْتَ فَانَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه اِلاَّ هُوَ-وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِه-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যা তোমাকে কোনো উপকার দিতে পারে না, তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। তুমিও যদি তাই করো তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহর যদি তোমাকে কোনো বিপদে নিক্ষেপ করেন, তাহলে এমন কেউ নেই যে সেই বিপদকে দূর করে দিতে পারে। আর তিনিই যদি তোমার জন্য কোনো কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁর এই অনুগ্রহকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। (সূরা ইউনুস-১০৬-১০৭)

যখন কোনো বিপদ আসে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং কোনো কল্যাণ এলেও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে-ঈমানদার এটাই বিশ্বাস করবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه اِلاَّ هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহই যদি তোমার ক্ষতি সাধন করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তোমাকে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে, এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণের অংশীদার করতে চান, তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান। (সূরা আন'আম-১৭)

অর্থাৎ কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। এ সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জেনে রেখো, সমস্ত মানুষ যদি একতাবদ্ধ হয়ে তোমার কোনো কল্যাণ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তারা তা করতে পারবে না ততটুকু ছাড়া, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবেই সমস্ত মানুষ যদি একতাবদ্ধ হয়ে তোমার একবিন্দু ক্ষতি করতে ইচ্ছুক হয় তবুও তারা কিছুই করতে সক্ষম হবে না কেবল ততটুকুই ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।' সুতরাং মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে যা ঘটার তাই ঘটবে, এর বাইরে কিছুই হবে না। এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই যে, তা মানুষের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে।

অতএব মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না, সে মৃত নবী-রাসূল, ওলী, পীর, বুযুর্গ যিনিই হোন না কেনো। মানুষ মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে সাহায্য কামনা করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ-

তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদের অনুরূপই দাসানুদাস মাত্র। (সূরা আরাফ-১৯৪)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পৃথিবী থেকে যারা বিদায় গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে যারা ডাকে, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য আবেদন-নিবেদন জানায়, এসব কিছু তাদের কাছে মোটেও পৌঁছে না। তারা স্বয়ং ভক্তদের আহ্বান শুনতে সক্ষম নন এবং কোনো মাধ্যমেও তাদের কাছে এসব সংবাদ পৌঁছে না। এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন যা বলেছে তা অনুধাবন করতে হলে এভাবে বুঝতে হবে যে, পৃথিবীর সমস্ত মুশরিক মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব সত্তাকে ডাকে, তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়, সেসব সত্তা হলো তিন ধরনের।

প্রথম ধরনের সত্তা হলো ঐসব মূর্তি, মানুষ যেগুলোকে নিজের হাতে পৃথিবীর বস্তু সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করে তাদের প্রতি পূজা-অর্চনা নিবেদন করে, তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায় এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা পেশ করে।

পৃথিবীর বস্তু সামগ্রী দিয়ে যেসব উপাস্য নির্মাণ করা হয়, এরা হলো নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ বিশেষ। এসব উপাস্যের কোনোই ক্ষমতা নেই এমন কি তাদের দেহে একটি মাছি বসলেও তারা সেই মাছির উৎপাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এদেরকে কেউ আঘাত করে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেও এরা সামান্যতম প্রতিবাদ করতেও পারে না। সুতরাং এরা যে কোনো আহ্বান শুনতে পারে না, কারো কোনো ধরনের কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে না, এ কথা অবোধ শিশুর কাছেও সুস্পষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ-اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ-وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ-

হে লোকেরা! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো, তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল। (সূরা হজ্জ-৭৩)

দ্বিতীয় ধরনের সত্তা হলো ঐসব সৎকর্মশীল বুযুর্গ লোকজন, পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে জীবন পরিচালিত করতেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে নিজের জীবনকাল ও কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ কোরবান করেছেন। তাদের ইন্তেকালের পরে এক শ্রেণীর লোক তাদেরকে কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে ও সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি জানায়।

আল্লাহর মহান বুযুর্গ বান্দাহ্, পীর, ওলীদেরকে যারা আহ্বান জানায়, তাদের কাছে যারা সাহায্য কামনা করে তাদেরকে উপাস্যের আসনে আসীন করেছে, এসব মৃত ব্যক্তি দুইটি কারণে পৃথিবীর কোনো মানুষের আবেদন-নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না। প্রথম কারণ হলো, এসব সম্মানিত-মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ মহান আল্লাহর হেফাজতে এমন এক জগতে অবস্থান করছেন, যেখানে পৃথিবীর মানুষের আবেদন সরাসরি পৌঁছে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, তাঁদের নাম ধরে যারা ডাকে, তাদের কাছে সাহায্য চায়, দোয়া-প্রার্থনা করে, এসব বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ তাদের কাছে পৌঁছান না।

এর কারণ হলো, ঐ লোকগুলো তাঁদের গোটা জীবনকাল ব্যাপী অনুসারী ও ভক্তদের এ কথাই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে, একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে এবং তাঁর কাছেই দোয়া করতে হবে। তাঁদের বিদায়ের পরে তাঁর ভক্তরা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর শিক্ষা পরিহার করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এখন তাঁকেই ডাকছে, বিষয়টি যদি তাঁরা জানতে পারেন, তাহলে এটা হবে তাঁদের মনোকষ্টের কারণ। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কোনো প্রিয় বান্দার আত্মা কোনো ধরনের কষ্টানুভব করুক, এটা তিনি হতে দেবেন না। তবে পৃথিবীতে তাঁদের মাগ্ফিরাতের জন্য যারা দোয়া করে, তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে, তাঁদের জীবন ও কর্মের প্রশংসা করে, এসব তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের আনন্দের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়।

তৃতীয় ধরনের সত্তা হলো ঐ শ্রেণীর লোকজন, যারা পৃথিবীতে নিজেরা যেমন ছিল বিভ্রান্ত, ভুল পথে নিজের জীবন পরিচালিত করেছে, ভ্রান্ত মতবাদ-মতাদর্শ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে এবং জনগণের বিরাট একটি অংশকেও তার অনুসারী বানিয়েছে। যেমন ফেরাউন, নমরুদ, হামান, সাদ্দাদ, যুগের ফেরাউন ও তাদের ভক্ত এবং অনুসারীবৃন্দ বা তাদের অনুরূপ গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকজন। এসব লোক ইন্তেকাল করার পরে তাদের অনুসারীরা তাদেরকে উপাস্যের আসনে বসিয়ে, তার মূর্তি ও প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। তাদের কবরে ও মূর্তিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে, তাদের প্রশংসা করে গ্রন্থ রচনা করে, প্রচার মাধ্যমে স্তবস্তুতি পরিপূর্ণ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, নানা ধরনের আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে তার প্রতি এমন গুণ আরোপ করে যে, যে গুণের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা।

ইন্তেকালের পরে এই শ্রেণীর লোকদের কাছেও পৃথিবীর কোনো সংবাদ না পৌছারও দুইটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, এই লোকগুলো পৃথিবীতে জীবিত থাকতে নিজেরা যেমন মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি, তেমনি নিজের অনুসারী দলীয় লোকদেরকেও আল্লাহর পথে চলার নির্দেশ দেয়নি। ক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশের জনগণকেও আল্লাহর পথে চলতে না দিয়ে নিজের বা অন্যের বানানো আদর্শ অনুসারে চালিয়েছে। ইন্তেকালের পরে আসামী হিসাবে আল্লাহর কয়েদখানায় এসব লোক বন্দী রয়েছে এবং সেখানে পৃথিবীর কোনো সংবাদ পৌছে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, পৃথিবীতে তারা যে মতবাদ-মতাদর্শের, রীতি-পদ্ধতির ও চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে দল গঠন, সমর্থক তৈরীর কাজ করে গিয়েছে, তাদের এসব কাজের অগ্রগতির সংবাদ, প্রশংসা ইত্যাদি তাদের কাছে এ জন্য পৌছানো হবে না যে, এসব বিষয় তাদের জন্য সন্তুষ্টির কারণ ঘটবে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদের সন্তুষ্ট করবে না। কিন্তু তাদের মনোকষ্টের কারণ যা ঘটবে, তা তাদের কাছে পৌছানো হবে।

সুতরাং কবর যিয়ারত অবশ্যই করতে হবে কিন্তু তা হতে হবে ইসলাম প্রদর্শিত পন্থানুসারে। কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে কোথাও ভ্রমণ করা অনুচিত। মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনা করাই যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার জন্য নিজ স্থানে বসেই তো করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন্ জীবিত বান্দাহ্ পৃথিবীর কোন্ কোণায় বসে মৃত মানুষের মাগ্‌ফিরাতের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করছে, তিনি তা শোনেন এবং ইচ্ছা করলে তিনি যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে সক্ষম। 'কবরকে সামনে রেখে দোয়া করতে হবে'-মাগ্‌ফিরাত কামনার সাথে এই শর্ত কেন জুড়ে দিতে হবে?

এই শর্ত যারা জুড়ে দিতে চায়-তাহলে তো এ কথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা কবর ব্যতীত কবরে শায়িত ব্যক্তির জন্য মাগ্‌ফিরাত কামনা করলে তা গ্রহণ করবেন না, অথবা কবর থেকে দূরে অবস্থান করে দোয়া করলে সে দোয়া আল্লাহ্ শুনতে ও গ্রহণ করতে অক্ষম! (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

কোনো ব্যক্তি যদি কর্মব্যপ দেশে কোথাও গমন করে, তাহলে সেখানে অবস্থিত কারো কবর সে যিয়ারত করতে পারে, এতে কোনো নিষেধ নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশ ও কয়েকটি অমুসলিম দেশে মহান আল্লাহর ওলী ও বুযুর্গ বান্দাদের কবর রয়েছে। সেসব দেশে মানুষ যখন কোনো কারণে যাবে, তখন তাঁদের কবর যিয়ারত করবে-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের নিয়তে এককভাবে হোক আর দলবদ্ধভাবে হোক, ভ্রমণে বের হওয়া যাবে না। এই পৃথিবীতে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় বা সওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা যাবে না। সে তিনটি মসজিদ সম্পর্কে হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে-

لاَتَشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدُ الْحَرَمِ وَمَسْجِدِى هٰذَا وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى-(بخارى، مسلم)

মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশায় ভ্রমণ শুধুমাত্র তিনটি মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তাহলো মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্সা। এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো স্থানে ভ্রমণ করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

ঈমানদার এই তিনটি স্থান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা সওয়াবের আশায় ভ্রমণে বের হবে না। সে মক্কার কা'বাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে, মদীনার মসজিদে নববী ও বায়তুল মাক্দাসে মসজিদে আক্সা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করবে। কোনো ব্যক্তি যখন মদীনার মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হবে, তখন তো স্বাভাবিকভাবেই সে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের রওজা মোবারক যিয়ারত করবে। মক্কা ও মদীনায় আল্লাহর রাসূলের পবিত্র স্ত্রী ও সাহাবায়ে কেরামের কবর রয়েছে, সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁদের কবর যিয়ারত করবেন এবং কোনো ধরনের বেআদবী যেনো না ঘটে- সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(পাঁচ) ঈমানদারের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের জীবনকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় মহান আল্লাহর সামনে রুকু ও সিজ্দায় অবনত হয়ে। ঈমানদার যে মহান আল্লাহর গোলাম, সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আল্লাহর গোলামীর মধ্য দিয়েই সে পৃথিবীর জীবনের অবসান ঘটাতে চায়, নামায আদায়ই হলো তার বড় প্রমাণ। ঈমানদার শুধুমাত্র নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই আদায় করে না, সময়-সুযোগ এলেই সে আল্লাহকে সিজ্দা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। নফল নামায আদায় করে। বিশেষ করে তারা রাতের অধিকাংশ প্রহর রুকু, সিজ্দা ও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ-وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

তারা রাতকালে খুব কম সময়ই শয়ন করতো এবং তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য স্বত্ব ও অধিকার ছিল। (সূরা যারিয়াত-১৭-১৯)

ঈমানদাররা রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর যিক্র, কোরআন তিলাওয়াত ও নামাযের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতো। শেষ রাতে তারা আপন রব মহান আল্লাহর কাছে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতো যে, হে আল্লাহ! তোমার দাসত্ব করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার প্রতি

ছিল, তার হক আমি পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারিনি। তুমি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তারা যতটুকু সম্পদের অধিকারী, এই সম্পদ একান্তভাবেই সে এবং তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই ভোগ করার অধিকারী, এই চিন্তা সে কখনো মনে স্থান দিতো না। তার সম্পদে অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ও অসহায় লোকজনের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার সে আদায় করতো। প্রদর্শনীমূলকভাবে প্রশংসা লাভের জন্য সে দান করতো না, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই সে দান করতো।

(ছয়) ঈমানদারদের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সৎকাজের আদেশ দানকারী। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুসারে জীবন-যাপনকারী। এরা নিজেরা যেমন সৎকাজ করে, তেমনি অন্যকেও সৎকাজের দিকে আহ্বান জানায়।

(সাত) সপ্তম বৈশিষ্ট্য হলো, ঈমানদাররা অসৎ কাজে বাধা দানকারী। অসামাজিক কার্যকলাপ, নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ড বা দেশ ও জাতির পক্ষে ক্ষতির কার্যসমূহ কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে যেমন বন্ধ করা সম্ভব নয়, তেমনি কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে অসৎ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দলবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ শক্তির। একমাত্র সুশৃঙ্খল একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমেই সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে দুষ্কৃতিকারীদের বিরত রাখা সম্ভব। এ জন্য ঈমানদারকে এই দুইটি গুণের অধিকারী হতে হলে একটি সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত হতে হবে। তারপর সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে এবং অসৎকাজ থেকে অপরাধ প্রবণ লোকদেরকে বিরত রাখতে হবে। ঈমানদারের পক্ষে একাকী অবস্থান করায় যেমন সুযোগ নেই তেমনি একাকী এই দুটো গুণ অর্জন করার মতো পরিবেশও নেই।

(আট) ঈমানদারের অষ্টম বৈশিষ্ট্য হলো, মহান আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমান-আকিদা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, আনুগত্য-অনুসরণ, নৈতিকতা, সামাজিকতা, কৃষ্টি, সভ্যতা-সাংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, শ্রমনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থাৎ মানব জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঈমানদার সে সবের প্রতি পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রেখে জীবন পরিচালিত করে। নিজের ব্যক্তি জীবন যেমন মহান আল্লাহর সীমার মধ্যে পরিচালিত করে, তেমনি সমষ্টিগত জীবনও আল্লাহর দেয়া নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই পরিচালিত করে। কোনো একটি ক্ষেত্রেও সে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে বা আল্লাহর আইনের বিপরীত কোনো বিধানের অনুসরণ করে না।

ঈমানদার যেমন স্বয়ং আল্লাহর দেয়া সীমা রক্ষা করে চলবে, তেমনি আল্লাহর সীমা কেউ লঙ্ঘন করতে চাইলে তাকে বাধা দেবে এবং আল্লাহর সীমা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করবে। আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠিত করার পর তা সংরক্ষণ

করার জন্য নিজের সর্ব শক্তি নিয়োগ করবে। ঈমানদার যে পরিবার, সমাজ, দল ও রাষ্ট্র গড়ে তুলবে, সেখানে সে মহান আল্লাহর সীমা কার্যকর করবে এবং তা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রয়োজনে নিজের প্রাণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করবে। ঈমান আনার পরে এই আটটি গুণ অর্জন করা যেমন একান্ত প্রয়োজন এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করাও ঈমানের দাবি।

ঈমান ব্যক্তির মধ্যে স্থায়ী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে

এই পৃথিবীতে ঈমানহীন লোক যারা ছিল এবং বর্তমানেও যারা রয়েছে, চিন্তা-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়ে এরা দেউলিয়া। কোনো বিষয়ের প্রতি এদের বিশ্বাস স্থায়ী নয়-পরিবর্তনশীল। এদের কোনো সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও স্থায়ী দৃষ্টিকোণ নেই। এদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, নৈতিকতা, রীতি-পদ্ধতি, আদর্শ ইত্যাদি সমস্ত পরিবর্তনশীল। কোনো একটি চিন্তাধারার উপরে ঈমানহীন লোকগুলো কখনো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাধারার কারণে নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছে। প্রথমে এক ধরনের চিন্তাধারা প্রচার করেছে, কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই নিজেদের সেই চিন্তাধারাকে নিজেরাই ভুল বলে আখ্যায়িত করে দ্বিতীয় আরেকটি চিন্তাধারা প্রচার করেছে। পরিশেষে এরা নিজেরাই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি, তাদের কোন্ চিন্তাধারা সঠিক।

ঈমানহীন লোকগুলোর স্থায়ী দৃষ্টিকোণ যেমন নেই, তেমনি এরা হয় অত্যন্ত ভীরু এবং কাপুরুষ প্রকৃতির। এদের জীবনে কোনো দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত এলেই এরা কাটা কলা গাছের মতো নেতিয়ে পড়ে এবং মন ভাঙ্গা হয়ে যায়। ভয়ে আতঙ্কে এদের বুকের ভেতরে থর থর করে কাঁপতে থাকে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও দুর্বল ঈমানের লোকগুলো প্রায় একই প্রকৃতির। কারণ এই ধরনের লোকগুলো তক্দীরের প্রতি বিশ্বাসী নয়। এই পৃথিবীতে অতীত ও বর্তমানে আল্লাহর প্রতি ঈমানহীন যতো লোক ছিল এবং বর্তমানে রয়েছে, এদের পরস্পরের চিন্তা-চেতনাও এক নয় এবং এদের পরস্পরের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

এই পার্থক্যের পরিধি এতই বিশাল যে, তা কোনো দিনই একত্রিত হবার সম্ভাবনা নেই। এদের মধ্যেকার দূরত্ব কখনো কমবে না বরং বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। পৃথিবীর ঈমানহীন লোকগুলোকে দেখলে মনে হয় এরা একতাবদ্ধ, আসলে এদের পরস্পরের হৃদয় পরস্পর থেকে অনেক দূরে এবং একজনের চিন্তাধারার সাথে আরেকজনের চিন্তাধারার কোনো সাদৃশ্য নেই। এদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ-تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى-

পারস্পরিক বিরুদ্ধতায় এরা বড়ই কঠিন ও অনমনীয়। তুমি তো এদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করো, কিন্তু তাদের হৃদয় পরস্পর বিদীর্ণ। (সূরা হাশর-১৪)

স্বার্থের টানাপোড়েন এদের মধ্যে লেগেই থাকে ফলে কোনো একটি সিদ্ধান্তও তেমনি অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। ঈমানহীন লোকদের মধ্যে যারা দেশ ও জাতির নেতৃত্বের আসনে আসীন, দেশ ও জাতির নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এরা নিজ নিজ জাতির অঢেল অর্থ ব্যয় করে বৈঠকে মিলিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সংস্থা গঠন করে। কিন্তু স্বার্থবাদী ও কলুষিত মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়ার কারণে এদের পক্ষে সমস্যা বৃদ্ধি ব্যতীত কোনো একটি সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হয় না। কারণ একটিই আর তাহলো ঈমানের দিক থেকে এরা নিজেরা নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে। ঈমান থাকলে ঈমানের তাগিদেই এরা দুস্থ মানুষের সমস্যার সমাধানের লক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতো।

কিন্তু ঈমানদার লোকদের চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস অত্যন্ত স্পষ্ট। এর ভেতরে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা প্রচ্ছন্নতার কোনো কিছুই নেই। ঈমানদারের আকিদা-বিশ্বাস অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত, সুদৃঢ়, অপরিবর্তনীয় এবং চিরস্থায়ী। অধিকাংশ নবীর সাথে আরেকজন নবী ও রাসূলের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এবং তাদের মধ্যে কয়েক শত বছরের ব্যবধান রয়ে গিয়েছে, তবুও তাদের চিন্তা-বিশ্বাস, কথা ও দাওয়াতের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তাদের দৃষ্টিকোণ স্থায়ী। নবী-রাসূলের ক্রমধারা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু হয়েছে, তিনি যে কথা বলেছেন সেই একই কথা বলেছেন সর্বশেষে আগত নবী এবং যাঁর মাধ্যমে নবী-রাসূলের ক্রমধারায় পরিপূর্ণতা ও সমাপ্তি ঘটেছে, সেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সর্ব প্রথম আগত ও সর্বশেষে আগত দুই জন নবী-রাসূলের মাঝে অগণিত নবী-রাসূল-হেদায়াতকারী এসেছেন, কিন্তু তাদের কোনো একজনের কথার ভেতরে কোনো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়নি।

পক্ষান্তরে বিস্ময়ের বিষয় হলো, হাতে গোনা মাত্র দুই চারজন নবী-রাসূল ব্যতীত অধিকাংশ নবী-রাসূল ও হেদায়াতকারীর পরস্পরের সাথে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি এবং তাদের মাঝে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত ইউসুফ বা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত সালেহ্ আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের, তাঁর সাথে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের এবং তাঁর সাথে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা-সাক্ষাৎ যেমন ঘটেনি এবং এঁদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি রয়েছে সময়ের বিশাল ব্যবধান।

কিন্তু পৃথিবীর মানুষ অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে, এঁদের একজনের কথার সাথে আরেকজনের কথার, একজনের প্রচারিত আদর্শের সাথে আরেকজনের প্রচারিত আদর্শের অদ্ভূত সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য। এঁরা সবাই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দিকে মানব মন্ডলীকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানব মন্ডলীকে একই কথার দিকে ডেকেছেন–

يـٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلـٰهٍ غَيْـرُهُ–

হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। (সূরা হূদ-৮৪)

ঈমানদারদের আকীদা-বিশ্বাস এবং দৃষ্টিকোণের এটাই হলো মূল কথা যে, তাঁরা একমাত্র আল্লাহর গোলামী করবে এবং এটাই তাঁদের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস। ঈমানদারদের স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছেন এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই সমস্ত কিছু নিজ ইচ্ছা শক্তিবলে অস্তিত্ব দান করেছেন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন এবং সমস্ত কিছুর মাত্রা নির্ধারণ করে পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির রব, প্রতিপালক, সংরক্ষক ও পরিচালক। তিনি এক ও একক, তাঁর সমকক্ষ ও সাদৃশ্য কেউ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই সমীপে বিনয়াবত এবং তাঁরই অনুগত। জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর তাঁরই হাতে নিবদ্ধ এবং তিনিই ইচ্ছে করলে সম্রাটকে ভিখারী এবং ভিখারীকে সম্রাটে পরিণত করতে পারেন, যেখানে বিশালাকারের পর্বত রয়েছে সেখানে সাগর আর সাগরকে পর্বতে পরিণত করতে সক্ষম।

ঈমানদারদের এই চিন্তা-বিশ্বাস ও আকীদায় শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, এর ভেতরে কোনো অস্পষ্টতাও আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও পরিবর্তন ঘটবে না এবং কোনো অস্পষ্টতাও আসবে না। এটাই ঈমনাদারদের স্থায়ী দৃষ্টিকোণ ও প্রেরণার সবথেকে স্থায়ী শক্তিশালী উৎস। এই বিশ্বাস, চেতনা ও আকীদা সমস্ত মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি জগতের এই বিপুলতা ও বৈচিত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও একাত্মতার অনুসন্ধান করে, সমস্ত প্রাণ ও বস্তুর পশ্চাতে যে শক্তি ও মূলীভূত কার্যকারণ তা একান্তভাবেই জানার চেষ্টা করে। ঈমানদারগণ ইসলামের যে বিধান অনুসরণ করে, তার আকীদা মানব প্রকৃতি নিহিত এই প্রবণতার সত্য-সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর আর এর নামই হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের আকীদা।

মহান আল্লাহর একত্ব, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানব মন্ডলীকে সঠিক পথপ্রদর্শন ও পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকান্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি ও এরই ভিত্তিতে পুরস্কার এবং শাস্তি–এটাই এই আকীদার মর্মকথা। এই আকীদার মধ্যে কোনো ধরনের অসংলগ্নতা ও জটিলতার স্থান নেই। হাজার বছর পূর্বে যিনি

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল নির্বাচিত হয়েছেন, তিনিও এই আকীদাই পেশ করেছেন এবং তাঁর বিদায়ের হাজার বছর পরে যাঁকে নবী-রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, তিনিও অনুরূপ আকীদাই পেশ করেছেন। কোথাও কোনো কিছুর প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এই আকীদা কাউকে আহ্বান জানায় না, বরং সমস্ত কিছু বুঝে শুনে বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে গ্রহণ করতে বলে।

ঈমানদারদের এই আকীদা স্বভাবসিদ্ধ এবং মানব প্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানব প্রকৃতি এই দৃষ্টিকোণের সাথে অপরিচিত নয়, এর সাথে নেই কোনো বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ-সংঘাত। মানুষের প্রকৃতি ও গোটা বিশ্ব প্রকৃতি এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে নীরব সাক্ষ্য ঘোষণা করছে এবং মানুষের কর্তব্য হলো এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সরব ঘোষণা করা এবং ঈমানদার সেই ঘোষণাই দিয়ে থাকে তার প্রতিটি স্পন্দনে 'আল্লাহু আকবার' বলে। 'আল্লাহ মহান' অর্থাৎ সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছেন এমন এক একক সত্তা যিনি মহান এবং সমস্ত কিছুর ওপরে শক্তিশালী, তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এই দৃষ্টিকোণের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক তেমনি, যেমন সম্পর্ক মানব দেহের সাথে মস্তিষ্কের। মস্তিষ্ক ব্যতীত যেমন মানব দেহ অচল এবং এর কোনো মূল্যই নেই, তেমনি এই দৃষ্টিকোণ ব্যতীত বিশ্ব প্রকৃতির অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের এই দৃষ্টিকোণের ওপরই মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا-فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ-ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ-

তোমার পূর্ণ সত্তাকে নিবদ্ধ রাখো দ্বীনের জন্য, সর্বদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। এটাই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতি, যার ওপর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, আল্লাহর এই সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম নেই। এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। যদিও তা অধিকাংশ লোকই জানে না। (সূরা রুম-৩০)

এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা, প্রতিপালক, সংরক্ষক, নিয়ন্ত্রণকারী, দাতা, অনুগ্রহকারী, আরোগ্যকারী, উপাস্য, আনুগত্য গ্রহণকারী, দাসত্ব লাভের অধিকারী নেই-এই প্রকৃতির ওপরই সমগ্র মানব মন্ডলীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই প্রকৃতির ওপরই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে-এটাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ যদি স্বেচ্ছাচারীভাবে জীবন পরিচালনার নীতি অবলম্বন করে তাহলে সে তার নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যদি সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির দাসত্বের শিকল কণ্ঠে পরিধান করে,

তাহলেও সে নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করবে। ঈমানদারের এটাই স্থায়ী দৃষ্টিকোণ। এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন-

مامن مولود يولد الا على الفطرة فابواه يهود انه اوينصرانه اويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء-

মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানব শিশু প্রকৃতপক্ষে মানবিক প্রকৃতির ওপরই জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতাই তাকে পরবর্তী সময় ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসাবে গড়ে তোলে। (বুখারী, মুসলিম)

আরবে সে যুগেও ছিল এবং বর্তমানেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অজ্ঞ লোকদের মধ্যে এই কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে যে, তাদের গৃহপালিত কোনো পশু বাচ্চা প্রসব করলেই তারা তার কানের কিছু অংশ কেটে দেয়। অথচ সেই বাচ্চা পৃথিবীতে নিঁখুত আকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে। অনুরূপভাবে মানব শিশুও নিজ প্রকৃতিগত কারণে মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবেই পৃথিবীতে আগমন করে। পরবর্তীতে তার মাতা-পিতা ও অভিভাবকই তাকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত শিক্ষা দেয় এবং সেই পথেই পরিচালিত করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانها فابواها يهودانها اوينصرانها-

প্রতিটি প্রাণসত্তা প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি যখন কথা বলতে শেখে তখন তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানে পরিণত করে।

সুতরাং ঈমান ব্যতীত কোনো মানুষের ভেতরে স্থায়ী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারে না। যে কালিমা পাঠ করে ঈমান আনা হয়, সেই কালিমার কারণে এই পৃথিবীতে ঈমানদার একটি স্থায়ী দৃষ্টিকোণ একটি সুস্পষ্ট চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও আকীদা এবং একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ লাভ করে থাকে। মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান বের করতে এবং প্রতিটি জটিলতাকে সহজ-সরল করে তুলতে এই দৃষ্টিকোণই সর্বাগ্রে অধিক ভূমিকা রাখে। যে কালিমা সে পাঠ করে ঈমান এনেছে, সেই কালিমার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসই ব্যক্তির ভেতরে নীতি-নৈতিকতার দৃঢ়তা ও চরিত্রের অনমনীয়তা সৃষ্টি করে দেয়। মহাকালের আবর্তন ও বিবর্তন এর ভিত্তিকে কোনোক্রমেই শিথিল করতে পারে না, বরং এর সাহায্য-সহযোগিতায়

জীবন পরিচালনার জন্য এমন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নীতি-আদর্শ লাভ করা সম্ভব হয়, যা একদিকে ব্যক্তির হৃদয় ও মন-মস্তিষ্ককে পরম প্রশান্তি, স্বস্তি, নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা দান করে।

অন্য দিকে ব্যক্তিকে চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম ও কর্ম পথে বিভ্রান্ত হওয়া, বিচ্যুত হওয়া, আঘাতের পর আঘাত খাওয়া এবং বারবার দল, নীতি-আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতি পরিবর্তন করার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে। এরপর ব্যক্তি যখন পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত করে মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে পরকালের পটভূমিতে পদার্পণ করবে, তখন সেখানে তাকে কোনো ধরনের অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, দুঃখ-যন্ত্রণা ও কাতরতার সম্মুখীন হওয়া থেকেও হেফাজত করবে। কারণ পৃথিবীর জীবনে সে যে অপরিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছেন, তার সেই আশা-আকাঙ্খার অনুরূপ ফলই সে পরকালের জীবনে লাভ করবে। এ কারণে পরকালের জীবনে তাকে কোনো ধরনের অস্বস্তি স্পর্শ করবে না। আখিরাতের জীবন সম্পূর্ণভাবে নতুন এক জীবন হলেও ঈমানদার স্থায়ী দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করার কারণে এমনভাবে সেই জীবনে প্রবেশ করবে, মনে হবে সে যেন এই জীবনে অভ্যস্থ, এই জীবন সম্পর্কে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে কি অপেক্ষা করছে, তা সে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল।

জলযান আরোহী ব্যক্তির যদি সাগরের উত্তাল উর্মিমালার সাথে পূর্ব পরিচয় না থাকে, তাহলে সাগরের প্রচন্ড তরঙ্গ দর্শনে সে স্বাভাবিকভাবেই নিজ জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়বে। আর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে জলযান আরোহী নিশ্চিন্ত মনে সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার উত্তাল নৃত্য দেখতে থাকবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার তার স্থায়ী দৃষ্টিকোণের কারণে পরকালীন জীবনের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করবে কিন্তু কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর জীবনে ঈমান না থাকার কারণে যাদের স্থায়ী দৃষ্টিকোণ ছিল না, পরকালীন জীবনে তাদের অবস্থা পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন বিক্ষুব্ধ সাগর ভ্রমণকারীর থেকেও ভয়ানক হবে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তারা নিশ্চিত ধ্বংসই শুধু দেখতে পাবে। ঈমানদার তার স্থায়ী দৃষ্টিকোণের কারণেই পৃথিবী ও আখিরাত-উভয় স্থানেই দুশ্চিন্তাহীন জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ-

ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ এক সুদৃঢ় বাণীর ভিত্তিতে পৃথিবী ও আখিরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। (সূরা ইবরাহীম-২৭)

আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা হলো, কোনো জিনিস ক্রয়কালে তা যথাযথ, অকৃত্রিম ও ক্রটিযুক্ত কিনা তা বার বার পরীক্ষা করে তারপর ক্রয় করে। লেখাপড়া না জানা নিরক্ষর বা আকাট মুর্খ ব্যক্তিও জমি ক্রয়কালে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর তা ক্রয় করে। কোনো মেশিনারীজ ক্রয়কালে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করে তা ক্রয় করে। মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে মৃত্তিকা নির্মিত স্বল্প মূল্যের পানির পাত্র নানাভাবে পরীক্ষা করে অবশেষে তা পানি দ্বারা পূর্ণ করে পরীক্ষা করে দেখে কোনো ছিদ্র রয়েছে কিনা। এভাবে পরীক্ষা করে তবেই মানুষ কোনো জিনিস ক্রয় করে। বস্তুর যথার্থতা প্রমাণের জন্য বিক্রেতার সনদই যথেষ্ট-এই থিউরীতে একজন ক্রেতাও বিশ্বাস করে না। সামান্য অর্থ ব্যয় করে কোনো জিনিসই যাচাই না করে মানুষ ক্রয় করে না। এই যদি হয় মানুষের বাস্তব অবস্থা, তাহলে 'ঈমান এনেছি' এইটুকু কথার বিনিময়েই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহ্কে জান্নাত দিয়ে দেবেন, এই আশা কিভাবে পোষণ করা যায়?

একজন লোক বললো, 'ঈমান এনেছি' অমনি সে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে গেলো-আর তার ঈমানের কোনো পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না, এই ধারণা পোষণ করার কোনোই অবকাশ নেই। ঈমানদারকে অবশ্যই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের আগমন যখন ঘটেছে আর যারা ঈমানের দাবি করেছে, তাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ ঈমানের দাবি করবে, তাদেরকেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ-وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ-

লোকেরা কি মনে করেছে, 'আমরা ঈমান এনেছি' কেবলমাত্র এ কথাটুকু বললেই ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি, আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক। (আনকাবুত-২-৩)

ঈমান আনার কারণে মক্কায় যখন ঈমানদারদের ওপরে নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের ভয়াবহ স্টীম রোলার চালানো হচ্ছিলো, তখন ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রথম দিকে মক্কায় যে কোনো ব্যক্তি ঈমান আনলেই তার ওপর নানা ধরনের জুলুম অত্যাচার, নির্যাতন আর নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। অর্থ-বিত্তহীন কোনো মানুষ যদি ঈমান আনতো, তার ওপরে দৈহিকভাবে লোমহর্ষক নির্যাতন করা হতো। কোনো

দিনমজুর ঈমান আনলে শ্রমের বিনিময়ে মজুরী তো দেয়া হতোই না, মজুরীর বিনিময়ে জুটতো দৈহিক প্রহার। কোনো ক্রীতদাস ঈমান আনলে তাকে বেঁধে দিনের পর দিন দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হতো, এমনকি মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপরে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো।

স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী ও দিনমজুরদের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হতো। এসব লোক অনাহারে-অর্ধাহারে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধুকে ধুকে মরতো, তবুও ইসলাম বিরোধী লোকগুলোর হৃদয়ে সামান্য মমতার উদ্রেক হতো না। কোনো প্রভাবশালী লোক ঈমান আনলে সামাজিকভাবে যেমন তাকে অপমানিত নিগৃহীত করা হতো, তেমনি তার নিজ পরিবারের লোকজন তার সাথে এমন অমানবিক ব্যবহার করতো যে, তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতো। আগুনের অঙ্গার বানিয়ে তার ওপরে কোনো কোনো ব্যক্তিকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের ওপর পাথর চাপা দেয়া হতো। দেহের গোস্ত আর চর্বি গলে গলে আগুন নিভে যেতো, তবুও নির্যাতনকারীরা নির্যাতন বন্ধ করতো না। এভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে মক্কায় এমন এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, কোনো মানুষের পক্ষে প্রাকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দেয়া চরম কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যারা অনুভব করতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই মহান আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর ওপরে কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে-প্রকৃত সত্য অনুধাবন করার পরও ভয়াবহ নির্যাতনের ভয়ে তারা ঈমানের ঘোষণা দিতে সক্ষম হতো না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবাগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে সামান্য দোদুল্যমানতাও সৃষ্টি করেনি, তবুও মানবিক প্রকৃতির কারণে অধিকাংশ সময় তাদের ভেতরেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এই নির্যাতনের অবসান কবে ঘটবে-এই চিন্তায় অনেকেই পেরেশান হয়ে যেতেন। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, মক্কায় ইসলাম বিরোধিদের নির্মম অত্যাচারে আমরা ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। এ সময় একদিন আমি দেখলাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।

তাঁকে দেখে আমি তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না?' আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিম আভা ধারণ করলো। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের ভেতরে যারা ঈমান এনেছিল তারা এর থেকেও অধিক নির্যাতিত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে আবক্ষ গেড়ে তারপর তাদের মাথা করাত দিয়ে চিরে দুই টুকরো করে দেয়া হতো। কারো কারো দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো। ঈমান ত্যাগ করার জন্য তাদের ওপরে

এভাবে নির্যাতন করা হতো। আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই সফল হবে এবং একজন ব্যক্তি একাকী নিশঙ্ক চিত্তে সান'আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত যাতায়াত করবে, তখন তার মনে একমাত্র মহান আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কোনো ভয় থাকবে না।'

অর্থাৎ মানুষকে সমস্ত দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার ও যাবতীয় শোষণ, নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ও ভীতি থেকে মুক্ত করে একটি শোষণহীন নিরাপত্তাপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী ভীতিহীন কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত কুফরী মতবাদ ও মতাদর্শের কবর রচনা করে কোরআনকে বিজয়ী করার জন্য। সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে-তবে এর জন্য কোরবানী করতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এই ত্যাগ শুধু তোমাদেরকেই স্বীকার করতে হচ্ছে না। তোমাদের পূর্বে যারা এ কাজ করেছে, তাদেরকেও তোমাদের তুলনায় অধিক মূল্য দিতে হয়েছে। সুতরাং ধৈর্যহারা হয়ো না। সফলতা ইন্‌শাআল্লাহ আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারপর এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, মানুষের মনে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর অন্য কোনো ভয় অবশিষ্ট ছিল না। যে সমাজে মানুষের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না, কথায় কথায় যুদ্ধ নামক সন্ত্রাস মানব সমাজকে গ্রাস করতো। পথে প্রান্তরে নারী ধর্ষিতা হতো। শক্তি প্রয়োগ করে অপরের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং নারী ও শিশুদেরকে ধরে নিয়ে দাস-দাসী হিসাবে বিক্রি করা হতো। সেই বর্বর সমাজের লোকগুলো ঈমানের স্পর্শে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলো। যাদের স্বভাব ছিল আগ্রাসী, তারা জমাট বাঁধা বরফের মতোই শান্ত হয়ে গেলো। অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল যাদের কাজ, তারা হয়ে গেলো অপরের সম্পদের প্রহরাদার। নারীর কোমল দেহকে যারা খুবলে খেতো, তারাই হয়ে গেলো নারীর সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষাকারী জানবাজ সৈনিক।

একজন সুন্দরী তন্বি তরুণী ষোড়শী যুবতী মূল্যবান বস্ত্রে আর অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে দিবাবসানে গোধূলী লগ্নে নির্জন পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে একাকী আত্মীয় বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ছেয়ে যাচ্ছে। যুবতী দ্রুত গতিতে তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বেশ দূরে এক সুন্দর সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। যুবক তার দিকেই ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। যুবতী আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। চারদিকে সে তাকিয়ে দেখলো, তাকে সাহায্য করার মতো কেউ কোথাও নেই। আত্মরক্ষা করার মতোও কোনো স্থান নেই।

যুবতীর মনে ধারণা এলো, এই যুবকের হাতে তার মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেমন লুণ্ঠিত হবে, তেমনি সে এই যুবক কর্তৃক নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে আজ ধর্ষিতা হবে। ভয়ে

যুবতীর চেহরা থেকে রক্ত সরে গেলো। আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে যুবতী রাস্তার ওপরেই বসে পড়লো। যুবক ধীর পায়ে যুবতীর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর ভয়বিহ্বলা চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতা সিক্ত কণ্ঠে বললো, 'মা, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি কোথায় যাবে বলো-আমি নিরাপত্তার সাথে প্রহরা দিয়ে তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থলে পৌছে দিয়ে আসবো। আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, আমার পরিচয় শোনো-আমি একজন মুসলমান।'

ঈমান মানুষকে এভাবেই পরিবর্তন করেছিল আর ঈমানদারদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ ধরনেরই সমাজ ও রাষ্ট্র-যা পরিচালিত হতো মহান আল্লাহর কোরআন দিয়ে। কিন্তু এই ধরনের ঈমান শুধুমাত্র নামাজ-রোজা আর হজ্জ আদায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ময়দানে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়। সেখানেই প্রমাণ হয়ে যায় ঈমান কতটা শক্তিশালী। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে ঈমানদারদের ওপরে নির্যাতন এসেছে, ঈমানদার নিষ্পেষিত হয়েছে, তার দেহ থেকে রক্ত ঝরেছে, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। মানবিক দুর্বলতার কারণে ঈমানদারের ভেতরে চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, তার এই চিত্তচাঞ্চল্যকে অটল অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আনকাবুতের দুই ও তিন নম্বর আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র মৌখিক ঈমানের দাবির ভিত্তিতে সেসব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিনিময় লাভ করতে পারে না।

পুরস্কার বা বিনিময় লাভের অধিকারী সে তখনই হবে, যখন সে ঈমানের পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে নিজের দাবির সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা তথা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যেমন সহজলব্ধ নয়, তেমনই আল্লাহর জান্নাতও এমন সস্তা জিনিস নয় যে, কোনো ব্যক্তি ঈমানের দাবি করবে-আর অমনি তাকে পৃথিবীর জীবনে বিশেষ অনুগ্রহ ও পরকালীন জীবনে জান্নাত দিয়ে দেয়া হবে। এই পৃথিবীর জীবনে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ করতে হলে, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে-কঠিন পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয়ে ঈমানের দাবিতে অটল থাকতে পারলেই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে।

ঈমানদার যখন ঈমানের দাবি অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করবে, তখন নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট তার জীবনে আসবে, এসব কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে হবে। প্রয়োজনে লোমহর্ষক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী ঈমানদারকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেবে, নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের জালে আট্‌কানোর চেষ্টা করবে। এসব কিছু হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করতে হবে। এমন প্রত্যেকটি জিনিস, যা নিজের একান্ত

প্রিয় ও পছন্দের, তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোরবান করতে হবে। এমন প্রত্যেকটি কষ্ট ও মুসিবত যা ঈমানদার অপছন্দ করে এবং যা অনভিপ্রেত, তা মহান আল্লাহর জন্যই মেনে নিতে হবে। এসবের মাধ্যমেই যাচাই করা হবে, কে ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

ঈমান আনার কারণে দৈহিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, এরপর শেষ সম্বল পৈতৃক ভিটা-বাড়ি ত্যাগ করে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা থেকে মদীনায় নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করতে হয়েছে। এই অবস্থায় একদিকে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রকট, চারদিকে প্রাণের দুশমনরা ওৎপেতে রয়েছে, মদীনার ভেতরে ইয়াহুদী কালনাগিনীরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে, মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা ষড়যন্ত্রের কালো থাবা বিস্তার করছে, এসব মিলিয়ে ঈমানদারদের এক করুণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল মদীনায়। ঠিক এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদেরকে জানিয়ে দিলেন-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ-مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَه مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ-اَلاَ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ-

তোমরা কি মনে করেছো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা ও দুঃখ-কষ্টের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথের যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখনই তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি কাছেই। (সূরা বাকারা-২১৪)

ইসলাম বিরোধী শক্তি এমন নির্যাতন শুরু করেছিল যে, শুধু ঈমানদার লোকজনই নয়, স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূল পদে অধিষ্ঠিত মহামানব যিনি, তিনিও নির্যাতনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মহান আল্লাহর সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ওহূদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের পরে ইসলাম বিরোধী শক্তি অতি উৎসাহী হয়ে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে ভয়ঙ্কর তৎপরতা শুরু করেছিল। এই অবস্থায় ঈমানদারদেরকে বলা হয়েছিল-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ-

তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে ধৈর্যশীল? (ইমরাণ-১৪২)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে ঈমানদারদের মনে একটি চূড়ান্ত সত্য বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, পরীক্ষা হচ্ছে এমন এক মানদন্ড যার মাধ্যমে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যাচাই করে নেয়া যায়। যা কৃত্রিম তা অন্য কোনো পথে স্থায়ীভাবে না হলেও সাময়িকভাবে টিকে থাকে, কিন্তু মহান আল্লাহর পথে আন্দোলনের রক্তঝরা আর ত্যাগের ময়দানে মুহূর্তকাল টিকে থাকতে পারে না। আন্দোলনের ময়দানে অবিচল অটলভাবে টিকে থাকে একমাত্র খাঁটি-অকৃত্রিম ঈমান। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ঈমানদার এমন সব পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়, যে পুরস্কার শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের জন্যই নির্ধারিত রেখেছেন। ঈমানদার কখনো বাতিলের সামনে মাথানত করে না এবং সে মাথানত করে না বলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত পুরস্কারের অংশীদার হবে। যতো বড় পরীক্ষা-ই আসুক না কেনো, পরীক্ষায় নিমজ্জিত ঈমানদারের অবস্থা সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

বাতিলছে দাবানেওয়ালে আয় আছমাঁ নেহি হাম
ছওবার কার চুকা হায় তু ইমতে হাঁ হামারা।

হে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা! মিথ্যার কাছে আমরা কখনো পরাজয় স্বীকার করিনা, তুমি বহুবার তা পরীক্ষা করে দেখেছো।

এই পরীক্ষার বিষয়টি নতুন কোনো বিষয় নয়। ঈমানদারদের ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তেই এই পরীক্ষা সংঘটিত হতে থাকে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবি করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, পরীক্ষা নামক আগুনের কুন্ডে জ্বলে পুড়ে অকৃত্রিম সোনায় পরিণত হতে হয়েছে। নবী-রাসূল ও তাঁর সাহাবাদেরকে এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের লোকদেরকেও যখন পরীক্ষা ব্যতীত বিজয় দেয়া হয়নি, তাহলে বর্তমান যুগের ঈমানদারদের এমন কি বিশেষত্ব রয়েছে যে, এদেরকে পরীক্ষা না করেই শুধুমাত্র মৌখিক ঈমানের বিনিময়েই আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবী ও আখিরাতে বিজয় দান করবেন?

ঈমান আনার পরে কে ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী, অর্থাৎ পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হয় আর কে ব্যর্থ হয়, তা অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা দেখতে চান। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন্ ব্যক্তি ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে আর কে ব্যর্থ হবে, এ কথা তো মহান আল্লাহর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে–অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তো সবই জানেন, তাহলে আবার পরীক্ষার প্রয়োজন কেন?

বিষয়টি হলো, যতক্ষণ কোনো এক ব্যক্তির মধ্যে কোনো কাজের ব্যাপারে শুধুমাত্র কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বাস্তব কার্যক্ষেত্রে তার প্রকাশ হয় না ততক্ষণ বিবেক-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি যেমন কোনো ধরনের পুরস্কার লাভ করতে পারে না, তেমনি কোনো ধরনের শাস্তি লাভেরও যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন জনকল্যাণমূলক একটি কাজ করার বুদ্ধি, শক্তি, যোগ্যতা ও অন্যান্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ এক ব্যক্তির আয়ত্বে রয়েছে, শুধু এসব কারণেই সেই ব্যক্তিকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয় না। পুরস্কারের জন্য তখনই মনোনীত করা হয়, যখন সে তা বাস্তবে করে দেখায়।

আবার মানুষকে হত্যা করার জন্য যে ধরনের উপায়-উপকরণ, বুদ্ধি, শক্তি ও যোগ্যতা এক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে, এসব থাকার কারণেই সেই ব্যক্তির প্রতি কোনোরূপ শাস্তির দন্ডবিধি প্রয়োগ করা যায় না। তখনই তার প্রতি শাস্তির দন্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে, যখন সে ব্যক্তি আরেকজনকে হত্যা করবে।

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর এক বান্দাহ্কে হত্যার অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য শাস্তি প্রয়োগ করবেন, আর আরেক বান্দাহ্কে শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য পুরস্কার দান করবেন, এই ধরনের কাজ আল্লাহ তা'য়ালা কখনো করেন না এবং এই ধরনের কাজ তাঁর ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের বিরোধী। পুরস্কার ও শাস্তি লাভের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোনো বান্দাহ্কে বিনিময় দেবেন না, তখনই তিনি বিনিময় দেবেন, যখন সেই বান্দাহ্ বাস্তবে তা সংঘটিত করবে।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সমস্ত বান্দাহ্দের ভবিষ্যৎ কর্মনীতি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। যদি আরো ৫০০ কোটি বছর পরে কিয়ামত সংঘটিত হয় এবং কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্ব মুহূর্তে যে মানব শিশুটি পৃথিবীতে আগমন করবে, পৃথিবীতে তার কর্মনীতি কি হতো, সে ঈমানদার হতো না কাফির হতো, সে জ্ঞানও মহান আল্লাহ্ সংরক্ষণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ করে তাঁর কোনো বান্দাহ্কে শাস্তি বা পুরস্কার দেন না। এভাবে মানুষকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হলে শাস্তিপ্রাপ্ত বান্দাহ্ তো আল্লাহর দরবারের অভিযোগ করে জানতে চাইবে, কেনো তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ যেনো কোনো মানুষ করতে না পারে, এ জন্যই পৃথিবী নামক পরীক্ষাগারে মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছে, যেনো তারা বাস্তবে কি ধরনের কর্মনীতি অনুসরণ করে–তা তারা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারে।

শিক্ষক তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার ক্লাসের বিজ্ঞানের সব থেকে মেধাবী ছাত্র সম্পর্কে নিশ্চিত থাকেন যে, এই ছাত্রটি প্রাক্‌টিক্যাল পরীক্ষায় সবচেয়ে অধিক নম্বর পাবে। কিন্তু শিক্ষক শুধু তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সেই ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ না করে তাকে নম্বর দিয়ে

দেন না। প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষা গ্রহণ করে তবেই তার খাতায় নম্বর দেন। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে পাপ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে, এ কারণেই তাকে আল্লাহ তা'য়ালা গ্রেফতার করবেন না। যতক্ষণ না সেই মানুষ তার যোগ্যতা ও ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশ না করছে। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যাই অধিক, যারা মুখে ঈমানের দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ امَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-

এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (সূরা বাকারা-৮)

মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু পৃথিবীতে সামান্য স্বার্থের কারণে ঈমান বিক্রি করে দেয়। নির্বাচনের সময় একটি সিগারেট, লুঙ্গি, শাড়ী ও মাত্র কয়েকটি টাকার বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করে এমন লোককে ভোট দেয়, যারা ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামের মূলোৎপাটন করবে। মুখে ঈমানের দাবি করছে, নামায, রোযা, হজ্জ আদায় করে সাধারণ মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, তারা ঈমানদার। কিন্তু যখনই কোনো বিপদ-মুসিবত দেখা দিচ্ছে, স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, নির্যাতিত হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, অমনি তারা বিপদ মুক্ত থাকার জন্য দ্বীনি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিচ্ছে।

মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে, নিজেকে সাচ্চা ঈমানদার বলে জাহির করছে, কিন্তু মুসলমানদের বিপদের সময় কচ্ছপের মতোই মাথা গুটিয়ে নিচ্ছে-মৌখিক প্রতিবাদও করছে না। শক্তিশালী অমুসলিম রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু দেখেই ঈমানের দাবিদার অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ঈমানের দাবির বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে নির্যাতন করছে, তাদেরকে গ্রেফতার করে ইসলামের শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এসব লোকদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُوْا امَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ-

লোকদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহীত হয়েছে তখনই লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে। (সূরা আনকাবুত-১০)

ঈমানের দাবিদার, মুখে দাড়ি, সুন্নতি পোষাকে দেহ আবৃত, কপালে নামাযের দাগ, কথনে কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি, মসজিদে সামনের কাতারে, মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আসীন, মুসলমানদের অর্থে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করছে, হজ্জ আদায় করে আসছে, অথচ বিশ্বব্যাপী

মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছে, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এবং সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, মুসলমানদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে-কিন্তু তারা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরে থাক, মৌখিক কোনো প্রতিবাদও করছে না। ইসলামের দুশমনদের উচ্ছিষ্ট ভোগী এসব লোক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে ইসলামের দুশমনদেরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হয়। আল্লাহর আযাবের তুলনায় এরা দ্বীনের শত্রুদের আযাবকে অধিক ভয়াবহ মনে করে। এসব লোকের অন্তরে ঈমানের কোনো আলো নেই, এরা সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করে না। এদের সম্পর্কেই ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন-

জিনকো আতা নেহিঁ দুনিয়া মেঁ কো-ই ফন তুম হো
নেহি জিছ কওম কো পরওয়ায়ে নেশীমান তুম হো।
বিজলিয়াঁ জিছ মেঁ হোঁ, আছুদাহ উও খিরমান তুম হো
বেচ খাতে হেঁ জো আছলাফ কে মদফন, তুম হো।
হোনে কো নাম কাবরোঁ কি তিজারাত কার কে
কেয়া না বেচোগে যো মিলজায়ে ছনম পাথার কে।

এই পৃথিবীতে যদি কেউ অজ্ঞ থেকে থাকে, অকর্মণ্য যদি থেকে থাকে তো, সে ব্যক্তি তুমিই। তুমি নিজের অদ্ভূত স্বপ্নে এমনভাবে বিভোর হয়ে রয়েছো যে, নিজের অস্তিত্বের কথাটাই বিস্মৃত হয়েছো। যে নিজের বাড়ির প্রতি উদাসীন, সে ব্যক্তি তুমিই। তোমার হৃদয়ের বিদ্যুৎ নিদ্রার ঘোরে ঢোলে পড়েছে, তুমি এখন একটি অসাঢ় জড়-পদার্থে পরিণত হয়েছো। বাপদাদার কবর বিক্রি করা যাদের পেশা, সে ব্যক্তি তুমিই। তুমি একটি মাটির পুতুলের বিনিময়ে তোমার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে দিতেও প্রস্তুত।

সুতরাং ঈমানের ব্যাপারে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই মহান আল্লাহর ওয়াদানুসারে পৃথিবী ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন করা যাবে। এক শ্রেণীর লোক ধারণা করে যে, ঈমান আনার পরে ইসলামের কিছু বিধি-বিধান অনুসরণই যথেষ্ট অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ আদায়, কিছু তস্বীহ্ পাঠ, স্ত্রী-কন্যাকে পর্দায় রাখা ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করলেই ঈমানের দাবি আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী পৃথিবীর নেতৃত্বও তাদের হাতে তুলে দেবেন এবং আখিরাতেও জান্নাতের দিকে ঠেলে দেবেন। বিষয়টি এতো সহজ নয়, পরীক্ষা দিতে হবে-কঠোর পরীক্ষা। পরীক্ষা যখন আসে, তখন ঈমানদারদের ঈমান যেমন শক্তিশালী হয় এবং সে আল্লাহর প্রতি অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

রাসূলের যুগে সাহাবীদের ওপরে যখন কোনো বিপদ-মুসিবত এসেছে, তখন তারা চিৎকার করে বলেছেন, 'এতো সেই বিপদ যার কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে পূর্বেই

জানিয়েছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওয়াদা অবশ্যই সত্য।' বিপদ-মুসিবতের ঘটনা তাদের ঈমানকে আরো অধিক শক্তিশালী করেছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَازَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا-

এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ আরো অধিক বৃদ্ধি করে দিয়েছে। (আহ্যাব-২২)

ঈমান যখন আনা হয় তখনই তো মহান আল্লাহর সাথে এই ওয়াদা করা হয় যে, প্রয়োজনে সে তার জান-মাল মহান আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করবে। সাহাবাগণ জান-মাল দেয়ার পরীক্ষার সম্মুখীন যখন হয়েছেন, তখন তাঁরা নিজেদের ওয়াদা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যাঁরা সুযোগ পাননি, তাঁরা জান-মাল কোরবান করে দেয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছেন। ঈমানের দাবি থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। তাঁদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন-

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ-فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ-وَمَابَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً-

ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। তাদের কেউ নিজেকে নজরানা হিসাবে পেশ করেছে এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় থেকেছে। তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহ্যাব-২৩)

আল্লাহর রাস্তায় তাঁরা জান-মাল দেয়ার জন্য সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এতই পেরেশান থাকতেন, যেমনভাবে রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের ব্যাপারে মাতা-পিতা অস্থির থাকেন। আল্লাহর রাস্তায় পরীক্ষায় নিমজ্জিত হওয়াকে তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। পরীক্ষার মুখোমুখী হলেই তাঁরা অকাতরে জান-মাল বিলিয়ে দিতেন। যাঁরা পরীক্ষার মুখোমুখি হননি, তারা সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। অস্ত্রের অভাবে যারা যুদ্ধে যোগ দিতে পারতেন না, তাঁরা দুঃখ-যন্ত্রণায় এতই কাতর হয়ে পড়তেন যে, পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলেও তারা অতটা বিচলিত হতেন না। সাহাবাদের অল্প বয়স্ক সন্তানদেরকে আল্লাহর রাসূল যুদ্ধে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখতেন। কিন্তু ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অদম্য আগ্রহে তাঁরা নানা কৌশল ও কসরত প্রদর্শন করে আল্লাহর রাসূলকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবেলা করার যোগ্যতা তাদের ভেতরেও বিদ্যমান।

এভাবে ঈমানের পরীক্ষা অতীতকালের ঈমানদারদেরকে দিতে হয়েছে, বর্তমানকালের লোকদেরকেও দিতে হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের পরীক্ষা চলতেই থাকবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে এবং পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা আসবে।

ঈমানদার অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করে না

ঈমানদার সময় নষ্ট করে না এবং নিজেকে এমন কোনো অর্থহীন কাজেও জড়িত করে না, যার ভেতরে কোনো উপকারিতা নেই। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে সে গণিমত মনে করে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে, সময়কে সে কোন্ কাজে ব্যবহার করেছে। জীবনকালের প্রতিটি মুহূর্ত যেন মহান আল্লাহর গোলামীর ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়, ঈমানদার সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে। মহান আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি অর্জনের লক্ষ্যেই আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত পথে ঈমানদার ঘুমায়, খাদ্য গ্রহণ এবং শরীর চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সতেজ ও সজীব রাখে। এসব কাজে সে যে সময় ব্যয় করে, এর পেছনে তার উদ্দেশ্য থাকে যে, সে অধিক যোগ্যতার সাথে মহান আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। ঈমানদার লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের কাজে সময় ব্যয় করে, অর্থোপার্জনের কাজে সময় ব্যয় করে, এসব কিছুর মূলেই তার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে যে, সে আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ-وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا-وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا-

(আর রাহ্মানের বান্দাহ্ হলো তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না এবং কোনো বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়। তাদের যদি তাদের রব-এর আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না। (সূরা ফুরকান-৭২-৭৩)

ঈমানদারের অন্যতম গুণ হলো সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। কোরআনের গবেষকগণ বলেন, 'ঈমানদার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না' এ কথার দুইটি অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ ঈমানদার ব্যক্তি কোনো সালিশ, বিচার বা আদালতে কোনো ব্যাপারেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, যেখানে যা বলে তা সত্য এবং যথাযথভাবেই বলে। কোনো ঘটনা বর্ণনা করার সময় তা অতিরঞ্জিত করে বা প্রকৃত সত্য গোপন করে অথবা এমন ভাষায় ও শব্দে তা ব্যক্ত করে না, যার সততা সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করা যেতে পারে বা বর্ণনা শুনে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে।

পত্র-পত্রিকা তথা প্রচার মাধ্যমে এবং সাহিত্য ও ইতিহাস লেখনীর ক্ষেত্রে ঈমানদার প্রকৃত সত্যই ব্যক্ত করবে। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রকৃত সত্য আড়াল করে, বিদ্বেষ প্রসূত মনোভাব নিয়ে সে কোনো ঘটনাবলী বর্ণনা করবে না। বর্ণনার ক্ষেত্রে জটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করবে না, এমন কোনো শব্দও চয়ন করবে না, যা প্রকৃত সত্য প্রকাশে ও বুঝার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। যা সত্য এবং যা ঘটেছে, ঈমানদার সে বিষয়টিই প্রাধান্য

দেবে। কোরআনের মাহ্ফিলে বা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত লোকদের বিশাল জমায়েতে অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটে। ঈমানহীন লোকগুলো ইসলাম বিষয়ক সংবাদ তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমে মোটেও প্রচার করে না অথবা করলেও গুরুত্বহীনভাবে প্রচার করে, বিশাল জমায়েতের ছোট্ট ছবি ছাপে-যেন সাধারণ মানুষ বোঝে, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো আগ্রহ নেই।

অপরদিকে হাতে গোনা কয়েকজন নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মহীন, আল্লাহ-রাসূল ও কোরআন বিরোধী পথভ্রষ্ট ব্যক্তি একত্রিত হয়, তখন দশ পনের জন ব্যক্তির একত্রিত হওয়াকে ঈমানহীন লোকগুলো পত্র-পত্রিকায় 'বিশাল জমায়েত' নামে অভিহিত করে, বিশালাকারের ছবি ছাপে। এমন ভাব, ভাষায় ও শব্দে সংবাদ পরিবেশন করে, সাধারণ মানুষ যেন বুঝে, দেশের অধিকাংশ লোকজন এসব ভ্রষ্ট ব্যক্তিদের পেছনে রয়েছে। এ জন্য মৌখিকভাবে, পত্র-পত্রিকায় বা ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় পরিবেশিত সংবাদ বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে আল্লাহর কোরআন স্পষ্ট নীতিমালা পরিবেশন করেছে যে, 'ঈমানহীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা যাবে না এবং সে সংবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো ধরনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না।' এটাই হলো ইসলামের সাংবাদিকতার নীতিমালা।

কোনো ফাসিক, মুনাফিক, জালিম, নাস্তিক, মুরতাদ ও কাফির কর্তৃক পরিবেশিত কোনো সংবাদই যাচাই-বাছাই না করে বিশ্বাস করা যাবে না। সংবাদ হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ, যার ভেতরে কোনো ধরনের মিথ্যা, সত্য গোপন করার প্রবণতা, জটিলতা, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে কৃপণতা ইত্যাদির আশ্রয় নেয়া যাবে না। কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে আঘাতের পর আঘাত করা হচ্ছে, ইসলাম বিদ্বেষী পত্র-পত্রিকা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যার খিস্তি-খেউড় ছড়াচ্ছে-পক্ষান্তরে তারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়লেই তাদেরকে খুনী, সন্ত্রাসী, রগকাটা বাহিনী ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। নিজেরা দলীয় কোন্দলে নিহত হচ্ছে কিন্তু নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে।

অমুসলিম এন, জি, ও গুলো দেশ ও জাতি বিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে ঈমানহীন সাংবাদিক ও ইসলাম বিদ্বেষী সংবাদ মাধ্যম গুলো নিজের অজান্তেও একটি শব্দও লেখে না, কিন্তু ইসলামের সাথে সম্পর্কিত এন, জি, ও গুলোর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কাল্পনিক অভিযোগ দৃষ্টি আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে পরিবেশন করা হচ্ছে। এই শ্রেণীর সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যম কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا-

হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে গ্রহণ করো। (সূরা হুজুরাত-৬)

সূরা ফোরকানের ৭২ ও ৭৩ আয়াত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে ঈমানদারদের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। কোরআনের এ কথার দ্বিতীয় অর্থ হলো, তারা কোনো অর্থহীন এবং মিথ্যা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে না। মিথ্যা কোনো বিষয়ের পেছনে সময় নষ্ট করে না। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা শব্দটি একান্তই বাতিল ও অকল্যাণের সমার্থক। অর্থহীন মিথ্যা ঘটনা ও কাজের গায়ে শয়তান যে বাহ্যিক আনন্দ, স্বাদ, চাকচিক্য ও লাভের প্রলেপ জড়িয়ে রেখেছে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মানুষ সেদিকে ধাবিত হয়। মিথ্যার দেহ থেকে যখনই চাকচিক্যের আবরণ অপসৃত হয় তখনই প্রত্যেকটি অবৈধ কাজই তার স্বরূপে মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়। এ জন্য ঈমানদার কখনো এই ধরনের কাজের পেছনে যেমন সময় নষ্ট করে না, তেমনি তা প্রত্যক্ষও করে না।

কোরআন ও হাদীসের বিপরীত প্রত্যেকটি কাজের দেহে শয়তান চাকচিক্য জড়িয়ে দেয় এবং মানুষ সেই বাহ্যিক চাকচিক্যের কারণেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঈমানদারের কাছে কোরআন নামক মানদন্ড রয়েছে, যে মানদন্ড সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। এ জন্য মিথ্যা যতোই আকর্ষণীয়, চাকচিক্যপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী, দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হোক না কেনো, যতোই মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে বা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে নিজেকে পরিবেশন করুক না কেনো, সেটা যে মিথ্যা এবং কৃত্রিম–তা ঈমানদারের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঈমানদার মিথ্যার প্রকৃত রূপ চিনতে পারে। এ জন্য সে মিথ্যার পেছনে ছুটে না বা তা প্রত্যক্ষ করেও সময় নষ্ট করে না।

আল্লাহ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কথা ও বিষয়াবলী সমৃদ্ধ গীত, ছায়াছবি, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, গল্প-কাহিনী, শিল্পকলা ও চারুকলা ইত্যাদি পড়ে, শুনে বা দেখে ঈমানদার সময় নষ্ট করে না। এসব অর্থহীন কাজে ঈমানদার নিজেকে জড়িত করে না। পথ চলতে বা ঘটনাক্রমে কখনো এসব বাজে অর্থহীন কোনো বিষয় ঈমানদারের সামনে এসে যায়, তাহলে এমনভাবে সে ঐ স্থান ত্যাগ করে, যেমনভাবে রুচিবান কোনো মানুষ দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য নাকে কাপড় চেপে ময়লার ভাগাড় অতিক্রম করে। পৌরসভার ময়লাবাহী গাড়িগুলো বড় বড় শহর ও নগরের যাবতীয় আবর্জনা বহন করে শহরের বাইরে কোনো স্থানে স্তুপিকৃত করে। রুচিবান কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার হওয়া ব্যতীত ময়লার সেই ভাগাড়ে অবস্থান করে আনন্দ অনুভব করা দূরে থাক–সেই এলাকায় পা দেয়ারই প্রশ্ন ওঠে না। ঈমানদারদের এই উন্নত রুচি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ–

এরা বাজে কাজ থেকে দূরে অবস্থান করে। (সূরা মু'মিনুন-৩)

ঈমানদার এমন প্রত্যেকটি কথা ও কর্মকান্ড যা একান্তই অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন, অকল্যাণকর ও যার মাধ্যমে কোনো শুভ ফলও লাভ করা যায় না, তা থেকে দূরে অবস্থান করে। যেসব কথায় বা কাজে কোনো লাভ নেই, যেগুলোর পরিণাম ফল কল্যাণকর নয়, যেগুলোর প্রকৃতপক্ষে কোনোই প্রয়োজন নেই, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্যও ভালো নয়, এসবই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে বাজে ও অর্থহীন কাজের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানদার এসব দিকে দৃষ্টি দেয় না, এর প্রতি আকৃষ্টও হয় না এবং কোনো কৌতুহলও প্রকাশ করে না। যে স্থানে এসব বাজে কাজ সংঘটিত হয়, অর্থহীন কথাবার্তা, গল্প-গুজব চলতে থাকে, বাজে দৃশ্য প্রদর্শিত হয়, ঈমানদার বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার না হলে সে স্থানে যায় না এবং ঘটনাক্রমে নিজের অজান্তে সে স্থানে গেলেও দ্রুত সেখান থেকে সরে যায়।

এটা ঈমানদারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানদার এমন এক ব্যক্তি যার ভেতরে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে। তার মনে এ ধারণা জাগ্রত থাকে যে, এই পৃথিবী হলো একটি পরীক্ষার স্থান। যে বিষয়টিকে জীবন, সময়, বয়স, হায়াত ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা একটি নির্ধারিত ও পরিমাপকৃত সময়। তাকে পরীক্ষা করার জন্যই 'জীবনকাল নামক' এই সময়টি আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে দান করেছেন। এ জন্য ঈমানদার এই সময়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার সে করে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় পন্থায় ব্যয় করে।

শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রকে পরীক্ষাগৃহে নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়। পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার ব্যাপারে অভিলাষী একজন ছাত্র পরীক্ষাগৃহে বসে প্রশ্নপত্রের উত্তর নিবিষ্ট মনে, একাগ্রচিত্তে, অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লিখে যায়। নির্ধারিত সময়ের একটি মুহূর্তও সে অযথা ব্যয় করে না। পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তা-চেতনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখার কাজে নিজেকে নিমগ্ন করে। ছাত্রটি অনুভব করে, যে নির্ধারিত সময় তাকে কর্তৃপক্ষ দিয়েছে, এই নির্ধারিত সময়ই তার আগামী ভবিষ্যৎ জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী সময়। নির্ধারিত এই সময়কে যথাযথ পন্থায় ব্যবহার করতে সক্ষম হলেই সে ভালো ফল লাভ করতে সক্ষম হবে এবং ভালো ফলাফলের কারণেই সুনাম, যশ, সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে ও কর্ম জীবনে উচ্চপদ লাভ করে সে অর্থ-বিত্ত ও সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হবে।

আর কর্তৃপক্ষের দেয়া এই নির্ধারিত সময়কে যথাযথ পন্থায় যদি সে ব্যবহার না করে, প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর না লিখে অলস বসে থাকে বা ভিন্ন কোনো অর্থহীন কাজে সময় ব্যয় করে, তাহলে নিজের বিবেকের কাছে সে যেমন তিরস্কৃত হবে, তেমনি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষকসহ নিজের অভিভাবকবৃন্দ, পরিচিত মহল এবং আত্মীয়-স্বজন, সবার কাছ থেকেই অনাদর আর তিরস্কার লাভ করবে। সেই সাথে তার ভবিষ্যৎ কর্ম জীবন-যে জীবনটা হতে পারতো সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, তা হবে চরম দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানে পরিপূর্ণ।

অনুরূপভাবে একজন ঈমানদার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেয়া যে 'জীবনকাল নামক' সময় লাভ করেছে, এই সময়কে সে যথাযথ পন্থায় ব্যবহার করে। সময়ের একটি মুহূর্তও ঈমানদার অর্থহীন কোনো কাজে ব্যয় করে না। ঈমানদার পৃথিবীর জীবন নামক এই সময়কালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণকর। চিত্তবিনোদন তথা খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও ঈমানদার এমন সব বিষয় নির্বাচন করে যা নিছক সময় নষ্ট বা সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না, বরং কোনো অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে। যেমন সমাজের তরুণ ও যুবকদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজ, নৈতিকতা বিধ্বংসী কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর খেলাধূলায় নিয়োজিত রাখা, শরীর চর্চার মাধ্যম হিসাবে খেলাধূলাকে ব্যবহার করা ও বেকার লোকদেরকে মানসিক বিষন্নতা থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ঈমানদারগণ বৈধ খেলাধূলাকে ব্যবহার করে থাকে।

ঈমানদারের দৃষ্টিতে সময় অত্যন্ত মূল্যবান এবং তা কোনো অর্থহীন কাজে নষ্ট করার মতো বা ক্ষেপণ করার মতো জিনিস নয়-সময় হলো যথাযথ উপায়ে ব্যবহারের জিনিস। ঈমানহীন লোকগুলো নানা ধরনের উদ্ভট কাজে সময় ব্যয় করে, তারপরেও তারা সময়ের ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে যে, 'সময় যেন পাথরের মতো স্থির-সময় কাটতে চায় না।' আটলান্টিক মহাসাগরে কতো গ্যালন পানি রয়েছে, হিমালয় পর্বতের ওজন কতো, কোন্ গ্রহের কতো ওজন ইত্যাদি কল্যাণহীন কাজে সময় ও অর্থ ব্যয় করে থাকে। যেসব কাজে কোনো উপকারিতা নেই, তা নিয়ে সময় ও অর্থ ব্যয় যারা করে, তাদের অবস্থা হলো পরীক্ষাগৃহের সেই ব্যর্থ ছাত্রের অনুরূপ। যার গোটা জীবনটাই ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা আর অপমানে পরিপূর্ণ।

ঈমানদার হয় একজন শান্ত, সুস্থ, আপন প্রভুর চিন্তায় সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী ব্যক্তি, তার গোটা জীবনই হয় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন এবং সে হয় সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ। ব্যক্তিত্বহীনতা, লজ্জাহীনতা ও বেহুদাপনা ঈমানদারের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে কোনো ক্রমেই খাপ খায় না। ঈমানদার ওজনহীন ফাল্তু কথা বলে না, আজেবাজে গল্প করা তার স্বভাবের বিপরীত। সে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপমূলক কথা বলে আনন্দ লাভ করে না, হালকা হাস্য-কৌতুক ও রসিকতা সে করে বটে, কিন্তু তা আল্লাহর রাসূলের অনুকরণে। সত্যের বিপরীত রসিকতা ঈমানদার কখনো করে না। আল্লাহর রাসূলও হালকা রসিকতা করতেন, কিন্তু তা কখনো সত্যের বিপরীত হতো না। যেমন তিনি একদিন সাহাবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'দেখো, এক মুয়াজ্জিন আরেক মুয়াজ্জিনকে জবেহ করছে।' সাহাবাগণ অবাক-বিস্ময়ে দেখলেন, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মোরগ জবেহ করছেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবাগণ রাসূলের কথার অর্থ অনুধাবন করে হেসে উঠলেন।

ঈমানদার হালকা রসিকতা করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা, বিদ্রুপ-তামাসায় মেতে ওঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামিমূলক আচরণ ও কথাবার্তা বলতে পারেনা। যেখানে কথায় কথায় অশ্লীল-অশালিন শব্দ ব্যবহৃত হয়, বাজে ঠাট্টা-মস্করা করা হয়, ভাঁড়ামিপূর্ণ আনন্দ-ফূর্তি করা হয়, পরনিন্দা-পরচর্চা করা হয়, অপবাদ দেয়া হয়, মিথ্যা কথা বলা হয় এবং মিথ্যা বিষয়কে কেন্দ্র করে মেতে ওঠা হয়, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা হয়, সে স্থান ঈমানদারের জন্য কঠিন আযাবের স্থান হিসাবেই বিবেচিত হয়। ঈমানদার সে স্থান থেকে দ্রুত সরে পড়ে–এটা তার স্থায়ী গুণ।

অন্ধ ও বধির লোকগুলো পাথরের মতোই অনড়। কারণ তারা চোখেও দেখে না এবং কানেও শোনে না। সুতরাং কোনো আদেশ পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ঈমানহীন লোকগুলো ঐ অন্ধ ও বধিরদেরই অনুরূপ। তারাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ শোনে, কিন্তু তাদের আচরণ অন্ধ ও বধিরদের অনুরূপ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদের গুণাবলী সম্পর্কে বলেন, এদের সামনে যখন আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের কথা বলা হয়, তখন তারা অন্ধ ও বধিরদের অনুরূপ আচরণ না করে, তৎক্ষণাত আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ কার্যকরী করে।

ঈমানদার নিজেই শুধু জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে না, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকেই কেবলমাত্র নিয়োজিত করে না, নিজে একাকীই শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে যায় না–নিজের স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকেও সেই পথে চলার উপযোগী হিসাবে গড়ার চেষ্টা করে, যে পথে সে স্বয়ং এগিয়ে যাচ্ছে। এটাও ঈমানদারের স্থায়ী গুণ। এ জন্য সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করতে থাকে। তারা কিভাবে দোয়া করে, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا–

তারা প্রার্থনা করে থাকে, হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম। (সূরা ফুরকান-৭৪)

ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারকে অতি আপন করে নেয়, যদিও তার সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক থাকে না। শুধুমাত্র আদর্শিক কারণে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত একজন ঈমানদারের সাথে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থানরত ঈমানদারের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন হয় এবং এটাও ঈমানদারের স্থায়ী গুণ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ–يَأْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ-أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ-

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী-এরা পরস্পরের বন্ধু-সাথী ও শুভাকাংখী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায়-পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। (সূরা তওবা-৭১)

ঈমানহীন লোকগুলো দিনের অধিকাংশ সময় অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের কাজে ব্যয় করে। স্বার্থের পেছনে ছুটতে ছুটতে এরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তি দূর করার জন্য এরা রাতের একটি বিরাট অংশ নাচ-গান, মদ্যপান, তাস-পাশা, জুয়া, সিনেমা ইত্যাদির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। তারপর আরামদায়ক বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে দিনের দ্বিতীয় প্রহরে উঠে পুনরায় পূর্বের কাজেই নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। আর ঈমানদারদের অভ্যাস হলো এরা মহান আল্লাহর নির্দেশেই বৈধ পথে রিযিক অনুসন্ধান করে, হৃদয়ে জাগ্রত থাকে যে, সে আল্লাহর গোলাম।

এই গোলামীর পরিচয় সে দিয়ে থাকে নামায আদায়ের মাধ্যমে। তারপর রাতে গোটা দিনের কর্মক্লান্ত শরীরটাকে মহান আল্লাহর নামে বিছানায় এলিয়ে দেয়। রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে শেষ রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহর ভয়ে থর থর করে সে কাঁপতে থাকে এবং চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দেয়। ঈমানদারদের এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا-وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

তাদের পৃষ্ঠদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে, নিজেদের রব-কে ডাকে আশঙ্কা ও আকাংখা সহকারে এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা সাজ্দাহ্-১৬)

ঈমানদার গোটা দিন দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে উপস্থিত হয় নিজের রব-এর সামনে। তাঁর স্মরণেই গোটা রাত অতিবাহিত হয়। নিজের যাবতীয় আশা-আকাংখা সে নিবেদন করে আপন রব মহান আল্লাহর কাছে। আর যে যৎসামান্য সম্পদ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দান করেছেন, তা থেকে নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং অভাবী লোকদেরকেও দান করে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ব্যয় করে। ঈমানদার মহান আল্লাহর পথে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ ব্যয় করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য

করার ব্যাপারে নিজেদের সামর্থ অনুসারে প্রচেষ্টা চালাতে তারা কসুর করে না। কোনো ইয়াতিম, বিপদাপন্ন, দুর্বল, অক্ষম, গরীব, রুগ্ন ও অভাবী ব্যক্তি তাদের লোকালয়ে তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। আর আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হলে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা কখনো কার্পণ্য করে না এবং এটাও ঈমানদারদের স্থায়ী গুণ।

আমলে সালেহ্ ও তার অর্থ

ঈমান আনার পরে যে গুণ অর্জন করতে হবে, তা আলোচ্য সূরায় তথা সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণের মধ্যে দ্বিতীয় গুণ। সে গুণটির নাম হলো আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ।

মানুষকে যে চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য মহাক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম, তার দ্বিতীয় গুণটিই হলো সৎকাজ। শুধুমাত্র সৎকাজই মানুষকে সেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতে পারবে না, সৎকাজের সাথে ঈমান থাকতে হবে এবং সেই সৎকাজ করতে হবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত আদর্শ ও পন্থানুসারে। অর্থাৎ যে কোন সৎকাজের বিনিময় মহান আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করতে হলে সর্বপ্রথমে ঈমানের যাবতীয় শাখা-প্রশাখার প্রতি ঈমান আনতে হবে। ঈমানহীন যে কোন সৎকাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। ঝিনুক ব্যতীত যেমন মুক্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি ঈমান ব্যতীত কোন ধরনের সৎকাজের বিনিময় আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে আশা করা যায় না।

আল্লাহর কোরআনে এই সৎকাজকে 'আমলে সালেহ্' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এক কথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ–নিষেধকেই আমলে সালেহ্ বলা যেতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর রাসূল যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, সেই কাজ করা এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকাই আমলে সালেহ্। একজন ঈমানদারের জীবনের যে কোন কাজই আমলে সালেহ্ হতে পারে, যদি সে কাজের পেছনে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন থাকে। ঈমান ও আমলে সালেহ্ এ দুটো বিষয় একটির সাথে অপরটি এমনভাবে জড়িত যে, একটি ব্যতীত আরেকটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

ঈমান ব্যতীত যেমন আমলে সালেহ্–এর কোন মূল্য নেই, তেমনি আমলে সালেহ্ ব্যতীত ঈমানের দাবী করাও বৃথা। নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করা হলো অথচ আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করা হলো না এবং আল্লাহর বিধান যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো ধরনের চেষ্টা-সাধনা করা হলো না, এই ধরনের ঈমান আনায় মহান আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই। আমলে সালেহ্ ব্যতীত, শুধুমাত্র ঈমান মানুষকে সেই মহাধ্বংস এবং মারাত্মক ক্ষতি থেকে কিছুতেই হেফাজত করতে সক্ষম হবে না, যে ক্ষতির কথা আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরার প্রথমেই সময়ের শপথ করে বলেছেন।

উল্লেখিত দুটো গুণ যখন মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হবে তখন এই ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের পক্ষে একাকী এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার কোনই সুযোগ থাকবে না। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যারা ঈমান আনবে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে থাকবে, তাদের পক্ষে সমাজে বা দেশে যে যার মতো বাস করবে, এই সুযোগ তাদেরকে ঈমান দেবে না। ঈমানকে টিকিয়ে রাখা এবং আমলে সালেহ্ জারী রাখার জন্যই উল্লেখিত দুটো গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকগুলোকে পরস্পর যোগাযোগ রাখতে হবে। সুযোগ থাকলে এই লোকগুলো একত্রিত হয়ে একটি সমাজ কায়েম করবে অথবা একটি দল প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অধিক সুযোগ থাকলে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে।

ইসলামে ঈমানের অর্থ হলো এমন জিনিসকে আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়া এবং বাস্তবে কাজে পরিণত করা, যেগুলো মেনে নেয়া ও কাজে পরিণত করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল আহ্বান জানিয়েছেন। আর আমলে সালেহ্ বা সৎকাজের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা ও প্রেরিত রাসূলের নির্দেশ অনুসারে জীবনের প্রতিটি দিক বিভাগ পরিচালিত করা। মানব দেহে রয়েছে মন-মস্তিষ্ক এবং নানা ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধারণা-কল্পনা এবং ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হলো মন-মস্তিষ্কের সৎকাজ বা আমলে সালেহ্। মানুষের মন-মস্তিষ্ক এমন এক শক্তিশালী জিনিস, যা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না এবং এর ওপরে নফস ও শয়তান প্রতি মুহূর্তে প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত রয়েছে।

সৎ মন-মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তির নিজের অজান্তেই তার মন-মস্তিষ্ক এমন ধরনের কল্পনার জাল বুনতে থাকে যে, সে ব্যক্তি সম্বিৎ ফিরে পাওয়া মাত্র কলুষ কল্পনার কারণে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়। এ জন্য ঈমানদার ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে নিজের চিন্তার জগতের প্রতি সজাগ লক্ষ্য রাখে, এই চিন্তার জগৎ যেন কোনো ধরনের অকল্যাণকর চিন্তায় নিজেকে নিমজ্জিত না করে। চিন্তা শক্তি নানা ধরনের চিন্তা করবে এটাই স্বাভাবিক। চিন্তার জগতে শয়তান সন্দেহ, সংশয়, দোদুল্যমানতা, দুর্বলতা, হতাশা ইত্যাদি বিষয় প্রবিষ্ট করে দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। অশুভ প্রবণতা তথা নফসে আম্মারা এ কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে যাচ্ছে। ঈমানাদর এসব অশুভ শক্তির সাথে প্রতি মুহূর্তে লড়াই-সংগ্রাম করবে এবং অসৎ চিন্তাধারা, ধারণা-কল্পনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা-সাধনা করবে—আর এটাই হলো মন-মস্তিষ্কের আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ।

ঈমানদারের চিন্তাধারা ক্ষণিকের জন্য তার নিজের অজান্তেই বা মানবীয় দুর্বলতার কারণে কলুষিত হবে, অর্থহীন বাজে চিন্তা করবে, তার দ্বারায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে গোনাহ্ সংঘটিত হবে, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পাওয়া মাত্র ঈমানদার তওবা করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার তওবা মঞ্জুর করে গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর

বান্দাহ্কে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং তাতে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। এই কণ্ঠ দিয়ে যে কোনো কথা উচ্চারণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঈমানদার তার কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রিত রাখে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় কোনো কথা উচ্চারণের ক্ষেত্রে সে এই কণ্ঠকে ব্যবহার করে না। সুতরাং খারাপ কথা, অবৈধ কোনো কথা না বলা এবং হক, ইনসাফ, সত্য-সঠিক ও ন্যায়ের কথা বলাই হলো কণ্ঠের আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ।

এমনিভাবে চোখ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত দৃশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে না দেখা, হাত-পা ও দেহকে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহার না করাই হলো এসবের আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ। কারণ কিয়ামতের ময়দানে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাদেরকে কোন্ কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো। ঈমানদার ব্যক্তিও মানুষ এবং সে মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। ঈমানহীন লোকগুলো গোনাহ্ করে বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে আর ঈমানদারের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হয় অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরও নিজের ভুল অনুধাবন করতে পেরে যারা তওবা করে ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করতে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আর যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করবে তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো। (সূরা আনকাবুত-৭)

উল্লেখিত আয়াতে ঈমান ও সৎকাজের দুটো ফল বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ফল এটাই লাভ করবে যে, ঈমান আনার পূর্বে মানুষ যেসব পাপ কাজ ও দুষ্কর্ম করেছে, ঈমান আনার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিকে তা থেকে মুক্ত করবেন। অর্থাৎ তার অতীতের যাবতীয় অপকর্ম এবং গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। ঈমান আনার সাথে সাথে মানুষ সদ্যজাত শিশুর মতোই নিষ্পাপ হয়ে যাবে। আর ঈমান আনার পরে বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয়, অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে অথবা নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় নিপতিত হয়ে মানবীয় দুর্বলতার কারণে যেসব ভুল-ভ্রান্তি বা পাপের কাজ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির সৎকাজ বা আমলে সালেহ্-এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঐসব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান ও আমলে সালেহ্ এমন এক জিনিস, যা মানুষের ভেতর থেকে অসৎ প্রবণতা দূর করে দেয়, সৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, চরিত্রের বিভিন্ন দুর্বলতা দূর করে এবং মানুষকে সংশোধনের পথে এগিয়ে দেয়।

আর দ্বিতীয় ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তাদের সৎকাজের বিপুল প্রতিদান দেবেন। এই শ্রেণীর লোকদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নে'মাত প্রাপ্ত বান্দাদের দলে শামিল করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ-

আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সালেহীন বা সৎকর্মশীলদের দলে শামিল করবো। (সূরা আনকাবুত-৯)

সৎকর্মশীল বা সালেহীন যারা তারাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। রাব্বুল আলামীন যে চার শ্রেণীর বান্দাদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত, তার মধ্যে এই সালেহীন একটি দল। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথপ্রদর্শন করো' শিরোণাম দেখুন।)

আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজের মূল্য মহান আল্লাহর দরবারে অপরিসীম। ঈমানদার যখন কোনো সৎকাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, সে সৎকাজ করার সুযোগ তার জীবনে ঘটুক আর না-ই ঘটুক, তার আমলনামায় তার সওয়াব লেখা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যখন কোনো গোনাহ্ করার চিন্তা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই গোনাহ্ আমলনামায় লেখা হয় না, যতক্ষণ সে তা বাস্তবায়িত না করে। গোনাহ্ করার পরেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার জন্য ক্ষমার দরোজা উন্মুক্ত রাখেন। বান্দাহ্ অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন। ঈমানদার যতটুকু আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করবে, মহান আল্লাহ ঠিক ততটুকুই বিনিময় দেবেন না, বরং অনেক অনেক বেশী বিনিময় দেবেন। আর বান্দাহ্ যে পরিমাণ গোনাহ্ করবে, ঠিক সেই পরিমাণই সে শাস্তি লাভ করবে, প্রাপ্যের অধিক শাস্তি দেয়া হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর সমীপে সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য দশ গুণ বেশী পুরস্কার রয়েছে। যে পাপের কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে, যতটুকু সে অপরাধ করেছে। আর কারো ওপর জুলুম করা হবে না। (সূরা আন'আম-১৬০)

আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার বান্দাদের জন্য বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তারা যে পরিমাণ সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ করবে, তিনি তার কয়েকগুণ বেশী বিনিময় দেবেন এবং সৎকাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার সাথে সাথে সেই বান্দার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে। আর অপরাধিদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ থেকে বিরত থাকার এটাও এক বিরাট সুযোগ যে, তারা অপরাধের চিন্তা করার সাথে সাথে আমলনামায় তা

লিখা হবে না, বরং যখন সেই অপরাধ সংঘটিত করবে, তখনই তা লিখা হবে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ অপরাধ করা হবে, ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তি সে লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা ক্রোধ বশতঃ অধিক শাস্তি দেবেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا-

আল্লাহ তা'য়ালা কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না। কেউ যদি একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন। তদুপরি তিনি নিজের পক্ষ থেকে আরো বড় ফল দান করেন। (সূরা নেছা-৪০)

সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ হতে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। পৃথিবীর মানুষকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বা সমাজে নিজের নাম, যশ, প্রশংসা-সুনাম অর্জনের আশায়, জনসমর্থন নিজের দিকে টানার লক্ষ্যে বা ক্ষমতায় আরোহনের জন্য যেসব সৎকাজ করা হবে, তার বিনিময় আখিরাতে লাভ করা যাবে না। আপন রব আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে যে সৎকাজ করা হবে, তার কয়েকগুণ বেশী প্রতিদান পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه خَيْرٌ مِّنْهَا-وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

যে কেউ ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভালো ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিত যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে। (সূরা কাসাস-৮৪)

মহান আল্লাহর দরবারে সেই ধরনের সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ করার তওফীক কামনা করতে হবে, যা বাহ্যিক দিক দিয়ে অবিকল আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী হবে এবং বাস্তবেও তা মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবার উপযুক্ত হবে। কোনো কাজ যদি পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে অতি উত্তম বলেও বিবেচিত হয়, কিন্তু তাতে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানের আনুগত্য না করা হয়, তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে পৃথিবীর মানুষ তার যতো প্রশংসাই করুক না কোনো, মহান আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তাঁর কাছে আদৌ তা কোনো প্রশংসার যোগ্য হবে না। আবার এমন কোনো সৎকাজ যা অবিকল আল্লাহর বিধান অনুসারে করা হয়েছে এবং তার বাহ্যিক রূপ ও কাঠামোতে কোনো ভুল-ত্রুটি নেই, কিন্তু এই সৎকাজের পেছনে রয়েছে অসৎ উদ্দেশ্য, নাম, যশ, প্রশংসা ও প্রদর্শনীর মনোভাব, আত্মতুষ্টি, গর্ব ও অহঙ্কার এবং

স্বার্থ, লোভ তাকে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অন্তসারশূন্য করে দেয়, এ ধরনের কোনো একটি সৎকাজও মহান আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করা হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে যারা আমলে সালেহ্ করবে, তিনি তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করবেন। তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কাজও ব্যর্থ হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً-اُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الاَرَائِكِ-نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا-

নিশ্চয়ই যারা মেনে নেবে এবং সৎকাজ করবে, সেসব সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আমি কখনো নষ্ট করি না। তাদের জন্য রয়েছে চির বসন্তের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী, সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন সজ্জিত করা হবে, সূক্ষ্ম ও ঘন রেশম ও কিংখাবের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এবং উপবেশন করবে উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে, চমৎকার পুরস্কার এবং সর্বোত্তম আবাস। (সূরা কাহ্ফ-৩০-৩১)

ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্র সম্পর্ক

ঈমান ও সৎকাজ বা আমলে সালেহ্-এ দুটোর সম্পর্ক মানব দেহের সাথে তার মস্তিষ্কের ন্যায়। মস্তিষ্ক ব্যতীত যেমন দেহ অচল এবং দেহ ব্যতীতও তেমনি মস্তিষ্ক অচল। অনুরূপ ঈমান ব্যতীত আমলে সালেহ্-এর কোনো মূল্য নেই তেমনি আমলে সালেহ্ ব্যতীত ঈমান তার অকৃত্রিম রূপে কখনোই প্রকাশিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন হতে দেবেন না। আল্লাহ ছুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন-

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا-

যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সামান্যতম অধিকারও ক্ষুণ্ন হবে না। (সূরা মার্য়াম-৬০)

পৃথিবীর মানুষ জানে না ঈমান ও আমলে সালেহ্ বলতে কি বুঝায়। আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে নবী-রাসূল প্রেরণ করে এ সম্পর্কে মানব জাতিকে অবহতি করেছেন। কোরআন ও

সুন্নাহর প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়িত করা এবং নিষেধ থেকে দূরে অবস্থান করার নামই হলো আমলে সালেহ্। কোন্ কোন্ কাজ আমলে সালেহ্ এবং কোন্ কাজ আমলে সালেহ্ নয়, তা জানার একমাত্র মাধ্যম হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরআন নির্দেশিত আমলে সালেহ্ কোন্ নিয়ম-পদ্ধতিতে করতে হবে, সেটাও জানার একমাত্র মাধ্যম হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তিনি প্রতিটি আমলে সালেহ্ কোন্ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে, তা বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحتِ وَامَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ-كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ-

আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আর তাদের রব-এর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণকৃত মহাসত্যকে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ তাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিক করে দেবেন। (সূরা মুহাম্মাদ-২)

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাঁর প্রেরিত রাসূলের ওপরে ঈমান আনতে হবে এবং এ কথা উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে না যে, রাসূলের ওপরে ঈমান আনলাম। অথবা এটাও যথেষ্ট হবে না যে, মুখমন্ডলকে শ্মশ্রুমন্ডিত করে, লম্বা জোব্বা পরিধান করে, মাথায় পাগড়ী পরিধান করে নামায, রোজা ও হজ্জ আদায় করা। বরং রাসূলকে গোটা জীবনের জন্য, জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। নিজেকে পৃথিবীর কোন নেতার আদর্শের সৈনিক হিসেবে দাবি করা যাবে না। এ ধরনের দাবি যদি কেউ করে তাহলে তার ঈমান নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। নিজেকে একমাত্র রাসূলের আদর্শের সৈনিক হিসেবে দাবি করতে হবে এবং সে দাবির অনুকূলে রাসূলের আদর্শ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাহলেই ঈমানদার হওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

নিশ্চয় রাসূলের মধ্যে নিহিত রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব-২১)

মহান আল্লাহ তাকে 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী' বলে সনদ পত্র দিয়েছেন এবং সর্বকালের মানুষদের জন্য 'একমাত্র উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় চরিত্র' হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রাণের শত্রু যারা ছিল সে সমাজে, তাঁরাও তাকে 'আল আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী এই উপাধিতে ভুষিত করেছেন। পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মধ্যেও কালোদাগ থাকতে পারে কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে কেউ কোনো কালোদাগ আবিষ্কার করতে পারেনি। তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ ও উজ্জল চরিত্রের অধিকারী।

সাধরাণত মানুষ যাদেরকে নেতা হিসেবে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকে, কোনো মানুষ কি কখনও সেই নেতার চরিত্র সম্পর্কে এই সনদ দিতে পারবে যে, তিনি কোনো মিথ্যা কথা বলেননি। কোনোদিন প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি কখনও যিনা-ব্যভিচার করেননি। তিনি কখন কারো সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ-দখল করেননি। তাঁর চরিত্র একেবারে নিষ্কলুষ। এই ধরনের সনদ কোনো নেতা সম্পর্কে কেউ দিতে পারবে না।

একজন মানুষের চরিত্রের অপ্রকাশিত দিক সম্পর্কে জানার প্রথম সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মানুষের চরিত্র বাইরের জগতের কাছে অদ্ভুত সুন্দর বলে প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু কোনো মানুষের চরিত্র তাঁর স্ত্রী এবং একান্ত সেবকের কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। স্বামীর চরিত্রের দুর্বল দিক তাঁর স্ত্রী জানে। স্বামী তাঁর দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কাছে নির্লজ্জ কিনা, লজ্জাশীল কিনা, যৌন জীবনে স্বামী পশুর মত আচরণ করে কিনা, স্ত্রীর সামনে স্বামী বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে কিনা, এ সমস্ত দিক বাইরে প্রকাশ না হলেও স্ত্রীর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। ব্যক্তির একান্ত সেবক জানে তাঁর মনিবের অভ্যাস, চলাফেরা, সে কোথায় কোথায় যায়, কি আহার করে, তাঁর আচরণ, কথাবার্তা, ভাষার মাধুর্যতা বা কাঠিন্য ইত্যাদি দিক সম্পর্কে সেবক বাইরের লোকজনের থেকে বেশী জানে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীর কাছে যদি মানবশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত না হতেন, তাহলে তিনি কোন ক্রমেই ঈমান আনতে পারতেন না। আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কোনো অপ্রাপ্ত বয়সের নারী ছিলেন না। ইতোপূর্বে তাঁর জীবনে দু'জন স্বামী অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বামীরূপে লাভ করার পূর্বেই আগের স্বামীর সন্তানের জননী ছিলেন। তারপরেও গোটা মক্কায় তাঁর চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সুনাম ছিল। একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। অধিক বিচক্ষণ না হলে সাধারণ কোনো জ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। খাদিজা ছিলেন সেই পর্যায়ের ব্যবসায়ী। সুতরাং ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর মত নারী ভুল করতে পারেন না।

প্রতিটি মানুষের জীবনের দুটো দিক থাকে, দুটো চরিত্র থাকে। একটা হলো ব্যক্তিগত দিক বা চরিত্র, আরেকটা হলো সাধারণ দিক বা চরিত্র। এ দুটো চরিত্র কোনো মানুষের কখনো একই ধরনের হতে পারে না। কিন্তু একমাত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ব্যতিক্রম ধরনের ব্যক্তিত্ব–অসাধারণ নেতা। যার দুটো চরিত্র ছিল না। তাঁর দিনের এবং রাতের চরিত্রে কোনই পার্থক্য ছিল না।

তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছেন, 'আমি রাতে কি করি এবং দিনে কি করি, সমস্ত কিছুই মানুষকে ডেকে ডেকে জানিয়ে দাও।'

পৃথিবীর বুকে বিশ্বনবীর পূর্বে বা পরে এমন কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, এমন কোনো নেতার অস্তিত্ব ছিল না–কিয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করবেও না–যিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনের

সঙ্গিনীকে আদেশ দেবেন, 'তোমরা আমার দিন রাতের সবদিক সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দাও ?' তাঁর চরিত্রে যদি কোন সামান্য কালিমা থাকতো, তাঁর দাম্পত্য জীবনে যদি কোন ধরনের উচ্ছৃংখলতা মুহূর্তের জন্যও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে প্রকাশ পেত, তাহলে তিনি তাঁর স্বামীর দাবির প্রতি-স্বামীর নেতৃত্বের প্রতি তথা নবুওয়াতের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতেন না।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মত একজন বয়স্কা, ঐশ্বর্যশালিনী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দাম্পত্য জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নারীর সাথে এমন এক ব্যক্তিত্বের বিয়ের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করলেন, যার ছিল না কোনো ধন-সম্পদ, বয়সে খাদিজার তুলনায় পনের বছরের ছোট অথচ তাকেই নির্বাচিত করা হবে বিশ্বনবী হিসাবে। এমন একটা অসম বিয়ের ঘটনার মধ্যেও একটা কারণ নিশ্চয়ই নিহিত আছে। গবেষকগণের ধারণায় সে কারণ হলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের নিষ্কলুষতার দিক। কেননা, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোনো একটি দিকও অপ্রকাশিত থাকবে না, অন্য কোনো পনের বিশ বছর বা সমবয়স্কা নারীর দৃষ্টিতে যা ধরা পড়তো না, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার দৃষ্টিতে তা অবশ্যই ধরা পড়তো। এ কারণেই বোধহয় তাঁর মত মহিয়সী অভিজ্ঞতা সম্পন্না নারীকেই মহান আল্লাহ বিশ্বনবীর জন্য স্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। যে নারী দিনের আলোয় এবং রাতের অন্ধকারে অতি কাছ থেকে ঐ মহান ব্যক্তিকে দীর্ঘ পনের বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, যে ব্যক্তিকে বিশ্বনবী-বিশ্বনেতা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত করা হবে।

একজন মানুষ নিজের স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের সমস্ত সদস্য এমন কি পিতা-মাতা ও নিজের সন্তান-সন্ততির কাছেও ভেক ধরতে পারে, ভন্ডামি করতে পারে। এ সমস্ত কাজে সে সাময়িকের জন্য সফলও হতে পারে। নিজের স্ত্রীর কাছে এসব করে সফল হওয়া যায় না। প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা যে মানুষটি সর্বপ্রথম নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন তাঁর পনের বছরের জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা । দীর্ঘ পনের বছরে তিনি দেখেছিলেন, এই মানুষটি কত বিশাল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। দীর্ঘ পনের বছর সংসার ধর্ম পালন করলেন যার সাথে, তাঁর সামান্য কোনো ক্রুটিও তিনি দেখতে পাননি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন তাঁর তের চৌদ্দ বছর বয়সের কন্যা, চাচাত ভাই আলী, যিনি সেই শিশুকাল থেকে বিশ্বনবীর সাথে ছিলেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু , তিনিও ছিলেন পনের বছর বয়সের। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শিশুকাল থেকেই নবীর খেদমতে ছিলেন। তাঁর একান্ত বন্ধুও ছিল, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ছিল। প্রাণের দুশমন চাচা আবু লাহাব ছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফল তিনিও

ছিলেন মক্কার একজন বৃদ্ধ জ্ঞান তাপস। তিনিও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শিশুকাল থেকে দেখেছেন। বিশ্বনবীর দাবির প্রতি তিনিও সামান্য সন্দেহ পোষণ না করে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তাঁর কাছেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উচ্চ সম্মান এবং মর্যাদা ছিল, তা না হলে তিনি তাঁর ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না।

সুতরাং রাসূলই হলেন একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ নেতা। তাঁকে অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথ লাভ করা যেতে পারে, তাঁর আদর্শের মধ্যে নিহিত রয়েছে যাবতীয় সমস্যার সমাধান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا-

তোমরা রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথ লাভ করবে। (নূর-৫৪)

রাসূলকে আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। কেউ যদি আমলে সালেহ্-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই রাসূলকে আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ-

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, সে-ই ঠিক আল্লাহর আনুগত্য করলো। (নিছা-৮০)

রাসূলের ওপরে ঈমান আনার অর্থ হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। কারণ রাসূলই হলেন একমাত্র আদর্শ নেতা। রাসূলের আদর্শ কিছুটা অনুসরণ করা হবে আর কিছুটা অনুসরণ করা হবে না, অর্থাৎ রাসূলের আদর্শ খন্ডিতভাবে অনুসরণ করা হবে, তাহলে ঈমানদার হওয়া যাবে না। নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল, জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করা হবে আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন-রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, শ্রমনীতি, পরিবার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, বিচার কার্য পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূলের আদর্শ ত্যাগ করে পৃথিবীর দার্শনিক-চিন্তাবিদদের আদর্শ অনুসরণ করলে কোনো ক্রমেই ঈমানদার হওয়া যাবে না।

রাসূলের নেতৃত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত করতে হবে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। রাসূল এ জন্য পৃথিবীতে আগমন করেননি যে, তাঁর আনিত আদর্শ তাঁরই অনুসারীগণ খন্ডিতভাবে অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ-وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

আমার রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন তাই করো আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُواْ فِى السِّلْمِ كَافَّةً-

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারা)

উল্লেখিত আয়াতে ইসলামে প্রবেশ করো বলতে বুঝানো হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে রাসূলের আনুগত্য করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُواْ اَطِيْعُواْ اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ-

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রন করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খন্ডিতভাবে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। রাসূলের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে যদি কারো মধ্যে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে একজন লোক এসে একটি মামলার নিষ্পত্তি করে দেয়ার আবেদন পেশ করেছিল। সেই ব্যক্তি ঐ একই মামলা রাসূলের আদালতে পেশ করেছিল-কিন্তু রাসূলের দেয়া রায় তার মর্জ্জি মাফিক ছিল না।

এ কারণে সে পুনরায় মামলাটি হযরত ওমরের কাছে পেশ করেছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটির কাছে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ মামলাটি প্রথম কার কাছে পেশ করেছিলে ?'

লোকটি জানালো, 'আমি মুসলমান, আমি নামায আদায় করি, রোযা পালন করি, ইসলামের পক্ষে জিহাদেও যোগদান করি। একজন ইহুদী রাসূলের আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করলো আর রাসূল সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ইহুদীর স্বপক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এ রায় সঠিক হয়নি। আপনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে সঠিক ফায়সালা করে দিন।'

লোকটির কথাগুলো হযরত ওমরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ধমনীর রক্ত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। ক্রোধে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি জলদগম্ভীর কন্ঠে বললেন, 'তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমার মামলার ফায়সালা করে দিচ্ছি।'

এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোষমুক্ত তরবারী এনে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা শোনো, আল্লাহর রাসূল যে ফায়সালা করে দেন, তাঁর ফায়সালার সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের ফায়সালা এভাবেই করে দিতে হয়।'

এ কথা বলে তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে দ্বিখন্ডিত করে দিলেন। রাসূলের দরবারে সংবাদ পৌঁছে গেল, হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। চারদিকে এ সংবাদ প্রচার হয়ে গেল। লোকজন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন, ওমর কেন এমন কাজ করলো।

রাসূলের যাবতীয় দ্বিধা সংকোচ দূর করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন-

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

তোমার রবের শপথ ! লোকেরা কোনক্রমেই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তারা-হে নবী-আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী হিসেবে মেনে নেয়, আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনে কুণ্ঠাহীনতা রোধ করে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। (সূরা নিছা-৬৫)

অর্থাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যাকে হত্যা করেছেন সে ব্যক্তি মুমিন নয়, সে ব্যক্তি হলো মুনাফিক। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পরে নিজেকে মুসলমান দাবি করে খন্ডিতভাবে নবীর নেতৃত্ব মানার কোনো অবকাশ নেই, পরিপূর্ণভাবে নবীর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ পেশ করেছেন, সে আদর্শের কোন একটি দিকও ত্যাগ করা যাবে না। সে আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁর আদর্শ যেমন বাস্তবায়িত করতে হবে ব্যক্তি জীবনে, তেমনি বাস্তবায়িত করতে হবে দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ-وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا-

যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। (আহ্যাব-৩৬)

কোনো মুসলমান যদি রাজনীতি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই রাসূলের আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি করতে হবে। ইসলাম কোন মুসলমানকে এ সুযোগ দেয়নি যে, সে রাসূলের আদর্শের বিপরীত কোনো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করবে। এ ধরনের কোন রাজনীতির সাথে যে ব্যক্তি নিজেকে জড়িত করবে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করার তাঁর কোনো অধিকার নেই।

শাসন ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত, তাকেও রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। শাসক হিসেবে আল্লাহর রাসূল কিভাবে দেশ পরিচালিত করেছেন, সেভাবেই মুসলিম শাসক দেশ পরিচালনা করবেন। মুসলিম সেনাপ্রধান অনুসরণ করবেন আল্লাহর রাসূলকে। তিনি তাঁর বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখবেন, আল্লাহর রাসূল সেনাপ্রধান হিসেবে কিভাবে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী পরিচালিত করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে রাসূলের আদর্শকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে দরিদ্রতা দূর করেছিলেন। রাসূলের সেই অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হবে।

রাসূল যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষগুলোকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছিলেন, সেই শিক্ষানীতি অনুসরণ করতে হবে। শিল্পপতিগণ তাদের অধীনস্থ শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করবেন। মসজিদের ইমামকে দেখতে হবে, আল্লাহর রাসূল ইমাম হিসেবে কিভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইমামকেও সেভাবেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দেশ ও জাতির নেতা হিসেবে আল্লাহর রাসূল যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, বর্তমানেও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। পরিবারের প্রধান হিসেবে তিনি যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, স্বামী হিসেবে যেভাবে কর্তব্য পালন করেছেন, সেভাবেই কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হবে। জাগতিক কোনো বিপদ দেখা দিলে তিনি একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করতেন। মুসলমানদেরকেও যে কোনো বিপদে, কামনা-বাসনা পূরণে কোন পীর-মাজারে নয়—একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে এবং রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জিহাদ করতে হবে। আর নবীর পরিপূর্ণ আদর্শ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা—সংগ্রামের নামই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। এই জিহাদ করতে হবে জান্ ও মাল দিয়ে এবং এর নামও আমলে সালেহ্। এই আমলে সালেহ্ যথাযথ পন্থায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেই নবীর ওপরে ঈমান আনার ও তাঁকে অনুসরণ করার দাবি পরিপূর্ণ এবং যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, আমলে সালেহ্ কবুল

হওয়ার শর্ত, কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হওয়ার বিষয়টি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ওপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং কোরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত ভিন্ন কোনো পন্থায় সম্পাদিত আমলে সালেহ্ আল্লাহ কবুল করবেন না এবং তা কল্যাণকর ও ফলপ্রসূও হবে না। সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈমান ব্যতীত যেমন আমলে সালেহ্র কোনো মূল্য নেই, তেমনি আমলে সালেহ্ ব্যতীত ঈমানেরও কোনো মূল্য নেই। একজন ব্যক্তি বললো, 'আমি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের' প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ সে কর্মের মাধ্যমে তার বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটালো না, এই ঈমানের কোনো মূল্য নেই। যখন কোনো ব্যক্তি বলে যে, আমি অমুক কথা মেনে নিলাম। তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য মানুষ আশা করে যে, এবার লোকটির কর্মে ও ব্যবহারে ঐ স্বীকৃতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে। প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধি দাবি করে যে, কোনো কথাকে স্বীকার করার পর স্বীকারকারীর কাজে, আচার-আচরণে ও ব্যবহারে ঐ স্বীকৃতির অনিবার্য ফল ও বাস্তব চিত্র প্রস্ফুটিত হতে হবে। এখন যদি তা বাস্তবে প্রস্ফুটিত না হয় বা এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়, যা মূলতঃ অস্বীকৃতির লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথাই মনে করবে যে, এই লোকটি যে কথা স্বীকার করার দাবি করছে, প্রকৃতপক্ষে তা সে স্বীকার করেনি।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, বরং এটা একটি স্বীকৃত সত্য যে, পৃথিবীর কোনো কথা স্বীকার করার ও স্বীকার করানোর জন্য যে সমস্ত কাজ করা হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য নিছক মেনে নেয়া বা স্বীকার করানো হয় না, বরং স্বীকৃতি দানকারীর কোনো কথার স্বীকৃতি প্রদান করার পেছনে এই উদ্দেশ্য সতত ক্রিয়াশীল থাকে যে, স্বীকারকারী এই স্বীকৃতির দাবি পূরণ করবে বা সেই অনুসারে কাজ করবে। অপরদিকে স্বীকারকারী যখন স্বীকৃতি দেয়, তখন প্রত্যেক জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এর এই অর্থ গ্রহণ করে যে, এবার এই ব্যক্তি তার স্বীকৃতির দাবি পূরণ করতে আগ্রহী। যেমন সালিশ বৈঠকে কোনো সন্ত্রাসীর মুখ থেকে সন্ত্রাসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করা হলো, তাহলে সন্ত্রাসীকে কার্যত সন্ত্রাস করা থেকে বিরত রাখাই হয় স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্য। নিছক সন্ত্রাসের ক্ষতিকর

দিকের মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করা সেই সালিশ বৈঠকের উদ্দেশ্য হয় না। সন্ত্রাসী যখন সালিশ বৈঠকে স্বীকার করে যে, সন্ত্রাস অবশ্যই জনজীবনের জন্য চরম ক্ষতিকর, তখন সালিশে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই এ কথা মনে করে এবং সন্ত্রাসী ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করে যে, সে ব্যক্তি সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ড ত্যাগ করবে।

এখন সালিশে সন্ত্রাসী স্বীকারোক্তি দিলো যে সন্ত্রাস দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এই স্বীকৃতির পরও যদি সমাজের লোকজন ঐ ব্যক্তিকে সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ড করতে দেখে, তাহলে লোকজনের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, ঐ ব্যক্তি তার স্বীকৃতি পরিহার করেছে অথবা সালিশে উপস্থিত লোকজনের চাপে সে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো--সন্ত্রাস পরিহার করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে স্বীকারোক্তি দেয়নি। ঈমানের বিষয়টিও অনুরূপ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল মানুষের কাছ থেকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি স্বীকৃতি আদায়ের যে চেষ্টা করেছেন তা নিছক মানুষ শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দেবে, এটাই উদ্দেশ্য নয়। বরং এই সত্যকে স্বীকৃতি দেয়ার পর তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও নিদর্শনসমূহ স্বীকৃতি দাতার আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, কর্ম, কথাবার্তায়, চলাফেরায় তথা ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে প্রস্ফুটিত করাও এর অপরিহার্য উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল কোরআন ও হাদীসে এই নিদর্শন ও ফলসমূহকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এগুলো ঈমানের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও জীবনের অপরিহার্য অংশ। কোরআন ও হাদীসে ঐসব কাংখিত নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেই ইতিকর্তব্য পালন করা হয়নি, বরং এসব নিদর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলা হয়েছে, যেসব ব্যক্তির মধ্যে এগুলোর প্রকাশ না ঘটবে অথবা এগুলোর বিপরীতধর্মী নিদর্শন দেখা যাবে, তারা ঈমানদার হতে পারবে না। কোরআন ও হাদীসে বিষয়টি সম্পর্কে অসংখ্য উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞানও রয়েছে, সেই ব্যক্তি কোরআন ও হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে যে, ঈমান ও আমলে সালেহ্র মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জনের উপায়

যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় এবং তা অর্জিত হয় চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে ভালো ও মন্দের প্রবণতা প্রবলভাবে বিদ্যমান। কোরআনের পরিভাষায় এই প্রবণতাদ্বয়কে 'ফুজুর ও তাক্ওয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা আশ্ শাম্স-এর ৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে আগ্রহী এবং নিজের অভ্যন্তরের 'তাক্ওয়া' তথা ভালো প্রবণতাকে শক্তিশালী করতে আগ্রহী, কেবলমাত্র তার পক্ষেই আমলে সালেহ্ করা সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মহাক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, ব্যর্থ হয়ে যাবে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড, কেবলমাত্র তারা ব্যতীত-যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে। সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্ না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষেই সফলতা অর্জন করা কখনো সম্ভবপর হবে না। আর আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই তিনটি গুণের অধিকারী হতে হবে। সেই তিনটি গুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ- اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

যারা নামায আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। এরাই তাদের রব-এর পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই সফলতা অর্জন করবে। (লুকমান-৪-৫)

ঈমানদারদের নীতি হলো, তারা আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করার পথ অবলম্বন করে, সৎ হতে চায়, কল্যাণ ও ন্যায়ের সন্ধান করে এবং অসৎকাজ সম্পর্কে যখনই সতর্ক করা হয় তখনই তা পরিহার করে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ যখনই উন্মুক্ত হয়, তখনই সে পথে চলা শুরু করে। কোরআন যাদেরকে সৎকর্মশীল বলে অভিহিত করেছে তারা কেবলমাত্র নামায আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে ও আখিরাতে বিশ্বাস করবে-এই তিনটি গুণই তাদের থাকবে, এ কথা বলা হয়নি। আমলে সালেহ্ তথা সৎকর্ম যারা করে কোরআন তাদেরকে 'মুহ্ছিনীন' বা 'সৎকর্মশীল' হিসাবে অভিহিত করে বলেছে, এরা ঐ সমস্ত কাজই করে, কোরআন যে কাজের নির্দেশ দিয়েছে এবং ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকে, কোরআন যা নিষেধ করেছে। 'মুহ্ছিনীন বা সৎকর্মশীল' শব্দটি কোরআনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ঐ তিনটি গুণ যথা নামায আদায়, যাকাত আদায় ও আখিরাতে বিশ্বাস-সৎকর্মশীল হওয়ার জন্য এই তিনটি গুণের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ মানব জীবনের যাবতীয় সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্ এই তিনটি সদগুণের ওপরে একান্তভাবেই নির্ভরশীল। প্রথম গুণ হলো নামায আদায়-কারণ এই নামাযই একজন মানুষকে মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়ে তোলে। যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই নামাযী, সে তো একথারই প্রমাণ দেয় যে, সে মহান আল্লাহর গোলাম হতে আগ্রহী। কারণ নামাযী ব্যক্তি নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে নিজেকে মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিবেদন করে থাকে। এ জন্য প্রত্যেক মুসলমানকেই এই বিষয়টি একান্তভাবেই

জানতে হবে যে, সে নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে কি বলছে। নামাযে মুখে সে যা বলছে, তার মর্ম যদি সে অনুধাবনই করতে না পারে, তাহলে সেই নামায তো তার জীবনে কোনো পরিবর্তন আনবে না এবং সে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবেও গড়তে সক্ষম হবে না। (সূরা ফাতিহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পাঠ করুন-তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীর।)

নামায ব্যক্তির মন-মানসিকতায় মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলে, আল্লাহর বিধান অনুসরণের স্থায়ী অভ্যাস সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হওয়ার জন্য সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মনে এ কথা স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক যে, সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একজন গোলাম এবং জীবনকাল নামক সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর গোলামীর ভেতর দিয়েই অতিবাহিত করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানব সত্তায় যে মন্দ প্রবণতা নিহিত রয়েছে, সেই প্রবণতা ও ইবলিস শয়তান মানুষকে নিজের গোলাম বানানোর চেষ্টা করছে, অপরদিকে এক শ্রেণীর শক্তিমান মানুষও অন্য মানুষকে নিজের গোলামে পরিণত করতে চায়। নিজের মন্দ প্রবণতা, ইবলিস শয়তানের প্ররোচনা ও শক্তিমান মানুষের চেষ্টা-সাধনাকে প্রতিহত করে একমাত্র নামাযই মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি একমাত্র মহান আল্লাহর গোলাম।

একজন মানুষ নিজেকে ঈমানদার দাবি করছে, সে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী কিনা এবং বাস্তব কর্মজীবনে সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে প্রস্তুত কিনা, তার প্রথম পরীক্ষাই হলো সে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করছে। যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না, নামাযের আহ্বান অর্থাৎ আযান শুনেও নামাযের জন্য প্রস্তুত হয় না, তাহলে এ কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর গোলাম হতে রাজী নয়। এই ধরনের ব্যক্তি মুখে যতোই দাবি করুক না কেনো যে, সে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী, তার এই দাবির কোনেই মূল্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ-وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ -

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ -

নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেও কঠিন নয়, যারা বিশ্বাস করে যে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা-৪৫-৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করে না এবং আখিরাতও বিশ্বাস

করে না, তার পক্ষে নামায এক দুঃসাধ্য কাজ ও বোঝা বিশেষ। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফুর্তভাবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে, যার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাকে আদালতে আখিরাতে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, তার পক্ষে নামায আদায় করা সামান্যতম কঠিন কাজ নয়, বরং নামায আদায় না করাই তার কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার অনুরূপ কষ্টদায়ক।

ঈমান আনার পরে একজন মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম যে কাজ ফরজ হয়, তাহলো নামায আদায়। এই নামাযই মানুষের ভেতরে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। নামায মানুষের ভেতরে এই চেতনা জাগ্রত রাখে যে, সে যে কোনো অবস্থায় এবং যেখানেই অবস্থান করুক না কোনো, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখছেন। তার দেহের প্রতিটি স্পন্দন, চোখের পলক, মনের কল্পনা আল্লাহ তা'য়ালা দেখছেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে, আলোয় ও অন্ধকারে, উর্ধ্ব জগতে বা পানির অতল তলদেশে, যেখানেই সে যাক না কেনো, মহান আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই চেতনা মানুষের হৃদয়ে নামায সৃষ্টি করে দেয় এবং এ কারণেই ব্যক্তি সৎকাজ বা আমলে সালেহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়।

সুতরাং আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নামায আদায় করতে হবে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল নামায আদায় করেছেন। নামাযে যা পাঠ করা হয়, তার মর্ম অনুধাবন করতে হবে এবং নামাযের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। অতএব নামায হলো ঈমানে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জনের প্রথম গুণ।

আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জনের দ্বিতীয় গুণ হলো, যাকাত আদায় করা। যাকাত প্রত্যেক সম্পদশালী ঈমানদারের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু সম্পদ না থাকলেও প্রত্যেক ঈমানদারকে দান-সদকার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে। গোপনে-প্রকাশ্যে, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল যে কোনো অবস্থায় ঈমানদারকে দান-সদকা করতে বলা হয়েছে। যাকাত আদায় ও দান-সদকার ফলে ব্যক্তির ভেতরে আত্মত্যাগের প্রবণতা সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। 'যাকাত' শব্দের অর্থ হলো পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত বা কষ্টার্জিত সম্পদ, যার মালিক ব্যক্তি স্বয়ং নিজে, সেই ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভাবী, গরীব ও মিসকীন লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়াকে 'যাকাত' বলা হয়েছে। এভাবে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বন্টন করে দেয়ার ফলে সম্পদশালী ব্যক্তি যেমন নিজের আত্মাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে, তেমনি তার ধন-সম্পদও পরিশুদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ তাঁর অভাবী বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে না, সেই ব্যক্তির সমুদয় ধন-সম্পদ যেমন অপবিত্র, তেমনি সেই ব্যক্তির মন-মানসিকতাও কলুষিত। এর কারণ হলো, যেসব সম্পদশালী যাকাত আদায় করে না, তাদের হৃদয়ে

কৃতজ্ঞতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এসব লোক দৈহিকভাবে সুন্দর-সুঠাম ও বলিষ্ঠ হলেও তাদের হৃদয় অতি সঙ্কীর্ণ। এরা অত্যন্ত স্বার্থপর ও অর্থ পিশাচ। যে আল্লাহ্ একান্ত অনুগ্রহ করে তাদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করেছেন, সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এরা ভয়ঙ্কর কৃপণ। নিজের রব মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এই ধরনের কৃপণ ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে নিজের স্বার্থে যে কোনো উপায়ে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত, কিন্তু মহান আল্লাহর পছন্দনীয় পথে, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এরা একটি কানাকড়িও ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়।

যাকাত আদায়, দান-সাদকা করার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেছেন। যে ব্যক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের ইচ্ছায় দান-সাদকা করে, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ যাকাত দেয়, অভাবী লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, সেই ব্যক্তির পক্ষেই মহান আল্লাহর গোলামীর পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং তার পক্ষেই আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। আর যে ব্যক্তি দান-সাদকা ও যাকাত আদায়ে কৃপণতা করে, তার পক্ষে আল্লাহর পছন্দনীয় পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তার পক্ষে আমলে সালেহ্ করাও সম্ভব নয়।

এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যতো নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাঁরা সকলেই নিজের অনুসারিদেরকে নামায ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়েছেন এবং পরকালে জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হলো, এই তিনটি গুণ না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জন করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যাদের ঈমান নেই এবং নামায ও যাকাত আদায় করে না তারা শুধু মহান আল্লাহর হেদায়াত থেকেই বঞ্চিত হবে না, কল্যাণ ও সাফল্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না–তারা অবশ্যই মহাক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। প্রত্যেক নবী-রাসূলই নামায ও যাকাতের কথা বলেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামও এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে–

وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا-

আল্লাহ আমাকে মহান করেছেন, যেখানেই আমি অবস্থান করি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকবো ততোদিন নামায ও যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা মারইয়াম-৩১)

অনুরূপভাবে শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নামায ও

যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। যেন মানুষ আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জন করে সেই মহাক্ষতি থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে সক্ষম হয় এবং সফলতা অর্জন করতে পারে।

আমলে সালেহ্ করার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বশেষে যে গুণের কথা আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, সে গুণটি হলো ব্যক্তিকে হতে হবে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। এ কথা আমরা সূরা ফাতিহার তাফসীরে ও আমপারার তাফসীরে একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, পৃথিবীর জীবন শেষে মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনে হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে প্রত্যেক মানুষকেই পৃথিবীতে সংঘটিত করে যাওয়া যাবতীয় কিছুর ব্যাপারেই জবাবদিহি করতে হবে। এ কথাও আমরা উল্লেখ করেছি যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে কোনো একক বিষয়ে এত অধিক আলোচনা করেননি, যতো আলোচনা করেছেন আখিরাত সম্পর্কে।

একটি বিষয় সম্পর্কে এত অধিক আলোচনা করার কারণ একটিই, তাহলো মানুষের চরিত্র কোনোক্রমেই ভালো হতে পারে না, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে কোনোভাবেই অপরাধ মুক্ত রাখা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ সেই মানুষের হৃদয়ে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি না হবে।

কারণ, এই একটি মাত্র অনুভূতিই মানুষকে সমষ্টিগতভাবে অথবা একাকী, নির্জনে বা লোকালয়ে, গোপনে বা প্রকাশ্যে, আলোয় অথবা অন্ধকারে অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত রাখে। আখিরাতের ভয় ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষেই অবৈধ লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। আখিরাত বিশ্বাস মানুষের ভেতরে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি করার অনুভূতি সৃষ্টি করে। যার ভেতরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়, সে ব্যক্তি পশুসুলভ আচরণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং জন্তু-জানোয়ারের অনুরূপ চারণক্ষেত্রে বাঁধনহারা হয়ে যেদিক খুশী সেদিকে যেতে পারে না। বরং এরা হয় মহান আল্লাহর গোলাম এবং নিজেদেরকে কখনো স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। এদের মনে এ কথা সব সময় জাগ্রত থাকে যে, সে এমন এক শক্তির গোলাম, যে শক্তির দৃষ্টির বাইরে তার পক্ষে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় এবং তাঁর সামনে তাকে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে।

যারা আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করতে আগ্রহী, উল্লেখিত তিনটি গুণ তাদেরকে সর্বপ্রথম অর্জন করতে হবে। এই তিনটি গুণ অর্জিত হলে ব্যক্তির ভেতরে সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ করার একটি ধারাবাহিক অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তারা রাসূল প্রদর্শিত পথে সৎকাজ করতে থাকে। এদের দ্বারা ঘটনাক্রমে বা হঠাৎ করে কোনো সৎকাজ সংঘটিত হয় না, বরং

তারা সঠিক চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতেই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ করে। এদের দ্বারা যদি কখনো কোনো অসৎকাজ সংঘটিত হয়েই যায়, তাহলে তা হয় ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং সে ভুল করেছে–এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তওবা করে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এসব লোক আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ মনে করে এমন কোনো কাজে নিজেকে জড়িত করে না, যে কাজ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবা কেরাম কখনো করেননি। সওয়াব অর্জনের আশায় অথবা আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে যে কাজই তারা করে বা করার নিয়ত করে, সেই কাজের পেছনে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন রয়েছে কিনা–তা এসব লোক অনুসন্ধান করে দেখে। কেউ একজন বললো, নামায-রোযা আদায় করা এবং দেশ-বিদেশে মসজিদে মসজিদে অবস্থান করে মানুষকে নামায-রোযা আদায় করার উপদেশ দেয়ার পথই হলো মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সহজ পথ।

অথবা অমুক পীরের মুরীদ হয়ে তার নির্দেশ অনুসারে সকাল-সন্ধ্যায় বা গভীর রাতে বিশেষ কতকগুলো যিক্‌র করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাত দিয়ে দেবেন। এসব কথা শোনার সাথে সাথেই সে ব্যক্তি তা অনুসরণ করবে না। বরং সে কোরআন ও হাদীসে অনুসন্ধান করে দেখবে, কোন্ ধরনের আমলে সালেহ্ করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপরে সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবা কেরাম কোন্ ধরনের আমলে সালেহ্ করেছেন। রাসূল প্রদর্শিত পথে যারা ঈমান এনে আমলে সালেহ্ করেছে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ–

যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত। (সূরা লুক্‌মান-৮)

আমলে সালেহ্ করার জন্য জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতা

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রায় সত্তরটিরও অধিক আয়াতে ঈমানের কথা বলার সাথে সাথে আমলে সালেহ্র কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ঈমান ও আমলে সালেহ্ ব্যতীত কারো পক্ষেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা। এখন যে ব্যক্তি ঈমান এনে ঈমানের দাবি করলো, তার যদি ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকে, এ দুটো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকে, তাহলে তার পক্ষে ঈমান টিকিয়ে রাখার জন্য আমলে সালেহ্ করা কখনো সম্ভব হবে না। সুতরাং ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈমান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে এবং প্রকৃত আমলে সালেহ্ কি, তা চেনার মতো জ্ঞানার্জন করতে হবে। ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে জ্ঞানহীন ব্যক্তির অবস্থা হবে অন্ধ ব্যক্তির অনুরূপ, যে ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে কখন্ হোচট্ খাবে বা খানা-খন্দে পড়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বিপন্ন করবে, তা সে নিজেও জানে না।

অনুরূপভাবে ঈমানের দাবিদার ব্যক্তির ঈমান সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকলে তার ঈমান যেমন শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে না, শয়তান তার ঈমানের মধ্যে গলদ সৃষ্টি করবে, তেমনি আমলে সালেহ্ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এমন ধরনের কর্মকান্ডকে সে ব্যক্তি আমলে সালেহ্ বলে গণ্য করবে এবং আল্লাহর পসন্দের কাজ বলে ধারণা করবে, প্রকৃতপক্ষে যা আমলে সালেহ্র পর্যায়ে পড়ে না।

ইতোপূর্বে আমরা ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, ঈমান কি, কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে, ঈমান আনা বলতে কি বুঝায় এবং ঈমানের দাবি কি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কোনো ধরনের বিপদে নিপতিত হলে বিপদ মুক্তির জন্য একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করতে হবে এবং এটা ঈমানের দাবি। ঈমান আনয়নকারীর যদি ঈমানের এই দাবি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে সে ব্যক্তি তো বিপদে নিপতিত হলেই দৃশ্যমান পার্থিব কোনো শক্তিকেই বিপদে ত্রাণকারী হিসাবে গ্রহণ করে তার কাছেই মুক্তি কামনা করবে। এতে সে যেমন নিজের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো এবং যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহর, তা অন্যের প্রতি আরোপ করে শিরক্ নামক মারাত্মক গোনাহ্ করলো–শুধুমাত্র ঈমানের দাবি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে।

একইভাবে ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তির যদি আমলে সালেহ্ সম্পর্কে সম্যক স্বচ্ছ-জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়দের প্রয়োজন পূরণ না করে নিজের কষ্টার্জিত অর্থ মৃত মানুষের জন্য ব্যয় করাকেই সওয়াবের কাজ তথা আমলে সালেহ্ বলে মনে করবে। আপনজন খাদ্যের ও বস্ত্রের অভাবে রয়েছে, সে ব্যক্তি সে অভাব পূরণ না করে মাজার আবৃত করার জন্য মূল্যবান চাদর কিনে দিচ্ছে

অথবা ওরশ করার জন্য অর্থ ব্যয় করছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা মশারীর অভাবে মশার আক্রমণে রাতে ঘুমাতে পারে না, সে ব্যক্তি পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয় করে মাজারে মশারী কিনে দিয়ে মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে যে, সে আমলে সালেহ্ করে আমলনামায় অনেক সওয়াব অর্জন করলো।

আমলে সালেহ্ সম্পর্কে জ্ঞানহীন এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, চলন্তি পথে বাস বা ট্রেনে কোথাও যাচ্ছে, পাশের যাত্রীর কাছে টাকা নেই, ফলে সে গন্তব্য স্থানের ধার্যকৃত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে ভাড়া সংগ্রহকারীর কটুবাক্য নীরবে সহ্য করছে। এই অভাবী লোকটিকে সাহায্য করাই ছিল ঈমানের দাবি এবং এই কাজটি ছিল আমলে সালেহ্। অথচ এই অভাবী লোকটিকে সাহায্য না করে রাস্তার পাশে অথবা রেল স্টেশনে যখনই কোনো মাজার দেখা গেলো, অমনি সেই মৃত মানুষের কবরে নগদ অর্থ দান করে মনে মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করলো যে, সে বড়ই সওয়াবের কাজ তথা আমলে সালেহ্ করলো। এর কারণই হলো, ঐ ব্যক্তির আমলে সালেহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান নেই।

এ জন্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে ঈমান সম্পর্কে অবশ্যই সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং সেই সাথে আমলে সালেহ্-যা ঈমানদারের দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হবে। এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সবথেকে বড় নে'মাত এবং এই নে'মাতের প্রতি যারা ঈমান আনলো, তারা নিজেদেরকে ধন্য করলো। এই নে'মাত লাভ করা এবং একে রক্ষা করা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই নে'মাত সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপর। এই জন্য ইসলাম ঐটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরজ করে দিয়েছে, যেটুকু জ্ঞান থাকলে মানুষ তার আপন স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হবে এবং সৃষ্টি হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজ্ঞাগ-সচেতন হতে পারবে।

জ্ঞান না থাকলে মানুষ ঈমান নামক নে'মাত লাভ করতে পারে না। আর যদিও ঈমানের কিছুটা স্বাদ লাভ করলেও তা হেফাজত করা মারাত্মক কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতি মুহূর্তে আশংকা থেকে যায় যে, তা কখন কোন্ মুহূর্তে হারিয়ে যায়। এক শ্রেণীর লোক এমন রয়েছে যে, ঈমান সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই, অথচ নিজেদেরকে বড় ধরনের ঈমানদার মনে করে-এর একমাত্র কারণ হলো ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। এসব ব্যক্তির ঈমান ও ঈমানহীনতা যেমন কোনো ধারণা নেই, তেমনি ধারণা নেই আমলে সালেহ্ ও আমলে মুনকার সম্পর্কে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত ভালো ও মন্দ কাজ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এসব লোক জানে না, ইসলাম ও কুফর, হক ও বাতিল, ইসলাম ও শিরক-এসবের মধ্যে পার্থক্য কি।

ঈমানের দাবিদার যেসব ব্যক্তির উল্লেখিত বিষয়সমূহের সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং এসবের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তাদের অবস্থা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন তিমিরাবৃত

রাতের দুর্গম পথের পথিকের মতো। কুহেলিকাবৃত অন্ধকার পথে চলতে গিয়ে নিজের অজ্ঞান্তেই কখন যে সে সোজা পথ থেকে ছিট্‌কে মরণ গহ্বরে পতিত হবে, সে ধারণাই তার থাকবে না। ঈমানের জ্ঞান না থাকার কারণে কখন যে সে শির্‌ক করে বসবে এবং আমলে সালেহ্ করতে গিয়ে কখন যে সে আমলে মুনকারে জড়িয়ে পড়বে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকবে না। এসব লোকদের সামনে শয়তান অত্যন্ত পরহেজগার লোকের রূপে এসে ধোকা দেবে যে, 'তুমি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পথ অনুসন্ধান করছো, এসো আমি তোমাকে সেই সোজা সহজ সরল পথটি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে জ্ঞানহীন ব্যক্তি পরহেজগাররূপী সেই শয়তানের হাতে নিজেকে অর্পণ করে ধ্বংসের পথের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকবে। কারণ এই ব্যক্তির কাছে তো ঈমান ও আমলে সালেহ্-এর জ্ঞান নামক আলো নেই, যা দিয়ে সে সত্য-সঠিক পথ চিনে সেই পথে চলবে। আর আমলে সালেহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের আলো যদি তার কাছে থাকতো তাহলে সে ব্যক্তি সত্য-সঠিক পথও চিনতে ভুল করবে না এবং ভিন্ন কোনো শক্তি তাকে ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্টও করতে পারবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে ইসলাম প্রদর্শিত সহজ-সরল পথের ওপর দিয়েই চলতে থাকবে এবং যতগুলো বাঁকা-চোরা পথ তার সামনে আসবে, সে সহজেই তা ভুল পথ বলে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। সত্য পথ থেকে বিচ্যুতকারী কোনো লোকের তৎপরতা দেখলেই সে চিনতে পারবে, এই লোক ভ্রান্ত পথের পথিক এবং কোনো ক্রমেই তাকে অনুসরণ করা যাবে না।

সুতরাং এখান থেকে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে যে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকা এবং ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ইসলামের অনুসারী বলে দাবিদার লোকদের জন্য কতটা বিপজ্জনক। এই অজ্ঞানতার কারণে সে ব্যক্তি স্বয়ং যেমন পথভ্রষ্ট হতে পারে, অপরকেও ভ্রষ্ট পথের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং ভিন্ন কোনো শক্তির মাধ্যমেও ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। অতএব তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। যারা জেনে বুঝে ঈমান এনে আমলে সালেহ করে এবং যারা অন্ধের মতো ইসলামের বিপরীত কাজগুলো সওয়াবের নিয়তে করে, এই উভয় দলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন-

وَمَا يَسْتَوِى الأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ-وَلاَالظُّلُمٰتُ وَلاَالنُّوْرُ-وَلاَالظِّلُّ وَلاَالْحَرُوْرُ-وَمَايَسْتَوِى الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ-

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, না অন্ধকার ও আলো সমান পর্যায়ভুক্ত, না শীতল ছায়া ও রোদের তাপ একই পর্যায়ের এবং না জীবিত ও মৃতরা সমান। (সূরা ফাতির-১৯-২২)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? (কোরআন)

অতএব মানুষ হিসাবে পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে জ্ঞানার্জন করতে হবে। প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীত সফলতা অর্জন করা যাবে না বরং আখিরাতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে শামিল হতে হবে। হেরা পর্বতের গুহায় লাইলাতুল কদরের রাতে সর্বপ্রথম যে ওহী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, সেখানেও বলা হচ্ছে 'পড়ো' অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের পথে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে মানব মন্ডলীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফসীরে সাঈদী-আমপারা সূরা আলাকের প্রথম আয়াতের তাফসীর।)

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করা এবং ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কিত সঠিক ধারণা লাভ করার ওপরে নির্ভর করে সফলতা ও ব্যর্থতা। সূরা আসরে সময়ের শপথ করে বলা হচ্ছে, সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল-তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করেছে এবং অন্য মানুষকেও মহান আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানিয়েছে-আর আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে যখন বিপদ-মুসিবত এসেছে, তখন ধৈর্য ধারণ করেছে। এই চারটি গুণ যারা অর্জন করেছে, কেবলমাত্র তারাই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে আর যারা পারেনি, তারা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারাই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এই গুণগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তা যেমন অর্জনও করা যাবে না, সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হতে হবে।

অতএব ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও তা বাস্তবায়নের ওপরেই নির্ভর করে একজন মানুষের ঈমানদার হওয়া না হওয়া তথা মুসলমান থাকা না থাকা। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একে অবহেলা বা এড়িয়ে যাবার সামান্যতম অবকাশও নেই। মানুষ যেমন কোনো ব্যবসায় পূজি বিনিয়োগ করে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে না বা সেই ব্যবসার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে না। বিনিয়োগকৃত পূজি টিকিয়ে রাখা, তা লাভজনক পর্যায়ে উপনীত করা ও ব্যবসার পরিধি বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য যত্নবান হয়, সজাগ থাকে এবং তৎপরতা প্রদর্শন করে। এভাবে কর্মতৎপর না হলে সেই ব্যক্তি ব্যবসাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নিত করা তো দূরে থাক-মূল পূজিই হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

অনুরূপভাবে একজন মানুষ ঈমানের পূজি বিনিয়োগ করে যদি সেই ঈমানের প্রতি যত্নশীল না হয় অর্থাৎ ঈমান কি, ঈমানের দাবি কি, কোন্ কাজ করলে ঈমান থাকবে না, ঈমানকে শক্তিশালী করার উপায় কি, ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্-এর সম্পর্ক কি, আমলে সালেহ্

বলতে কি বুঝায় ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন না করে এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, উদাসীন থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির ঈমান নিরাপদ থাকবে না, শয়তানের আক্রমনে ঈমানের সৌধ ভেঙ্গে ধূলিস্মাৎ হয়ে পড়বে–পরিশেষে তাকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হতে হবে।

বর্তমানে মুসলমানরা এই ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কেই সবথেকে বেশী অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে। অথচ এই জিনিসটিই পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতার একমাত্র মাধ্যম। প্রথম যুগের মুসলমানদের ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল এবং সেই জ্ঞানানুসারে তাঁরা আমলে সালেহ্ করেছেন। ফলে তাঁরা পৃথিবীতে সফলতা অর্জন করেছিলেন। অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ ও অভাব থেকে তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন। অঢেল ধন-ঐশ্বর্য্য তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল, সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে তাঁরা আসীন ছিলেন। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব ছিল না, যে শক্তি তাঁদের দিকে রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করবে। ঈমান আনলে এবং আমলে সালেহ্ করলে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সফলতা দেবেন, মহান আল্লাহর এই ওয়াদা অনুযায়ী তাঁরা পৃথিবীতে যেমন সফলতা অর্জন করেছিলেন, তেমনি আখিরাতেও সফলতা অর্জন করবেন।

মহান আল্লাহর ওয়াদা চির অনড়-অবিচল। এখনও যারা ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করবে, তাদের ব্যাপারেও মহান আল্লাহর ওয়াদা সেই একইভাবে বাস্তবায়িত হবে। ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানরা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে, আমলে সালেহ্ও করছে না, যৎসামান্য যা করছে তা-ও গলদে পরিপূর্ণ–এর বিষময় ফল যা হবার তাই হয়েছে। পৃথিবীতে তারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত হচ্ছে। অভাব তাদেরকে ঘিরে ধরেছে, নিজেদের সম্পদ ভিন্ন জাতি শক্তি প্রয়োগ করে বা কৌশলে লুটে নিচ্ছে। সংখ্যায় প্রথম যুগের মুসলমানদের তুলনায় কয়েক শতগুণ বেশী হওয়ার পরও তারা ভিন্ন জাতির স্বৈরাচারী শক্তির সামনে অনুগত ভৃত্যের মতোই দন্ডায়মান। দেহ থেকে রক্তের বন্যা ছুটছে, আঘাতে আঘাতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সময়ের প্রতিটি মূহূর্তে তারা ভিন্ন জাতির আধুনিক সমরাস্ত্রের খোরাকে পরিণত হচ্ছে, সবথেকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করেও সন্ত্রাসী অভিধায় অভিযুক্ত হচ্ছে, তবুও 'আহ্' শব্দটুকু করার সাহসও পাচ্ছে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে মুসলিম জাতি ছিল সিংহের মতোই বিক্রমশালী, ঈমান ও আমলে সালেহ্-এর অভাবে সেই জাতি শৃগালের জাতিতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের এই দুঃখজনক পরিণতি দেখে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন–

শের কি ম্যর পে বিল্লি খেল রাহি
ক্যয়সা ব্যদ্ নছিব মুসলমাঁ কা-শাহাদাত কি তামান্না ভুল গ্যায়ি,
তাস্‌বীহ্ কি দাঁনু মেঁ জান্নাত ঢুন্ড রাহি।

সিংহের মাথার ওপরে বিড়াল খেলা করে, বড়ই হতভাগ্য এই মুসলমানদের, তাদের হৃদয় থেকে শাহাদাতের কামনা মুছে গিয়েছে, এরা এখন আসরীতুর নালার মধ্যে জান্নাত অনুসন্ধান করছে।

অতুলনীয় শৌর্য-বীর্য, সাহসী, নির্ভীক, বীরত্ব ও বিক্রমের অধিকারী মুসলিম জাতির ওপরে আজ শৃগালের জাতি দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করছে, শৃগাল পদানত করে রেখেছে সিংহকে। আফসোস এই মুসলমানদের জন্য, এরা কতই না হতভাগ্য! যে জিহাদ ও শাহাদাতের অদম্য কামনা এদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিল, পৃথিবীতে সফলতা এনে দিয়েছিল, সেই জিহাদ আর শাহাদাতের আকাংখা এদের ভেতরে থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। আল্লাহর জান্নাতের পথই হলো জিহাদ আর শাহাদাতের পথ-এই পথ ত্যাগ করে মুসলমানরা আজ তসবীহ্ পাঠ করে জান্নাতে যাবার সহজ পথ বের করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'জান্নাত হলো তরবারীর ছায়ার নীচে।'

অর্থাৎ জিহাদ আর শাহাদাতের পথের শেষেই জান্নাত অবস্থিত। ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে যেমন ঈমান হারিয়ে গিয়েছে, তেমনি আমলে সালেহ্ও মুসলিম জীবনে অনুপস্থিত। ফলে দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-অপমান আর নির্যাতন হয়েছে মুসলমানদের নিত্য সঙ্গী। ঈমান ও আমলে সালেহ্ না থাকার দরুণ পৃথিবীতেই যখন মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা হয়েছে, তখন আখিরাতে তাদের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে, তা কল্পনা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ঈমান ও আমলে সালেহ্ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে। তাহলেই পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা যাবে। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে তিরমিযীর হাদীস বলা হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا-

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কথা ঈমানদার ব্যক্তির হারানো সম্পদ। সে সম্পদ যে যেখানেই পাবে, সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী।

উল্লেখিত হাদীসে 'কালিমাতুল হিক্‌মাহ্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির বহুবিদ অর্থ রয়েছে। এর একটি অর্থ হলো 'বিজ্ঞানসম্মত কথা' অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত ও বুদ্ধিসম্মত কথা, এমন কথা যার ভেতরে কোনো ধরনের দুর্বলতা, সংশয়-সন্দেহ ও অযৌক্তিক কিছু নেই। প্রকৃত যুক্তি ও বুদ্ধিসম্মত যতো কথা রয়েছে, তা সবই ঈমানের কথা। কারণ এই পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঈমানই হচ্ছে একমাত্র যুক্তি ও বিবেকসম্মত বিষয়।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের অনুকূলে যতো কথা হবে, তা সবই নিশ্চিতরূপে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত হবে। এর বিপরীত যা রয়েছে, তা সবই মূলত ভিত্তিহীন, সন্দেহ-সংশয়ে পরিপূর্ণ ও অবিশ্বাস্য। সুতরাং বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত যা কিছু রয়েছে, তা বলা, গ্রহণ করা ও একান্ত আপন করে নেয়া ঈমানদারদের একান্ত কর্তব্য।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। বহু পারদর্শী ও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীই তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণার ফলেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন যে, এই বিশ্বলোকের অন্তরালে এক মহাশক্তিধর সত্তার অবস্থিতি বিদ্যমান, যিনি এই মহাবিশ্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করছেন এবং প্রতি মুহূর্তে এর নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ ও হিসাবে ভারসাম্য রক্ষা করেই বর্ষণ করছেন তাঁর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ। গোটা সৃষ্টিলোকে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, পরম্পরা, ঘনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা রয়েছে, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও অত্যুজ্জ্বল বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে এই পৃথিবী।

সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকটি জীব কোষে তিনিই জীবন সৃষ্টি করেন, প্রত্যেকটি অণুকণা একান্তভাবে তাঁরই অনুগ্রহে বর্তমান। মহাশূন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাত ও দিনের সুনিয়ন্ত্রিত আবর্তন, সাগর-মহাসাগর, নদী-সমুদ্রে মানুষের কল্যাণবহ দ্রব্যাদিসহ ভাসমান জলযান, বৃষ্টি বর্ষণে শুষ্ক মৃত যমীনের বুকে উদ্ভিদের উদ্গম, যমীনের বুকে চলমান জীব-জন্তু, শূন্যে উড্ডিন প্রাণীসমূহ, বাতাসের প্রবাহ ও দিক পরিবর্তন, আকাশ ও পৃথিবীর শূন্যমার্গে ভাসমান মেঘমালা ইত্যাদিতে একমাত্র এক আল্লাহর শাশ্বত অস্তিত্ব ও সদা সক্রিয় অশেষ শক্তি ও অকল্পনীয় ক্ষমতার অকাট্য নিদর্শন নিহিত রয়েছে।

সুতরাং অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে কোরআন পরিবেশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। জ্ঞানের বর্মে ঈমানকে আবৃত করে কোরআন ও হাদীস প্রদর্শিত পথে আমলে সালেহ্ করতে হবে, তাহলে ইন্শা আল্লাহ মহাক্ষতি থেকে নিজেকে হেফাজত করা যাবে।

ঈমান ও আমলে সালেহর ভিত্তি

ঈমান হলো মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ভিত্তি (Foundation)। ভিত্তি যদি মজবুত না হয়ে দুর্বল হয়, তাহলে বাইরের কারুকার্য যতোই মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি নন্দন হোক না কেনো বা এর ওপরে যতো কিছুই দাঁড় করানো হোক না কেনো, তা মৃদুমন্দ বাতাসেই যে কোনো দিকে হেলে পড়বে। এ জন্য মুসলমানকে সর্বপ্রথম ঈমানের ভিত্তি মজবুত করতে হবে, ঈমান আকিদা ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস কোরআন-হাদীস তথা আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের আকীদা অনুযায়ী মজবুত করে গড়তে হবে। তাওহীদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে এবং এটাই ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এরপর নবী-রাসূল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে এবং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, তাঁরা

সবাই মাসুম, বে-গোনাহ্ ছিলেন, তাঁরাই একমাত্র সত্য পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম এবং আনুগত্য লাভের অধিকারী। তাঁরা কোনো ভুল করতে পারেন না এবং কখনো কোনো গোনাহ্ করেননি, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

এরপর কোরআন বুঝতে হবে। কোরআন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বলেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। যেন মানুষকে তিনি কোরআন বুঝিয়ে দিতে পারেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'আল্লাহর রাসূলের চরিত্র কেমন?'

জবাবে তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি কোরআন পড়নি?' সাহাবাগণ জানালেন, 'হ্যাঁ, কোরআন পড়েছি।' তিনি বললেন, 'কোরআনের যা পড়েছো, তার বাস্তব নমুনা যদি দেখতে চাও তাহলে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নাও।' আল্লাহর রাসূল ছিলেন কোরআনে কারীমের মুজাচ্ছামে নমুনা। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোরআনের বহু তাফসীর রচিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরো রচিত হবে। কিন্তু আল্লাহর কোরআনের মূল ব্যাখ্যাতা, মূল ভাষ্যকার ও মূল মুফাচ্ছীর যিনি তিনি হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল হলেন কোরআনের সরকারী ব্যাখ্যাতা। সুতরাং কোরআন বুঝার জন্য প্রথম শর্তই হলো আল্লাহর নবীকে বুঝা। আল্লাহর নবীকে বুঝতে না পারলে, তাঁর পবিত্র জীবনধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে না পারলে কোরআন বুঝা যাবে না।

আর আল্লাহর নবীকে বুঝতে হলে তাঁর পবিত্র সাহাবায়ে কেরামদেরকে বুঝতে, জানতে হবে তাঁদের পূত ও পবিত্র জীবনধারা। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং ভালোবাসতে হবে। একমাত্র তাঁদের অনুসরণ করলেই রাসূলের অনুসরণ করা হবে আর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে। আর একমাত্র এ পথেই মানব জীবনে সফলতা অর্জিত হবে। মহাক্ষতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং সফলতা অর্জনের এই পথ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। সুতরাং ঈমান আনতে হবে ঐভাবে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল ঈমান আনতে বলেছেন এবং আমলে সালেহ্ও করতে হবে ঐ পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল আমলে সালেহ্ করেছেন। তাঁর সাহাবাগণ যে পদ্ধতিতে আমলে সালেহ্ করেছেন, সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে-ভিন্ন কোনো পদ্ধতি কেউ যদি কারো সামনে পেশ করে, তাহলে বুঝতে হবে, সেটা শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যই পেশ করা হয়েছে।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য এবং আমলে সালেহ্ করার জন্য নবী-রাসূলদেরকে বুঝতে হবে। এই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলর প্রেরণ করা হয়েছে পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সহজ সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাঁদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে সমস্ত দাসত্ব

থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান করা। একমাত্র আল্লাহকেই সমস্ত শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁকেই প্রতিপালক হিসেবে মান্য করা, একমাত্র আল্লাহকেই নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াই হলো মানুষের কর্তব্য, এই কর্তব্য পালনের দিকেই মানুষকে আহ্বান করাই হলো পৃথিবীতে নবী-রাসূলের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বই সমস্ত নবী ও রাসূলগণ পালন করেছেন।

প্রতিটি নবীই তাঁর নিজের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে তাঁরা শিক্ষা দান করেন, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। নবী ও রাসূলগণ তাঁর অনুসারীকে মূর্তি পূজা এবং শিরক থেকে হেফাজত করেন। সমাজে প্রচলিত মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় প্রথা থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন। আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহর আইন প্রচলন করে তা মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন।

পৃথিবীর এমন কোন জনপদ বা নগরী নেই, যেখানে মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। প্রতিটি নবীর প্রচারিত আদর্শ ছিল ইসলাম। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রতিটি নবীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং আইন কানুনে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নবীগণ তাদের জাতির ভেতরে যেসব মূর্খতা অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং অনাচার প্রচলিত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর মূল উৎপাটনের ব্যাপারে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। যে সব ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা জাতিকে গ্রাস করেছিল, এসব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির দিক দিয়ে জাতি যখন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন নবীগণ তাদেরকে আইন কানুন দান করেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, সেই সাথে তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও আইন কানুনও ব্যাপকভাবে দান করেছেন। মোট কথা নবী ও রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের মুহূর্তেও মানুষকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীতে যারা মনিব সেজে বসে আছে, মানুষকে যারা নিজেদের তৈরী আদর্শ, মতবাদ, আইন-কানুনের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছে, তাদেরকে যেন সাধারণ মানুষ অস্বীকার করে, এই অনুপ্রেরণা মানুষের ভেতরে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংগ্রাম মুখর করে গড়ে তোলাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবন বিধান দান করেছেন নবী এবং রাসূলগণ তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এ দায়িত্ব পালন করেন নবীগণ। আল্লাহ তাঁর আইন-কানুন নিজে এসে কোন মানুষের কাছে দিয়ে যান না। তাঁর নিয়মের অধিনেই তাঁর আইন-কানুন মানুষের কাছে আসে। আল্লাহর নিয়ম হলো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকেই একজনকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে জীবন বিধান

প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল এসেছেন তাঁরা তাদের গোটা জীবন ব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করে যান। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা সামান্যতম কোন অবহেলা প্রদর্শন করেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁরা ভুলে যাননা, কোন দায়িত্বসহ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।

নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাঁরা সাধারণ মানুষকে ঐ পথের দিকেই আহ্বান জানাবেন, যে পথকে আল্লাহ সিরাতুল মুস্তাকিম নামে অভিহিত করেছেন। এই পথের পরিচয় নবীগণ মানুষকে জানাবেন, এ পথে চলতে সাহায্য করবেন, মানুষ যেন এ পথে অগ্রসর হয়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে সেভাবে তিনি সহযোগিতা করবেন। সাধারণ মানুষ আল্লাহর পরিচয় জানে না। সত্য মিথ্যার পার্থক্য তাঁরা বোঝে না। কোনটা কল্যাণের পথ আর কোনটা অকল্যাণের পথ তা মানুষ জানেনা। মানুষকে এসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দান করবেন নবীগণ। মানুষ যেন নির্ভুলভাবে সহজ সরল পথে চলতে পারে এ কারণেই মহান আল্লাহ নবীদের কাছে ওহী অবতীর্ণ করেন।

নবী পৃথিবীতে এসে মানুষকে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দিবেন। যারা নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামী দলে শামিল হয়েছে, তাদেরকে তিনি পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন এবং যারা ইসলামের বিরোধিতা করেছে, ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে তিনি পরকালে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করবেন। তিনি আল্লাহর আদেশেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানাবেন। তিনি নবুওয়তের আলো দিয়ে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করবেন। মূর্খতার অন্ধকার বিদায় করে তাওহীদের জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করবেন। তাঁরাই হবেন একমাত্র অনুসরণ যোগ্য নেতা। মহান আল্লাহ তাদেরকে যেমন উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন তেমনিভাবে তাঁরা হলেন পবিত্র। সুতরাং তাঁরাই হলেন মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং একমাত্র আদর্শ নেতা। প্রশ্নাতীতভাবে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। এই নেতৃত্ব মানুষকে পরকাল সম্পর্কে অবহিত করবেন। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে-এ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার দায়িত্ব হলো নবী রাসূলদের।

এই দায়িত্ব তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেন। সেদিন অপরাধীদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বার রক্ষী প্রশ্ন করবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا-حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا-قَالُوْا بَلٰى

وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ-قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-

অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের ব্যবস্থাপক দ্বার খুলে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে-তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রব-এর আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? অপরাধীগণ উত্তরে বলবে-হ্যাঁ, তাঁরা সবই তো করেছেন। কিন্তু কাফেরদের জন্যে শাস্তির যে ওয়াদা করা হয়েছিল, সেদিন তা পূর্ণ করা হবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। অহংকারী কাফেরদের জন্য ভয়ানক গর্হিত স্থান এ জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে থাকতে হবে চিরকাল। (যুমার-৭১-৭২)

মানুষের সমস্ত কাজের হিসাব মহান আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে; এ কথা মানুষকে জানানোর দায়িত্ব হলো নবী রাসূলের। কারণ আদালতে আখেরাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে প্রশ্ন করবেন-

اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا-

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আগমন করেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেবে? (সূরা আনয়াম-১৩১)

নবীগণ মানুষকে তাঁর আসল গন্তব্যের দিকে অগ্রসর করাবেন। মানুষকে জানাবেন, এই পৃথিবী তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়, পরকালের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন এবং সে জীবন হলো অনন্তকালের। সুতরাং ঐ অনন্তকালে যেন তোমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারো, সে পাথেয় এই পৃথিবী থেকেই তোমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ নবী রাসূলগণ মানুষকে জড়বাদ আর নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদ থেকে সরিয়ে নৈতিকতাবাদীতে পরিণত করবেন। উল্লেখিত কাজ এবং দায়িত্বই হলো রাসূল ও নবীদের প্রধান কাজ।

মহান আল্লাহ হলেন মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এর পরেই হলো নবীদের স্থান। অর্থাৎ আল্লাহর পরেই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হলেন পৃথিবীতে আগমনকারী নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা যখন দেখেন মানুষ সত্য পথ ত্যাগ করে ভুল পথে চলছে এবং পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন। মানব দরদী হিসেবে তাঁরা মানুষকে সংশোধন করার জন্য

চেষ্টা সাধনা করতে থাকেন। এই মানুষ না বুঝে অথবা বুঝেও নবীর ওপর আঘাত করে, তাঁদেরকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দেয়, তবুও তাঁরা সেই আঘাতকারী মানুষের কল্যাণের জন্য দোয়া করেন।

এই পৃথিবীর মানুষ তাদের এই পরম বন্ধুর সাথে বড় বিচিত্র আচরণ করে। নবী ও রাসূলগণ যখন মানুষের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা শুরু করেন, তখন এই মানুষ তাদেরকে বিদ্রূপ করতে থাকে। নবীর কথা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। শতশত মানুষের ভেতরে অপমানিত করে। কোন নবীকে হত্যা করে। কোন নবীর নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেয়। কাউকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখে।

কিন্তু নবী এবং রাসূলগণ পৃথিবীতে এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েও তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালন করা হতে সামান্যতম বিরত হন না। তাঁরা তাদের আন্দোলন পরিচালিত করতেই থাকেন। অনেক নবীর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁরা গোটা জীবন ইসলামী আন্দোলন করেছেন, কিন্তু তাদের কর্মী যোগাড় হয়েছে মাত্র দশ বিশজন লোক। কিন্তু তাঁরা হতাশ হননি। এক সময় তাদের শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে। বড়বড় জাতি তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

নবী ও রাসূলগণ যখন ইন্তেকাল করেছেন, তার কিছুদিন পরেই তাদের প্রচারিত শিক্ষা ও আদর্শের ভেতরে তাঁরই অনুসারীগণ সামান্য স্বার্থের কারণে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপরে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, নবীর ইন্তেকালের পরে তাঁর সে কিতাবের ভেতরে পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুসারীগণ নিজেদের কথা সেই কিতাবে নবীর কথা বলে লিপিবদ্ধ করেছে। আল্লাহর ইবাদাত করার বিভিন্ন নতুন পদ্ধতির কথা লিপিবদ্ধ করেছে।

কেউ কেউ স্বয়ং নবীর কবরের পূজা করা আরম্ভ করেছে। অনেকে এমন মন্তব্য করেছে যে, স্বয়ং আল্লাহ নবীর রূপ ধারণ করে আমাদের মাঝে অবতার হিসেবে আগমন করেছিলেন। অনেকে নিজেদের নবীকে স্বয়ং আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষনা করেছে। তারা বলেছে, আমাদের নবী যেহেতু আল্লাহর পুত্র, আমরা সেই নবীর অনুসারী, সুতরাং আমরাও আল্লাহর আত্মীয়। আল্লাহর ক্ষমতার সাথে আমাদেরও অংশীদারিত্ব রয়েছে।

অনেকে নবীর এবং তাঁর মায়ের মূর্তি নির্মাণ করে তার পূজা আরাধনা করা শুরু করেছে। আফসোস! যারা এসেছিলেন পৃথিবী থেকে মূর্তি উৎখাত করতে, আর তাদের ইন্তেকালের পরে তাঁর অনুসারীরা তাদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা শুরু করেছে। নবীগণ তাঁর অনুসারীদেরকে যে বিধান দান করেছিলেন, সে বিধান তারা বিকৃত করেছে। সে বিধানের সাথে তারা তাদের মনগড়া নানা কাহিনী সংযোজন করেছে। এমনভাবে তারা তাদের নবীর শিক্ষা এবং জীবন বিকৃত করেছে, ঐ নবীর শিক্ষা যে কি ছিল, বর্তমানে তা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। নবীর প্রকৃত জীবন যে কেমন ছিল, তাও জানার কোন উপায় তারা

রাখেনি। তাদের নবীর জীবনীর নামে নানা ধরণের ভিত্তিহীন কাহিনী তারা রচনা করেছে। নবীর জীবন সংক্রান্ত নির্ভর যোগ্য কোন কিছুই জানার উপায় নেই।

এভাবে সেই নবীর অনুসারীগণ তাদের নবীর প্রবর্তিত ইসলামকে বিকৃত করে এক নতুন নামকরণ করেছে। গোটা পৃথিবীতে অন্যান্য যতো ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে, সেসব ধর্মের বর্তমানে এই হলো অবস্থা। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র ইসলামকে এই বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন।

এরপরেও নবীদের আন্দোলন বৃথা যায়নি। নবীর শিক্ষা এত বিকৃত করেছে, তবুও প্রতিটি জাতির ভেতরে সে নবীর শিক্ষা কিছুটা হলেও রয়ে গেছে। নবীর শিক্ষার কারণে বর্তমানে হাজার বছর পরেও সে নবীর অনুসারীদের ভেতরে কিছু ভালো মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে। এটা সেই নবীর প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফসল। মানুষের পরম বন্ধু নবীগণ, তাদের সাথে এই মানুষ এই ধরণের অন্যায় আচরণ করেছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে কি ধরণের আচরণ মক্কায় করা হয়েছিল, বদরের ময়দানে তিনি কি ব্যবহার লাভ করেছিলেন, ওহুদের ময়দানে এই মানুষ কিভাবে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, বিশ্বনবীর জীবনীর পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন।

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সংশোধন করার জন্য যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সবাই মানুষকে একই দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিটি নবীই বলেছেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই।' আমরা দেখি বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদগণ মানুষকে নিজের দলে আকৃষ্ট করার জন্য বা সরকারকে উৎখাত করার জন্য মুখরোচক কথাবার্তা বলে জনগণকে নিজের দিকে টানে। অথবা কোন সাময়িক সমস্যার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। তারপর ক্ষমতায় বসে নিজের আসল রূপ প্রকাশ করে।

পৃথিবীতে কোনো নবী কিন্তু এমন করেননি। তাঁরা দেশের কোন সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে মানুষের সামনে অবতীর্ণ হননি। কৃত্রিম কোন বিষয় তাঁর জাতির সামনে টেনে আনেনি। তাঁরা সরাসরি বলেছেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই।' এই কথা শোনার সাথে সাথে নবীর পরিবার, সমাজ, দেশ কেন তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। ইলাহ শব্দ দিয়ে তাঁরা কি বুঝিয়েছেন যে, নবীদেরকে মানুষ নির্যাতন করেছে, হত্যা পর্যন্ত করেছে। প্রতিটি নবীর ওপরেই নির্যাতন করা হয়েছে শুধুমাত্র এই ইলাহ্ বলার কারণে, এখন আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, এই ইলাহ্ শব্দ দ্বারা আসলে কি বুঝায়।

যে শক্তি এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের, ভেতরের সমস্ত প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন, আরবী ভাষায় সেই শক্তিকে ইলাহ বলে।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজন যিনি পূরণ করেন, সমাজ, পরিবার, দেশ পরিচালনার জন্য যিনি আইন দান করেন এবং যার আইন একমাত্র চলতে পারে তিনিই হলেন ইলাহ্।

যে কোনো প্রয়োজনে মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয়, যিনি মানুষকে সাহায্য করবেন এবং মানুষ যার কাছে সাহায্য চাইবে তিনিই হলেন ইলাহ্।

সুতরাং সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি, শোষকের দল, শাসকের দল যখন বুঝেছে, নবীর এই কথা গ্রহণ করলে নিজের কর্তৃত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না, সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে হবে, তখনই তারা নবীর সাথে তথা দ্বীনি আন্দোলনের সাথে শত্রুতা করেছে-বর্তমানেও করছে।

পবিত্র কোরআন অধ্যায়ন করলে দেখা যায়, প্রতিটি নবীর সাথেই তৎকালীন সমাজের এবং শাসকের সাথে এই ইলাহ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। কোরআনে বিবৃত এ সমস্ত কাহিনী অন্য কোন পৃথিবীর নয়, বরং যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে, মানুষের সাথে যে পৃথিবী সম্পর্কিত সেই পৃথিবীরই ঘটনা এবং এ সমস্ত ঘটনা মানুষের সাথে সম্পর্কিত। নবী এবং রাসূলগণ যে দেশে এবং জাতির ভেতরে আগমন করেছেন, তাদের রাজনৈতিক সমস্যা ছিল, অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, সাংস্কৃতিক সমস্যা ছিল তথা নানা ধরণের সমস্যা ছিল। সে সব সমস্যা সমাধানেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবী ও রাসূলগণ, তাদের অনুসারী ইসলামী আন্দোলনের নেতাগণ প্রতিটি দেশেই সব ধরণের সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র একটি সমস্যা সামনে রেখেছেন। সে সমস্যা হলো ইলাহ্ কেন্দ্রিক।

তাঁরা অন্য কোন সমস্যা জাতির সামনে তুলে না ধরে প্রধান সমস্যা অর্থাৎ সমস্ত ইলাহ্-এর দাসত্ব ত্যাগ করে মহান আল্লাহকে ইলাহ বলে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রথম আহ্বানেই বলেছিলেন, হে মানুষ! বলো আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (ইয়া আইয়ুহান্নাস! কুলু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ......তুফলিহুন।)

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, পৃথিবীতে কোন সমস্যার সৃষ্টি তখনই হয়, যখন মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে, ইলাহ হিসেবে পরিত্যাগ করে। নিজেকে, সমাজের নেতাকে, প্রচলিত প্রথাকে, নিজের পরিবারকে, সমাজের আইনকে, দেশের শাসককে, দেশের নানা ধরণের নীতিকে, দৃষ্টির সামনের সাময়িক স্বার্থকে, ধর্মনেতাকে তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে নিজের মাবুদ বা ইলাহ তথা রব হিসেবে প্রধান্য দান করেছে, তখনই দেশে, সমাজে, ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে নানা ধরণের সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে। এ কারণে নবী, রাসূল ও তাঁদের অনুসারী দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকগুলো দেশের, সমাজের সমস্ত সমস্যা উপেক্ষা করে মৌলিক ও প্রধান সমস্যার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নবী বা রাসূলগণ জানতেন সমস্ত সমস্যার স্রষ্টা হলো মাত্র একটি। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান হলে অন্য সমস্যাসমূহ এমনিতেই মুছে যাবে। এই সমস্যার সমাধানের ওপর জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল। এ কারণে তাঁরা তাদের গোটা জীবন এই সমস্যা সমাধানের জন্যই ব্যয় করেছেন।

মহান আল্লাহর উলুহিয়াত এবং রবুবিয়াতই হলো প্রধান বিষয়। মানুষ মুখে আল্লাহকে স্বীকার করছে, তাঁর কালাম পাঠ করছে, লম্বা জুব্বা পরিধান করছে, মুখে দাড়ি রাখছে, নামাজ আদায় করতে করতে কপালে দাগ ফেলেছে, রোজা আদায় করতে করতে পেট পিঠের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তি মানুষের বানানো আদর্শ অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করছে।

সে এমন রাজনীতি করছে, যে রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সে নিজেকে এমন দলের সদস্য বানিয়েছে, এমন দলকে সমর্থন দিচ্ছে, ভোটের সময় এমন দলকে ভোট দিচ্ছে, যারা ইসলামী শাসন তথা কোরআন সুন্নাহর আইন কামনা করে না। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, এই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে সে নামাজ, রোজা, হজ্জ আদায় করছে। কিন্তু সে আল্লাহর রবুবিয়াত এবং উলুহিয়াত গ্রহণ করতে রাজী নয়। আল্লাহকে সে আইন দাতা এবং বিধান দাতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। Law Giver হিসেবে সে পৃথিবীর এক শ্রেণীর দার্শনিককে গ্রহণ করছে। এই ধরণের ব্যক্তিদের জন্য নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে দাবী করার অবকাশ আল্লাহর বিধানে উপস্থিত নেই।

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি কি উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষের সামনে যেন তাঁরা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেন। আল্লাহর আইন তথা তাঁর দাসত্ব কেন করতে হবে, তা তাঁরা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিবেন। কেননা, আল্লাহর আদালতে এ সমস্ত মানুষ যখন উপস্থিত হবে, তখন তাঁরা যেন এ কথা বলতে না পারে, আমাদের কাছে এমন কোন ব্যক্তি আসেনি বা আমাদের কাছে এমন কোন মাধ্যম ছিল না, যার মাধ্যমে আমরা আপনার আইন সম্পর্কে অবগত হবো। আমরা যদি আপনার আইন সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আপনার আইন অনুসরণ করতাম।

এ সমস্ত কথা যেন কোন মানুষ আল্লাহর সামনে বলতে না পারে, এ কারণেই মহান আল্লাহ প্রতিটি জনপদে মানুষের কাছে নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আগমন করে মানুষের কাছে আল্লাহর আইন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন। যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই এই কারণে আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। নবী ও রাসূলগণ ইন্তেকালের সময় আল্লাহর কিতাব তাঁর অনুসারীদের কাছে রেখে গেছেন। নবীর অনুসারীগণ নবীর শিক্ষা মানুষের ভেতরে প্রচার

করেছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধন-প্রাণ দিয়ে দ্বীনি আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। এখন কোন মানুষ যদি আল্লাহর আইন গ্রহণ না করে, পৃথিবীর কোন আইন প্রণেতার আইন গ্রহণ করে, তার চিন্তাধারা অনুসরণ করে দেশ সমাজ পরিচালিত করে, তাহলে নবী, রাসূল এবং তাদের অনুসারীগণ আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হবেন না।

গ্রেফতার হবে তারা, অভিযুক্ত তারাই হবে, যারা দ্বীনি আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে বিদ্রূপ করেছে। তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে। কেননা, তাদের কাছে আল্লাহর আইন ছিল, সে আইনের কিতাব তারা কাপড়ে জড়িয়ে যত্নের সাথে বিশেষ স্থানে রেখে দিয়েছে, অনুসরণ করেনি। সে আইনের কিতাব তারা ঝাড় ফুঁকের কাজে ব্যবহার করেছে। সওয়াবের আশায় তিলাওয়াত করেছে, কিন্তু তার শিক্ষা ব্যক্তি, পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করেনি।

সেই সাথে ঐ সমস্ত লোকগুলোও গ্রেফতার হবে, যাদের কাছে আল্লাহর আইনের কিতাব ছিল, তাঁরা দেখছিল দেশ সমাজ আল্লাহর আইনের বিপরীত চলছে। অর্থাৎ আলেম সমাজ-তাঁরা তো সবই জানেন। জেনে বুঝেও তাঁরা যদি কোন প্রতিবাদ না করেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে। আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ মহাসত্যের আহ্বায়ক, সেই সাথে তাঁরা মানুষের আনুগত্য লাভের অধিকারী। তাদের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য।

রাসূল বা নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে-এতেই মানুষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নবীকে বিশ্বাস করবে সেই সাথে মানুষ অন্য কারো আইন মেনে চলবে বা নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করবে, এটা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ নবী বা রাসূল প্রেরণ করেননি। বরং নবী বা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো, জীবন যাপনের জন্য যে বিধান তিনি নিয়ে আসেন, পৃথিবীর সমস্ত বিধান ত্যাগ করে কেবলমাত্র সেই বিধান অনুসারেই জীবন-যাপন করতে হবে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসূল যে নির্দেশ প্রদান করেন, পৃথিবীর সবার নির্দেশ ত্যাগ করে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

এটাই হলো রাসূলকে রাসূল এবং নবীকে নবী বলে স্বীকৃতি দানের স্পষ্ট অর্থ। নবী রাসূলদেরকে স্বীকৃতি দান করবে, অপরদিকে মানুষের তৈরী করা আইন পালন করবে, মানুষের তৈরী করা মতবাদ মতাদর্শ দেশের বুকে বাস্তবায়ন করার আন্দোলন করবে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা অনুসরণ করবে, এ অবকাশ আল্লাহ দেননি। যারা এ ধরণের করে, তারা স্রে স্পষ্ট মুনাফিক এবং আল্লাহর দ্বীনের মারাত্মক শত্রু এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

নবী ও রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের আরো একটি দায়িত্ব হলো, তাঁরা আল্লাহর দেয়া মতবাদ মতাদর্শ পৃথিবীর সমস্ত মতবাদ মতাদর্শের ওপরে বিজয়ী করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর

সমস্ত আদর্শ, মতবাদ, মতাদর্শ, আইন কানুনের মোকাবেলায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহর দেয়া আদর্শ রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে দেশ বা পৃথিবী শাসন করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

আল্লাহ তাঁর নিজের রাসূলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন (ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা) সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন অন্য সমস্ত দ্বীনের (মতবাদ মতাদর্শের) ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য। (সূরা তাওবা)

দ্বীন শব্দটিকে আরবী ভাষায় এমন জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ ও অনুসরণ যোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে নবী ও রাসূল আগমনের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে আগমন করে মানুষের তৈরী করা সমস্ত মতবাদ-মতাদর্শকে পরাজিত করে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করবেন। পৃথিবীর সমস্ত আইন থাকবে আল্লাহর আইনের অধীনে। আল্লাহর আইন প্রচলিত কোন আইনের অধীনে থাকবে না বা এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন বা বিধান পৃথিবীতে আগমন করেনি। অন্য কোন আইনের অধীনে আল্লাহর আইন সামান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে অবস্থান করবে, এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন আগমন করেনি।

পৃথিবীর সব ধরণের মতবাদ-মতাদর্শ আল্লাহর আইনের অনুগ্রহ কুড়িয়ে টিকে থাকার হলে টিকে থাকবে আর না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর আইন যিনি নিয়ে আসেন, তিনি পৃথিবী ও আকাশের বাদশাহ তথা অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালীর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন। তিনি অর্থাৎ নবী বা রাসূল নিজের বাদশাহ মহান আল্লাহর আইনকে বিজয়ী হিসেবে দেখতে চান। পৃথিবীতে যদি কোন আদর্শ বা মতবাদ-মতাদর্শ টিকে থাকতে চায়, তাহলে আল্লাহর আইনের দেয়া সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেই তাকে থাকতে হবে। আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় পৃথিবীতে অন্য কোন আইন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এমন ধরণের কোন আইনের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে না। নবী ও রাসূলদের আহ্বানের এই হলো মূল কথা।

পৃথিবীর ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করে যে, এই পৃথিবীর মানুষ যখন আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় অন্য কারো আইনকে প্রাধান্য দান করেছে, যে দেশে বা যে স্থানে এই অবস্থা হয়েছে, সেখানেই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে। মানুষ যখন নিজের মনের চাহিদা অনুসারে জীবন পরিচালনা করেছে,

মানুষ নামক নেতার আনুগত্য করেছে, তাদের আইন অনুসরণ করেছে, আল্লাহর দেয়া হেদায়েত ও পথনির্দেশ অমান্য করে অন্যের তৈরী আইন কানুন ও বিধানের ভিত্তিতে নিজেদের রাজনীতির ভিত্তি, অর্থনীতির ভিত্তি তথা সার্বিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত করেছে, তখনই প্রকৃত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

গোটা পৃথিবীতে অশান্তি–অনাচার দেখা দিয়েছে। মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে, শোষণের শিকার হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে, বঞ্চনার শিকার হয়েছে, জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ আর্তনাদ করা শুরু করেছে। মহান আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তখন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মানুষকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা পৃথিবীতে আগমন করে সার্বিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছেন। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত জুলুমমূলক ব্যবস্থা উৎখাত করে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সার্বিক বিপর্যয় রোধ করেছেন।

নবী বা রাসূল মানুষের গোটা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে চান। প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে চান। কারণ কোন মানুষ যখন নিজেকে বিশ্ব জগতের স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে পেশ করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মানুষের কাছে এই দাবী করবেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আমার আনুগত্য করো। আল্লাহর প্রতিনিধি বা নবী ও রাসূল পৃথিবীর কোন নেতার নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আসেন না। পৃথিবীর কোন শাসকের অধীনে অবস্থান করার জন্য আগমন করেন না। এটা তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতের মর্যাদার পরিপন্থী।

নবীগণ কোন শাসকের প্রজা হতে আসেন না। বরং তাঁরা আসেন সমস্ত মানুষের শাসক হিসেবে। রাজা, বাদশাহ এবং সমস্ত নেতাগণ নবীর আনুগত্য করবে, নবীর আনীত বিধানের কাছে মাথানত করবে, নবীর বিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা আগমন করেন। পৃথিবীর মানুষ নানা ধরনের বিশৃংখলা করবে, বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, ফলশ্রুতিতে তাদের ওপরে নানা ধরনের শাস্তি অবতীর্ণ হবে। তখন তারা যেন বলতে না পারে, এ সমস্ত কর্মকান্ড করলে যে শাস্তি নেমে আসবে এ কথা আমরা পূর্বে অবগত ছিলাম না। যদি জানতাম তাহলে এ সমস্ত কর্মকান্ড হতে বিরত থাকতাম। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ–

(আর এটা আমি এ কারণে করেছি যে) এমন যেন না ঘটে যে, তাদের স্বীয় কর্ম ফলের দরুণ তাদের ওপরে যখন কোন আযাব এসে পড়বে তখন তারা এ কথা বলতে যেন না

পারে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের কাছে কেন কোন রাসূল প্রেরণ করোনি ? (যদি রাসূল প্রেরণ করতে) আমরা তোমার বিধানের অনুসারী হতাম এবং বিশ্বাসীদের দলে শামিল হতাম। (সূরা কাসাস-৪৭)

পৃথিবীতে বা কোন জাতির কাছে যতক্ষণ আল্লাহর বিধান অবিকৃত থাকে এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম বর্তমান ছিল, ততক্ষণ সে জাতির জন্য নবীর প্রয়োজন হয়নি। তবে আল্লাহর বিধান যখন বিকৃত করেছে, এর ভেতরে হ্রাস বৃদ্ধি করেছে তখন নবী রাসুলের প্রয়োজন হয়েছে, তাঁরা আগমন করেছেন। কোন ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর বিধান বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেই বিধানের সাথে মানুষের মনগড়া বিধান মিশ্রিত হয়ে যায়, তখন সেখানের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহর কাছে বলার থাকে যে, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা আমরা বুঝতে পারিনি। তোমার বিধান যেখানে বিকৃত ছিল, সেখানে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য আমরা করতে পারিনি। কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে তা বলার সুযোগ দান করেননি। সেখানে দ্রুত নবী বা রাসূল প্রেরণ করে তাদেরকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন।

এরপরেও যে ব্যক্তি বা জাতি ভুল পথে চলেছে, এ কারণে তাদেরকেই দায়ী হতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে কোরআন অবিকৃত অবস্থায় অবস্থান করছে, রাসূলের হাদীস অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, গোটা বিশ্বব্যাপী তা প্রচারিত হচ্ছে, এ অবস্থায় পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, 'প্রকৃত সত্য আমাদের জানা ছিল না বলেই আমরা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছি। মুক্তির সঠিক পথ কোনটি আমরা জানতাম না বলেই ভ্রান্ত পথে মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছি। তোমার ইবাদাতের সঠিক মাধ্যম আমরা জানতাম না বলেই মূর্তি পূজা করেছি, মাজার পূজা করেছি, পীরের পায়ে সেজদা করেছি, মাজারে মানত মেনেছি, আগুনের পূজা করেছি, পাথরে মাথা ঠুকেছি। তোমার পক্ষ থেকে দেয়া রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ছিল না, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ছিল না, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যার সমাধান ছিল না, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান ছিল না, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান ছিল না এ কারণে আমরা পৃথিবীর দার্শনিকদের কাছ থেকে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেছি।'

পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য এই অজুহাত পেশ করার কোন সুযোগ বর্তমানে নেই কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে না। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এই কোরআন ও হাদীস ইন্‌শা আল্লাহ অবিকৃত থাকবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আমলে সালেহ্ ও নিয়্যতের বিশুদ্ধতা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকাই হলো আমলে সালেহ। সুতরাং কোন্ ধরনের কর্ম আমলে সালেহ্ এবং কোন্ ধরনের কর্ম আমলে গায়ের সালেহ, এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে, এ কথা

আমরা উল্লেখ করেছি। ঈমানকে যদি গণিত শাস্ত্রের (এক-এর) ১-এর সাথে তুলনা করা যায় তাহলে আমলে সালেহ্কে (শূন্য-এর) ০-এর সাথে তুলনা করতে হয়। ১-এই অঙ্কটির সাথে একটি ০-জুড়ে দিলে হবে ১০ এবং আরেকটি ০-জুড়ে দিলে হবে একশত। এভাবে একটির পরে আরেকটি ০-জুড়ে দিতে থাকলে ঐ প্রথম ১-এর মান ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে ঈমান আনার পরে একটির পর আরেকটি আমলে সালেহ্ করতে থাকলে ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে অর্থাৎ ঈমান শক্তিশালী হবে।

১-এর সাথে ০-জুড়ে দিলেই ঐ ১-এর মান বৃদ্ধি পাবে না। ০-জুড়তে হবে ১-এর ডান দিকে। ডান দিকে ০-জুড়ে না দিয়ে বাম দিকে যতগুলোই ০-জুড়ে দেয়া হোক না কোনো, ঐ প্রথম ১-এর মান ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। ঐ ১-এর কোনো মূল্যই থাকবে না। অর্থাৎ আমলে সালেহ্ করতে হবে ঈমানের সাথে। আর ডান পাশে ০-জুড়ে না দিয়ে যদি বাম পাশে দেয়া হয়, তাহলে ঐ ১-এর কোনো মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ বামপন্থী যারা, মহান আল্লাহর দরবারে তাদের কোনো ধরনের কর্মকান্ড গ্রহণ যোগ্য হবে না। আল্লাহর দরবারে সফলতা অর্জন করবে কেবলমাত্র ডানপন্থী লোকেরা। পৃথিবীতে ডানপন্থী বলতে যাদেরকেই বুঝানো হোক না কোনো, আল্লাহর কোরআনে ডানপন্থী (আস্হাবুল ইয়ামিন) বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা মহান আল্লাহর বিধানের অনুসারী। আর বামপন্থী (আস্হাবুশ্ শিমাল) বলতে কোরআনের তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা মানুষের বানানো আদর্শ তথা শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ-মতাদর্শের অনুসারী।

বামপন্থীরা হলো কাফির এবং এদের নেতা হলো স্বয়ং শয়তান, মৃত্যুর পরের জগতে তারা শয়তানের নেতৃত্বেই জান্নামে প্রবেশ করবে। সূরা ওয়াকেয়াতে বলা হয়েছে, এই বামপন্থীরা কিয়ামতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। বামপন্থীরা শয়তান কর্তৃক প্রভাবিত, শয়তান এদেরকে মহান আল্লাহর পথ থেকে গাফিল করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ-اَلاَ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুজাদালা-১৯)

আর ডানপন্থীরা হলো মহান আল্লাহর মুমিন বান্দাহ্ আর তাদের নেতা হলো নবী ও রাসূলগণ। আদালতে আখিরাতে ডানপন্থীরা নবী-রাসূলদের নেতৃত্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সূরা ওয়াকেয়ায় ডানপন্থীদের সৌভাগ্যের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ডানপন্থীরাই হলো ঈমানদার এবং এদের আমলে সালেহ্ মহান আল্লাহ কবুল করবেন।

এদের প্রতি মহান আল্লাহও সন্তুষ্ট এবং এরাও আল্লাহর তা'য়ালার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط أُوْلٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহর প্রতি। এরা আল্লাহর দলভুক্ত লোক। জেনে রেখো, আল্লাহর দলভুক্ত লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। (মুজাদালা-২২)

আমলে সালেহ্ করার ব্যাপারে দুটো শর্ত রয়েছে। এর প্রথম শর্ত হলো, আমলে সালেহ্ হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, আমলে সালেহ্ হতে হবে সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত পন্থানুসারে। অর্থাৎ যেভাবে মহান আল্লাহর রাসূল আমলে সালেহ্ করেছেন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, সেইভাবে আমলে সালেহ্ করতে হবে।

যে কোনো সৎকাজই করতে হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। নিয়্যত হবে হবে সহীহ-শুদ্ধ। সৎকাজ কবুল হওয়ার প্রথম শর্তই হলো নিয়্যতের বিশুদ্ধতা। এ জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সমস্ত কাজই নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।' এটা একটি বড় হাদীসের ক্ষুদ্র অংশ এবং হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এটি বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস এবং মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে কিতাবুল জিহাদ, আবু দাউদ শরীফে তালাক অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ্ শরীফে জুহুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসনাদে আহ্মাদ, দারেকুতনী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখও হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অতএব সৎকাজের বা আমলে সালেহ্র পেছনে নিয়্যত থাকতে হবে মহান আল্লাহকে খুশী করা। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করলে আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হবে না। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

قُلْ اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

বলো, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য নিবেদিত যিনি সারা সৃষ্টিলোকের রব। (সূরা আনআ'ম)

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। এসবের ভেতরে যদি প্রদর্শনীমূলক মনোভাব থেকে থাকে যে, নামায-রোজা আদায়

করলে সমাজের লোকজন ভালো বলবে এবং নির্বাচনের সময় লোকজন তাকেই সমর্থন করবে। হজ্জ করলে লোকেরা নামের পূর্বে 'হাজী' শব্দ সহযোগে সম্বোধন করবে, দান-খয়রাত করলে লোকজন 'দানবীর' উপাধিতে ভূষিত করবে, এই যদি নিয়্যত হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। কাজগুলো নিঃসন্দেহে আমলে সালেহ্-কিন্তু তা সম্পাদন করা হয়েছে বৈষয়িক উদ্দেশ্যে, এসব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিবেদিত ছিল না। কিয়ামতের দিন এসব লোকদেরকে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময় পৃথিবীতে দেয়া হয়েছে। লোকজন তোমাদেরকে পরহেজগার, হাজী সাহেব, দানবীর, মহৎ, মহানুভব ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছে, সমাজের লোকজন তোমাদেরকে সমর্থন করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ করেছিলে, পৃথিবীতে তার বিনিময় লাভ করেছো, আজকের দিনে তোমাদের আর কিছুই পাওনা নেই। আজকের দিনে কেবলমাত্র তারাই বিনিময় লাভ করবে, যারা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ করেছে।

একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা ব্যাপক প্রচার করে তারপর যাকাতের নামে বস্ত্র বিতরণ করে থাকে। নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সম্পদ দান করে। এসবের পেছনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকে না। ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে পত্র-পত্রিকা, স্মরণিকা প্রকাশ হবে, তাতে তার নাম উল্লেখ থাকবে, প্রতিষ্ঠানে দানকারীদের নামের যে তালিকা থাকবে, তাতে তার নাম উল্লেখ থাকবে, লোকজন তার দানের ভূয়সী প্রশংসা করবে, এই উদ্দেশ্যেই দান করে থাকে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তা-পথ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়ে তার নামকরণ করা হয় নিজের নামে। এর পেছনে উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে নিজের কীর্তি ও নামকে অক্ষয়-অমর করা। এদের এসব কাজ নিঃসন্দেহে আমলে সালেহ্ কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্য সৎ নয়। এদের এসব সৎকাজ কিভাবে বরবাদ হবে, মহান আল্লাহ শোনাচ্ছেন-

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِى هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ-وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সেই প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'শৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং একে একেবারে বরবাদ করে দেয়। (সূরা ইমরান-১১৭)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, এই পৃথিবী হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত স্বরূপ, এখানে যা বপন করা হবে, আখিরাতে তার ফসল লাভ করবে। উল্লেখিত আয়াতে 'শস্যক্ষেতের' যে

দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, সেই 'শস্যক্ষেত' বলতে মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকে বুঝানো হয়েছে, যার বিনিময় মানুষ আখিরাতে লাভ করবে। আয়াতে 'প্রবল বাতাস' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই বাহ্যিক ও স্থূল কল্যাণ-স্পৃহাকে যার দরুণ দুনিয়া পূজারি লোকজন জনকল্যাণ ও সাধারণ উপকারের কাজকর্মে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আয়াতে উল্লেখিত 'শৈত্য বা শীত' অর্থ প্রকৃত ঈমান এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভাব বুঝানো হয়েছে, যার ফলে তাদের গোটা জীবনকাল একেবারে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে।

এই উপমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, বাতাস শস্য ক্ষেতের জন্য উপকারী এবং তা শস্য উৎপাদনে সহায়ক। কিন্তু এই বাতাসই যদি 'তীব্র শৈত্য প্রবাহ' হয়, তাহলে তা শস্য ক্ষেতের উপকার ও উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক না হয়ে চরম ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বাতাস যদি শস্যের পক্ষে সহনশীল না হয়ে ক্ষতিকর হয়, তাহলে শস্য উৎপাদিত হবে না। ঠিক একইভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিবির স্থাপন করে জনগণের সেবা-যত্ন করা, চিকিৎসা প্রদান করা বা অন্য কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করার কাজও মানুষের পরকালের ক্ষেতকে লালন-পালন ও শক্তি দান করে, একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এসব কাজের পেছনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহলে এসব মহান কাজ কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে আখিরাতের ময়দানে প্রমাণিত হবে।

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মানুষের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আর মানুষের ধন-সম্পদের মালিকও তিনি-যদিও এসব ধন-সম্পদ মানুষই ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপভাবে এই মহাবিশ্ব, রাষ্ট্র, রাজত্ব ও রাজ্যেরও একচ্ছত্র প্রভু হলেন আল্লাহ তা'য়ালা, যদিও মানুষই এর মধ্যে বসবাস করে। এখন আল্লাহর কোনো বান্দাহ্ যদি তার প্রকৃত মালিকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না করে, অথবা তাঁর দাসত্ব করার সাথে সাথে অন্য কারো অসংগত দাসত্ব করে এবং আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ ব্যবহার ও তাঁর রাজ্য-সাম্রাজ্যে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ না করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে না করে, তাহলে তার গোটা জীবনকালে সম্পাদিত যাবতীয় সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ একটি বিরাট অপরাধের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এসব কাজের কোনো সওয়াব বা বিনিময় আখিরাতে পাওয়া তো দূরের কথা, গোনাহের বোঝা মাথা নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে।

মহান আল্লাহর কাছে মানুষের চেষ্টা ও কর্মের বিনিময় লাভ করা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর। প্রথম হলো, মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্ম-সাধনা হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে। আর দ্বিতীয়টি হলো, এই চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে পৃথিবীর পরিবর্তে আখিরাতের সাফল্যই হতে হবে প্রধান ও চরমতম লক্ষ্য। যেসব সৎকাজে এ দুটো শর্ত পূরণ করা হবে না, সেখানে সমস্ত সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِايتِنَا وَلِقَاءِ الاَخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ-

আমার নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। লোকেরা যেমন করবে, তেমন ফলই পাবে, এটা ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে? (সূরা আ'রাফ-১৪৭)

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করে, কোরআনের হেদায়াত অনুসরণ না করে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বা আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহাত্মক নীতিতে পৃথিবীতে যতো সৎকাজই করা হোক না কেনো, এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কোনো ধরনের ফল লাভ করার আশা পোষণ করা যায় না বা এই আশা পোষণ করার কোনো অধিকারই থাকে না। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পৃথিবীতে স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সৎকাজ করলো, পরকালে এসব কাজের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ-اُولئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الاَخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ-وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا وَبطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ-

যেসব লোক শুধু এই পৃথিবীর জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দান করি আর সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনরূপ কম করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ব্যতীত আর কিছুই নেই। (সেখানে তারা জানতে পারবে যে) তারা পৃথিবীতে যা কিছুই বানিয়েছে, তা সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে। (সূরা হূদ-১৫-১৬)

পৃথিবীতে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, নিজের রব মহান আল্লাহর বিধানের কোনো পরোয়া যারা করে না, মৃত্যুর পরে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, এ বিষয়টির প্রতি যারা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে দোলায়িত হয় বা অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা অস্বীকার করে, বৈধ-অবৈধ তথা উপার্জনের ব্যাপারে কোনো সীমারেখা মানে না, এই শ্রেণীর লোকগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ-বিত্তের ও ধন-সম্পদের অধিকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মান-মর্যাদাকর পদসমূহ এই শ্রেণীর লোকদের অধিকারে থাকে। এরাই দেশের বুকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। পৃথিবীর আরাম-আয়েশ এদের দখলে, ভোগ-বিলাসে এদের জীবন অতিবাহিত

হয়। সর্বত্র এদেরকেই গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হয় এবং সাধারণ মানুষও এদেরকেই বরণ করে। গাড়ি-বাড়ি ও ইন্ডাষ্ট্রী-কোনো কিছুরই অভাব এদের থাকে না।

দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রেও এরাই অগ্রগামী। এরা জনকল্যাণমূলক কাজ করে কিন্তু তাদের এসব কাজের ফলাফল পরকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে না। কারণ তাদের কর্মকান্ড পরকাল অর্জনের জন্য ছিল না। পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, নাম-যশ ইত্যাদি অর্জন ছিল এসব কাজের উদ্দেশ্য। এরাও দুনিয়া কামনা করে, মহান আল্লাহও তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। যে উদ্দেশ্যে কর্ম পরিচালিত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল করে দেন এবং দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কোনোরূপ কৃপণতা করেন না। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার লক্ষ্যে নির্বাচক মন্ডলীর কল্যাণে রাস্তা-পথ নির্মাণ করে দেয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেয়, নগদ অর্থ বন্টন করে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয়, বস্ত্রের অভাব পূরণ করে। এসবই করে নির্বাচনের সময়ে সমর্থন লাভের আশায়।

এসব সৎকাজ কেউ করে গুণ-কীর্তন ও প্রশংসা লাভের আশায়। আল্লাহ তা'য়ালা এসব কাজের বিনিময় এই পৃথিবীতে দিয়ে দেন। সাধারণ লোকজনের সমর্থন তারা লাভ করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে। অথবা তারা প্রশংসা লাভ করে, লোকজন তাদের গুণ-কীর্তন করতে থাকে। মৃত্যুর পর প্রশংসা করে তাদের জীবনী রচিত হয়, তাদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা রাস্তা-পথের নামকরণ তাদের নামে করা হয়। তাকে উপলক্ষ্য করে প্রশংসামূলক গীত-কবিতা, সাহিত্য রচিত হয়, পত্র-পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। সুতরাং তাদের যা কাম্য ছিল, আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতেই তা দিয়ে দেন।

কিন্তু পরকালে তারা দেখতে পাবে, পৃথিবীতে তারা যতো সৎকাজ করে এসেছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে ও নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে সূরা কাহ্ফ-এর ১০৩-১০৫ আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا-

হে রাসূল! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রব-এর নিদর্শনাবলী মেনে নিতে

অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার বিষয়টি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে না।

অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকজন যেসব আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করেছে তা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে করেছে, মহান আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন ও আখিরাতের চিন্তা না করেই শুধুমাত্র পৃথিবীতে স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে করেছে। পৃথিবীর জীবনকেই তারা প্রকৃত জীবন মনে করে করেছে। পৃথিবীর সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই স্রষ্টা কিসে সন্তুষ্ট আর কিসে অসন্তুষ্ট এবং তাঁর আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে হিসাবের জন্য পেশ করতে হবে, এই চিন্তা করে সে কোনো ধরনের আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজসমূহ করেনি। এসব লোক নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও আপন স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বহীন অথচ বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যে জীবের একমাত্র করণীয় কাজ হলো, এই পৃথিবী নামক চারণ ভূমি থেকে যতোটা পারা যায়, ততোটা হাতিয়ে নেয়া–এটাই তারা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতো।

এসব লোকজন পৃথিবীতে যতো বড় কৃতিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করুক না কেনো, পৃথিবী ধ্বংস হবার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় কর্ম-কীর্তি ও কৃতিত্বও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজেদের অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত সেবাকর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহ, রাস্তা-পথ, আসবাব-পত্র, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আবিষ্কারসমূহ, দাতব্যালয়-বিদ্যালয় সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব সৎকর্ম নিয়ে তারা কখনো মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধু কর্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল। যদি কারো সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য পৃথিবীর জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে এবং কাজের ফলাফলও পৃথিবীতেই কামনা করে থাকে, পৃথিবীতেই যদি নিজের কাজের সৎকাজের ফলও দেখে থাকে, তারপরেও তার সমস্ত আমল বা কাজই এই নশ্বর পৃথিবীর সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই শ্রেণীর লোকদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ছিল। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে এদের মন-মানসিকতা সন্দেহে পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য তারা পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম করেছে। এদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করবেন না, যাবতীয় কর্ম তাদের মুখের ওপরে ছুড়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا–

এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো। (সূরা ফুরকান-২৩)

ঈমানের দাবি যারা পূরণ করবে না, ঈমানের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতবাদ-মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাদের যাবতীয় সৎকাজও

ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামতের দিন এসবের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالاِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه-وَهُوَ فِى الاخِرَةِ مِنَ الْخسِرِيْنَ-

যে ব্যক্তি ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে। (সূরা মায়িদা-৫)

যারা ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নীতি পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধানাবলী অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে যতোই অর্থ-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হোক না কেনো, তাদের যাবতীয় সৎকর্মসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের দান-দক্ষিণা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ প্রদান করা, কোনোই কিছুই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا -وَاُولئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ-هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ-

যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহর সাথে মোকাবেলায় না তাদের ধন-সম্পদ তাদের কোনো উপকারে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। এরা তো জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে। (সূরা ইমরান-১১৬)

মুসলিম দাবিদার একশ্রেণীর লোক রয়েছে, আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় ঈমান নেই। পরকালের প্রতি তাদের মন-মানসিকতা সংশয়ে দোদুল্যমান। এ জন্য এসব লোক পৃথিবীতে অবৈধ ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকে, আবার এই উদ্দেশ্যেও মাঝে মধ্যে নামায-রোযা করে, সুযোগ বুঝে হজ্জও করে আসে এবং দান-খয়রাতও করে, কি জানি–পরকাল যদি সংঘটিত হয়েই যায়, তাহলে এসব কাজ তখন কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। এই শ্রেণীর লোকদের যাবতীয় সৎকর্ম তথা আমলে সালেহ্ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এর কোনো প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَاءً-حَتّى اِذَا جَاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَه فَوَفّهُ حِسَابَه-وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

এবং যারা কুফরী করে তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসাব নিতে দেরী হয় না। (সূরা নূর-৩৯)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে ও প্রদর্শনীমূলকভাবে আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করে এবং মনে মনে ধারণা করে যে, আখিরাত যদি হয়েই যায় তাহলে সেদিন এসব কাজের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাদের এই ধারণা মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি তা একটি তরঙ্গায়িত পানির ধারা মনে করে নিজের পিপসা মিটানোর জন্য উর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটতে থাকে, ঠিক তেমনি ঐ শ্রেণীর লোকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ আমলে সালেহ্র ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়।

কিন্তু মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যেমন যে স্থানে পানির ধারা রয়েছে মনে করে ছুটে গিয়েছিল, তারপর সেখানে পৌঁছে বালু ছাড়া আর কিছুই পায় না, ঠিক তেমনি ঐসব লোক আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে দেখতে পাবে সেখানে তাদের জন্য কিছুই নেই। মৃত্যুর পরের জীবনে যে কাজের মাধ্যমে তারা লাভবান হবে বলে আশা পোষণ করেছিল, সে কাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, এটা দেখে তারা হতাশ হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তারা দেখতে পাবে, যেখানে তারা পৌঁছেছে, সেখানে তাদের যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপস্থিত রয়েছেন।

মুসলিম দাবিদার আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে সব ধরনের লোকদের সাথে কপট সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন পরিচালিত করে। যখন যে ব্যক্তি ও দলকে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী দেখতে পায়, সেদিকেই তারা ঝুঁকে পড়ে। অর্থ ও কর্মতৎপরতা দিয়ে সহযোগিতা করে এবং বলে যে, 'আমরা আপনাদেরই সমর্থক, আপনাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি।' এভাবে শক্তিশালী প্রত্যেক দল প্রভাব বিস্তারকারী লোকদের সাথে সম্পর্ক রেখে এরা নিজেদেরকে ঝামেলা মুক্ত রাখতে চায়।

যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, নিজেকে তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসাবে উপস্থাপন করে নানাভাবে স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। ইসলামপন্থীদেরকে শক্তিশালী দেখলে তারা এদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য নামায-রোযা আদায় করতে থাকে। অর্থ ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করে যে, 'আমরা মনে প্রাণে কামনা করি যে, আল্লাহর বিধান অনুসারে দেশ ও জাতি পরিচালিত হোক।'

কিয়ামতের ময়দানে এসব লোকদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্রা এদের করুণ অবস্থা দেখে বলবে-

وَيَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ-

ঈমানদার লোকেরা বলবে, 'এরা কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে এই বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করতো যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।' তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেলো। (মায়িদা-৫৩)

আরেক শ্রেণীর লোকজন রয়েছে যারা দান-খয়রাত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে সে কথা লোকদের মধ্যে গর্বভরে প্রচার করতে থাকে। দান করে খোঁটা দেয়, দান গ্রহণকারীকে নিজের অনুগ্রহের দাস মনে করে। বার বার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম বলেই তুমি বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলে বা আমি নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলাম বলেই তুমি আজ খেয়ে-পরে বাঁচতে পারছো।' এই শ্রেণীর লোকদের অন্তরে মহান আল্লাহর বিশ্বাস নেই এবং পরকালের ভয়ও তারা করে না। এদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। সূরা বাকারার ২৬৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى-كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَه رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-فَمَثَلُه كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَه وَابِلٌ فَتَرَكَه صَلْدًا-لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আর না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এমন যে, যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তরণ পড়ে ছিল। এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে পানির স্রোতের সাথে মুছে গেলো এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে থাকলো। এসব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না।

উল্লেখিত আয়াতে 'বৃষ্টি' বলতে দান-সদকাকে বুঝানো হয়েছে আর পাথুরে 'চাতাল' বলতে হীন উদ্দেশ্য ও দুষ্ট মনোভাব তথা খারাপ নিয়্যতকে বুঝানো হয়েছে। যমীনের বুকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে সেই যমীনে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, ফসল উৎপাদন হয়। সর্বোৎকৃষ্ট সার হলো বৃষ্টির পানি। এই পানি শস্য ক্ষেতের জন্য বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু যে পাথুরে চাতালের ওপরে মাটির কয়েক ইঞ্চি আস্তরণ পড়ে থাকে, কঠিন পাথরের ওপরে মৃত্তিকার লেয়ার জমে

থাকে। মাটির এই আস্তরণের ওপরে বীজ বপন করা হলে বা কোনো উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার পরে যখন প্রবল বেগে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে, তখন মহাকল্যাণকর সেই বৃষ্টির পানি কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনে। কারণ পানির স্রোতে পাথরের ওপর থেকে মৃত্তিকার আস্তরণ ক্রমশ মুছে গিয়ে উদ্ভিদ ও বপনকৃত বীজ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মৃত্তিকার আস্তরণের নীচ থেকে কঠিন পাথর উদ্ভাসিত হয়ে বীজ বপনকারীকে উপহাসই করতে থাকে।

তেমনি যাদের দান-সদকার পেছনে পরকালে বিনিময় লাভের উদ্দেশ্য থাকে, মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে সন্তুষ্ট এবং নিজেকে দানবীর-দানশীল হিসাবে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। দানের পেছনে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বৃষ্টির পানি যেমন পাথরের ওপর থেকে মাটির আস্তরণ সরিয়ে দেয়, তেমনি খারাপ নিয়্যাত তাদের যাবতীয় সৎকাজকে তথা আমলে সালেহ্কে ধ্বংস করে দেবে। দান-সদকা মানুষের মধ্যে কল্যাণময় ভাবধারার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাশীল, কিন্তু তা উপকারী বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্য, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা থাকতে হবে। উদ্দেশ্য যদি সৎ না হয়, তাহলে অনুগ্রহ, দয়া ও করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করে অর্থ-সম্পদের অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

যারা ঈমান এনেছে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে আমলে সালেহ্ করেছে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই মালিক ও মুনিব হিসাবে মেনে নিয়েছে, রাসূলকে একমাত্র নেতা হিসাবে অনুসরণ করেছে, নামায-রোযা আদায় করেছে, সাধ্যানুসারে যাকাত দিয়েছে, দ্বীনি আন্দোলন করেছে এবং মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তারাই হলো মহান আল্লাহর দল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ-وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ-

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোক, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়। আর যে ব্যক্তি বস্তুতই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে, তার এই কথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে। (সূরা মায়িদা-৫৫-৫৬)

মহান আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে-এ কথার অর্থ এটা নয় যে, যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে, এই পৃথিবীতে তারা বিপুল ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, কলকারখানার মালিক

হবে, বৈষয়িক দিক থেকে এদের কোনো অভাব থাকবে না। বরং এ কথার অর্থ হলো, কিয়ামতের ময়দানে এরা এদের ঈমান ও আমলের বিনিময়ে বিজয়ী হবে। মহাক্ষতি থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। অনেকে এই ধারণা পোষণ করে যে, পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের তো কোনো অভাব থাকার কথা নয়। তারা অভাবহীন স্বচ্ছল জীবন-যাপন করবে। লোক সমাজে তারা বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।

কিন্তু বাস্তবে এই ধারণার বিপরীত অবস্থাই পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকজন গরীব–অভাবী। বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, কলকারখানা নেই, লোক সমাজে প্রভাব–প্রতিপত্তি নেই। অর্থের অভাবে সন্তান-সন্ততিকে ভালো খাধ্য দিতে পারে না, উত্তম পোষাক দিতে পারে না, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাতে পারে না।

অপরদিকে যাদের জীবনে নামায-রোযা নেই, পরকালের চিন্তা-চেতনা নেই। আল্লাহর অপছন্দনীয় পথই তাদের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সেই লোকগুলোর এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই। বিপুল ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব তাদের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে। আপন রব-এর প্রতি অকৃতজ্ঞ এই অপরাধী লোকগুলো পৃথিবীতে অঢেল ধন-সম্পদ লাভ করে ধারণা করে যে, তারা যে সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করছে, তার ওপরে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন বলেই তাদেরকে বিপুল ঐশ্বর্য দান করেছেন।

এদের অবস্থা হলো সেই গাধা আর খাসীর গল্পের মতো। এই দুটো পশুর যিনি মালিক তিনি খাসীটির প্রতি ছিলেন অধিক যত্নবান। এই অবস্থা দেখে খাসীটি একদিন গাধাটিকে ডেকে বললো, 'ব্যাটা গাধা! তুই তো আসলেই একটি গাধা!'

খাসীর কথা শুনে গাধাটি মনোক্ষুন্ন হয়ে খাসীটিকে বললো, 'আমি তো আসলেই গাধা, সুতরাং আমাকে এভাবে তাচ্ছিল্যভরে গাধা বলছো কেনো?'

খাসীটি বললো, 'বলছি এই জন্য যে মালিক আমার প্রতি কতটা যত্নশীল তা লক্ষ্য করেছো! তোমার প্রতি মালিকের কোনো যত্নই নেই। বরং তিনি বাইরে থেকে এসেই তোমাকে এক থাপ্পড় মারে আর যাবার সময়ও লাথি মারে।'

খাসীর কথা শুনে গাধা মুচ্কি হেসে বললো, 'খাসী! তোমার মালিক তোমার প্রতি এত যত্নশীল কেনো তা কি তুমি জানো? কোরবানীর চাঁদ উঠেছে, এই জন্য তোমার প্রতি মালিক এত যত্নবান।'

সুতরাং পৃথিবীতে ঈমানহীন পরকালের ভীতিশূন্য অপরাধী লোকদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন, এর অর্থ এটা নয় যে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন। বরং পৃথিবীতে এরা ঈমানহীন যে আমলে সালেহ্ করে, তার বিনিময়েই এদেরকে ধন-সম্পদ দান করা হয়। আল্লাহর দেয়া এই বিনিময় পরকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে না। এই পৃথিবীতেই তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয় এবং এরাই হবে

জাহান্নামের ইন্ধন। এরা জাহান্নামের জ্বালানী হবে বলেই পৃথিবীর জীবনে এদের বল্গাহারা ভোগ-বিলাস আর আপাদ-মস্তক নোংরামীতে পরিপূর্ণ জীবন-যাপন। এসব লোকের সম্পদ আছে কিন্তু শান্তি নেই। শান্তি নামক শব্দটিই এদের জীবনের পাতা থেকে মুছে গিয়েছে। শান্তির আশায় হন্য হয়ে এরা নানা ধরনের নাচ-গান, পার্টি-ক্লাব আর শরাবের স্রোতধারায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেয়, তবুও শান্তির স্পর্শ এরা পায় না।

অনিয়ন্ত্রিত বল্গাহারা জীবন-যাপনের কারণে এদের দেহে নানা ধরনের দূরারোগ্য রোগ বাসা বাঁধে। এক পর্যায়ে চিকিৎসক এদের রিযুক নিয়ন্ত্রন করে। চিকিৎসকের দেয়া তালিকা ও পরিমাপের বাইরে কোনো খাদ্য গ্রহণ করার অধিকার এদের থাকে না। চোখের সামনে স্ত্রী আরেক জনের হাত ধরে ক্লাব-পার্টিতে চলে যায়। মেয়ে রাতের পর রাত বয়ফ্রেন্ডদের সাথে রাত কাটায়, মেয়ের ভ্যানেটি ব্যাগ থাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। তারপরেও অসতর্ক মুহূর্তে মেয়ে কুমারী মাতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ছেলে মাতা-পিতার কথা শোনে না। এক পর্যায়ে ছেলে অন্ধকার জগতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।

ঈমান ও পরকালের ভীতিশূন্য নারী-পুরুষ, এদের দাম্পত্য জীবনও স্থায়ী হয় না। এই শ্রেণীর শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, গায়ক-গায়িকা, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাসহ নানা পেশায় নিযুক্ত নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে শান্তি নেই। পুরুষ একটির পর আরেকটি স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, নারীও একটির পর আরেকটি স্বামী পরিবর্তন করছে। ফলে সন্তান-সন্ততির জীবনে নেমে আসছে অন্ধকারের ঘোর অমানিশা। সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ঈমান ও পরকালের ভীতিহীন নারী-পুরুষদের একই অবস্থা। শান্তির আশায় এরা উন্মাদ, অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা সবকিছুই আছে, কিন্তু শান্তি এদের জীবনে সোনার হরিণের মতোই। রাতে ঘুম হয় না, ঘুম নামক নে'মাত এদের জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, ফলে নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে ঘুমের জগতে প্রবেশ করতে হয়।

অপরদিকে যারা ঈমানদার এবং পরকালকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে, তাদের তেমন অর্থ-সম্পদ নেই। অভাব এদের নিত্যসঙ্গী–কিন্তু এদের জীবনে রয়েছে অনাবিল শান্তি। বৈধ পথে রিযুক অর্জনের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়িতে ফিরে আসার সাথে সাথে প্রেমদায়িনী স্ত্রী সেবাযত্নের বাহু বিছিয়ে দেয়, ছেলে-মেয়ে মমতার ছায়া বিস্তার করে, ডাল-ভাত যা রান্না হয় তাই আহার করে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। তারপর নামায আদায় করে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। গোটা রাত পরম শান্তিতে ঘুমায়। যাবতীয় ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে বলে এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না, ঈমান ও মহান আল্লাহর স্মরণ এবং পরকালের ভীতিই এদের ভেতরে এই শান্তির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ–

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই হৃদয়ে শান্তির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেয়। (সূরা রা'দ-২৮)

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্ করে, তারা যদি কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় বা দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়, তখন তারা বিপদ থেকে মুক্তিদাতা মহান আল্লাহকেই ডাকে। বিপদগ্রস্ত কোনো মানুষ যখন শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ-উচ্ছ্বাস উজাড় করে দিয়ে একবার মহান আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলে ডাকে-মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর সেই গোলামের ডাকে ৭০ বার সাড়া দিয়ে বলেন, 'বান্দাহ্, আমি তোমার কাছেই আছি, বলো কি চাও।' পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ-اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-

হে নবী! আমার বান্দাহ্ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। (সূরা বাকারা-১৮৬)

ঈমানদার সন্দেহ-সংশয়ে দোলায়িত হয়ে আপন রব আল্লাহ তা'য়ালাকে ডাকে না, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েই ডাকে। এ জন্য কবি বলেছেন-

দিল ছে যো বাত নিকাল তি হ্যায় আছর রাখ্তি হ্যায়

প্যর নাহি মাগার তা-কতে পরওয়াজ রাখতি হ্যায়।

হৃদয় থেকে যে কথা নির্গত হয় তা প্রভাব বিস্তার করে। ডানা থাকে না কিন্তু উড়তে পারে।

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্কারী, মহান আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ-وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ-

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা রয়েছে। তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। (সূরা শূরা-২৫-২৬)

আমলে সালেহ্‌কারীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা

এই ঈমানদার লোকগুলোও মানুষ, তারা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এদের দ্বারাও গোনাহ্ সংঘটিত হয়। কিন্তু এদের আমলে সালেহ্-এর কারণে করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবানী করে তাদের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং এরাই সফলতা অর্জন করবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّؤْمِنْ ۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا–ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ–

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে ও আমলে সালেহ্ করে আল্লাহ তার গোনাহ্ ঝেড়ে ফেলবেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। এই লোকেরা চিরকালই সেখানে থাকবে। এটাই বড় সাফল্য। (সূরা তাগাবুন-৯)

মানুষের ভেতরে অপরাধ প্রবণতা রয়েছে, অতএব তারা অপরাধ করবেই। মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে যারা আমলে সালেহ্ করবে, মহান আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদের অসৎ কাজগুলো সৎকাজের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেবেন। ঈমান আনয়নকারী ও আমলে সালেহ্‌কারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

যারা গোনাহের পর তওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা ফুরকান-৭০)

এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার কারণেই সে যুগে অপরাধে নিমজ্জিত অগণিত লোক তওবা করে নিজেদেরকে এমন সৎ মানুষে পরিণত করেছিল যে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল। ইতোপূর্বে নানা ধরনের অপরাধে জড়িত ছিল এবং বর্তমানে যারা সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে, উল্লেখিত আয়াত তাদের জন্য একটি মহাসুসংবাদ। এই আয়াতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার কারণেই সে যুগের অধঃপতিত ও বিকৃত সমাজের অগণিত মানুষ স্থায়ী বিকৃতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। মহান আল্লাহর এই ঘোষণা অপরাধিদেরকে আশার আলো দেখায়, মুক্তির পথপ্রদর্শন করে এবং বিকৃত অবস্থা থেকে সংশোধনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে।

এই সাধারণ ঘোষণা না দিয়ে যদি অপরাধিদেরকে বলা হতো, 'পাপ করেছো, তোমরা পাপী। সুতরাং পাপের শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে, এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।' তাহলে কোরআন নাযিলের যুগের অপরাধিরা হতাশ হয়ে চিরকালের জন্য পাপের সমুদ্রে ডুবে যেতো এবং তাদেরকে সংশোধন করার কোনো পথই উন্মুক্ত থাকতো না, তাদের ভেতরের কল্যাণকর যোগ্যতাসমূহ দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা যেতো না। বর্তমান ও আগামী দিনের অপরাধিদেরকেও সংশোধন করার কোনো পথ উন্মুক্ত থাকতো না। আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবান, তিনি দয়া করে পবিত্র কোরআনে বার বার ক্ষমার ঘোষণাই দিয়েছেন, তাঁর অসীম দয়া। এই সুযোগটি তিনি তাঁর বান্দাদেরকে গ্রহণ করতে বলেছেন। অপরাধীকে একমাত্র ক্ষমার আশাই অপরাধের শৃংখল থেকে মুক্ত করে, অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আলোর জগতে নিয়ে আসতে পারে। পাপ করলে পাপের শাস্তি পেতেই হবে-ক্ষমা পাওয়া যাবে না, এ কথা মানুষের ভেতরে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করে এবং নিরাশ হবার পর মানুষ অপরাধের সাগরে তলিয়ে যায়।

ঈমান আনলে এবং সৎকাজ করতে থাকলে আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, এই ঘোষণা সে যুগের আরবের জাহিল, পথভ্রষ্ট ও অপরাধে নিমজ্জিত লোকদেরকে কিভাবে সত্য-সঠিক ও সহজ-সরল পথের দিশা দিয়েছিল, তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অপরাধিদের আগমন ও অনুশোচনা প্রকাশের ঘটনাসমূহের মাধ্যমে বুঝা যায়। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা বর্ণনা করেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে এশার নামায আদায় করে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তখন দেখি একজন ভদ্রমহিলা আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি তাকে সালাম জানিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে আমার ঘরে গিয়ে নফল নামায আদায় করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর সেই মহিলা আমার বাড়ির দরজায় আওয়াজ দিলো। আমি দরজা খুলে তার কাছে জানতে চাইলাম, সে কি চায়।

মহিলার মুখমন্ডল অনুশোচনায় অবনমিত। অনুতাপের ভাষায় সে আমাকে বললো, 'আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্নের উত্তরের আশায় এসেছি। প্রশ্নটি হলো, আমি জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচার করেছিলাম ফলে আমার গর্ভে সন্তান এসেছিলো। সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে আমি তাকে হত্যা করেছি। এখন আমি জানতে চাই, আমার সেই অপরাধ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করবেন কি না?'

হযরত আবু হুরাইরা বলেন-আমি মহিলার প্রশ্নের উত্তরে তাকে বললাম, 'না, তোমাকে ক্ষমা করা হবে না। পাপের শাস্তি তোমাকে লাভ করতেই হবে।' আমার কথা শুনে উক্ত মহিলার চেহারায় হতাশার চিহ্ন দেখা দিলো। সে চলে যাচ্ছিলো আর আক্ষেপ করে বলছিল, 'হায়! হায়! আমার এই রূপ-সৌন্দর্য তাহলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলে যাবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল।' পরদিন ফজরের সময় আমি উক্ত মহিলার বিষয়টি এবং আমি মহিলাকে যে

উত্তর দিয়েছিলাম, তা আল্লাহর রাসূলের কাছে বললাম। আমার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'আবু হুরাইরা, তুমি সেই মহিলাকে ভুল কথা শুনিয়েছো। তুমি কি আল্লাহর কোরআনে পড়নি-

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الِهًا اخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ-وَمَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ اَثَامًا- يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا-الاَّ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

যারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণ হারাম করেছেন কোনো সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়। তবে তারা ব্যতীত যারা (ঐসব গোনাহের পর) তওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা ফুরকান-৬৮-৭০)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূলের মুখে আমি এ কথা শুনে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম সেই মহিলার সন্ধানে। সারা দিন ধরে খুঁজতে থাকলাম, অবশেষে তাকে রাতে এশার নামাযের সময় তার সন্ধান পেলাম। তার কাছে গিয়ে তাকে আমি সুসংবাদ দিয়ে বললাম, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তওবা করে ঈমান এনে আমলে সালেহ্ করতে থাকলে মহান আল্লাহ তাদের অসৎ কাজগুলোকে সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।'

আমার কথা শোনার সাথে সাথে উক্ত মহিলা সিজ্‌দায় গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, 'সেই আল্লাহর শোকর আদায় করছি, যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।' তারপর সেই মহিলা তওবা করে নিজের দাসীকে তার পুত্রসহ স্বাধীন করে দিয়েছিল। আরেকদিন একজন বৃদ্ধ লোক এসে আল্লাহর রাসূলের দরবারে আরজ করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার গোটা জীবনকাল গোনাহের মধ্য দিয়ে কেটে গেলো, এমন কোনো গোনাহ্ নেই-যা আমার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। এখন আমি কি ক্ষমা পাবো, আমার জন্য কি ক্ষমার পথ উন্মুক্ত রয়েছে?'

রাহ্মাতাল্লিল আলামীন ঐ বৃদ্ধের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছো?'

জবাবে বৃদ্ধ জানালো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি পড়ে নিলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যাও, মেহেরবান আল্লাহ তোমার গোনাহ্ ক্ষমা করবেন এবং তোমার গোনাহ্গুলোকে নেকীতে পরিণত করে দেবেন।।'

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে পুনরায় জানতে চাইলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ কি ক্ষমা করে দেয়া হবে?'

আল্লাহর নবী জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ, তোমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (ইবনে কাসীর)

সূরা ফুরকানের উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করতে থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অতীতের সমস্ত গোনাহ্গুলোকে সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।' আল্লাহর কোরআনের গবেষকগণ এই আয়াতের দুটো অর্থ করেছেন। একটি হলো, গোনাহ্ থেকে যখন তওবা করবে তখন ইতোপূর্বে জাহিলি জীবনে তারা যেসব অপরাধ ও পাপ কাজ করতো, তার জায়গায় বর্তমানে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জীবন গ্রহণ করার কারণে মহান আল্লাহ তাদের সৎকাজ করার সুযোগ করে দেবেন এবং সেই অপরাধী লোকগুলো পবিত্র জীবন-যাপনের সুযোগ পাবে এবং সৎকাজ করতে থাকবে। এভাবেই সৎকাজ তাদের অসৎ কাজের স্থান দখল করবে।

দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, অপরাধীগণ যখন তওবা করবে, এর ফলে শুধুমাত্র তাদের আমলনামা থেকে জাহিলি জীবনে যেসব গোনাহ্ করেছিল সেগুলো মুছে না দিয়ে সেই স্থানে তওবাকারী প্রত্যেক অপরাধীর আমলনামায় এই নেকী লেখা হবে যে, 'এই ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর সেই গোলাম, যে বিদ্রোহ ও নাফরমানীর পথ পরিহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জীবন-যাপনের পথ অবলম্বন করেছে।'

এই ব্যক্তি পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন সে তার অতীত জীবনের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে তওবা করতে থাকবে, লজ্জিত হবে, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমার জন্য কাঁদতে থাকবে। এভাবে অতীতে করা অপরাধের জন্য বান্দাহ্ যতবার তওবা করতে থাকবে, লজ্জিত হতে থাকবে, কাঁদবে, ততবারই তার আমলনামায় অসংখ্য নেকী লেখা হতে থাকবে। কারণ হলো, ভুল ও অপরাধের জন্য তওবা করা, অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াও ইবাদাত, নেকীর কাজ এবং আমলে সালেহ্। এভাবে অনুতপ্ত অপরাধির আমলনামায় পূর্বেকার সমস্ত পাপের জায়গা দখল করে

নেবে পরবর্তী কালের নেকীসমূহ এবং আমলে সালেহ্। শুধু তাই নয়, এসব ব্যক্তিকে যাবতীয় শাস্তি থেকেই নিষ্কৃতি দেয়া হবে না, বরং শাস্তির পরিবর্তে তাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরস্কৃত করবেন। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা, সূরা নসর-এর তাফসীর পড়ুন।)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতের শেষ নেই। তাঁর অসীম দয়া, তিনি শুধু উসিলা খুঁজতে থাকেন, কোন্ উসিলায় বান্দাহ্কে ক্ষমা করা যায়। তাঁর কোন্ বান্দাহ্ যখন অপরাধ করার চিন্তা করে, পাপের চিন্তা করার সাথে সাথেই তার আমলনামায় পাপ লেখা হয় না। যখন সেই বান্দাহ্ পাপ কাজ সংঘটিত করে, তখনই কেবলমাত্র তা লেখা হয়। যতটুকু করে ততটুকুই লেখা হয়–এতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয় না। এরপরেও তওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে। বান্দাহ্ যখনই নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদতে থাকে, মহান আল্লাহ তাঁর সেই গোলামের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

অপরদিকে আল্লাহর কোনো গোলাম যখন সৎকাজ করার চিন্তা করে, ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সাথে সাথেই সেই বান্দার আমলনামায় নেকী লেখা হয়ে যায়। বান্দাহ্ যখন সেই সৎকাজের ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করে, তখন তার আমলনামায় আরো কয়েকগুণ নেকী লেখা হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার করা একটি সৎকাজের বিনিময়েও একটি পুরস্কার দেন না। বরং একটি সৎকাজের অসংখ্য বিনিময় দান করেন। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

আমলে সালেহ্কারীদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা

অপরাধের জগৎ থেকে যারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا–اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

আর যারা খারাপ কাজ করবে, এরপর তওবা করবে ও ঈমান আনবে, নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আ'রাফ-১৫৩)

অপরাধ করার পরে যারা তওবা করবে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে, ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা হলো–

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى–

যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল। (সূরা ত্বা-হা-৮২)

ঈমান আনার পরে যারা আমলে সালেহ্ করবে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে লক্ষ্য করে ওয়াদা করছেন–

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ–

যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগ্ফেরাত ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা হাজ্জ-৫০)

আমলে সালেহ্কারীদের জন্য মহান আল্লাহর ওয়াদা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন এক অদৃশ্য পন্থায় তাদের রিয্ক-এর ব্যবস্থা করবেন, যা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। ঈমান আনয়নকারী ও আমলে সালেহ্কারীদের যাবতীয় সমস্যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমাধান করে দেবেন। সৎকাজের কারণে তাদের আচার, আচরণ সুন্দর করে দেবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا–يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ–وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে। (আহ্যাব-৭০-৭১)

আল্লাহ্ তা'য়ালার কত দয়া, কত বিশাল তাঁর রহমত—কল্পনাও করা যাবে না, তাঁর ক্ষমার পরিধি কতটা ব্যাপক। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো মানুষের অস্তিত্ব নেই, যে ব্যক্তি তার শত্রুদেরকে, তার প্রতি বিদ্রোহীদেরকে আহ্বান জানিয়ে বলবে, এসো তোমাকে ক্ষমা করে দেই। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা সূরা যুমার-এর ৫৩-৫৪ আয়াতে তাঁর অবাধ্য, বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দাহ্দের ডেকে বলছেন–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ–اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا–اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَه مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ–

হে নবী! (আমার অপরাধী বান্দাদের ডেকে) বলে দিন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজের আত্মার প্রতি জুলুম করেছো (অর্থাৎ অপরাধ করেছো) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো

না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ফিরে এসো তোমাদের রব-এর দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। (আযাব যখন এসে যাবে) তখন কোনদিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না।

অর্থাৎ যে অপরাধে তোমারা নিমজ্জিত রয়েছো, সেই অপরাধের কারণে শাস্তি নেমে আসার পূর্বেই তোমরা তওবা করে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে এসো। আর যদি ফিরে না আসো, তাহলে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি এসেই যাবে, তখন সেই শাস্তি থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না।

যারা ঈমান আনবে, আল্লাহকেই একমাত্র রব হিসাবে মেনে নেবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, কিয়ামতের দিনে তাদের কোনো ভয় বা চিন্তা থাকবে না। (রব শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের রব-শব্দের তাফসীর পড়ুন।) ভয়ে আতঙ্কে যখন মানুষের বুকের কলিজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হবে, তখন আমলে সালেহ্কারীগণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

যারা ঘোষণা করেছে আল্লাই আমাদের রব, অতপর তার ওপরে স্থির থেকেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না। এ ধরনের সমস্ত মানুষ জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তাদের সেই কাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছিলো। (সূরা আহ্কাফ-১৩-১৪)

যারা ঈমান এনেছে এবং একমাত্র আল্লাহকেই রব হিসাবে গ্রহণ করেছেন, অন্য কাউকেই রব হিসাবে মানেনি, একমাত্র আল্লাহকেই আইনদাতা-বিধানদাতা, একমাত্র রিযিকদাতা, বিপদ থেকে মুক্তিদাতা, সাহায্যকারী, রোগ থেকে আরোগ্যকারী, মনের বাসনা পূরণকারী হিসাবে মেনেছে। বিপদে নিমজ্জিত হয়ে বা মনের বাসনা পূরণ করার আশায় কোনো মাজারে বা পীর সাহেবের কাছে ছুটে যায়নি, আল্লাহর আইন ব্যতীত দেশের প্রচলিত বা মানুষের বানানো কোনো আইন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ করেনি। আল্লাহর সাথে অন্য কারো শির্ক করেনি। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর ওয়াদা হলো-

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ

اَوْلِيٰـؤُكُمْ فِى الْحَـيٰـوةِ الدُّ نْيَـا وَفِى الْاٰخِرَةِ-وَلَكُمْ فِـيْـهَـا مَا تَشْـتَـهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ-نُزُلاً مِّنْ غَـفُـوْرٍ رَّحِـيْمٍ-

যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশ্‌তারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই পৃথিবীতেও তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে, তাই পাবে। আর যে জিনিসের আকাংখা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (হামীম আস্ সাজ্‌দাহ্-৩০-৩২)

যারা ঈমান এনে আমলে সালেহ্ করবে, তারা এই পৃথিবী থেকে যখন চিরবিদায় গ্রহণ করবে, সেই মৃত্যুর সময় তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে উল্লেখিত কথাগুলো বলবে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেবে। (জান্নাতে কিভাবে তাদের মেহমানদারী করা হবে, বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা নাবা-এর ৩১ থেকে ৩৬ আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আশ শূরার ২২ নম্বর আয়াতে আমলে সালেহ্কারীদের ব্যাপারে ওয়াদা করে বলেন-

وَالَّذِيْـنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ-لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُ وْنَ عِـنْدَ رَبِّـهِـمْ-ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ-

পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগ-বাগিচার মধ্যে অবস্থান করবে। তারা যা-ই কামনা করবে তা-ই তাদের রব-এর কাছ থেকে পাবে। এটাই বড় মেহেরবানী। (সূরা আশ শূরা-২২)

পবিত্র কোরআনে অসংখ্য স্থানে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং ঈমানের সাথে সাথে আমলে সালেহ্র বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে যারা আমলে সালেহ্ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি অঙ্গীকার করছেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَـظِـيْـمًا-

যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাত্হ-২৯)

পৃথিবীতে যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে অর্থাৎ আমলে সালেহ্ করবে, তাদের প্রতি মহান আল্লাহর ওয়াদা হলো, তিনি তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন। (সূরা আন নূর-৫৫)

(এই আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুঝার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরে 'দাসত্বকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা' ও 'ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা' শিরোণাম ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।)

আদর্শ তা যত সুন্দর বা কল্যাণকর হোক না কেন, তা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বা তার সুফল লাভ করতে হলে সে আদর্শ দেশের বুকে প্রয়োগ করতে হয়। আইন কিতাবে আছে, সে আইনের ধারাসমূহ প্রতিদিন শতকোটি মানুষ উচ্চকণ্ঠে প্রতিটি মুহূর্তে যদি পাঠ করতে থাকে তাহলে তার সুফল লাভ করা যায় না। সুফল লাভ করতে হলে আইনের ধারাসমূহ প্রয়োগ করতে হয়। তেমনি আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধান, যাবতীয় আইন-কানুন পবিত্র কোরআনে আর হাদীসে রয়েছে, প্রতিদিন লক্ষ কোটি কণ্ঠে তা পাঠ করা হচ্ছে, হাদীসের তাফসীর হচ্ছে, কোরআনের তাফসীর হচ্ছে, কিন্তু তার সুফল ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

কারণ এ সমস্ত আদর্শ এবং যা পাঠ করা হচ্ছে তার প্রয়োগ নেই। আল্লাহর নাজিল করা কিতাব অবশ্যই পাঠ করতে হবে, তার তাফসীর করতে হবে, কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন হলো তা বাস্তবে আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা। কোনো আদর্শ আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা না হলে তার কল্যাণকর বা ক্ষতিকর দিক মানুষের কাছে অন্ধকারে রয়ে যায়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একাই শুধু নন, হাতে গোনা গুটি কয়েক নবী ব্যতীত অন্যান্য নবী রাসূলগণ সবাই ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আইনের মাধ্যমে দেশের বুকে বাস্তবায়িত করেছেন। ইসলামী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে তার সুফল জাতির সামনে প্রদর্শন করেছেন।

'আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধান বাস্তবায়ন করলে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে এই পৃথিবীতে এবং আখেরাতে'-নবী রাসূলগণ মানুষকে এই কথা বলে তাদের দাওয়াত কবুল করতে বা তাদের আন্দোলনে শামিল হতে বলেছেন। যারা তাদের আহবানে সাড়া

দিয়েছেন, তারা এই পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করে বাস্তবে কল্যাণ লাভ করার পরে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে যে, আল্লাহর আইন এই পৃথিবীতে পালন করে কল্যাণ লাভ করা গেল, তাহলে আখেরাতে অবশ্যই এরচেয়ে শতকোটি গুণে বেশী কল্যাণ লাভ করা যাবে।

এ কারণে যে সমস্ত নবী রাসূলগণ রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেছেন, তাঁরা আল্লাহর আইন দেশের বুকে প্রয়োগ করে যে কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, সে কল্যাণ বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও তাই করেছিলেন। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল-

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا-

আর দোয়া করো, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো। এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (বনী ইসরাঈল-৮০)

রাসূলের প্রতি যখন মক্কা থেকে হিজরত করার আদেশ এসেছিলো, তখন তাঁকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করার জন্য এভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছিলো। তিনি মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। তারপর গোটা পৃথিবীবাসীকে দেখালেন, তিনি মানবতাকে যে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেছেন, সে কল্যাণের বাস্তবরূপ কেমন। মানুষকে যে শান্তির দিকে ডেকেছেন, সে শান্তির অনুভূতি কেমন তা মানুষকে অনুভব করিয়েছেন।

যেখানে মানুষ অনাহারে থেকেছে, তিনি সেখানে এমন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন যে, খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়েছে। যাকাত গ্রহণের মত কোন গরীব মানুষ খুঁজেও পাওয়া যায়নি। মানুষ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে মানুষকে জ্বালিয়েছে। আল্লাহর বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষের হৃদয় জগৎ থেকে সে অহঙ্কার মুছে গিয়েছে। পূর্বে গৃহে অর্গল বদ্ধ করে থেকেও মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। ইসলামী আইন প্রয়োগ করার ফলে, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজের প্রাণ কোরবানী করতে প্রস্তুত হয়েছে।

নারীর মর্যাদা যেখানে ছিল স্বপ্নের অতীত, সেখানে নারী একজন পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশী অধিকার ভোগ করেছে। সমাজে নারীর সতীত্বের কোনো মূল্য ছিল না। সেখানে পথের মাঝে বিপদগ্রস্তা কোনো সুন্দরী যুবতীকে একাকী পেয়েও তাকে প্রহরা দিয়ে নিরাপত্তার সাথে তার গন্তব্য স্থলে পৌছে দিয়েছে একজন যুবক এবং বলেছে, 'আমার পরিচয় শোনো, আমি একজন মুসলমান।'

রাতের অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না। তবুও মানুষ আল্লাহর ভয়ে দুধে পানি মিশ্রিত করেনি। অপরাধীকে ধরে আনার জন্য কোন বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি। তার অপরাধের কথা কেউ জানতেও পারেনি। হঠাৎ কারো দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সে বিবেকের দংশনে নিজেই এসে বিচারক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে শাস্তি কামনা করেছে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে প্রয়োগ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে রাষ্ট্রে মানুষ তো দূরে থাক-ছোট্ট একটা পাখিও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। অকারণে একটি পিঁপড়াকেও কেউ হত্যা করতো না এবং গাছের পাতাও ছিঁড়তো না।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে না থাকলে ওয়াজ-বক্তৃতা করে, বিশালাকারের গ্রন্থ রচনা করে সুদ, ঘুষ, যিনা, ব্যভিচার, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, সন্ত্রাস, নির্লজ্জতা, উচ্ছৃংখলতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, নগ্নতা তথা নৈতিকতা ও মানবতা বিরোধী কোনো ধরনের কর্মকান্ড বন্ধ করা যায় না। এ জন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِعُ بِا لسُّلْطٰنِ مَالاَ يَزِعُ بِالْقُرْآنِ-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করেন, যা কোরআন দিয়ে তিনি করান না।

কোনো কোনো মনীষী এই হাদীসটির ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, এটি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কথা-আল্লাহর রাসূলের নয়। এটি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কথা হলেও হতে পারে, হয়ত তিনি আল্লাহর রাসূলের মুখে কথাটি শুনে থাকবেন। আর রাসূলের কথা না হলেও তাঁর সম্মানীত ও মর্যাদাবান সাহাবী হযরত উসমানের কথার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং সাহাবায়ে কেরামদের কথাও হাদীস হিসাবে গণ্য। কারণ তাঁদের সামনেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাসূলের কাছ থেকেই ইসলাম শিখেছিলেন।

সে যাই হোক, ক্ষমতা হাতে না থাকলে আল্লাহর বিধান যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তার বাস্তব নমুনা হলো বায়তুল্লাহ শরীফ। পৃথিবীর বুকে পবিত্র কা'বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অংশীবাদীর অমানিশা দূর করার লক্ষ্যে। কিন্তু সেই কা'বাতেই অংশীবাদীর আখড়া স্থাপন করা হয়েছিল। মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল পবিত্র কা'বায়। মক্কা বিজয়ের দিনে তাওহীদের বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন, সিপাহসালার কখন নির্দেশ দিবেন, 'পবিত্র কা'বাকে মূর্তিমুক্ত করো।'

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বাঘরের আঙ্গিনায় উট থেকে অবতরণ করেন। তারপর ওসমান ইবনে তালহাকে কা'বাঘরের চাবি আনতে বললেন। অথচ ক্ষমতা হাতে না থাকার কারণে এই কা'বার আঙ্গিনায় তাঁকে

নির্যাতিত হতে হয়েছে। কা'বার আঙ্গিনায় তিনি নামায আদায় করছেন, আর তাঁর পবিত্র মাথা মোবারকের ওপর উটের পচা নাড়ি-ভূড়ি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কা'বায় তাঁকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করার পরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেলো।

হযরত ওসমান ইবনে তালহা তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। আজ তাঁকে আল্লাহর রাসূল অনুরোধ করলেন না, মোলায়েম কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন চাবি আনার জন্য। কা'বার চাবি রক্ষক হযরত ওসমান ইবনে তালহা দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে চাবি এনে রাসূলের হাতে দিলেন। চাবি দিয়ে আল্লাহর ঘর খোলা হলো। আল্লাহর রাসূল পুনরায় সেই চাবি হযরত ওসমান ইবনে তালহার হাতে দিয়ে করুণা সিক্ত কণ্ঠে তাঁকে বললেন, 'তুমিই এই চাবির সংরক্ষক, কোনো জালিম ব্যতীত তোমার কাছ থেকে কেউ এই চাবি কোনোদিন ছিনিয়ে নেবে না।'

হযরত ওসমান অবাক বিস্ময়ে আল্লাহর রাসূলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি অনুভব করলেন, এই মহান ব্যক্তি কোনো সাধারণ দেশ বিজয়ী লোক নন, এই মহৎ মানুষটি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। সাথে সাথে তিনি রাসূলের হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করলেন। সেই থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও কা'বা ঘরের চাবি হযরত ওসমান ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বংশধরদের কাছেই রয়েছে। তাঁরাই কা'বা ঘরের চাবির সংরক্ষক। সাউদী আরবের কোনো শাসকই সেই চাবি নিজে গ্রহণ করেন না। কারণ চাবি গ্রহণ করলে আল্লাহর রাসূলের কথা অনুসারে তাঁরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে তাকবির দিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বিলাল, হযরত উসামা ইবনে যায়িদ ও হযরত ওসমান ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন। আল্লাহর নবী দীর্ঘক্ষণ কা'বার ভেতরে অবস্থান করলেন। সে সময় কা'বার ভেতরে এবং তার চারপাশে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। বুখারী হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْنِ مَسْعُوْدٌ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلٰثُ مِاءَةٍ نُصُبٌ فَجَعَلَ يُطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ جَاءَالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَايُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَايُعِيْدُ–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন বায়তুল্লাহর চারপাশে ও হারাম শরীফের মধ্যে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। আল্লাহর নবী হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে

আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন, 'সত্য এসেছে, আর মিথ্যা বিতাড়িত হয়েছে। সত্য এসেছে, বাতিল পুনরায় আর আসবে না।' অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ইসলাম বাতিলকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়েছে। এখন শুধু ইসলামই থাকবে।

পবিত্র কা'বা দীর্ঘ দিন পরে কালিমা মুক্ত হলো। সমস্ত মূর্তি ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হলো। এই কা'বায় প্রাণহীন পাষাণ প্রতীমার পূর্জা হয়েছে শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে। আজ সেখানে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বজ্রকণ্ঠে তাওহীদের বিপ্লবী বাণী দিকদিগন্ত মুখরিত করে তুললো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবাদের নিয়ে পবিত্র কা'বায় মহান আল্লাহর কুদরতী পদপ্রান্তে সিজদা দিলেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের নির্মিত কা'বায় এবার যে তাওহীদের মশাল প্রজ্জ্বলিত হলো, মহাসত্যের এই আলোকবর্তিকা কিয়ামত পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত থাকবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেদিনই ঘোষনা করলেন, 'সত্য এসেছে বাতিল আর আসবে না।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কা'বায় প্রবেশ করে কা'বার দেয়ালে যত দেবদেবীর ছবি ছিল তা মুছে দিলেন। মহাসত্য আপন প্রভায় মক্কা নগরীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মহাসত্যের মধ্যমনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি যখন কা'বা থেকে বের হলেন, তখন সাহাবাগণ তথা মহাসত্যের আলোর আবাবিলগণ ছুটে এসে কা'বায় প্রবেশ করতে লাগলেন। আল্লাহর রাসূলের হাতে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল না, তখন এই মক্কা নগরীতে রাসূল অত্যাচারিত হয়েছেন। শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী অবস্থায় তাঁদেরকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় বৃদ্ধ, নারী, শিশু-কিশোররা যখন আর্তনাদ করেছে, তাদের সেই করুণ আর্তনাদ শুনে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম অত্যাচারিত হয়েছেন। তাঁদের সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে দিনের পর দিন অনাহারে রেখে দুই হাত পেছনে বেঁধে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করা হয়েছে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপরে তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর পবিত্র বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর পায়ের সাথে রশি বেঁধে সেই রশি উটের পায়ে বেঁধে দিয়ে উটকে ক্ষিপ্ত করে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। উট কাঁটা বিছানো ও পাথুরে পথ দিয়ে ছুটে গিয়েছে, হযরত বিলালের দেহের রক্ত গোস্ত-চর্বি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় মিশে গিয়েছে।

হযরত সুমাইয়াকে শহীদ করা হয়েছে। হযরত খাব্বাবকে আগুনের অঙ্গারের ওপরে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকে পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। দেহের গোস্ত-চর্বি গলিত হয়ে আগুন নিভে গিয়েছে, তবুও তাঁর অত্যাচারে কোনো বিরতি দেয়া হয়নি। এভাবে প্রত্যেকটি সাহাবার ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন করা হয়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা রাসূলের হাতে ছিল না, ফলে তিনি

কোনো প্রতিকার করতে পারেননি। সাহাবাদের ওপরে নির্যাতন করা হয়েছে, আর আল্লাহর রাসূল শুধু চোখের পানি ফেলেছেন। কিন্তু আজ তাঁর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা। সাহাবাগণ আল্লাহর ঘর কা'বায় প্রবেশ করছেন, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব আজ নেই যে, তারা বাধার সৃষ্টি করবে।

এই রাষ্ট্র ক্ষমতাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমলে সালেহ্কারীদেরকে দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। মুসলমানরা দাবি করে, তারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্ করছে। অথচ আল্লাহর ওয়াদা হলো, যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেবেন। অথচ বর্তমানে পৃথিবীতে নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে নেই। নেতৃত্ব দিচ্ছে অমুসলিম শক্তি আর মুসলমানরা তাদের পদতলে পিষ্ট হচ্ছে। মুসলমানরা কেন নির্যাতিত হচ্ছে? সর্বত্র কেনো তাদেরই রক্ত ঝরছে? মুসলমান আল্লাহর ইবাদাতও করবে, অপরদিকে অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত হবে, শোষিত হবে-বিষয়টি তো মহান আল্লাহর ঘোষণার বিপরীত। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা কি সত্য নয়? (বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'দাসত্বকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা' ও 'ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা' শিরোণাম এবং তাফসীরে সাঈদী-আমপারার সূরা কুরাইশ-এর তাফসীর পড়ুন।)

রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ঈমান এনে ঈমানের দাবি পূরণ করেছিলেন এবং আমলে সালেহ্ করেছিলেন, তাদের অনুসরণে মুসলমানরা যদি বর্তমানে ঈমানের ওপরে অবিচল থেকে ঈমানের দাবি পূরণ করে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাহলে অবশ্যই তাদের হাতে পৃথিবীর ক্ষমতা আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু পৃথিবীতেই নয়, আখিরাতেও জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً- خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً-

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য থাকবে ফিরদৌসের বাগান। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কখনো সে স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না। (সূরা কাহ্ফ-১০৭-১০৮)

আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস দিয়ে ধন্য করবেন। 'ফিরদৌস' নামক জান্নাতটি গোটা জান্নাতের মধ্যে সবথেকে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। পৃথিবীতে সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যতগুলো ভাষা প্রচলিত রয়েছে, প্রায় সমস্ত ভাষাতেই এই শব্দটি উচ্চারণ ভেদে প্রচলিত রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় 'পরদেষা' প্রাচীন

কালদানীয় ভাষায় 'পরদেসা' প্রাচীন ইরানের যিন্দা ভাষায় 'পিরীদাইজা' হিব্রু ভাষায় 'পারদেস' আর্মেনীয় ভাষায় 'পারদেজ' সুরিয়ানী ভাষায় 'ফারদেসো' গ্রীক ভাষায় 'পারাডাইসোস' ল্যাটিন ভাষায় 'প্যারাডাইস' এবং আরবী ভাষায় 'ফিরদৌস' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জান্নাতুল ফিরদৌস দেবেন তাঁর ঐসব বান্দাহ্কে, যারা পৃথিবীতে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে।

মানুষের জন্য সবথেকে বড় নে'মাত হলো মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ। এই নে'মাত সবার ভাগ্যে জুটবে না। কেবলমাত্র তারাই আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে, পৃথিবীতে যারা ঈমান এনে আমলে সালেহ্ করবে, মহান আল্লাহর গোলামী করবে এবং তাঁর গোলামীর সাথে কোনো ধরনের শির্ক মিশ্রিত করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّ لاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا–

যে ব্যক্তি তার রব-এর সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং দাসত্বের ক্ষেত্রে নিজের রব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'ইবাদাতের পূর্বশর্ত লক্ষ্য স্থির করা' শিরোণাম থেকে 'ইবাদাতের লক্ষ্য হবেন একমাত্র আল্লাহ' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাহ্দের প্রতি রহমত করেন এবং তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। যারা ঈমান এনে আমলে সালেহ্ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকেও সেই দলে শামিল করে নেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوْا الصّلِحتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّلِحِيْنَ–

আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করে থাকবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করবো। (সূরা আনকাবুত-৯)

শুধু তাই নয়, করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحتِ لَهُمْ جَنّتُ النَّعِيْمِ–

যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত। (সূরা লুক্মান-৮)

আমলে সালেহ্কারীদের পরিচয়

তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে যারা আমলে সালেহ্ করে, তাদের গোটা জীবনধারাই পরিবর্তন হয়ে যায়। পৃথিবীতে যে স্রোত বইতে থাকে, সে ব্যক্তি নিজেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে না দিয়ে যে আদর্শের প্রতি সে ঈমান এনেছে, সেই আদর্শের রঙে নিজেকে রঙিন করে এবং তার চারদিকের পরিবেশকে সেই রঙে রঙিন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করতে থাকে। এই লোকগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঈমান ও আমলে সালেহ্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এদের পরিচয় এভাবে দিচ্ছেন–

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا–

এ কথা সুনিশ্চিত যে, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম, মু'মিন, আদেশের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সূরা আহ্যাব-৩৫)

যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তথা ইসলামকে নিজেদের জন্য জীবন-যাপনের পদ্ধতি তথা জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এখন জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাদের মধ্যে কোরআন-হাদীস প্রদত্ত চিন্তা-পদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র নেই। বরং তারা আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআনের পরিভাষায় এরাই হলো মুসলিম। এরা মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল। এই আনুগত্য শুধুমাত্র বাহ্যিক আনুগত্য নয়, না মেনে উপায় নেই তাই মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে বা মন চায় না––তবুও আনুগত্য করছে, বিষয়টি এ রকম নয়। অর্থাৎ ইচ্ছার বিপরীত নয়, বরং আল্লাহর বিধানের প্রতি যে আনুগত্য করছে, তা একান্তভাবেই হৃদয়-মন দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথেই করছে।

আমলে সালেহ্কারীরা ইসলামের নেতৃত্বকেই একমাত্র সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং চিন্তা ও কর্মের যে পথ আল্লাহর কোরআন ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রদর্শন করেছেন, সেটাকেই একমাত্র সোজা-সঠিক ও সহজ-সরল পথ হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং এই পথ অনুসরণের মধ্যেই জীবনের সাফল্য নিহিত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে। যে বিষয় বা জিনিসকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন, আমলে সালেহ্কারী লোকগুলোও সেই বিষয় ও জিনিসকে নিশ্চিত ভ্রান্ত বলেই আখ্যায়িত করে থাকে। আর যা কিছু আল্লাহ এবং রাসূল সত্য বলে ঘোষণা করেছেন, আমলে সালেহ্কারী লোকগুলোর মন-মস্তিষ্কও তাকেই একমাত্র সত্য ও নির্ভুল বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোনো প্রকারের সন্দেহ-সংশয় মিশ্রিত থাকে না।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো বিধানকে তারা পরিবর্তন করে না। নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই বিধানের মধ্যে কোনো ধরনের ফাঁক-ফোকড় অনুসন্ধান করে না। অথবা পৃথিবীতে প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির অনুকূলে আল্লাহর বিধানকে ঢেলে সাজানোর অপচেষ্টাও করে না। মোঘল সম্রাট আকবর আল্লাহর বিধানকে কাটছাঁট করে, এর ভেতরে নতুন কিছু জুড়ে দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার এক নতুন আদর্শ রচনা করে তার নাম দিলো 'দ্বীনে ইলাহী' এবং প্রজাসাধারণকে এই আদর্শ অনুসরণ করার লক্ষ্যে আদেশ জারী করলো। তার সামনে মাথানত করার আদেশ দেয়া হলো। দুনিয়া পূজারী একশ্রেণীর আলিম নামধারী লোকজন সম্রাট আকবরের কুফ্রী পদক্ষেপের স্বপক্ষে ফতোয়াও দিলো। প্রতিবাদ করলেন হযরত শায়খ আহ্মদ সরহিন্দ মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ)। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মানুষের এই মাথা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে নত হতে পারে না।

তাঁর ওপরে রাজরোষ নেমে এলো, তাঁকে অত্যাচারিত হতে হলো। কুফ্রী মতবাদের প্রবর্তক সম্রাট আকবর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো কিন্তু তার প্রবর্তিত প্রথা বহাল থাকলো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলেও এই ঘৃণ্য প্রথার অনুকূলে মতামত দেয়ার জন্য হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ)-এর ওপরে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রইলো। একদিন তাঁকে সম্রাটের দরবারে আসার জন্য আহ্বান জানানো হলো। দরবারের প্রবেশ পথে কৌশল করে স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট তোরণ নির্মাণ করা হলো। এই পথে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তাকেই মাথা নিচু করে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, এই পথে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে সম্রাটের সামনে মাথানত করতেই হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ) সম্রাটের দরবারের প্রবেশ পথের সামনে এসে থেমে গেলেন। তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করলেন, কৌশলের মাধ্যমে তাঁর মাথা নত করানো হবে সম্রাটের সামনে। দরবারে উপবিষ্ট দুনিয়া পূজারী আলিম নামধারী লোকগুলো তাঁকে বললো, 'হুজুর, মাথা নিচু করে সম্রাটকে কুর্ণিশ জানালে এমন তো কোনো ক্ষতি হবে না, আপনি দয়া করে সম্রাটকে কুর্ণিশ করুন।'

আল্লাহর দ্বীনের অকুতোভয় সিপাহ্সালার হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী সিংহের মতো গর্জন করে বললেন, 'তোমাদের মতো ঈমান বিক্রিকারী লোকগুলো এই বাদশাহের সামনে মাথানত করতে পারে, কিন্তু আমার মাথা প্রতিদিন সমস্ত সম্রাটের সম্রাট মহান আল্লাহর সামনে অনেক বার নত হয়। আমি আমার সেই মাথা এই বাদশাহের সামনে নত করতে পারি না।' কথা শেষ করেই তিনি তাঁর বাম পা বাদশার দরবারের প্রবেশ পথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথা বাইরে রেখে সেই তোরণ দিয়ে প্রবেশ করলেন।

এই অপরাধে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হলো। গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁকে বন্দী রাখা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পরে সেখানকার কর্তৃপক্ষ সম্রাটের কাছে এভাবে রিপোর্ট করলো যে, 'কারাগার হলো অপরাধিদের বাসস্থান, কিন্তু আমার এখানে আপনি মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী নামক এমন একজন বন্দীকে প্রেরণ করেছেন যে, এই কারাগারে যত অপরাধী ছিল, তাঁর স্পর্শে সেই অপরাধী লোকগুলো আল্লাহর ওলীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।'

যারা ঈমানদার, আমলে সালেহ্কারী, তারা নিজেদের স্বার্থে অথবা শক্তিমান লোকদের রক্তচক্ষু দেখে আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন সাধন করেন না, কোরআন-হাদীসের বিপরীত কোনো প্রজ্ঞাপন বা অধ্যাদেশের অনুকূলে কথা বলেন না। বরং এর বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করেন। যারা আমলে সালেহ্ করেন, তাদের পবিত্র স্পর্শে অসৎ লোক সৎলোকে পরিণত হয়, অপরাধী অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

আমলে সালেহ্কারী লোকদের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা দেখা যাবে না। তারা মুখে যা বলেন, কার্যত তাই করেন। লোকদেরকে নানা ধরনের উপদেশ দেবেন, অকারণ ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকতে বলবেন, সৎ গুণাবলী অর্জন করতে বলবেন, দ্বীনি আন্দোলনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে বলবেন, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে বলবেন অথচ নিজে তা করবেন না। ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো এই ধরনের স্ববিরোধী চরিত্রের হয় না। তারা সাধারণ মানুষকে যেসব সৎকাজ করতে বলেন, সর্বপ্রথমে তা নিজে করেন। নিজেকে সর্বপ্রথম সৎগুণাবলীতে বিভূষিত করে তারপর অন্যকে সেই গুণ অর্জন করতে বলেন।

আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো নিজের কথা ও কাজে সততার স্বাক্ষর রাখেন। তাদের বিবেক যা সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়, তাই তারা অকপটে প্রকাশ করেন। ধোকা, প্রতারণা ও ছলনা তাদের মধ্যে কাজ করে না। কৌশলে কথা বলে প্রকৃত সত্যকে তারা শ্রোতার কাছ থেকে আড়াল করেন না। যার সাথেই তারা কোনো কাজ করেন, তা বিশ্বস্ততা ও ইনসাফের সাথেই করেন। প্রকৃত সত্য জানার আগ্রহী প্রশ্নকারীর প্রতি তারা বিরক্ত হন না। প্রশ্নের জবাব নিজের প্রতিকূলে গেলেও সত্য জবাব দিয়ে থাকেন, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীবন বিধান হিসাবে যা অবতীর্ণ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল যে সত্য সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন, সেই পথে চলতে গিয়ে এবং আল্লাহর যমীনে

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রাম করতে গিয়ে যত বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেনো, যত ক্ষতিই হোক না কেনো, আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো তা হাসি মুখে মেনে নেয়। আমলে সালেহ্ করতে গিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে তারা দৃঢ়ভাবে এর মোকাবেলা করে। কোনো ধরনের ভয়-ভীতি এদেরকে দুর্বল করতে পারে না। এই পথ থেকে বিরত রাখার জন্য বিরোধী পক্ষ লোভ-লালসা প্রদর্শন করলেও তারা সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এদের সঙ্কল্পে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে না। যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থায় এরা ধৈর্য ধারণ করে মহান আল্লাহর পছন্দনীয় পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায়।

ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলোর ভেতরে এই চিন্তা-চেতনা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সক্রিয় থাকে যে, সে আল্লাহর গোলাম এবং গোলামীর বাইরে তার কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহ তাকে প্রতি মুহূর্তে দেখছেন এবং তার সমস্ত কথাবার্তা শুনছেন। এ কারণে তার দেহ ও আত্মা উভয়ই মহান আল্লাহর সামনে নত থাকে। আল্লাহ তা'য়ালার ভয় বর্মের মতো তার দেহ ও আত্মাকে জড়িয়ে রাখে। পরকালের ভীতি তার ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে। এ জন্য তারা দম্ভ, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরীতামুক্ত থাকেন। আত্মঅহমিকায় মত্ত আল্লাহভীতি শূন্য লোকদের কাছ থেকে যে ধরনের কথা শোনা যায়, তাদের চলাফেরায়, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে যে ভাব প্রকাশ করে এবং তাদের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়, এমন কোনো মনোভাব আমলে সালেহ্কারী লোকদের থেকে প্রকাশ পায় না। প্রচন্ড ক্ষমতাধর রাজাধিরাজের সামনে তার ভৃত্য সব সময় যেমন ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে, আমলে সালেহ্ যারা করে, তারা নামাযে দন্ডায়মান হলে আল্লাহর সামনে তেমনি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে।

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্ করেন, তারা কখনো অহঙ্কার করেন না। অহঙ্কার খুবই খারাপ এবং একটি ঘৃণিত গুণ। কোনো একটি বিশেষ গুণ ও দক্ষতা কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সে বিষয়ে সে স্বাভাবিকভাবেই সচেতন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক এবং সে তার সম্মান ও মর্যাদার বিপরীত কোনো কাজ, আচরণ বা কথা বলবে না, এটাও একান্তই স্বাভাবিক। মূলত বিষয়টি কোনো দোষের নয়-কিন্তু পরিণতিতে সেই গুণ ও দক্ষতাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি যদি নিজেকে অন্যদের তুলনায় যাদের মধ্যে সেই গুণ নেই বা তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে, তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে থাকে, তাহলে তা হবে আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার। সৃষ্টির ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহঙ্কারের বাস্তব প্রকাশ ঘটিয়ে ছিল ইবলিস শয়তান। সে নিজেকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে বলেছিল-

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ-

আমি তার অপেক্ষা উত্তম, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে করেছো মাটি থেকে। (সূরা আ'রাফ-১২)

শয়তানের কথার জবাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে ধমকের সুরে জানিয়ে দিলেন-

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ-

তাহলে তুই এখান থেকে নীচে নেমে যা, এখানে থেকে অহঙ্কার আর গৌরব দেখানোর তোর কোনই অধিকার নেই। বের হয়ে যা, তুই মূলত তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান-লাঞ্ছনাই কামনা করে। (সূরা আ'রাফ-১৩)

সুতরাং অহঙ্কার হলো শয়তানের বৈশিষ্ট্য এবং এর পরিণতি হলো ধ্বংস। এই অহঙ্কারই একশ্রেণীর মানুষকে সত্য গ্রহণে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। নবী-রাসূলগণ যখন সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন, তখন তারা নিজেদের অবস্থান ও পদের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বলেছে, 'আমাদের তুলনায় অর্থ-বিত্ত, সম্মান-মর্যাদায় নিচু স্তরের একজন লোককে নবী হিসাবে মেনে নেবো অর্থাৎ তাকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করবো, এটা তো আমাদের আত্মসম্মানের বিরোধী।' ফলে তারা মহাসত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা সত্য জ্ঞান নিয়ে আগমন করেছেন, তাদের তুলনায় নিজেদের 'সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশী' এই চেতনাই তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূলদেরকে হীন ও নগণ্য ভাবতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

বর্তমানেও প্রায় প্রতিটি দেশেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা বিদ্যমান। দেশ ও সমাজের কর্মকান্ড সম্পর্কিত কোনো সংস্থা বা কমিটি গঠিত হলে সেই সংস্থায় বা কমিটিতে কোনো আলিমকে রাখা হয় না। এসব সংস্থা ও কমিটিতে ঐসব লোকদেরই প্রাধান্য দেখা যায়, যারা দুর্নীতিবাজ, চরিত্রহীন, মদ্যপ, সন্ত্রাসী, কুচক্রী এবং যাদের আপাদ-মস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত। পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয়ে ভীত, সৎ ও মুক্ত মনের উদার মানুষ, যাবতীয় সৎগুণাবলীতে বিভূষিত আলিম সমাজের কোনো স্থান ঐ কমিটি বা সংস্থায় হয় না। এর মূলেও রয়েছে ঐ অহঙ্কারের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা যে, 'আলিমরা নেতৃত্ব দেবে ধর্মীয় স্থান মসজিদ-মাদ্রাসায়, জাগতিক ব্যাপারে অবদান রাখার মতো কোনো যোগ্যতা তাদের নেই, তাদের তুলনায় আমরাই শ্রেষ্ঠ-অতএব আমাদের মতো লোকজনদের পক্ষে তাদের আনুগত্য করা আত্মহত্যা করার শামিল।'

এই অহঙ্কারী লোকগুলো কোনো একটি যুগেও মহান আল্লাহর বিধান মেনে নেয়নি বরং বিরোধিতা করেছে। দেশ ও জাতির সাধারণ লোকগুলো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে

আগ্রহী হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আল্লাহ বিরোধী ঐসব অহঙ্কারী লোকগুলো সাধারণ মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে দেয়নি। প্রত্যেক যুগেই কখনো প্রকাশ্যে, গোপনে, কৌশলে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْانِ–

আমরা কক্ষনো এই কোরআন মানবো না। (সূরা সাবা-৩১)

কিয়ামতের দিন এসব অপরাধী অহঙ্কারী জালিম লোকগুলো আল্লাহর দরবারে অপমানিত ও লাঞ্ছিতাবস্থায় নত মস্তকে দন্ডায়মান থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ–

হায়! যদি তোমরা দেখো এদের তখনকার অবস্থা যখন এই জালিমরা নিজেদের রব-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (সূরা সাবা-৩১)

দেশের প্রজাসাধারাণ ও অধীনস্থ লোকগুলো সেদিন উপভোগ করতে থাকবে তাদের প্রিয় নেতাদের দুর্বিসহ অবস্থা। যাদেরকে তারা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করতো, যার আগমন উপলক্ষ্যে স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে তাকে দেখার জন্য ছুটে যেতো। যার নামে মিছিল করে শ্লোগান দিতো, রাতের ঘুম হারাম করে রাতব্যাপী যার নাম ও ছবিযুক্ত পোষ্টার দেয়ালে দেয়ালে সাজিয়ে দিতো, সেই প্রিয় নেতা-নেত্রীদের ধূলায় ধূসরিত শৃঙ্খলিত লাঞ্ছিতাবস্থা সেদিন তারা অবলোকন করবে। এসব লোকদের সমর্থকরা সেদিন নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যাবতীয় দোষ নেতাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে বলবে–

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ ج الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ–

সে সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে পৃথিবীতে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, 'যদি তোমরা না থাকবে তাহলে আমরা মু'মিন হতাম।' (সূরা সাবা-৩১)

অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তোমরা ক্ষমতায় থেকে আল্লাহর বিধান দেশের বুকে জারী করোনি, মানুষের বানানো বিধান দিয়ে আমাদেরকে পরিচালিত করেছো, নিজেদের বানানো আইন-কানুন আমাদেরকে মানতে বাধ্য করেছো। আল্লাহর বিধান থেকে আমাদেরকে দূরে রাখার জন্য দেশ-বিদেশের নর্তকী আমদানী করে জাঁকালো অনুষ্ঠান করে আমাদেরকে সেদিকে ধাবিত করেছো। নগ্ন ছায়া-ছবি নির্মাণ ও প্রদর্শনের অনুমতি দিয়ে আমাদের চরিত্রের সর্বনাশ করেছো। মদ আর

বেশ্যালয়ের অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে মত্ত করে রেখেছো। অহেতুক খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করে আমাদের মন-মানসিকতাকে সেদিকে তাড়িত করেছো। প্রেমের নামে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশায় তোমরাই উৎসাহিত করেছো। নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশার সমর্থনে 'আনন্দ ধ্বনি' উচ্চারিত করেছো। আমাদেরকে বুঝিয়েছো, আল্লাহর বিধানের কথা যারা বলে তারা মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী। এদেরকে ভোট দেয়া যাবে না, এদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠালে এরা দেশ ও জাতিকে উন্নতির পথে না নিয়ে অবনতির পথে নিয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের কারণেই আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে পারিনি। হতভাগার দল! তোমরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছো। আজ আমাদের সমস্ত বিপদের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করলে আমরা নবী-রাসূল ও আলিম-ওলামাদের কথা অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতাম।

দেশের জনগণ ও দলের কর্মীদের এমন মারমুখী আচরণ দেখে ও কথা শুনে সেদিন আল্লাহ বিরোধী অহঙ্কারী নেতারা বলবে-

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ-

ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে, 'তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে।' (সূরা সাবা-৩২)

হাশরের ময়দানে আল্লাহ বিরোধী নেতানেত্রী, অহঙ্কারী লোকজন, ভ্রষ্ট পথের পথিক অধীনস্থ কর্মীদের ও দেশের জনগণকে বলবে, আমাদের কাছে এমন কোনো শক্তি ছিল না যার সাহায্যে আমরা হাতে গোনা গুটিকয়েক মানুষ তোমাদের মতো কোটি কোটি মানুষকে শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করেছিলাম, আমাদের জারী করা আইন-বিধান মানতে বাধ্য করেছিলাম। যদি তোমরা সত্যই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে আগ্রহী হতে তাহলে আমাদের নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারতে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার দাবিতে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে পারতে। ভোটের মাধ্যমে আমাদেরকে পরাজিত করে আল্লাহর বিধান যারা জারী করার কথা বলতো, তাদেরকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় পাঠাতে পারতে।

কিন্তু তোমরা তাদেরকে ভোট না দিয়ে সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে আমাদেরকেই ভোট দিয়ে বিজয়ী করে ক্ষমতায় পাঠিয়েছো। নগ্ন নাচ-গান দেখার দাবিতে এবং ভাত-কাপড়ের দাবিতে দিনের পর দিন আমাদের বিরুদ্ধে হরতাল-ধর্মঘট করেছো, আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়েছো। কিন্তু আল্লাহর বিধান জারি করার দাবিতে একটি ঘন্টার জন্যও কোনো দিন

হরতাল-ধর্মঘট করোনি। আমাদের শাসনাধীন যাবতীয় বাহিনী ছিল তোমাদেরই আত্মীয়, তারাও তোমাদেরই লোকজন ছিল। আমাদেরকে তোমরাই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠিয়েছিলে। আমাদের শক্তি ও সম্পদের উৎস তো ছিল তোমাদের হাতে। তোমরা ট্যাক্স-ভ্যাট না দিলে আমরা এক কদমও অগ্রসর হতে পারতাম না। তোমরা আমাদেরকে মেনে না নিলে আমাদের মন্ত্রীত্ব থাকতো না। তোমরা আমাদের নামে মিছিল না করলে, শ্লোগান না দিলে দেশব্যাপী আমাদের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়তো না। কেউ আমাদের চিনতো না, সম্মান-মর্যাদাও দিতো না।

তোমরা আমাদের কর্মী ও সৈন্য হিসাবে ময়দানে তৎপরতা প্রদর্শন না করলে কেউ আমাদেরকে চিনতো না, আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতো না, আমাদের পরিচিতি ব্যাপকভাবে তোমরাই বিস্তৃতি করেছো। তোমরা এমন নেতার সন্ধানে ছিলে, তোমাদের এমন দল ও নেতার প্রয়োজন ছিলো, যারা তোমাদের পরকাল সমৃদ্ধ হোক বা না হোক, তোমাদের আখিরাত বরবাদ হোক বা না হোক, সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে, তার পরোয়া না করে যে কোনোভাবেই হোক না কেনো, পৃথিবীতে তোমাদের আরাম-আয়েশ, আনন্দ-ফুর্তি, ভোগ-বিলাস ও অন্যান্য স্বার্থ উদ্ধার করে দেবে। যারা নামায-রোযার কথা বলবে না, ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলবে না, অবৈধ উপার্জনের পথ খুলে দেবে, নর্তকী আমদানী করে আনন্দ দেবে, মদ আমদানী ও উৎপাদনের অনুমতি দিয়ে নেশায় বুঁদ করে রাখবে, খেলা-ধূলায় মত্ত করে রাখবে, এই ধরনের নেতা ও দলের প্রয়োজন ছিল তোমাদের এবং তোমরা এরই সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে। এমন ধরনের শাসকের প্রয়োজন ছিল তোমাদের, যারা নিজেরাও হবে মিথ্যাবাদী, অসৎ, চরিত্রহীন ও অবিশ্বস্ত, ওয়াদা ভঙ্গকারী, স্বার্থপর। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তোমরা সব ধরনের গোনাহ্, অবৈধ কাজ, চরিত্রহীনতা ও লজ্জাহীনতার কাজ করার অবাধ সুযোগ ও স্বাধীনতা লাভ করবে। আমরাই ছিলাম সেই ধরনের শাসক--সেই প্রকৃতির নেতা ও দলের লোক।

বিদআতী বাতিলপন্থী পীর নামক লোকগুলো সেদিন তাদের অনুসারীদেরকে বলবে, তোমরা উপহার-উপঢৌকন, হাদিয়া-তোহ্ফা, নজরানা না দিলে আমরা সম্পদশালী হতাম না। তোমরা আমাদের অনুসরণ না করলে আমার পীরগিরি থাকতো না। তোমরাই আমার নামে 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়েছো। আমি বিদআতী-বাতিলপন্থী ছিলাম, এসব কথা যেসব আলিম-ওলামা বলেছে, তোমরাই তাদের প্রতি মারমুখী আচরণ করেছো। তোমরা তারা–যারা এমন পীরের সন্ধানে ছিলে, যেসব পীর জিহাদ ও শাহাদাতের কথা না বলে সহজে জান্নাতের পথের সন্ধান দেবে এবং তোমাদের যে কোনো ধরনের পাপ কাজ করার ব্যাপক অনুমতি দেবে ও সেই সাথে পীর সাহেব উপহার-উপঢৌকন, হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণ করে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজের মাথায় উঠিয়ে নেবে, আজ এই হাশরের ময়দানে সুপারিশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

তোমরাই তো সেই সব লোক, যারা এমন সব পীর-বুযুর্গদের সন্ধানে থাকতে, যারা আল্লাহর ইসলামকে তোমাদের মর্জ্জি অনুসারে পরিবর্তন--পরিবর্ধন করে সাজিয়ে দেবে। যারা এই ফতোয়া দেবে যে, বাতিল শক্তির সাথে জিহাদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন মসজিদ আর খান্‌কায় বসে আল্লাহ্ নামের তস্‌বীহ্ জপ করলেই আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে। তোমরা তো সেই পীরেরই খোঁজ করেছো, যে পীর আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পরিবর্তিত করে তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা অনুযায়ী একটি নতুন জীবন বিধান তৈরী করে দেবে। যে পীর তোমাদের অবৈধ ভোগ-বিলাসে ও উপার্জনে নিষেধ না করে মৌন সমর্থন জানিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করবে। বলবে নামায-রোযা, জিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। পীর সাহেবকে উপঢৌকন দিলে, পীর সাহেব মারা গেলে তার মাজারে ওরশ করলে, জিন্দা পীরের পা ধোয়া, শরীর ধোয়া পানি, মরা পীরের মাজার ধোয়া পানি পান করলেই যাবতীয় পাপ ধুয়ে মুছে গিয়ে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে। আমরাই ছিলাম সেই পীর-বুযুর্গ নামধারী পথভ্রষ্টকারীর দল।

আল্লাহ বিরোধী নেতানেত্রী, শাসক, অহঙ্কারী ক্ষমতাশালী লোকজন, ভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী ও বিদআত-বাতিলপন্থী নামধারী পীর-বুযুর্গ লোকগুলো সেদিন নিজেদের অনুসারী, দেশের জনগণ, দলীয় কর্মীদের উল্লেখিত কথাগুলো বলে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেবে যে, এখন কেনো তোমরা এ কথা মেনে নিচ্ছো যে, আল্লাহর নবী-রাসূল তোমাদের সামনে যে বিধান পেশ করেছিলেন, তা তোমাদের সামনে স্পষ্ট ছিল, দ্বীনি আন্দোলনের লোকগুলো তোমাদেরকে সেই বিধানের দিকে আহ্বান জানিয়েছিল, তাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠানোর অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু তোমরা নিজেদের হীন প্রবৃত্তির কারণে সেই বিধানের ওপরে চলতে আগ্রহী ছিলে না বলেই আমাদের পেছনে ছুটেছিলে। তোমরা ছিলে নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস অনুদাসমাত্র। তোমরা হালাল-হারামের পরোয়া না করে পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রত্যাশী ছিলে এবং আমাদের পেছনে এসেছিলে তারই সন্ধানে। আমাদের কাছ থেকে সামান্য স্বার্থ লাভের আশাতেই আমাদেরকে ভোট দিয়েছিলে, আমাদের মুরীদ হয়েছিলে। নির্বাচনের সময় আমাদের পেছনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছিলে এই আশায় যে, আমি বিজয়ী হলে তার কয়েকগুণ বেশী তুমি উদ্ধার করে নিতে পারবে। আজ কেনো আমাদেরকে দোষী বানাচ্ছো এবং নিজেদেরকে নিরপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করছো?

আল্লাহর বিধান বিরোধী শাসক, নেতানেত্রী, ক্ষমতাশীল অহঙ্কারী লোকজন ও ভ্রষ্ট পীর-বুযুর্গদের এসব কথার উত্তরে কর্মী, অনুসারী, সাধারণ জনগণ, সমর্থক ও মুরীদরা পুনরায় বলবে-

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا–

সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, 'না, বরং দিনরাতের চক্রান্ত ছিলো যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি। (সূরা সাবা-৩৩)

আমাদের প্রতি দোষারোপ করো না। আমরা ছিলাম সহজ-সরল। মোটা ভাত-কাপড়ের প্রত্যাশী ছিলাম। তোমরাই নানা ধরনের মিথ্যা কথা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনার জাল বিস্তার করে আমাদের ওপরে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলে। রাতদিন তোমরা চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছো, আমরা যেন তোমার সমর্থক থাকি এবং দ্বীনি আন্দোলনের লোকদেরকে সমর্থন না করি। আমাদেরকে তোমাদের প্রতারণার জালে বন্দী রাখার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ তোমরাই গ্রহণ করেছিলে। গোপনে তোমরাই দেশের স্বার্থ ভিনদেশী প্রভুদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার ভিত মজবুত করতে। আমরা এসবের কিছুই জানতে পারতাম না। তোমাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, অর্থ-সম্পদ ছিলো, প্রচার যন্ত্র ছিলো, তোমরা এসব অবৈধভাবে ব্যবহার করে দ্বীনি আন্দোলনের লোকগুলোকে আমাদের সামনে খারাপভাবে উপস্থাপন করেছো। প্রকৃত সত্য আমাদেরকে জানতে দাওনি।

নিজেরা অপরাধ করে তা দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে আমাদের সামনে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছো। আমাদেরকে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের কোনো সুযোগ করে দাওনি। বরং সেই জ্ঞান যেন আমরা অর্জন করতে না পারি, সেই ব্যবস্থাই চূড়ান্ত করেছো। চটকদার কথা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছো এবং আমাদের সামনে তোমরা পৃথিবীর স্বার্থ উপস্থাপন করে আজকের এই আখিরাতের দিন সম্পর্কে গাফেল রেখেছো। রাতদিন প্রতারণা ও কৌশলের মাধ্যমে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছো এবং তোমাদের নিয়োজিত লোকজন আমাদেরকে ছল-চাতুরী ও প্রতারণার মাধ্যমে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আল্লাহর বিধানের বিরোধী বানিয়েছে এবং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমাদের আইন অনুসরণ করতে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছে।

এভাবেই শেষ বিচারের দিনে শাসক ও প্রজাসাধারণ, নেতানেত্রী ও দলীয় কর্মীগণ, বাতিল পীর ও তাদের মুরীদগণ এবং অহঙ্কারী ক্ষমতাশালী লোকজন তাদের অধীনস্থগণ বিতর্কে লিপ্ত হবে। ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদ, হামান, প্রত্যেকটি যুগের ফেরাউন তথা স্বৈরাচারী শাসক, নেতানেত্রী ও অহঙ্কারী ক্ষমতাশালী লোকগুলো কিয়ামতের দিন একা জাহান্নামে যাবে না। এদের ক্ষমতা আর অহঙ্কারের উৎস ছিল অনুসারী, সমর্থকবৃন্দ। যারা তাদেরকে ঐ পর্যায়ে উপনীত করতে দিন রাত সমর্থন যুগিয়েছে। এসব অনুসারী ও সমর্থকদের সাথে নিয়ে তারা সেদিন জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ-وَجَعَلْنَا الاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এই অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিলো তেমনি প্রতিদান পাবে, এ ছাড়া আর কোনো প্রতিদান কি তাদের দেয়া যেতে পারে? (সাবা-৩৩)

লোকেরা অহঙ্কার করে, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, অর্থবল-জনবলের কারণে। আর এই অহঙ্কারই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا-اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِه كٰفِرُوْنَ-وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّ اَوْلاَداً-وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ-

কখনো এমনটি ঘটেনি যে, আমি কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা এ কথা বলেনি যে, তোমরা যে বক্তব্য নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না। তারা সবসময় এ কথাই বলেছে, আমরা তোমাদের থেকে বেশী সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কক্ষনো শাস্তি পাবো না। (সূরা সাবা-৩৪-৩৫)

সত্য অস্বীকারকারী এসব অহঙ্কারী লোক সে যুগেও যে যুক্তি দিতো, বর্তমানকালেও সেই একই অর্থহীন যুক্তি পেশ করে। এরা বলে থাকে যে, দ্বীনি আন্দোলনে নিয়োজিত লোকদের তুলনায় আমরাই স্রষ্টার অধিক প্রিয় এবং পছন্দের লোক। স্রষ্টা আমাদেরকে অধিক পছন্দ করেন বলেই তিনি আমাদেরকে এমন সব নে'মাত দান করেছেন যে, তা থেকে তোমরা বঞ্চিত রয়েছো। সুতরাং তোমরা আমাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। স্রষ্টা যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না-ই হবেন, তাহলে আমাদের এত বিপুল ঐশ্বর্য, সম্মান-মর্যাদা কেনো দান করেছেন? পৃথিবীতে স্রষ্টা আমাদেরকে বিশাল ধন-ঐশ্বর্য দিয়ে ধন্য করেছেন, সেই স্রষ্টাই আবার আমাদেরকে আখিরাতে শাস্তি দেবেন, এ কথা তো মেনে নেয়া যায় না। বরং তোমরাই শাস্তি পাবে, কারণ তোমরা এই পৃথিবীতেও ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছো, আখিরাতেও বঞ্চিত থাকবে।

এই অহঙ্কারী লোকগুলো অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায় দিশা হয়ে থাকে। এদের পরিণতি জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ এরা আত্মম্ভরিতার ফলে আল্লাহর দ্বীন অনুসারে জীবন পরিচালনা করে না এবং তা সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। দ্বীনি আন্দোলনের সকল পর্যায়ের চেষ্টা-সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করে। এদের মনোভাব হলো, আমরা যা বলবো লোকজন তা মানতে বাধ্য। অন্য কোনো স্থান থেকে বিধান আসবে এবং

লোকজন তা অনুসরণ করবে, আর আমাদের আইন অমান্য করবে, এটা হতে দেয়া হবে না। অহঙ্কারী এসব ব্যক্তিদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন।

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের চলাফেরায়, কথাবার্তায় তথা সার্বিক আচরণে অহঙ্কারের সামান্য রেশ মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। এরা সর্বাগ্রে অন্য লোকদেরকে সালাম জানায়, তাদেরকে কেউ সালাম জানালে তারা অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে জবাব দেয়। হাসি মুখে সবার সাথে কথা বলে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাসি মুখে কথা বলাও সদকার সমান সওয়াব।' আচরণ ও ব্যবহারে এরা হয় বিনয়ী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিনয়, নম্রতা ও নিরহঙ্কারতাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের উৎকৃষ্ট গুণ হিসাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে বলেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلى الاَرْضِ هَوْنًا-

রাহমানের বিশেষ বান্দা তারা--যারা যমীনের ওপর খুবই বিনয়-নম্রতা নিরহঙ্কারতা সহকারে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান-৬৩)

অহঙ্কারী লোকগুলো পৃথিবীতে উদ্যত ও গৌরব প্রকাশের ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। এদের আচরণ ও ব্যবহার হয় দর্পিত। দর্পভরে এরা যমীনে পা ফেলে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَتَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَا الاَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُوْلاً-

তুমি যমীনের ওপর দর্পভরে চলাফেরা করো না। কেননা, তুমি পৃথিবীকে কখনোই চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে না, পারবে না পর্বতের ন্যায় উচ্চ হতে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৭)

অহঙ্কারের পদভারে যমীনে চলাফেরা করো না। তুমি পৃথিবীকে ধ্বসিয়েও দিতে পারবে না এবং পর্বতের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারীদের চলাফেরার মধ্যে এমনভাবই প্রকাশ পাবে যে, ইসলামের দুশমনরা দেখলে যেন অনুভব করে মুসলমানরা বীরের জাতি। বাতিলের সাথে তারা আপোষ করতে জানে না এবং অশুভ শক্তি এদের কাছে পরাভূত হতে বাধ্য। দুর্বল, কুণ্ঠিত, পলায়নপর ও পরাজিত ভঙ্গি এবং কাপুরুষতা প্রকাশ পায় এমন ভঙ্গিতে চলাফেরা করা যাবে না। এভাবে চলাফেরা করলে শয়তান ও তার অনুচরেরা আল্লাহর বিধানের ধারক ও বাহক মুসলিম মিল্লাতকে একান্তই হীনবল ভাববে এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে। দুর্বল ভঙ্গিতে একজন যুবককে চলতে দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা ধমক দিয়ে বলিষ্ঠ ও বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে চলার আদেশ দিয়েছিলেন।

অহঙ্কার হলো ধ্বংস আর লাঞ্ছনার পথ। সামান্য একটা পদ লাভ করে, একটু ক্ষমতা হাতে পেয়ে অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটাতে থাকে এক শ্রেণীর লোকজন। সালাম দিলে জবাব দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে, চেহারায় একরাশ গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে রাখে, সাধারণ লোকজন দেখলেও ভয় পায়। চেহারায় এমন ভাব পরিস্ফুটিত করে যে, অধীনস্থ লোকগুলো তার কাছে কোনো আবেদন পেশ করতেই দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে। চেহারায় হাসির পরিবর্তে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। কণ্ঠের মোলায়েম ভাব দূরীভূত হয়ে কর্কশতা স্থান লাভ করে। অন্যের তুলনায় নিজেকে এতটা বড় ভাবে যে, কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও এদের অহংবোধে বাধে। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে—

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ-وَلاَتَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا-اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

তুমি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে লোকদের জন্য নিজের মুখমন্ডল ঘুরিয়ে নিও না। যমীনের ওপর দর্পের সাথে চলাফেরা করো না। কারণ আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিক কোনো লোককেই পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না। (সূরা লুকমান-১৮)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে শুধুমাত্র তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলতেন না। গোটা শরীরটাকেই সেই লোকটির দিকে ঘুরিয়ে তারপর কথা বলতেন। শুধুমাত্র ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বললে, লোকটি ধারণা করতে পারে যে, তিনি তাকে অবজ্ঞা করছেন। এভাবেই আল্লাহর রাসূল এবং পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান মানব ও দুনিয়া আখিরাতে সবথেকে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী মানুষটি অন্য মানুষের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। প্রাণের দুশমনকেও কক্ষনো তিনি অবজ্ঞা করেননি। তাঁর চরিত্রে এতটাই নম্রতা ও বিনয় ছিল যে, তিনি যখন গোটা মুসলিম জাহানের শাসকের পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময় একদিন তিনি মসজিদে নববী থেকে বের হতেই এক আরব বেদুঈন তাঁর পবিত্র জামা মোবারক ধরে বললো, 'আমার বোঝা উঠিয়ে না দিয়ে আপনি কোথাও যেতে পারবেন না।' লোকটির কথা শুনে আল্লাহর রাসূলের মুখে চাঁদের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি লোকটির মাথায় বোঝা উঠিয়ে দিয়ে তারপর নিজের কাজে গেলেন।

বর্তমানে ঈমানের দাবিদার একশ্রেণীর লোক সামান্য একটি গাড়ির মালিক হয়ে নিজের কাজের লোকটি বা গাড়ির চালকের সাথে এক টেবিলে খেতে দ্বিধাবোধ করে, আত্মসম্মানে বাধে। নিজেকে এতটাই বড় মনে করে যে, নিজের গাড়ির চালক বেচারীর শারীরিক অবস্থা বা সংসারের কোনো খোঁজ-খবর ভুলেও জানতে চায় না। ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ যারা করেন, তারা এই ধরনের ঠুনকো আত্মসম্মানবোধে তাড়িত হন না। সম্মান ও মর্যাদা

তো কেবলমাত্র তাদের জন্যই মহান আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন, যারা তাঁকেই বেশী ভয় করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ-

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে তেমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যতবেশী আল্লাহকে ভয় করে চলে, তার সম্মান ও মর্যাদা ততবেশী।

আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো অহঙ্কার মুক্ত হয়। তারা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ধন-সম্পদ লাভ করলেও অহঙ্কার করে না। আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে তারা যাকাত আদায় করে এবং গোপনে-প্রকাশ্যে দান করে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা উন্মুক্ত হৃদয়ে অর্থ ব্যয় করে। নিজে অভাবে থাকলেও সামর্থ অনুযায়ী অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। কোনো ইয়াতিম, বিপদাপন্ন লোক, দুর্বল, গরীব-অভাবী ও রুগ্ন লোক তাদের কাছ থেকে সাহায্য বঞ্চিত থাকে না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। কাউকে সাহায্য করতে না পারলেও বিনয়ের সাথে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্য চেয়ে কোনো অভাবী শূন্য হাতে ফিরে যেতো না। তৎক্ষণাত কিছু দিতে না পারলে তিনি বিনয়ের সাথে বলতেন, 'পরে এসো তখন দেবো। অথবা বলতেন, আল্লাহ্ আমাকে দিক, আমিও তোমাকে দেবো।'

বর্তমানে কোনো অভাবী লোক একবারের বেশী দুইবার আবেদন জানালেই একশ্রেণীর লোকের মাথা গরম হয়ে যায়। ধমকের সুরে কর্কশ কণ্ঠে বলে, 'বললাম তো, মাফ করো।' ধমক শুনে বেচারী সাহায্য প্রার্থীর কলিজা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। যারা আমলে সালেহ্ করে, তারা অভাবী লোকদেরকে কিছু দিতে না পারলেও তাদের সাথে নম্র আচরণ করে।

আল্লাহর এসব মাহ্বুব বান্দাহ্, ফরজ রোযা তো আদায় করেই সেই সাথে তারা সপ্তাহে-মাসের দুইচার দিন রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে। রোযার মাধ্যমে তারা অধিক তাকওয়া অর্জন করে থাকে। রোযা মানুষের ভেতর থেকে লোভ-লালসা, অবৈধ কামনা, অশুভ ইচ্ছা, ক্রোধ ইত্যাদি খারাপ গুণ দূর করে দেয়। এ জন্য শরীর সুস্থ থাকলে প্রতি মাসেই দুই চারটি রোযা রাখা উচিত। রোযা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো অশালীন পোষাক পরিধান করে না। এমন আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করা নির্লজ্জতার নামান্তর, যা পরিধান করলে দেহের গোপন স্থান প্রস্ফুটিত হয়। আবার এমন সুক্ষ্ম-পাতলা পোষাক পরিধান করাও বেহায়াপনার নামান্তর, যা পরিধান করলে দেহের কান্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বা শরীর দেখা যায়। যারা আমলে সালেহ্ করতে অভ্যস্থ, তারা নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও ব্যক্তিত্বহীনতা থেকে দূরে

থাকেন। এরা নিজেরা যেমন অশ্লীল-অশালীন কথা বলেন না, তেমনি তারা এসব কথা শোনেনও না। অশ্লীলতা যে কোনো পর্যায়েই ঘৃণ্য ও পরিহার্য। অশ্লীলতা ও অশালীনতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যৌন লালসা-পঙ্কিলতার সাথে। মুখে অশ্লীল কথাবার্তা তখনই উচ্চারতি হয়, যখন সেই ব্যক্তির মন-মানসিকতা আল্লাহভীতি শূন্য থাকে এবং মনের গোপন কুঠুরিতে যৌন ভাবধারা বিরাজ করে। যাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহর ভয় নেই, পরকালের কোনো ভয় নেই, নৈতিক পবিত্রতার কোনো চেতনা নেই, সামাজিক অতি সাধারণ লজ্জা-শরমের শেষ রেশটুকুও বিদায় গ্রহণ করেছে, তাদের মুখেই লাগামহীনভাবে অশালীন আর অশ্লীল কথার উচ্চারণ বেশী দেখা যায়।

অশ্লীলতা এবং নির্লজ্জতা হলো শয়তানের ভূষণ আর লজ্জা হলো ঈমানদারদের ভূষণ। লজ্জা-শরম ও শালীনতা, ভদ্র আচরণ ও কথাবার্তা উত্তম চরিত্রের অংশ এবং এটা ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে। অশ্লীল কথাবার্তা বলা মূর্খতা ও চরিত্রহীনতার লক্ষণ। এসব বর্বর যুগের স্মারক এবং ভদ্রত্বা ও সভ্যতা-শালীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একজন সাহাবী নিজের ক্রীতদাসকে তার মায়ের কথা উল্লেখ করে গালি দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল তা শুনে বললেন, 'তোমার মুখ থেকে এখন পর্যন্ত জাহিলিয়াতের গন্ধ বের হচ্ছে।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা যে জিনিসে শামিল হবে, সে জিনিসকেই কুৎসিত করে দেবে। (তিরমিযী)

আমলে সালেহ্‌কারী লোকগুলোর অভ্যাস হলো, জীবনের সকল কাজকর্মে এদের মুখ থেকে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ সবসময় এরা মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। আমলে সালেহ্ যারা করে তাদের মন-মানসিকতায় মহান আল্লাহর চিন্তা এমনভাবে পরিপূর্ণরূপে ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে বসে যে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের জিহ্বা আল্লাহর নাম উচ্চারণে ব্যস্ত থাকে। এরা নিজের মনকে মুহূর্তের জন্যই অবসর দেয় না, যখন নীরব থাকে বা নীরবে পথ চলতে থাকে, তখনও মনে মনে তারা ছুব্‌হানাল্লাহি, আলহাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার জপতে থাকে। মানুষের মন-মানসিকতায় মহান আল্লাহর চিন্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা কারো মধ্যেই সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীর তলদেশেও মহান আল্লাহর চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই সেই মানুষের অবস্থা এমন হয় যে, সে যে কোনো কথা বললেই তার ভেতরে মহান আল্লাহর নাম জড়িত থাকে। কোনো কাজ শুরু করলেও আল্লাহর নামেই শুরু করে এবং কাজের মধ্যে বারবার আল্লাহর সাহায্য চায়, কাজ শেষ করেও আল্লাহরই প্রশংসা করে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা আমলে সালেহ্ করে, তাদেরই অবস্থা এমন হয় এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অভ্যাসে পরিণত হয়। এসব মানুষ মহান আল্লাহর প্রত্যেক নে'মাত লাভ করার সাথে সাথে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যে কোনো

বিপদ-মুসিবত এলেই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয়। যে কোনো অবস্থায় সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দিকেই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। অবৈধ কেনো কিছুর সুযোগ এলেই আল্লাহকে ভয় করে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে বা ভুল করলে সাথে সাথে মহান মালিকের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। প্রত্যেক পদে আল্লাহকে স্মরণ করাই হলো ঈমানদারের প্রাণ আর আমলে সালেহ্‌র মাধ্যমেই এই অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

ইসলামের অন্য যে কোনো বিধান পালন করার জন্য সময় ও সুযোগের প্রয়োজন হয়। অন্য কোনো ইবাদাত করার জন্য কোনো না কোনো সময় নির্ধারিত রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেই নামায কাযা হয়ে যাবে। ফরজ রোযার রমজান মাস নির্ধারিত রয়েছে। নামায-রোযা নামক ইবাদাতের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং এসব ইবাদাত করার সাথে সাথে মানুষ এসব ইবাদাত থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহকে স্মরণ করা নামক ইবাদাত করার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। এই ইবাদাত যারা করেন, তাদের জীবনে আমলে সালেহ্ সবসময় জারী থাকে এবং একমাত্র এই ইবাদাতই মানুষকে মহান আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে চিরস্থায়ীভাবে বেঁধে রাখে।

ঈমানের দাবিদার এমন অনেক লোক রয়েছে, তারা যেন একান্ত বাধ্য হয়ে নামায-রোযা আদায় করে, দ্বীনি আন্দোলনে বাধ্য হয়ে সময় দেয়। অর্থাৎ কোনো একটি ইবাদাত করেও তার স্বাদ অনুভব করতে পারে না এবং মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তির মন সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং তার কণ্ঠ সর্বক্ষণ মহান আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে, এ অবস্থায় সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাতের স্বাদ অনুভব করতে পারবে এবং দ্বীনি কাজে সময় ও অর্থ ব্যয় করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করবে। ইসলামের যাবতীয় কাজে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর স্মরণই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

আল্লাহ তা'য়ালা মানব দেহের অঙ্গ জিহ্বার মধ্যে কোনো অস্থি স্থাপন করেননি। এই জিহ্বা দিয়ে মানুষ শ্রদ্ধা জড়িত ভাষায় মমতাভরে, প্রেমাসিক্ত কণ্ঠে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, আল্লাহর সৃষ্টির সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলবে, এ জন্য জিহ্বার মধ্যে অস্থি দিয়ে তা শক্ত করা হয়নি। এই জিহ্বা একদিন মাটির কবরে মাটির সাথেই মিশে যাবে। সুতরাং যতক্ষণ এই জিহ্বা সচল ও সজীব রয়েছে, ততক্ষণ তা দিয়ে সর্বাধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর নামই উচ্চারণ করতে হবে। যারা আমলে সালেহ্ করতে অভ্যস্থ, মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। মুসনাদে আহ্মাদ-এ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عن معاذ بن انس الجهنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله اى المجاهدين اعظم اجرا يا رسول الله ؟

قال اكثرهم لله تعالى ذكرا-قال اى الصائمين اكثر اجرا ؟ قال اكثر هم لله عز وجل ذكرا-ثم ذكرا الصلوة والزكوة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرهم لله ذكرا-

হযরত মু'আয ইবনে আনাস জুহানী রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা জিহাদ করে তাদের মধ্যে সবথেকে বড় বিনিময় কে লাভ করবে? জবাবে রাসূল বললেন, 'যে তাদের মধ্যে সবথেকে অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করবে।' তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, 'রোযাদারদের মধ্যে সবথেকে অধিক বিনিময় কে লাভ করবে?' আল্লাহর রাসূল জানালেন, 'ঐ ব্যক্তি, যে রোযা অবস্থায় আল্লাহকে বেশী স্মরণ করবে।' এভাবে তিনি নামায, যাকাত, হজ্জ ও দান-সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, জবাবে আল্লাহর রাসূল ঐ একই জবাব দিয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করবে।'

পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যাই অধিক, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনে এবং তাদের আদেশ-নিষেধের কথা শোনে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে তা পাঠ করে। কিন্তু তা পালন করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায় না। কিন্তু যারা আমলে সালেহ্ করতে অভ্যস্থ, তারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো আদেশ-নিষেধের কথা শোনার সাথে সাথে প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তা পালন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। 'এই কাজ করতে হবে এর পেছনে যুক্তি কি' এ ধরনের কোনো কথা তারা বলে না। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ-

আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহঙ্কার করে না। (সূরা সাজ্দাহ্-১৫)

'কথাটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বলেছেন' এতটুকুই তাদের জন্য যথেষ্ট, কোনো প্রমাণ তারা অনুসন্ধান করে না। ঈমানের সাথে যারা আমলে সালেহ্ করে তারা ভোগ-বিলাসে অভ্যস্থ মানুষগুলোর মতো আরামের শয্যায় ঘুমিয়ে গোটা রাত অতিবাহিত করে না। রাতের

একাংশ তারা ঘুম নামক নে'মাত উপভোগ করে এবং এই নে'মাত যিনি অনুগ্রহ করে দিয়েছেন, সেই নে'মাতদাতা মহান আল্লাহকে সিজ্দা দিয়ে রাতের আরেক অংশ অতিবাহিত করে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তারা মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানায়। মহান আল্লাহর রহমত লাভের ব্যাপারে তারা নিরাশ হয় না। সম্পদের পরিমাণ বেশী হোক বা কম হোক, আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করে। মহান আল্লাহ তাঁর এসব গোলামদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا-وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে পৃথক, নিজেদের রব-কে ডাকে আশঙ্কা ও আকাংখা সহকারে এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সাজ্দাহ-১৬)

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এসব মাহবুব বান্দাদের জন্য এমন ধরনের মূল্যবান নে'মাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যে নে'মাত সম্পর্কে মানুষের মন কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاأُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ-جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُوْنَ

তারপর কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার হিসাবে তাদের চোখের শীতলতার কি সর াম লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সূরা সাজ্দাহ্-১৭)

ঈমানের সাথে যারা আমলে সালেহ্ করবে, তাদের পুরস্কারের ব্যাপারে একটি হাদীস প্রায় প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হাদীসে কুদসী, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

قال الله تعلى اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رآت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছি যা কখনো কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষ কোনোদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।

মহান আল্লাহর যেসব বান্দারা ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ করে, তাদের মন-মানসিকতা থাকে হিংসা মুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর কোনো বান্দাকে বিশেষ কোনো নে'মাত, গুণ-বৈশিষ্ট্য, ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য-চেহারা, নেতৃত্ব-জনপ্রিয়তা দান করেন, তা দেখে আরেক ব্যক্তির মনে যদি অনুরূপ কিছু লাভের বাসনা জাগে, এটা কোনো দোষের

বিষয় নয়। বরং এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা উচিত। কিন্তু কারো মধ্যে যদি এই মনোভাব সৃষ্টি হয় যে, আমার ঐসব গুণ-বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, ধন-সম্পদ নেই, স্বাস্থ্য-চেহারা, নেতৃত্ব-জনপ্রিয়তা কিছুই নেই। অতএব তা ঐ ব্যক্তির মধ্যে কেনো থাকবে। সুতরাং তার ঐসব ধ্বংস হয়ে যাক বা তার ধন-সম্পদ আমার হাতে এসে যাক। এরই নাম হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা–এটা বড় মারাত্মক ব্যধি।

এই ব্যধিতে আক্রান্ত মানুষগুলো হীনতার নিকৃষ্ট স্তরে উপনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে হিংসা এক নিকৃষ্ট ধরনের চরিত্রহীনতা এবং এই হিংসা যে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হয় সে ব্যক্তির হৃদয় জগৎ কলুষিত হতে বাধ্য। হিংসা ব্যক্তিকে হীন ও নীচ আচার-আচরণ করতে বাধ্য করে। এই হিংসার অনলে কত অসংখ্য ব্যক্তি, পরিবার যে জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। এ জন্য মানবতার মহান শিক্ষক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

ايَّا كُمْ وَالْحَسَدَ فَانَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ– (ابوداؤد-كتاب الادب)

তোমরা নিজেদেরকে হিংসা থেকে হেফাজত করো, কারণ হিংসা সমস্ত সৎকাজ ও কল্যাণকর কাজকে ঠিক ঐভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন কাষ্ঠ খন্ডকে ভষ্ম করে দেয়। (আবু দাউদ)

ঈমানের সাথে যারা আমলে সালেহ্ করে, তারা কারো প্রতি হিংসা করে না। সবার হক যথাযথভাবে আদায় করে। আল্লাহর হক, নিজের হক, সন্তান-সন্ততির, নিকটাত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক, পথিকের হক, অভাবীদের হক, ভ্রমণ সাথীর হক, মাতা-পিতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক তথা মহান আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির হক যথাযথভাবে আদায় করে। এরা অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে না। মিথ্যা কথা বলে না, বিশ্বাসঘাতকা করে না, কারো সাথে কোনো ব্যাপারে ওয়াদা করলে তা পালন করে–ওয়াদা ভঙ্গ করে না। একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে না অর্থাৎ চোগলখুরী করে না। অহেতুক কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে না। অন্যের গীবত করেও না এবং শোনেও না। অন্যের গীবত করাকে মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে না। অন্যের সম্মান ও মর্যাদাহানীকর কোনো কথাও তারা বলে না। কারো নাম বিকৃত করে এবং দেহের ত্রুটি উল্লেখ করে ডাকে না। অহেতুক কাউকে অভিশাপ দেয় না। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে নীতিমালা পেশ করেছেন, আমলে সালেহ্কারীগণ, সেই নীতিমালাই অনুসরণ করে চলে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ-وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ-بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ-وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ-اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا-اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-وَاتَّقُوا اللّٰهَ-اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষের বিদ্রূপ করবে-হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো নারী অন্যান্য নারীদের ঠাট্টা করবে-হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিসম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদের খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গোনাহের অন্তর্ভূক্ত। তোমরা দোষ অনুসন্ধান করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (হুজুরাত-১১-১২)

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মায়ায ইবনে মালিক আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিজের গোনাহের স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাঁর শাস্তি বিধান করেন। এই ঘটনার পরে আল্লাহর রাসূল দুইজন লোকসহ পথ চলছিলেন। লোক দুইজন একজন আরেকজনকে হযরত মায়ায ইবনে মালিকের শাস্তি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিল, 'ঐ লোকটির অবস্থা অনুমান করতে পারো, আল্লাহ তা'য়ালা তার গুনাহ্ গোপন করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর নফস্ তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি। ফলে তাঁকে কুকুরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করতে হলো।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির কথা নীরবে শুনে গেলেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পরে পথে একটি মৃত গাধার পচাগলা লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। রাসূল সেখানে দাঁড়িয়ে ঐ লোক দুইজনকে বললেন, 'এসো এসো, এই গাধাটির লাশ ভক্ষণ করো।' লোক দুইজন অবাক বিস্ময়ে রাসূলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই মৃত পচাগলা গাধার লাশ আবার কেউ ভক্ষণ করে নাকি?'

জবাবে রাসূল বললেন, 'এই মাত্র তোমরা দুইজন তোমাদের ভাইয়ের মান-সম্মানের ওপর যে কলঙ্ক লেপন করছিলে, তা এই গাধাটির লাশ ভক্ষণ করার তুলনায় অনেক বেশী খারাপ।' সুতরাং গীবত হলো নিকৃষ্ট স্তরের গোনাহ্, এই গোনাহ্ থেকে বিরত থাকাই হলো আমলে সালেহ্। তবে কতক ক্ষেত্রে সত্য প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে না। হযরত ফাতিমা বিনতে কাইস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামক একজন নারীকে একই সময়ে হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আবুল জাহাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মেয়ে পক্ষের লোকজন আল্লাহর রাসূলের কাছে এ ঘটনা জানিয়ে পাত্র দুইজনের সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলেন। আল্লাহর রাসূল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, 'মুয়াবিয়া হলো দরিদ্র ব্যক্তি আর আবু জাহাম স্ত্রীদেরকে প্রহার করায় অভ্যস্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

একটি বিয়ের ব্যাপার এবং যা সারা জীবনের প্রশ্ন। বিষয়টির সাথে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের সমস্যা জড়িত ছিল এবং তার পক্ষের লোকজন এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করতে এসেছিলো। এই অবস্থায় আল্লাহর রাসূল মেয়ে পক্ষকে পাত্রদ্বয়ের চরিত্রগত দুর্বলতার কথা, যা তাঁর জানা ছিল-তা পাত্রীপক্ষকে জানিয়ে দেয়া কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত হিন্দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর স্বামী হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের কাছে বলেছিলেন, 'আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রয়োজন অনুপাতে খরচ-পত্র দেয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

স্বামী বা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর অভিযোগ করা যদিও গীবত পর্যায়ের ব্যাপার কিন্তু তবুও আল্লাহর রাসূল উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হিন্দার কথার প্রতিবাদ করেননি। কারণ মজলুম জুলুমের বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তির কাছে ফরিয়াদ অথবা অভিযোগ পেশ করার অধিকার রাখে, যে ব্যক্তি সেই জুলুম দূর করার ক্ষমতা রাখে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের প্রতি নির্ভর করে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ গীবতের যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন তাহলো, 'গীবত শুধুমাত্র তখনই জায়েয হতে পারে, যখন ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ উদ্দেশ্যে তা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে এবং সেই প্রয়োজন এটা ব্যতীত

পূরণ হওয়ার অন্য কোনো পথ উন্মুক্ত থাকবে না।' এই নীতিমালার ওপর নির্ভর করে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনবিদগণ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কতক ধরনের গীবত জায়েয বলে রায় দিয়েছেন।

অত্যাচারী, জালিম, স্বৈরাচারী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে মজলুম বা ভুক্তভোগী লোকগণ এমন ব্যক্তি বা সংস্থার সামনে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে, যার ফলে ঐসব ঘৃণিত কাজ বন্ধ হতে পারে বা ওসব কর্মকান্ড বন্ধের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী, গোষ্ঠী বা দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়–একান্তই সংশোধনের উদ্দেশ্যে দরদভরা মন নিয়ে তাদের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ এমন কারো সামনে করা যেতে পারে এবং যিনি ঐ ব্যক্তি বা শ্রেণীকে সংশোধন করতে পারেন, যিনি তাদের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী।

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ বা মুফতীর কাছ থেকে কোনো ফতোয়া বা বিধান জানার জন্য প্রকৃত-সত্য ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে বা কোনো লোকের অথবা গোষ্ঠীর খারাপ গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেশের শাসক, নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি, নেতৃত্ব লাভ করতে যাচ্ছে এমন ব্যক্তি, জনগণ কাউকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে যাচ্ছে এমন ব্যক্তি, জনগণের নেতৃত্ব দানকারী কোনো দল, অর্থাৎ জনস্বার্থের সাথে জড়িত এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে জনগণকে ভেজাল থেকে সতর্ক করা একান্তই কর্তব্য। সাক্ষ্যদাতার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিতে হবে। নতুবা রাষ্ট্রের বিচারপতিগণ বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং বিচারপ্রার্থী ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। গ্রন্থকারদের ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করতে হবে, নতুবা জনগণ ভুল বিষয় পাঠ করে তা থেকে ভুল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবে। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর দোষ-ত্রুটি, কারো সাথে কেউ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়ে উভয়ের দোষ-ত্রুটি, কারো বাড়ির কাছে কেউ বাড়ি করতে আগ্রহী হলে যে ব্যক্তি প্রতিবেশী হবে তার দোষ-ত্রুটি, কারো কাছে কেউ কোনো মূল্যবান জিনিস বা নগদ অর্থ আমানত রাখার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে সেই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ এমন সবক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করলে তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, কেননা এর সাথে জনস্বার্থ জড়িত, অথবা এ ভূমিকা পালন না করলে কোনো মানুষ অজ্ঞতার কারণে প্রতারিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অজ্ঞতা দূর করে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়া একান্তই কর্তব্য।

যেসব ব্যক্তি, সংস্থা, দল, প্রতিষ্ঠান, শ্রেণী বা গোষ্ঠী দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর, সমাজ, দেশ ও জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, অন্যায়-পাপের দিকে আহ্বান জানায়, নগ্নতা-অশ্লীলতা, অশালীনতার দিকে উস্কানী দিতে থাকে, সীমালংঘনমূলক

কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে তৎপরতা চালায়, ধর্মের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বিদআত চালু করে, এসব শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা এবং তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা একান্তই কর্তব্য।

একজন অসৎ লোক সমাজের চেয়ারম্যান, কমিশনার, এমপি, মসজিদের ইমাম, শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষক হতে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি ঐ পদে নির্বাচিত হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এসব ক্ষেত্রে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিতে হবে। একই নামের কয়েক ব্যক্তিকে নির্দিষ্টভাবে চেনার জন্য তাদের নামের পূর্বে উত্তম কোনো উপনাম জুড়ে দিয়ে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ধরনের নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও কারো গীবত করা তথা তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং তা আমলে সালেহ্‌র বিপরীত কাজ। আমলে সালেহ্ যারা করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ-لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ-ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ-ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগ-বাগিচার মধ্যে অবস্থান করবে। তারা যা-ই চাইবে তা-ই তাদের রব-এর কাছ থেকে পাবে। এটাই বড় মেহেরবানী। এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই সব বান্দাদের দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। (সূরা শূরা-২২-২৩)

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারা কোনো ধরনের সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না, কেবলমাত্র তারা ব্যতীত-যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে। এই কাজ যারা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলেন-

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ- ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ-

যারা ঈমান এনেছিলো এবং সৎকাজ করেছিলো তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, এটা সুস্পষ্ট সাফল্য। (সূরা জাসিয়া-৩০)

'হক'–এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে এই 'হক' শব্দটির দুটো অর্থ করা হয়েছে এবং আল্লাহর কোরআনেও দুটো অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির প্রথম অর্থ হলো, 'প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ বিষয়, সত্য-সঠিক-নির্ভুল, অভ্রান্ত, ইনসাফ, ন্যায়' ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'অধিকার বা পাওনা।' সূরা আসরে যে 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার ভেতর এই দুটো অর্থই নিহিত রয়েছে। এই শব্দটি মিথ্যার বা বাতিলের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। ঈমানদারগণ যে সমাজ, দল বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে, সেই সমাজে, দলে বা রাষ্ট্রে কোনক্রমেই যেন সত্যের পরিপন্থী, ইনসাফের বিপরীত, মিথ্যা বা বাতিলের অনুকূলে কোন ধরনের কাজ যেন না হতে পারে, সেদিকে সবাই সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখবে। ঈমানদারদের জীবন হবে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন, এই রঙের বিপরীত কোন ধরনের রঙকে ঈমানদাররা বরদাস্ত করতে পারে না। এখানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন বাতিল মতবাদ–মতাদর্শ দেখলে বা হকের বিপরীত কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখলেই ঈমানদাররা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে।

সত্যের বিপরীতে মিথ্যার অনুকূলে কোন শক্তি জেগে ওঠা মাত্র ঈমানদাররা তার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য বুহ্য রচনা করে মিথ্যা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। যে শক্তি ঈমানের বিপরীত কোন কিছুর আমদানী করার চেষ্টা করবে, সে শক্তির উদ্ধত মস্তকে পদাঘাত করে তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে দেবে। ঈমান তথা 'হক'–এর বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের জাগরণকে তারা স্তব্ধ করে দেবে। মানুষের ওপরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার যেমন 'হক' রয়েছে, তেমনি আল্লাহ তা'য়ালার ওপরেও মানুষের 'হক' রয়েছে। মানুষের ওপরে মহান আল্লাহর 'হক' মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব, গোলামী, বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা করবে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মানুষের যে 'হক' রয়েছে, তা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে নিজেই ধার্য করে নিয়েছেন। এই হক মানুষ বা অন্য কোনো শক্তি ধার্য করেনি বা করার ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবানী করে স্বয়ং যদি তা নিজের ওপর ধার্য করে না নিতেন, তাহলে তা আল্লাহর ওপর আরোপ বা ধার্য করার কোনো ক্ষমতাই মানুষের ছিল না।

আল্লাহর ওপর মানুষের 'হক' হলো তিনি মানুষকে প্রতিপালন করবেন, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। মানুষের জীবন ধারণ, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদির জন্য মানুষের যে ক্ষমতা, যোগ্যতা ও উপায়-উপকরণ প্রয়োজন, তা মহান আল্লাহ সরবরাহ করবেন, এটা হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের হক বা অধিকার এবং এই অধিকার মানুষ না চাইতেই মহান আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ নির্ভুল পথ রচনা করতে সক্ষম নয়, এ জন্য আল্লাহর প্রতি মানুষের হক হলো, তিনি মানুষকে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করবেন। মানুষের এই অধিকারও

মানুষ না চাইতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের মাধ্যমে তা পূরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। (সূরা নাহ্‌ল-৯)

(বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা, সূরা আল আ'লা-এর ৩ নং আয়াত ও সূরা আল লাইল-এর ১২ নং আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

মানুষ তার কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে মহান আল্লাহর কাছ থেকে, এটা আল্লাহর প্রতি মানুষের হক। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত মেহেরবানী করে আদালতে আখিরাতে এই 'হক'-ও আদায় করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যাবতীয় 'হক' মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে মানুষের প্রতি তাঁর 'হক'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ-قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط
اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْ اِلَّا اَنْ يُّهْدٰى-

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহাসত্যের (হক-এর) দিকে পথ দেখায়? বলো, কেবল আল্লাহই এমন, যিনি মহান সত্যের (হক-এর) দিকে পথ দেখান। তাহলে এখন বলো, মহান সত্যের (হক-এর) দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে, যে নিজে কোনো পথ দেখাতে পারে না, বরং তাকেই পথ দেখাতে হয়। (সূরা ইউনুস-৩৫)

হক-এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তারিতভাবে বুঝে নেয়া একান্তই আবশ্যক। মানুষের প্রয়োজন অসীম। শুধুমাত্র তার জীবন ধারনের উপায়-উপকরণ লাভ করার মধ্যে দিয়েই প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। তার সবথেকে বড় প্রয়োজন হলো একটি নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। মানুষ তার ব্যক্তি স্বত্তার, শক্তি-ক্ষমতা, সামর্থ-যোগ্যতা, পৃথিবীর যেসব বস্তু নিচয়ের প্রতি সে কর্তৃত্বশীল রয়েছে তার সাথে, পৃথিবীতে যে অগণিত মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের সাথে, অর্থাৎ গোটা বিশ্বলোকের অধীনে অবস্থান করে মানুষ যে কর্মকান্ড করে তার সাথে সে কোন্ আচরণ গ্রহণ করবে, তা নির্ভুলভাবে অবগত হওয়া মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। তার অবগত হওয়া প্রয়োজন, কোন্ পন্থা-পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করলে সামগ্রিকভাবে তার জীবন মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থেকে সফল হতে পারবে এবং তার যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ব্যর্থ না হয়ে সফলতা অর্জন করবে। এই নির্ভুল পথ, পন্থা-পদ্ধতি, নীতি-আদর্শের নামই হলো 'হক' বা মহাসত্য।

আর এই মহাসত্যের দিকে, অভ্রান্ত পথের দিকে যে নেতৃত্ব মানুষকে পরিচালিত করবে, তাই হচ্ছে 'সত্যের হেদায়াত'। এ জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমার প্রতি তোমাদের যা 'হক' রয়েছে আমি তা আদায় করার ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমাদের প্রতি আমার 'হক' রয়েছে, তোমরা কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। এখন তোমরা আমার দাসত্ব ত্যাগ করে, আমার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত না করে অন্য যাদের আইন অনুসরণ করছো, তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সত্যের হেদায়াত লাভের তথা 'হক' পথপ্রদর্শনের কোনো সূত্র রয়েছে, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে কি?

মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদি তারা মহান আল্লাহর 'হক' আদায় না করে। আল্লাহর 'হক' আদায় না করা সবথেকে বড় অকৃতজ্ঞতা। যারা মহান আল্লাহর 'হক' অস্বীকার করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ-فَمَنِ اهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِه-وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-

হে নবী বলে দাও, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে প্রকৃত সত্য (হক) এসে পৌঁছেছে। এখন যে ব্যক্তি সত্য-সোজা পথ অবলম্বন করবে, তার এই সত্য পথ অবলম্বন তারই জন্য কল্যাণকর হবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে, তার ভ্রষ্টতা তার পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। (সূরা ইউনুস-১০৮)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে 'হক' শব্দ ব্যবহার করে বান্দার প্রতি আল্লাহর হক, আল্লাহর প্রতি বান্দার হক, মানুষের পরস্পরের হক, নিজের হক, মানুষ পৃথিবীতে যে পরিবেশে বাস করে তার হক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক, অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষের হক এবং মানুষের প্রতি অন্যান্য সৃষ্টির হক ইত্যাদি বিষয় বুঝিয়েছেন। মানুষের জন্য নির্ধারিত নির্ভুল জীবন বিধান বা হেদায়াতকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হক' শব্দের মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন-

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ-

তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তওবা-৩৩)

এই 'হক'-এর বিপরীত যা কিছু রয়েছে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বাতিল বলে ঘোষণা করে বলেছেন, একমাত্র 'হক'-ই টিকে থাকবে আর না-হক তথা বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৮১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ-اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই কথা।

'হক' কল্যাণকর এবং তা পৃথিবীতে টিকে থাকে আর যা কিছু না-হক, তা পানির বুদ্বুদের মতো, পানির ফেনার মতো–যা বিলীন হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاَرْضِ-

যা ফেনা, তা উড়ে যায় আর যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর (হক) তা যমীনে স্থিতিশীল হয়। (সূরা রা'দ-১৭)

'হক'–এর ওপরে আবরণ দিয়ে তা বেশী দিনে গোপন রাখা যায় না। 'হক'–কে দমিত করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা 'হক'-কে 'হক' হিসাবেই উদ্ভাসিত করে তোলেন। কোরআন ঘোষণা করছে– وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ-

আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা 'হক'-কে 'হক' হিসাবেই দেখিয়ে থাকেন, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতোই দুঃসহ হোক না কেনো। (সূরা ইউনুস-৮২)

আলোচ্য সূরায় মানব জীবন সফল করার লক্ষ্যে যে চারটি গুণ অর্জনের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথম দুটো গুণ অর্থাৎ ঈমান ও আমলে সালেহ্ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্জন করা গেলেও তা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পরবর্তী দুটো গুণের শক্তিশালী অস্তিত্ব। আর পরবর্তী দুটো গুণ অর্জন করা যেতে পারে বা বিকশিত হতে পারে কেবলমাত্র সামাজিকভাবে, দলীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।

প্রথম দুটে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলনে ঈমানদারদের তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা জীবন পরিচালিত করে তাদের একটি সমাজ বা দল অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিককে অতিমাত্রায় সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। যেন সেই সমাজ, সেই দল বা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের বিপর্যয় দেখা না দেয়। আমলে সালেহ্-এর বর্ম দ্বারা আবৃত তথা সৎকাজের দেয়ালে ঘেরা রাষ্ট্রের, দলের বা সমাজের গায়ে শয়তান ছিদ্র করে সেই ছিদ্র পথে প্রবেশ করে তার ভেতরে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং দুষ্কৃতি করতে না পারে। এ জন্য ঈমানদারদের সমাজের, দলের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্য সচেতন থেকে একে অপরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা হক অবতীর্ণ করেছেন, তার ওপরে সুদৃঢ় থাকার ব্যাপারে উপদেশ দেবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পথে যেসব বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আসবে, পরম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করার নসীহত করবে।

সৎ পথের ওপরে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত কবা বা পরস্পরের ভেতরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার কর্তব্য একাকী অথবা

বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে পালন করা যায় না। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে দায়িত্বও একাকী পালন করা যায় না।

সেই সাথে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তি ও বিপদ-মুসিবত আসে, সে অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। ধৈর্য ধারণের এই অনুশীলনও একাকী করা যায় না। একক কোন ব্যক্তির ওপরে কোন বিপদ এলে সে ব্যক্তি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আর বিপদ যদি সবার ওপরে আসে তাহলে একে অপরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়ে সে বিপদের মোকাবেলা সবাই একত্রিত হয়ে করতে পারে। সুতরাং হক-এর ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেয়া এবং ধৈর্য ধারনের অনুশীলন করা একাকী হয় না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের। এ জন্য প্রথম দুটো গুণের প্রাথমিক দাবীই হলো, এই গুণে গুণান্বিত লোকগুলো একত্রিত হয়ে একটি সমাজ বা দল গঠন করবে, যেন মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরবর্তী দুটো গুণও অর্জন করা যায়।

ঈমানদারদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেরাই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলবে না, এই বিধান অন্যান্য লোক যেন অনুসরণ করে, সে লক্ষ্যে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অন্য লোকদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবে।

এভাবে তারা প্রত্যেকটি লোককে ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করবে। ঈমানদাররা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে তোলে সেই আন্দোলনের মাধ্যমে আলোচ্য সূরার শেষে বর্ণিত দুটো গুণের অনুশীলন করবে, সেই অনুশীলনীই হলো ঐ সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি। সমাজ, দল ও রাষ্ট্রকে যে কোন ধরনের দুষ্টক্ষত থেকে মুক্ত রাখবে ঐ জীবনী শক্তি তথা পরস্পরকে হকের ওপরে টিকে থাকার উৎসাহ ও উপদেশ এবং ধৈর্য ধারণের অনুপ্রেরণা।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রথম গুণ হলো ঈমান, দ্বিতীয় গুণ আমলে সালেহ্ এবং তৃতীয় গুণ হলো হকের ওপরে টিকে থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি উৎসাহ দান করা এবং উপদেশ দেয়া তথা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা।

'হক'-এর প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারাই কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে হক-সহকারে আগমন করেছিলেন এবং যা গ্রহণ করে তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই দ্বীনে হক-এর প্রতি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাবে। 'ঈমান এনেছি, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করছি, তসবীহ্ পাঠ করছি, কোরআন তিলাওয়াত করছি তথা মহান আল্লাহর দ্বীনকে

মেনে নিয়েছি' এইটুকুর মধ্যেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তৃতীয় যে গুণটি অর্জন করতে হবে, তা হলো মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে।

যে মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করা হচ্ছে, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আল্লাহর দেয়া যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তা নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে সেই মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। যে সত্য তথা 'হক' গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে সেই 'হক'-এর সাক্ষী হিসাবে গোটা পৃথিবীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো ঈমানদার আমলে সালেহ্কারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে 'মধ্যমপন্থী দল' হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী দল বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

বিশ্ব ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্র আবির্ভাবের কারণই হলো এটা যে, তারা পৃথিবীর মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা দ্বীনে হক-এর দিকে আহ্বান জানাবে। এই দায়িত্ব ইতোপূর্বে অর্পণ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলীদের প্রতি। কারণ তাদের কাছে 'হক তথা মহাসত্যের জ্ঞান' বর্তমান ছিল এবং এ জন্য তাদেরকে গোটা পৃথিবীর জাতিসমূহের নেতার আসনে আসীন করা হয়েছিলো। তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে, মহাসত্যের প্রতি ডাকবে, মানুষ হিসাবে পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে, এটাই ছিল উদ্দেশ্যে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতিসমূহের নেতার মর্যাদায় তাদেরকে অভিষিক্ত করা হয়েছিলো।

কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে, শুধু তাই নয়, পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব যারা পালন করতে অগ্রসর হয়েছে, তাদের প্রতি বনী ইসরাঈলী জাতি তথা ইয়াহুদীরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। যে 'হক' তাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো এবং তার দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর আদেশ দেয়া

হয়েছিলো, সেই 'হক'-কে তারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি। বরং সেই 'হক'-কে তারা বিকৃত করেছিলো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'হক' তথা আল্লাহর বিধানে তারা নিজেদের মর্জি মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলো। এই বিকৃতির হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সেই নবী-রাসূল যখন তাদেরকে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তৎপর হয়েছেন, তখন ঐ জালিমরা আল্লাহর নবী-রাসূলদেরকে একের পর এক হত্যা করেছে।

ফলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করলেন এবং তাদের ওপরে কিয়ামত পর্যন্ত গযব চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর কোরআন বলছে-

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের ওপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এই ধরনের পরিণতির কারণ এই ছিলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিলো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছিলো আর এটাই ছিলো তাদের নাফরমানী এবং শরীয়াতের সীমালংঘন করার পরিণতি। (সূরা বাকারা-৬১)

এই বনী ইসরাঈলী তথা ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিলেন। তারপর তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের দরুন তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করলেন যে, তাদের জন্য যে মসজিদুল আক্সা-কে কিবলা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো, তা বাতিল করে দিয়ে মক্কার মসদিুল হারাম-কে কিবলা হিসাবে মনোনীত করে দিলেন। আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন হারানোর পরে তারা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই অপমানিত আর লাঞ্ছিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তারা নিজের যোগ্যতা ও স্বাধীন শক্তিতে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না, পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর ছত্রছায়া ব্যতীত মুখ খুলে একটি কথা বলার মতো শক্তিও তাদের নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ-ذٰلِكَ

بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِايٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ-ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ -

এরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই এদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে অথবা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করতে পারলে তা ভিন্ন কথা। আল্লাহর গযব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের ওপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছু শুধু এই জন্য হয়েছে যে, এরা আল্লাহর আয়াত অমান্য করছিলো এবং তারা নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বস্তুত এটা তাদের নাফরমানী ও সীমালংঘনের পরিণতি মাত্র। (সূরা ইমরান-১১২)

(ইয়াহুদীরা কিভাবে টিকে আছে এবং থাকবে, প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে তারা মার খেয়েছে, কোথা থেকে কিভাবে বিতাড়িত হয়েছে, এর বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'অভিশপ্তদের পথ নয়' শিরোণাম থেকে 'অভিশপ্ত ইহুদীদের নৃশংসতা ও আল্লাহর গযব' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

ইয়াহুদীদের দুষ্কৃতির কারণে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করে মুসলমানদেরকে সেই আসনে অভিষিক্ত করে তাদের উদ্দেশ্যে সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।' এই আয়াতে 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো, 'মধ্যপন্থী উম্মত'। কোরআনে ব্যবহৃত 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দটির অর্থ এতটাই ব্যাপক অর্থবোধক যে, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার মাধ্যমে এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য এবং ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই উম্মতে ওয়াসাতা শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁদের অনুরূপ সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো মানব গোষ্ঠী ইতোপূর্বে তৈরী হয়েছিল, না কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় তৈরী হবে। অর্থাৎ এমন একটি মানব গোষ্ঠী, যারা সর্বোন্নত যাবতীয় গুণ বিভূষিত। সুবিচার, সততা, ন্যায়-নীতি এবং যাবতীয় বিষয়ে যারা মধ্যমপন্থা অনুসরণে অভ্যস্থ। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর শাসনামলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। দীর্ঘ একটি বছর এই পদে কর্মহীন অলস সময় অতিবাহিত করার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে খলীফাতুর রাসূলকে জানালেন, 'হে খলীফাতুর রাসূল! এমন এক দায়িত্ব

আপনি আমার প্রতি অর্পণ করেছেন যে, আমাকে কর্মহীন সময় অতিবাহিত করতে হয়। দীর্ঘ একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, আজ পর্যন্ত একটি মামলা-মোকদ্দমার ফায়সালা করার সুযোগ এলো না।'

অর্থাৎ একটি বছরের মধ্যেও রাষ্ট্রের জনগণের পক্ষ থেকে কেউ একজনও আদালতের দারস্থ হয়নি। জনগণ এতটাই শান্তি-স্বস্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার মধ্যে বসবাস করছে যে, কেউ কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না, কারো প্রতি কেউ কটুবাক্য ছুড়ে দেয় না। স্বার্থের কারণে কারো সাথে দ্বন্দ্বও হয় না। ফলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় নি। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত ওমরের কাছে জানতে চাইলেন, 'জনগণের পক্ষ থেকে কেনো একটি মোকদ্দমাও আদালতে পেশ করা হয়নি, এর পেছনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাবে বললেন, 'মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে দেশের জনগণ এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রশংসনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে যে, এরা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। ফলে তাদের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না।'

একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে একজন মানুষও এক বছরের মধ্যে আদালতে কারো বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি, তাহলে সেই জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলো কিভাবে নিজেদের চরিত্রে বাস্তবায়িত করেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে। তাঁরাই ছিলেন গোটা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক, উন্নতি-অগ্রগতির পরিচালক ও অগ্রনায়ক, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির পথনির্দেশনা দানকারী। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার যাদের জীবন-অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিলো। অন্যায় বা জুলুমমূলক সম্পর্ক তাদের কারো সাথে ছিল না বরং সেস্থান দল করেছিল ন্যায় ও ইনসাফ। গোটা জগতের সামনে যারা ছিল সর্বব্যাপক ও সার্বিক দিক দিয়ে কল্যাণ, শুভ ও সুন্দরের প্রতীক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা দ্বীনে হক অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাঁরা এবং সেভাবেই তাঁরা সত্যের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ভেতরে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানবমন্ডলীকেই 'উম্মতে ওয়াসাতা' হিসাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদেরকে বলেন, তোমরাই উম্মতে ওয়াসাতা–মধ্যপন্থী উম্মত। আমি রাসূলকে যা কিছু শিখিয়ে ছিলাম, তিনি তা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। রাসূলের এই শিক্ষা তোমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং পৃথিবীর মানুষকে এই শিক্ষার দিকে তথা 'হক'–এর দিকে আহ্বান জানাবে। রাসূলের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তাঁর অনুসারী দল সাক্ষ্য দেবে যে,

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়ে অর্পণ করা হয়েছিলো, তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। রাসূলের অনুসারী দলকেও কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, সেই দায়িত্বও তারা যথাযথভাবে পালন করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে সত্য পৌঁছানো হয়েছে কিনা, তথা 'হক'–এর দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে কিনা, এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হবে। এই জন্য মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। (সূরা নিসা-১৩৫)

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সামনে মুসলমানদেরকে মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তথা দ্বীনে হক-এর সাক্ষী হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানকে দেখে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে যেন এ কথা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর বিধান সুন্দর ও কল্যাণকর এবং এর কোনো বিকল্প নেই। যাবতীয় দুষ্কৃতিতে আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত হওয়া ও মহাসত্যের প্রতি বিদ্রোহ করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে ইয়াহুদীদেরকে পদচ্যুত করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গঠিত ঈমানদার ও আমলে সালেহ্কারী জনগোষ্ঠী-মুসলমানদেরকে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের সাক্ষ্যদানের পদে নিযুক্ত করেছেন। এরাই মানব জাতির নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

এই পদে আসীন হওয়া একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক, এই পদ মানুষকে সম্মান-মর্যাদা ও জীবনের সার্বিক সফলতা এনে দেয়। যদি এই পদের যথাযথ ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে এই পদের যে দায়িত্ব, এই পৃথিবীর অন্য সকল দায়িত্বের মধ্যে সবথেকে কঠিন ও গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলার পরিচয় দিলে গোটা পৃথিবী জুড়ে যেমন ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত মুসলিম মিল্লাতের ওপরে। কিয়ামতের ময়দানেও মহান আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাব দিতে হবে। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো ধরনের অযোগ্যতার পরিচয় দিলে তা তেমন ক্ষতি বয়ে আনবে না, কিন্তু এই দায়িত্ব এমনই এক কঠিন দায়িত্ব যে, বিন্দু পরিমাণ অবহেলার পরিচয় দিলে মানবতাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সেই সাথে গোটা সৃষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দায়িত্ব পালন করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহভীতি, ন্যায়-পরায়ণতা, সততা, সত্যপ্রিয়তা, আদল-ইনসাফ,

সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক দিয়ে গোটা মানবমন্ডলীর জন্য জীবন্ত আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে সমস্ত মুসলিম মিল্লাতকেও সারা দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জাতির কাছে নিজেদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, ব্যবহার ও অন্যান্য যাবতীয় কিছুর মাধ্যমে জীবন্ত আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই মুসলিম মিল্লাতের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ব্যবসার ধরন, কথাবার্তা, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি দেখে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার অর্থ, সততার প্রকৃত অর্থ, সত্যবাদিতা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃত তাৎপর্য কি তা যেন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

এই দায়িত্ব অর্পণ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবী-রাসূলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনও যদি এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করতেন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হতো। নবী-রাসূলদের অবর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি। গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে তাদেরকে নিজেদের জীবন চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের কল্যাণকারিতা তুলে ধরতে হবে। মানুষের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর বিধানই পৃথিবীর মানবতার কল্যাণের একমাত্র উপযোগী বিধান, আর অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান কল্যাণের উপযোগী নয়।

মহান আল্লাহর মনোনীত যে বিধান তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা আল্লাহ তা'য়ালার সাধারণ বান্দাদের কাছে পৌঁছাতে আমরা যদি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করি, কিয়ামতের দিন যদি আমরা আল্লাহর দরবারে এ কথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হই যে, আমাদের ওপরে যে দায়িত্ব ছিল, তা আমরা যথাযথভাবে পালন করিনি। তাহলে অবশ্যই আমরা অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হবো। পৃথিবীতে যাবতীয় ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের কারণে আমাদেরকেই দায়ী করা হবে। পৃথিবীতে যে সম্মান-মর্যাদার আসন-নেতৃত্বের আসন আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, এই আসনই আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেবে।

এই পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে কোরআন রয়েছে, রাসূলের সুন্নাহ্ রয়েছে-রয়েছে সাহাবা কেরামের গোটা জীবন চরিত। এগুলো বাস্তবে প্রয়োগ অনুসরণ না করার কারণে পৃথিবীতে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যত প্রকার ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেবে, গোমরাহী, অসততা, পথভ্রষ্টতা, অবিচার, অন্যায়, অত্যাচার তথা মানব কল্যাণের বিরোধী ও মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর যতো কিছু দেখা দেবে, তার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য ভ্রষ্ট চিন্তা-নায়ক, নেতা, বুদ্ধিজীবী, ইবলিস শয়তান, মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানদের সাথে সাথে আমাদেরকেও অভিযুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করা হবে।

সুতরাং 'হক'-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নিজেরা পরস্পরকে মহান আল্লাহর 'হক'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং সেই সাথে পরস্পরের 'হক' তথা

বান্দার 'হক'-এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বিষয়টি শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেই দায়িত্ব পালন করা হবে না, সাহাবা কেরাম যেমন তা বাস্তবে অনুশীলন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তা বাস্তবে অনুসরণ করে দেখাতে হবে। নতুবা কিয়ামতের দিন আসামীর কাঠগড়ায় যেমন দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্যর্থ লোকদের কাতারে গিয়ে মহাক্ষতি বরণ করতে হবে।

'হক'-এর বাস্তব সুফল

মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে শুধু মক্কারই নয়, গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতা ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল তাদের আয় রোজগারের সর্বোত্তম মাধ্যম তথা মহৎ পেশা। যুদ্ধহীন জীবন তাদের কাছে ছিল এক অকল্পনীয় বিষয়। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক এবং গবেষকবৃন্দ বলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের উপায়-উপকরণের দৈন্যতা, অর্থ-সম্পদ উপার্জন ক্ষেত্রের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি তাদের সমাজে ঐক্য, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত না থাকা।

এ ধরণের নানাবিধ কারণে তাদের রক্তের শিরায় শিরায় যুদ্ধ যেন মিশে ছিল। কারণে বা অকারণে যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা এবং লুঠতরাজ করা তাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হত। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, চারণভূমিতে পশু চরানোর দখলদারী এবং নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রথমে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ধরনের যুদ্ধ তাদের ভেতরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত ফলে তাঁরা যুদ্ধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কারণে-অকারণে যুদ্ধে জড়িত থাকার ফলে তাঁরা নররক্ত দর্শনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের চরিত্রে কল্পনাতীত পাশবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থপ্রাপ্তির আকাংখা এবং লোভই অদেরকে যুদ্ধোন্মাদ ও জঙ্গী করে তুলতো। আরবের কোন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র ধারণ করতো, তখন তার মনের কোণে যে আকাংখা জাগ্রত থাকতো তাহলো, সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী ইত্যাদী হস্তগত করবে। কেননা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল তাদের কাছে বড় পবিত্র সম্পদ। যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাকর পেশা। ব্যবসা বা নিজের দেহের শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অপমানজনক।

শত্রু ভাবাপন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রীসহ পশুসম্পদ ও নারী-পুরুষদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মানুষগুলোকে তারা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করতো বা বিক্রি করে দিত।

আরো একটা কারণে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো, তাহলো নিজেদের সাহসিকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। একে অপরের আভিজাত্য প্রদর্শন এবং তা নিয়ে গর্ব করা এবং পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেকে একজন

সাহসী বীর হিসাবে সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাংখা। তাকে সবাই সাহসী যোদ্ধা বলুক, বিখ্যাত বীর বলুক এটা ছিল তাদের মনের ঐকান্তিক কামনা।

এ উদ্দেশ্যে তাঁরা যে কোন ধরনের পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতো। তাকে বীর এবং সাহসী হিসাবে সবাই জেনে যেন তার পশুচারণ ভূমিতে অন্য কেউ পশু চরাতে যেন সাহস না পায়, তার বাসস্থানের পাশে যেন কেউ বাস করতে সাহস না পায়, তার কূপ থেকে যেন কেউ পানি নিতে সাহস না পায়, তার তুলনায় অন্য কেউ যেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে না করে, তার মত রং এবং ধরনের পোষাক যেন কেউ পরিধান না করে, সে যাকে খুশী হত্যা করবে, কেউ যেন প্রতিবাদের সাহস না পায়, সে যে কোনো নারীকে ভোগ করবে কেউ যেন বাধা দিতে সাহস না পায়, তার ওপর কেউ যেন মাথা উঁচু করে উচ্চ কণ্ঠে কথা না বলে, সবাই যেন তাকেই নেতা হিসাবে মান্য করে, তাকে সবাই যেন সেবা-যত্ন করে এ ধরনের কামনা-বাসনা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেও তারা যুদ্ধ করতো।

মনের এ ধরনের কামনা-বাসনা ব্যক্ত করে তারা অজস্র কাব্য রচনা করেছে। আজো সেসব কাব্য ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। বর্তমান পৃথিবীতে পরাশক্তিগুলো যেমনভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার অশুভ লক্ষ্যে, প্রয়োজনে রক্তের খেলায় মেতে ওঠে, সে যুগেও তেমনইভাবে একজন ব্যক্তি তার প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে তরবারী ধারণ করতো।

'আইয়ামুল আরাব' অর্থাৎ আরবের লোকগাথা পাঠ করলে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে যতগুলো ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং দশকের পরে দশক জীবিত থেকেছে তা সবই ছিল তাদের অহঙ্কার ও আভিজাত্য প্রদর্শনের কারণে। 'হারবে বাসুস' বা বাসুস যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র নিজের অহঙ্কার এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখার হীন উদ্দেশ্যে। বনী তাগলাব এবং বনী বকর গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল।

বনী তাগলাবের গোত্রপতি ছিল কুলাইব ইবনে রাবিয়া। তার নীতি ছিল তার কূপ থেকে কেউ পানি নিতে পারবে না এবং অন্য কারো পশুকে সে পানি পান করতে দিত না। সে যেখানে শিকার করতো, সেখানে অন্য কাউকে শিকার করতে দিত না। সে যে চারণভূমিতে পশু চরাতো, সেখানে অন্য কারো পশু চরাতে দিত না। সে যেখানে অগ্নি প্রজ্জলিত করতো সেখানে আর কাউকে আগুন জ্বালাতে দিত না। একবার বনী বকরের গোত্রে এক অতিথির আগমন ঘটলো। সে অতিথির উট চরতে চরতে তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের চারণভূমিতে গিয়ে তার উটের সাথে চরতে থাকে। কুলাইব তা দেখে রাগে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে তীর ছুড়ে উটের স্তনে বিদ্ধ করলো। বনী বকরের সে অতিথি তার উটের এই দুর্দশা দেখে চিৎকার করে বললো, 'আহ্হা, কি আফসোস ! এ কি অসম্মান !' বনী বকর গোত্রের প্রতিটি লোকের রক্ত যেন প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। তাদের অতিথির এই অপমান কিছুতেই তারা সহ্য করলো না।

এই গোত্রের ভেতরে আত্মীয়তার বন্ধনও ছিল। বনী বকর গোত্রের জাসসাস ইবনে মুররা তার বোনকে বিয়ে দিয়েছিল বনী তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের সাথে। এই জাসসাস স্বয়ং গিয়ে তার বোনের স্বামী কুলাইবকে হত্যা করলো। কুলাইবের ভাই মুহালহিল তার ভাই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে ঘোষনা দিল। মুহালহিল কেনো বনী বকর গোত্রের জাসসাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষনা দিল-অহঙ্কারে লাগলো বনী বকর গোত্রের। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর। এই দুই গোত্র প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সে যুগে আরবদের ধারণা ছিল, কেউ নিহত হলে তার আত্মা পাহাড়-পর্বতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায়। সে পাখির নাম তারা বলতো হামা পাখি বা সাদা পাখি। নিহত ব্যক্তির আত্মা পাখি হয়ে উড়তো আর বলতো,'পান করাও আমাকে পান করাও!' আবার কেউ ধারণা করতো, কেউ নিহত হলে যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তাহলে সে নিহত ব্যক্তি কবরে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে মৃত অবস্থায় থাকে। কারো বিশ্বাস ছিল, নিহত ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে অন্ধকারের ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তার কবর আলোকিত হয়। এ সমস্ত কুসংস্কারের কারণে তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতো। ফলে যুদ্ধে বা অন্য কোন কারণে যারা নিহত হত, তাদের গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোনো ফয়সালায় না এসে যুদ্ধের পথই অবলম্বন করতো। নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কেউ যদি বিলম্ব করতো বা কোন অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিত, তাহলে তা ছিল তাদের কাছে লজ্জার বিষয়। এ সব ছিল তাদের কাছে নীচুতা এবং মর্যাদাহানীকর ব্যাপার। সুতরাং কোন প্রকার আপোষে না এসে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

আরবের কবিগণ তাদের কবিতায় নিজ নিজ গোত্রকে কোন অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা যেন করা না হয়, এ ধরনের কবিতা রচনা করে তাদেরকে উস্কানী দিত। তারা নিহত ব্যক্তির মাথার খুলিতে মদ পান করতো। আরবদের বিশ্বাস ছিল কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্য কোন কারণে শয্যায় শুয়ে মারা গেলে তার আত্মা নাক দিয়ে বের হয়। আর নাক দিয়ে আত্মা বের হওয়া ছিল তাদের কাছে চরম অপমানজনক বিষয়। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর হাতে নিহত হলে তার আত্মা বের হয় আঘাতপ্রাপ্ত সেই ক্ষতস্থান দিয়ে। এটা ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু। এ কারণে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মারা যাওয়াকে তারা বলতো, 'অমুক নাক নিয়ে মরেছে'। আর যুদ্ধের ময়দানে কেউ নিহত হলে তারা বলতো, 'সে নাক নিয়ে মরেনি'। নাক নিয়ে মরা অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্যভাবে মরা ছিল লজ্জার বিষয়। এ জন্য তাদের কবিগণ গর্ব করে বলেছে, 'আমাদের গোত্রের কোন নেতা নাক নিয়ে মরেনি।' অর্থাৎ তাদের গোত্রের কোন নেতা শয্যায় শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেনি।

ইয়াওমে মাসহালান যুদ্ধ, তাহ্লাকুল লামাম যুদ্ধ, দাহেস যুদ্ধসহ এ ধরনের নানা যুদ্ধ তাদের ভেতরে কোনো যুক্তি সংগত কারণে সংঘটিত হয়নি। সামান্য ঘোড় দৌড় নিয়ে-কার ঘোড়া আগে দৌড়ালো আর কার ঘোড়া পরে দৌড়ালো এই নিয়ে দাহেস যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রায় ৫০ বছর ধরে এই অহঙ্কার প্রদর্শনীর যুদ্ধ চললো। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের ভেতরে শুধুমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণে প্রায় ১০০ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। যথা সময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা না হলে উভয় গোত্রই ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল বদর ইবনে পাশা। উকাজের মেলায় এই লোক একস্থানে উপবেশন করে সামনের দিকে তার পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে কোন কারণ ছাড়াই অহঙ্কার প্রদর্শনের লক্ষ্যে ঘোষনা করলো, 'গোটা আরবের ভেতরে আমিই হলাম সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমার চেয়ে কেউ যদি নিজেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করে তাহলে তার সাহস থাকলে যেন আমার পায়ে তরবারীর আঘাত হানে।' লোকটির এ অর্থহীন ঘোষনা অনেকের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। বনী দাহমান গোত্রের একজন যুবকের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। সে এসে বদর ইবনে পাশার পায়ে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। আর যায় কোথা, শুরু হয়ে গেল কুখ্যাত ফুজ্জার যুদ্ধ। কিনানা গোত্র এবং হাওয়াজেন গোত্রের ভেতরে এমন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যে, উভয় পক্ষের মিত্র গোত্রগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। এই দুই গোত্রের মধ্যে আর আপোষই হলো না।

শেষ ফুজ্জার যুদ্ধও ছিল প্রতিহিংসা আর অহঙ্কারের অনিবার্য পরিণতি। ঐতিহাসিকদের মতে আরবের শেষ ফুজ্জার যুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়নি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের ছাব্বিশ বছর পূর্বে হিরার রাজা নোমান ইবনে মুনজের আরবের উকাজ নামক স্থানে যে বিখ্যাত মেলা অনুষ্ঠিত হতো, একটা বাণিজ্য বহর সে মেলায় প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন তিনি আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?' তার প্রশ্নের জবাবে কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার বাণিজ্য বহরের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।' অপর দিকে হাওয়াজেন গোত্রের নেতা উরওয়াতুর রাহহাল অহঙ্কার প্রদর্শন করে বললো, 'আমি আপনাকে সমস্ত আরবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলাম।'

হাওয়াজেন গোত্রের এই নেতার কথা কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশের শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হাওয়াজেন গোত্রের নেতা হিরার রাজার বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহহালকে পথিমধ্যে তায়মান নামক এলাকায় হত্যা করলো। পরিণতিতে যা হবার তাই হলো। এই দুই গোত্রের পুরোনো শত্রুতায় ঐ হত্যাকান্ডের ঘটনা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি

দিল। উভয় গোত্রে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশ গোত্র কানানা গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে গেল আর বনী সাকিফ গোত্র এগিয়ে গেল হাওয়াজেন গোত্রের পক্ষে। ইয়াওমে শামতাত, ইয়াওমে শারব ও ইয়াওমুল হুরিবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রায় চার বছরের অধিক কাল এই যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিভৎসতা এতই প্রকট ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবের অতীতের সমস্ত যুদ্ধের নৃশংসতাকে এই যুদ্ধ ম্লান করে দিয়েছিল।

কেনানা গোত্রের বাররাদ ইবনে কায়েশ তায়মান নামক এলাকায় যখন হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহহালকে হত্যা করে, সে সময় কুরাইশরা উকাজের মেলায় ছিল। তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছা মাত্র তারা মক্কার কা'বাঘরের দিকে চলে আসছিলো। কিন্তু তারা কা'বার এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াজেন গোত্র তাদের পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে ফেললো। ফলে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ, গোটা দিন যুদ্ধ চলার পরে রাতে কুরাইশরা কা'বা এলাকায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। ফলে হাওয়াজেন গোত্র যুদ্ধে বিরতি দেয়। কিন্তু তারপর দিন থেকে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফিজারের এই শেষ যুদ্ধ ছিল ফিজার আল বারাদ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পূর্বে আরো তিনবার ফিজার যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধ প্রথম হয়েছিল কেনানা এবং হাওয়াজেন গোত্রের মধ্যে। দ্বিতীয়বার হয়েছিল কুরাইশ এবং হাওয়াজেনের মধ্যে। তৃতীয় বার হয়েছিল হাওয়াজেন এবং কেনানা গোত্রের মধ্যে। সর্ব শেষ ফিজার যুদ্ধে কুরাইশ এবং কেনানার যৌথ বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন কুরাইশ গোত্রের হারব ইবনে উমাইয়া। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের পিতা এবং হযরত মুয়াবিয়ার দাদা।

আরব ভূখন্ডে 'হক'-এর কার্যক্রম শুরু হবার পূর্বে এটাই ছিল সেখানের লোকগুলোর বাস্তব অবস্থা এবং নানাবিধ জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে তারা নিশ্চিত ধ্বংস ও সর্বগ্রাসী অনলে ভষ্ম হয়ে যাচ্ছিলো। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছিলো মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দ্বীনে হক। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবা কেরাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হয়ে যে দ্বীনে হক-এর ভিত্তিতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফলে দ্বীনে হক-এর জীবন্ত ও বাস্তব সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য অবলোকন করেছিলো আরব জাহানসহ গোটা পৃথিবীর মানুষ। যুগ-যুগ ধরে যুদ্ধ ও নানা ধরনের অত্যাচারে জর্জরিত পরস্পর বিরোধী আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে পরস্পর একই মোহনায় মিলিত হয়ে মানবেতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের প্রতি এই গোত্রদ্বয় এমন অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব ত্যাগ ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলো যে, যা আপন ভাইয়ের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয় না। দ্বীনে হক এভাবেই মানুষের ভেতরে বাস্তব সুফল পরিবেশন করেছিলো।

দ্বীনে হক অনুসারে জীবন পরিচালিত করলে এভাবেই মানব জীবন সুন্দর, কল্যাণময় ও সজীব হয়ে ওঠে। দ্বীনে হক-এর আগমন পূর্ব অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا-وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا-كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত বা এই নিদর্শনাবলী থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা ইমরান-১০৩)

অর্থাৎ তারা এমন ধরনের অন্যায়-অত্যাচারে পরস্পর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, জাতি হিসাবে তারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেতো। এই অবস্থাকেই আল্লাহ তা'য়ালা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়ানোর সাথে তুলনা করে বলেছেন, দ্বীনে হক অবতীর্ণ করে তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। কিভাবে রক্ষা করলেন, দ্বীনে হক গ্রহণ করার কারণে অদের পরস্পরের ভেতর থেকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও অমানবিকতা বিদায় গ্রহণ করলো এবং তারা দ্বীনে হক পরিবেশিত সর্বোত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গোটা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হলো। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দেয়া জীবন বিধানের অতুলনীয় সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য এভাবেই সমুজ্জ্বল করে তোলেন, এসব দেখে গোটা পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে সত্য পথ অনুসরণ করতে পারে।

দ্বীনে হক কিভাবে পরস্পরের ভেতর থেকে যাবতীয় তিক্ততা মুছে দিয়ে তাদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি-ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানবেতিহাসে এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। মক্কা থেকে যাঁরা নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল মক্কার মুসলমান ও মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এভাবে মদীনার মুসলমানরা দ্বীনে হক-এর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদেরকে একান্ত আপন করে নিয়ে তাদের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলো। মক্কার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে

আওফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে মদীনার খাযরাজ গোত্রের ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত সা'দ ইবনে রাবী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছিলো।

তিনি একদিন হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ডেকে বললেন, 'ভাই, মদীনার সবাই জানে আমি ধনী মানুষ। আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ আমি দু'ভাগে ভাগ করছি। একভাগ তুমি গ্রহণ করো। আর আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয়, তাকে আমি তালাক দিচ্ছি। ইদ্দত অতিবাহিত হবার পরে তুমি তাকে বিয়ে করো।' হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সা'দের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভাই, তোমার ধন-সম্পদে মহান আল্লাহ্ বরকত দিন। আমার এসবে প্রয়োজন নেই, তুমি শুধু আমাকে মদীনার বাজারের পথটি দেখিয়ে দাও।' মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান তথা দ্বীনে হক এমন মানুষই তৈরী করেছিলো, পৃথিবীর মানবেতিহাসে তাদের অনুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই দ্বীনে হক বর্তমানেও এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে, এর বাস্তব প্রয়োগে এখনও সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ তৈরী হতে পারে।

'হক'-এর বাস্তবায়নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। নবী রাসূলদের দাওয়াত যারা কবুল করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁরা একতাবদ্ধ করে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে একই সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত করেছেন এবং সেই সংগঠিত শক্তিকে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মক্কার জীবনে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন। যেসব মহান ব্যক্তি তাঁর দাওয়াত কবুল করেছেন তিনি তাঁদেরকে একত্রিত করে 'হক'-এর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মক্কায় 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র অনুকূল না হবার কারণে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানে অনুকূল পরিবেশ লাভ করার ফলে 'হক'-এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের নিয়ে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই গোটা পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানানো এবং 'হক'-এর ভিত্তিতে তাদের জীবনকে রঙিন করা।

এই পথে যারা বাধা দিয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সহজ-সরল কথায় যারা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে পথ থেকে সেই বাধা অপসারিত করে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের পথ নিষ্কন্টক করেছেন। এই কাজ নির্জনে একাকী, শুধুমাত্র মসজিদ, খান্কাহ্ বা মাদ্রাসার চার দেয়ালে নিজেদেরকে বন্দী রেখে করা

সম্ভবপর নয়। এ জন্য একটি সংগঠনের পতাকা তলে হকপন্থীদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয়। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে তথা 'হক'-এর প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে তথা 'না-হক'-এর মূলোৎপাটন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মন্ডিত হবে। (সূরা ইমরান-১০৪)

অর্থাৎ মানবমন্ডলীর ভেতরে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করার কাজ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ অনুরোধ ও উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালোকাজে রত করানো যায়নি। অথবা ভালোকাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো মাওলানা বা পীর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে, আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী

সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না পারলে 'হক'-এর দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া-নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'হক'-এর তৎপরতা চালাতে হবে। 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে বেছে বের করে নেয়া হয়েছে-অর্থাৎ এই কাজের জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

পৃথিবীতে সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো। (সূরা ইমরান-১১০)

'হক'-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবমন্ডলীর কল্যাণের লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন এবং এই জীবন বিধান অনুসারে যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছেই মহান আল্লাহর এই বিধান প্রাণের চেয়েও প্রিয়। হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের কাছে তার নিজের জীবন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের তুলনায় আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর আদর্শ সর্বাধিক প্রিয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না। এই তাগিদ অনুসারে ঈমানদার লোকগুলো স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে সমস্ত কিছুর ওপরে স্থান দেবে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, সে যাকে সর্বাধিক ভালোবাসে তার স্বার্থ যে কোনো অবস্থায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং কথা ও আচরণের মাধ্যমে সেই ভালোবাসা বা আকর্ষণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। ঈমানদার তার সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের জন্য উজাড় করে দেবে-এটাই ঈমানের দাবি। কোরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনের ধন-সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং

ঈমানদার যে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামকে ভালোবাসে, তা অনুসরণ করে, স্বাভাবিকভাবেই সে ইসলামকে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরার সাম্ভাব্য যাবতীয় পথ অবলম্বন করবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষ্য হিসাবে সে নিজেকে উপস্থাপন করবে। মানুষ যেমন তার ভালোবাসার প্রকাশও কথা ও কাজের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মহাসত্যের পক্ষে তথা দ্বীনের হক-এর পক্ষেও কথা ও কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

পারস্পরিক কথাবার্তায় ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরবে। যেখানেই কথা বলার সুযোগ আসবে, সেখানে পরিবেশ ও প্রসঙ্গ অনুধাবন করে মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তা প্রয়োগের ফলে ব্যবহারিক জীবনে এর কল্যাণসমূহের বর্ণনা অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরবে। লেখার সুযোগ থাকলে সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনে হক-এর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কৃত হয়েছে, লেখনীর মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ক্ষতিকর দিকসমূহ প্রকাশ করে তার তুলনায় মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে।

বর্তমান যুগে প্রচারের যেসব মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, এসব মাধ্যমকে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দ্বীনে হক-এর সাথে পরিচিত করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রিন্টিং মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ আধুনিক বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যতগুলো মাধ্যম আবিষ্কার করেছে, তা কাজে লাগাতে হবে। মানুষের মন-মস্তিষ্কে দ্বীনে হক-এর মর্মবাণী পৌছানোর জন্য চিন্তা-গবেষণা করে প্রচার ও প্রসারে নিত্য-নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামী চিন্তাবিদদের একত্রিত করে মাঝে-মধ্যে গোল টেবিল বৈঠক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কোরআন-হাদীসের তাফসীরের আয়োজন করতে হবে। মহান আল্লাহর বিধানের যাবতীয় দিকসমূহ যুক্তি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে।

অপরদিকে যে আদর্শের দিকে মুসলমানরা মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর মানুষের সামনে এ কথাই প্রমাণ করে দিতে হবে যে, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি সর্বপরি কল্যাণ লাভ করতে হলে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে আদর্শ প্রচার করা হবে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেই আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে আগ্রহী হবে। তারা জানতে চাইবে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত তথা দ্বীনে হক-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের বাস্তব জীবনধারা কেমন। ঈমানের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিচার ব্যবস্থা, সাংবাদিকতা, শিক্ষানীতি,

শ্রমনীতি, বাণিজ্য নীতি, সম্পদ বন্টন নীতি তথা যাবতীয় নীতিমালা কোন্ ধরনের কল্যাণের স্বাক্ষর বহন করছে, কোন্ ধরনের সৌন্দর্য-সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কোন্ ধরনের আলো বিকশিত করছে তা পৃথিবীর মানুষ জানতে চাইবে এবং তা জানার অধিকার তাদের অবশ্যই রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে লন্ডনের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করছি। ইসলামের প্রতি অনুরাগী একজন মুসলমান সেখানের একজন খৃষ্টান নারীকে ইসলাম সম্পর্কে জানার দাওয়াত দিয়ে তাকে কোরআন পড়তে দিয়েছিলো। মাতৃ ভাষায় অনুদিত কোরআন পাঠ করে সেই নারী উক্ত মুসলমান লোকটিকে বলেছিলো, 'এবার সেই কোরআনটি দাও, যা তোমরা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করো।' মুসলমান লোকটি অবাক বিস্ময়ে খৃষ্টান নারীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমাদের কোরআন তো একটি, আপনি দ্বিতীয় কোরআনের কথা কেনো বলছেন?' খৃষ্টান নারীটি উপহাস করে জবাব দিয়েছিলো, 'আমাকে যে কোরআন তুমি পড়তে দিয়েছো, সেই কোরআনের নীতিমালার সাথে তোমাদের বাস্তব জীবনধারার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়েই তোমাকে দ্বিতীয় কোরআনের কথা বলেছি।'

সুতরাং যে নীতিমালার দিকে মুসলমান পৃথিবীর অন্যান্য মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই নীতিমালা সর্বপ্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ-اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই প্রয়োগ করো না? (সূরা বাকারা-৪৪)

সুতরাং পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর যে দায়িত্ব মুসলমানদের প্রতি অর্পিত হয়েছে, সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজেদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বাস্তবায়ন করে এর যাবতীয় কল্যাণ পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থানপন করতে হবে। যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো স্থানে, পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী ও জাতির সাথেই মুসলমানদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে, মুসলমান যে নীতি আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যে আদর্শ অনুসরণ করে তারা কল্যাণ লাভ করেছে, তাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, স্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, তা যেনো সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বাস্তবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তাহলে তারা দ্বীনে হক-এর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে।

'হক'-এর সাক্ষ্য দান ও বর্তমান মুসলমানদের কর্মনীতি

মহাক্ষতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ও সফলতা অর্জনের জন্য পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দানের ব্যাপারে ওপরে উল্লেখিত দিকসমূহ অবলম্বন করাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্র বিন্দু। এটাই ছিল তাদের সর্বাগ্রে পালনীয় দায়িত্ব। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত এই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলীরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিলো বলে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা মহান আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। লাঞ্ছনা আর অপমান হয়েছে তাদের লালট লিখন। যে কারণে ইয়াহুদীরা নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত হয়েছে এবং ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই একই কারণ যদি মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হতে থাকে, তাহলে ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা যে আচরণ করেছেন, সেই একই আচরণ তিনি মুসলমানদের সাথেও করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ) এমন শত্রুতা ছিলো না যে, তিনি তাদের প্রতি অকারণে গযব চাপিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সাথেও মহান আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, তারা ইয়াহুদীদের ন্যায় আচরণ করতে থাকবে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন রাখবেন এবং ক্রমাগতভাবে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাবেন।

'হক'-এর ব্যাপারে মুসলমানরা অতীতের সেই ইয়াহুদীদের তুলনায় মোটেও সুখকর আচরণ করছে না। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের চরিত্রে বিকশিত হয়ে পৃথিবীময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে মুসলমানরা আপন রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে স্মরণ করে শুরু করবে এবং এটাই ছিলো তাদের ঈমানী দায়িত্ব। অমুসলিম জাতিসমূহ কোনো দায়িত্ব গ্রহণকালে যে শপথ বাক্য পাঠ করে, সেখানে তারা নিজের ধ্যান-ধারণা অনুসারে স্রষ্টাকে স্মরণ করে। আমেরিকা-ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শপথ গ্রহণকালে তারা বাইবেলের ওপরে হাত রেখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণকালে শপথ বাক্যে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না।

আমি প্রথম বারের মতো যখন আমার নিজ এলাকা পিরোজপুর সদর ১ নম্বর আসন থেকে মহান আল্লাহ রহমতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রবেশ করলাম, তখন বাজেট অধিবেশনে আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করলাম, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ তাদের মৃত নেতাদেরকে স্মরণ করে বক্তৃতা শুরু করছেন। মুসলিম হিসাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণের সৎসাহস দেখাতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। আমার জন্য নির্ধারিত সময়ে আমি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর

রাসূলের হাম্‌দ না'ত পাঠ করে আমার বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি' এই কথাটুকু বলতেই আমি লক্ষ্য করলাম পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যগণ আমার দিকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় তারা অনুমান করেছিলো আমি তাদেরই অনুরূপ কোনো নেতাকে স্মরণ করবো। আমি বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে, আমার সবটুকু শ্রদ্ধার শেষ রেশটুকু বিলিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ও বিশাল আকাশের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে।'

মুসলমানরা 'হক'-এর স্বপক্ষে এবং 'হক'-কে সর্বোচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুখের কথা ও লেখনী ব্যবহার করা তো দূরে থাক, তারা এর বিপরীত কাজটিই অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। মুসলমান হিসাবে নিজেকে দাবি করে, পাশাপাশি মুখের কথা, বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা হচ্ছে। দ্বীনে হক-কে তথা মহান আল্লাহর বিধানকে মানুষের জীবনে অপ্রয়োজনীয়, সেকেলে, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক, অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম নামধারী লোকগুলো প্রিন্টেড এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোয় ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী লোকজন অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল চালু করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসমূহ 'হক'-এর বিপরীত পথেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কবিতায় ও সাহিত্যে 'হক'-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, কৃষিজীবী, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক তথা মুসলিম মিল্লাতের অধিকাংশ লোকজন নিজেদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় ভিন্ন জাতির সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামের বিপরীত নীতি আদর্শে প্রতিপালিত, বিপরীত পরিবেশে বর্ধিত কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকগুলোর ঘৃণ্য জীবনধারার তুলনায় মুসলিম মিল্লাতের লোকজনের জীবনধারা কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের তুলনায় মুসলমান দাবিদার লোকগুলোর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভৎসরূপে প্রকাশ ঘটছে। অমুসলিমদের জীবনধারায় আর মুসলিম দাবিদারদের জীবনধারায় কোনোই পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমান মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে অমুসলিম জাতিসমূহ এ কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলমানদের কাছে অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ নেই, এই জন্যই তারা আমাদের নীতি আদর্শ পরম মমতাভরে অনুসরণ করছে।

মুসলমানদের কেনো এই দুঃখজনক অবস্থা হলো, বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার জন্য একটু পেছনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ইসলাম বিবর্জিত আধুনিক জড়বাদ

আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ইতিহাস-যে ইতিহাস রচিত হয়েছে ইউরোপের ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠী দ্বারা বা তাদেরই মানস সন্তানের হাত দিয়ে, এসব ইতিহাসে তারা যখন পড়ছে যে, ইউরোপে ধর্ম ছিল প্রগতি এবং মানব কল্যাণের অন্তরায়। তখন এসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিগণ ইসলামকেও প্রগতির অন্তরায় মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ইসলাম মানেই মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং এই আদর্শ মানব কল্যাণের অন্তরায়। সুতরাং ইসলামকে সমাজ থেকে উৎখাত করতেই হবে। ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে এই মুসলিম নামধারী পন্ডিতরা ইসলামকে পাদ্রীদের পোপতন্ত্রের ন্যায় প্রগতি বিরোধী বলে ধারণা করছে, আবার কেউ জেনে বুঝে নিজের কলম এবং মাথা ইসলামের শত্রুদের কাছে বিক্রি করে উচ্ছিষ্টের লোভে ইসলামের বিরোধিতা করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন বা করেছেন, তাদের ভেতরে অধিকাংশ পন্ডিতই ইসলাম সম্পর্কে বহু অমুসলিম চিন্তা নায়কের তুলনায় ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে পিছিয়ে আছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ-যারা অমুসলিম, তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন, ঠিক এ সময়ে তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদগণ ভ্রান্ত মতবাদ-মতাদর্শ নিয়ে গবেষণায় বিভোর হয়ে আছেন। এই শ্রেণীর মুসলিম নামধারী চিন্তা-নায়করা পরিত্যক্ত আদর্শ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার অঢেল সময় পান, কিন্তু তারা সময় পান না ইসলামকে নিয়ে একটু মাথা চিন্তা-গবেষণা করার। তারা নিজের ঘরে গিলাফে মোড়া কোরআন খুলে দেখার সময় পান না।

অপরদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে যারা কোরআন-হাদীস নিয়ে চর্চা করছেন, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত নন। তারা বিজ্ঞান চর্চা করেন না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কি ধরনের বিজ্ঞানী তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাকে নবুয়াত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর আলেম সমাজ গবেষণা করেন-বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা করেন এবং চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁরা কেন এমন করেন, এরও যুক্তি সম্মত কারণ রয়েছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে গোটা পৃথিবী শাসন করেছে ইংরেজ জাতি। ভারতীয় উপমহা দেশেও তারা দস্যুর মত আক্রমন করে প্রায় দুই শত বছর শাসন

করেছে। তারা জানতো, তারা চিরদিন এই দেশে থাকতে পারবে না। সুতরাং তারা চলে যাবার পরেও যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক গোলামী না করলেও যেন অন্যান্য সমস্ত দিক ও বিভাগে গোলামী করে সেই ব্যবস্থা তারা পাকাপোক্ত করে রেখে যায়।

পরিকল্পনার ভিত্তিতে তারা তাই করেছে। মুসলমানদেরকে তারা প্রকৃত ইসলাম বুঝতে দেয়নি। ইসলামকে তারা বুঝতে দেবে না এ কারণে শিক্ষাকে তারা দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। একভাগের শ্রুতি মধুর এবং আকর্ষণীয় নাম General Education দেয়া হলো। আরেক ভাগের শ্রুতিকটু এবং অবহেলিত নাম ওল্ড স্কীম Old Scheme দেয়া হলো। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার নাম দেয়া হলো Old Scheme। এই নামটি এমন যে, তা শুনতেই খারাপ বোধ হয় এবং এই শিক্ষা গ্রহণের প্রতি কোন আকর্ষণ মানুষের মনে সৃষ্টি হয় না।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এখানেই থেমে থাকেনি। কোরআন হাদীসকে বিকৃত করা এবং কোরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে আড়াল করার লক্ষ্যে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অমুসলিম প্রিন্সিপাল নিয়োগ করলো। এভাবে বছরের পর বছর ধরে ২৬ জন অমুসলিম প্রিন্সিপাল সে মাদ্রাসায় থাকলো। সে মাদ্রাসা থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করলো, তাঁরা কোরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে কিনা, তাদের কার্যকলাপই তা প্রমাণ করে দিল। স্বামী-স্ত্রীর বিভেদের ফতোয়া দেয়া আর মিলাদ পড়া ব্যতীত তেমন কোনো যোগ্যতাই তাদের ভেতরে ইংরেজগণ সৃষ্টি হতে দেয়নি।

ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি কিছুই তারা জানতে পারলো না। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এই কথাটিই তারা জানতে পারলো না, অথচ তারাই হলো ইসলামের শিক্ষক এবং মুসলমানদের ধর্মগুরু। এই শিক্ষার প্রতি এতটাই ঘৃণা সৃষ্টি করা হলো যে, কোন একটি ধনীর সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না, মাতা-পিতার কোন মেধাবী সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না। কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, ডানপিটে সন্তানদেরকে মাতা-পিতা মাদ্রাসায় দিতে থাকলেন। এরাই আলেম নামে পরিচিতি পেল। ফল যা হবার তাই হলো। মুসলিম সমাজ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে গেল।

ইসলামকে যারা সত্যই ভালোবাসতো, তাঁরা বাধ্য হয়েই আরেক ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করলো। তার নাম দেয়া হলো কওমী মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় সরকার কোনো অনুদান দিল না। ফলে সাধারণ মুসলমানদের দানের ওপরে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হতে থাকলো। মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ভিক্ষা করতে রাস্তায় নেমে এলেন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে তাঁরা বাধ্য হলেন। ফলে তাদের ভেতর থেকে আত্মমর্যাদা বোধ হারিয়ে গেল। সমাজে তাদের কোন সম্মান-মর্যাদা রইলো না। তাদের ভেতরেও ইসলামের বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি হলো না। মুসলিম জাতিকে তাঁরাও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে টেনে নিতে পারলেন না।

আল্লাহর কিছু বান্দাহ্ যখন প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করে মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানালো, তখন ইংরেজদের তৈরী একশ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি প্রবল বাধার সৃষ্টি করলো। বর্তমান সময় পর্যন্তও তাদেরই অনুসারী এবং উত্তরাধিকারী আলেম নামধারী ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে আসছে। দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বই পুস্তক রচনা করছে, তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতোয়া দিচ্ছে।

বর্তমানেও ইসলামের নামে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা নয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলী, খালিদ, তারিক, মুসা সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ এদেরকে হযরত বিলালের কাহিনী পড়ানো হয়, হযরত খাব্বাবের কাহিনী পড়ানো হয়, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কিভাবে তাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন, এ কাহিনী পড়ে এবং শুনে তাঁরা কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তাদের ভেতরে এই ধারণার সৃষ্টি হয়, একজন লোক কালেমা পাঠ করে এই মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে আর কাফের এসে তার ওপরে কঠিন নির্যাতন করছে, তবুও সে ইসলাম ত্যাগ করছে না।

কিন্তু তাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না যে, রাসূল তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যে প্রশিক্ষণের কারণে তাদের ভেতরে ইসলামী আদর্শ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাঁরা এমন মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এ সমস্ত দিক তাদেরকে শিক্ষা না দেয়ার কারণ হলো, এসব শিক্ষা লাভ করলে তাঁরা ময়দানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁরা সাহাবাদের মতই রক্ত দেবে।

সে সময়ে বাংলা এবং আসামে মাদ্রাসা ছিল মাত্র একটি। সে মাদ্রাসা হলো কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা। ৭৭ বছর ধরে ২৬ জন খৃষ্টান প্রিন্সিপালের পরিচালনার পরে একজন মুসলমান প্রিন্সিপাল দেয়া হয়েছিল। সে প্রিন্সিপালও ছিল খৃষ্টানদের হাতে গড়া তথা তাদেরই মানস সন্তান এবং তিনি যে কেমন ধরনের মুসলমান ছিলেন তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। ১৮৫০ সালে প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিল ডক্টর স্প্রেংগার। তারপর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শেষ প্রিন্সিপাল ছিল আলেকজান্ডার হেমিলটন হালি। এই মাদ্রাসায় কোন বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

এই মাদ্রাসা থেকে যারা বের হলো তারাও বিজ্ঞান চর্চা বৈধ মনে করতেন না। কারণ তাদের মন মগজে প্রবেশ করানো হয়েছিল, বিজ্ঞান শিক্ষা করা হারাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এসব বিষয় তাদেরকে জানতে দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই পরিকল্পিতভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসীরে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বাইবেলের বিকৃত বর্ণনা ইসলামের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও সে বিকৃত বর্ণনা খৃষ্টানদের উচ্ছিষ্ট মুসলমানরা গলধকরণ করছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম

সম্প্রদায় বিজ্ঞান চর্চা করেন না এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞান চর্চাকে তারা হারাম ফতোয়া দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা থেকে নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন।

এর ফলে বস্তু জগতকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচার করতে না পারার কারণে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে তাঁরা নেতৃত্ব দানে সক্ষম হচ্ছেন না। দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামহীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসনের ফলে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের প্রতিটি বিভাগ থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত অথচ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শূন্য মুসলমান ব্যক্তিদের নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের সমস্ত বিভাগ ও স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠলেই ইসলামী শিক্ষাহীন এই আধুনিক শিক্ষিত নামধারী মুসলিম ব্যক্তিগণই সর্বপ্রথম বিরোধিতা করছে।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান সন্ধানীরা তথা বিজ্ঞানীরা এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক। গাড়ির পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ীই গাড়ির যাত্রীদেরকে গাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করে এগিয়ে যেতে হয়। ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন মুসলিম নেতৃত্ব যতো দিন এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক ছিলেন অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, সে সময় পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারা-ই মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্য, মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত তথা সমস্ত কিছুর মানদন্ড ছিল ইসলাম।

পাদ্রীদের জুলুমতন্ত্রের পরিণতি-ইউরোপের অবৈধ সন্তান ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার প্লাবনে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলিমদের তৃণখন্ডের ন্যায় ভেসে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার যে গাড়ি দুর্বার গতিতে মানব মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত মুসলিম এমনকি দাড়ি টুপি তসবীহধারী ধার্মিক বলে পরিচিত মুসলিম ব্যক্তির ভেসে যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় বরং এটাই স্বাভাবিক।

এ জন্য মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে। যে দায়িত্ব তাদের ওপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, এই দায়িত্ব পালন না করার কারণেই ইয়াহুদীদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তারা সামষ্টিকভাবে হক'-এর দায়িত্ব পালন করেনি বরং ব্যক্তিগতভাবে যারা দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের প্রতি তারা নির্মম অত্যাচার করেছে। তাদের সেই ঘৃণ্য আচরণের

সাথে বর্তমান মুসলমানদের আচরণে কোনোই পার্থক্য নেই। এরাও জাতিগতভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করছে না। ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে যারা এই দায়িত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হচ্ছে।

ইয়াহুদীরা নবী-রাসূলদের ওপরে নির্যাতন চালিয়েছে এবং হত্যা করেছে, বর্তমান মুসলমানরা অনুরূপভাবেই 'হক'-এর প্রতি আহ্বানকারী দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে নির্যাতন করছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করে কারারুদ্ধ করছে, বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে যে ঘৃণ্য আচরণ করে ইয়াহুদীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, সেই একই আচরণ মুসলিম নামধারী নেতৃত্ব স্থানীয় লোকগুলো নিজেরা করছে এবং গোটা জাতিকে করতে বাধ্য করছে। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সবথেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত, অবহেলিত, নিস্পেষিত, পদদলিত মানুষগুলোর পরিচয় হলো মুসলমান।

যতদিন তারা 'হক'-এর অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছে, ইতিহাস সাক্ষী, ততদিন এই মুসলমানরাই ছিলো পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন। গোটা দুনিয়ার ওপরে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যখন থেকে তারা 'হক'-এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে, দায়িত্ব পালনে গাফলতির পরিচয় দিয়েছে, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। মুসলমানদের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সম্মান-মর্যাদা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কোরআন। এই কোরআনের অনুসরণই কেবলমাত্র তাদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। কোরআন তো এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি যে, এর অনুসারীরা পৃথিবীতে বিপদগ্রস্ত হবে। সূরা ত্বা-হা-এর শুরুতেই মহান আল্লাহ বলেন–

طـــه-مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى-

আমি কোরআন এ জন্য তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে।

'হক'-এর দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলতা দেখা দেবে। নিষিদ্ধ যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদের হানী ঘটবে।

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে

তারা গোটা পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগের শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে-এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটেই দান করেছিলেন। যখনই তারা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নে'মাত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মহান আল্লাহর ভাষায়-

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ-

যদি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

আর যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ থাকবে না, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুরমুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খানকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে বিরত রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে বাতিল মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড চলতে থাকবে, আর ঈমানদার নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়।

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'শয়তানুন আখরাজ অর্থাৎ বোবা শয়তান' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম যখন মহান আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করতেন, তখন আল্লাহর কালাম শোনার জন্য নদীর মাছ কিনারায় চলে আসতো। ইয়াহূদীরা সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা

সেই মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এক শ্রেণীর ইয়াহুদী আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ অমান্য করে সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নিষেধ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা গযব নাযিল করে সত্তর হাজার ইয়াহুদীকে বাঁনরে পরিণত করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সেই অপরাধের কথা ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সূরা বাকারার ৬৫ আয়াতে তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ–

আর তোমাদের স্বজাতির সেই সব লোকদের ঘটনা তো জানাই আছে, যারা শনিবারের নিয়ম লংঘন করেছিলো। আমি তাদেরকে বলেছিলাম বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় দিন যাপন করো যে, চারদিক থেকে তোমাদের ওপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'য়ালার এই গযবে আক্রান্ত হলো, তারা সবাই আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে মাছ ভক্ষণ করেনি। কিন্তু তারপরেও তারা গযবের আওতায় এসে গিয়েছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন বনী ইসরাঈলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। জনতার এক অংশ নিষিদ্ধ মাছ ভক্ষণ করলো। তারা কৌশল অবলম্বন করলো এভাবে যে, শনিবারে মহান আল্লাহর কালাম শোনার জন্য মাছগুলো যখন কিনারায় আসতো, তখন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে, সেই মাছগুলো বিশেষ স্থানে যেন বন্দী হয়ে পড়ে। তারপরের দিন অর্থাৎ রবিবারে তারা সেই বন্দী মাছগুলো ধরে ভক্ষণ করতো।

জনতার মধ্য থেকে আরেকটি দল এসব ঘটনা নীরবে দেখেছে। চোখের সামনে মহান আল্লাহর আইন প্রকাশ্যে লংঘিত হচ্ছে, আর তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। নিজেরা অবশ্য সেই পাপ থেকে বিরত থেকেছে, কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখে তার প্রতিবাদ করেনি। হাদীস অনুসারে তারা বোবা শয়তানের ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় যে দলটি ছিলো তারা হলো প্রতিবাদকারী দল। তারা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত থেকেছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মাছ ভক্ষণকারীদেরকে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এভাবে মাছ ভক্ষন করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং এই কাজ থেকে বিরত থাকো। মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইয়াহুদী জাতির ওপরে গযব নাযিল করলেন, তখন প্রতিবাদকারী দল ব্যতীত ঐ দুই দলকেই গযবে আক্রান্ত করলেন, যারা মাছ ভক্ষণ করেছিলো আর যারা মাছ ভক্ষণ করেনি কিন্তু কোনো প্রতিবাদও করেনি। মহান আল্লাহর আইন অমান্য করা হচ্ছে দেখে কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেনি।

আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হক কথা বলতে হবে তথা বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। কারণ অন্যায় যে করে আর যে সহে-তারা উভয়েই সমান অপরাধী। হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের আমলে তাঁর অপরাধী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা গযবের ফেরেশ্‌তাদেরকে প্রেরণ করলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতো যমীনের তলদেশ থেকে লাভা উত্থিত হয়ে গোটা যমীনকে উলট-পালট করে দেয়া হয়েছিলো। এই কাজে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর যেসব ফেরেশ্‌তা দল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা কাজ সম্পাদন করতে এসে দেখলেন, সেখানে এমন একজন লোক রয়েছে, যে ব্যক্তি জীবনের ত্রিশ বছর ব্যাপী আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে।

তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলো, হে আল্লাহ! এই যমীনে তোমার এমন একজন বান্দাহ্ রয়েছে, যিনি ত্রিশ বছর ধরে তোমারই দাসত্ব করে যাচ্ছে।' আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তিকেও আযাবে নিক্ষেপ করো। কারণ গোটা জাতি যখন পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, তখন সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত ছিলো। লোকজনকে আল্লাহ বিরোধী কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য একটি কথাও বলেনি।

সুতরাং মহান আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে 'হক'-এর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, গোটা মানবতাও যদি আল্লাহ বিরোধী পথে ধাবিত হয়, তবুও একজন ব্যক্তিকে হলেও 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে। নতুবা যে গযব আসবে, সেই গযব থেকে আল্লাহভীরু লোক বলে কথিত লোকগুলোও মুক্ত থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

এবং দূরে থাকো সেই ভাঙ্গন ও বিপর্যয় থেকে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদেরকেই গ্রাস করবে না, তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধ করেছে। (সূরা আনফাল-২৫)

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, মনে করুন কোনো একটি বাড়ির সামনে যে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা রয়েছে, সেখানে কোনো কুকুর বা বিড়াল মরে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন তা পরিষ্কার করছে না। পথিক যারা নালার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, তারা দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নাকে কাপড় চেপে পথ অতিক্রম করছে। বাড়ির মালিকও পথিকের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে। কেউ যখন তা পরিষ্কার করলো না, তখন কেবলমাত্র ঐ বাড়ির মালিক শুধু দূষিত পরিবেশের কারণে রোগে আক্রান্ত হবে না, যারা তার চারদিকে বসবাস করে এবং সেই নালার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া

পথ অতিক্রম করে, তারাও রোগে আক্রান্ত হবে। রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এখানে একজনকে অবশ্যই তা পরিষ্কার করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং অন্যায়ের উদ্ভব যেখানেই ঘটবে, সেখানেই প্রতিবাদের ঝান্ডা উত্তোলন করতে হবে। 'হক' কথা বলতে হবে এবং না-'হক'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে–আর এটাই হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বের অঙ্গন থেকে মুসলমানরা যখনই অপসারিত হয়েছে, ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো বিদায় গ্রহণ করেছে, তখনই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারী ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত লোকগুলো বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। একের পর এক মহাযুদ্ধের কারণে অগণিত আদম সন্তান পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অসংখ্য মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও চরম ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশ অনাগত মানব সন্তানের জন্য যেমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবী থেকে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী চিরতলে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমান মানব গোষ্ঠীও নানা ধরনের প্রাণঘাতী অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করছে।

রাজনীতির অসৎ নিয়ন্ত্রকরা নিজেদের হীন স্বার্থে পৃথিবীর এক দেশের সাথে আরেকটি দেশের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করে রাখছে। প্রয়োজনে যুদ্ধে লিপ্ত করে নিজেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নানা স্বার্থ উদ্ধার করছে। কোনো একটি দেশেও দেশ ও জাতি প্রেমিক কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে অধিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না, দেশ ও জাতির স্বার্থে যারা তৎপর, প্রয়োজনে সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে দেশদ্রোহী লোককে ক্ষমতায় বসাচ্ছে। জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা। প্রায় দেশেই তাদের অনুগত লোকদের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে সে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রাখছে।

অর্থনীতির অঙ্গন থেকে আল্লাহভীরু লোকগুলো যখন বিদায় গ্রহণ করেছে, তখন চরম মুনাফাখোর-সুদখোর ও দস্যু-তস্করের দল অর্থ জগতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে মানবতার ওপরে শোষণমূলক পুঁজিবাদ চাপিয়ে দিয়ে মানবতাকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। ফলে পৃথিবীর মানুষগুলোকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করা হয়েছে, অর্থোপার্জনকে এমন কঠিন করা হয়েছে যে, 'সবথেকে দায়িত্বপূর্ণ ও মহৎ কর্ম অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালন–আদর্শ মানব গড়ার কারিগর' নারীদেরকে সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাকেও শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়েছে। শিশুদের অধিকার হরণ করে

তাদেরকেও পেটের ভাতের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এতে করে তাদের সুকুমার বৃত্তিসমূহের অকাল মৃত্যু ঘটছে, দুর্ব্যবহার পাবার ফলে তাদের ভেতরে নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের প্রতি যৌন নিপীড়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, বড়দের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের ভেতরের সুপ্ত চেতনাসমূহ অসময়ে জাগ্রত হচ্ছে এবং তারা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থোপার্জনের নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-বন্ধনহীন পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নারীদেহ, অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সমাজ, দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে। যার যেমন খুশী তেমন পথে অর্থোপার্জন করছে, এতে করে দেশ ও জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দেশের পরিবেশ কতটা কলুষিত হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো মানসিকতার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন-নারীকে সেই আসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে এনে পণ্যদ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে। নেশা জাতিয় মাদকদ্রব্যের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জাতির মেরুদন্ড কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে আখিরাত প্রেমিক লোকগুলো যখন সরে এসেছে, তখন সেই জগৎ দখল করেছে বিকৃত রুচিসম্পন্ন নেশায় অভ্যস্ত যৌন উন্মাদগ্রস্ত লোকগুলো। এরা গান-বাজনার নামে অশালীন ও নগ্ন নর্তন-কুর্দনের প্রচলন ঘটিয়েছে। শ্রবণের অযোগ্য অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক গীতমালা রচনা করে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তা তুলে দিয়েছে। চরিত্র বিধ্বংসী ছায়া-ছবি, চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মানবতাকে পাপ-পঙ্কিলতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ-মারামারি, হত্যা-ধর্ষন, শ্লীলতাহানী, রাহাজানী, ছিন্‌তাই, চুরি, ডাকাতী ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনের যাবতীয় কলা-কৌশল সম্বলিত সিনেমা প্রদর্শন করে কিশোর, তরুণ-যুবকদেরকে বিপদগামী করা হচ্ছে। পাঠের অযোগ্য কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে কিশোর-তরুণদের সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে ধর্ষনের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধিদের পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলে দেখা যাবে, অস্বাভাবিকহারে কিশোর-তরুণরা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা এমন ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে, যা কল্পনা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হত্যা-ধর্ষণ, ছিন্‌তাই এমন কোনো অপরাধ নেই, যা কিশোর-তরুণদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। পড়ালেখার জন্য শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক তার কিশোর ছাত্রদেরকে শাসন করছে, কিশোর ছাত্র প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে সেই শিক্ষককে হত্যা করছে। এসবই হলো বর্তমান মানবতা বিরোধী চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের বিষময় ফল।

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র থেকে ঈমানদার মুসলমানদের দুর্ভাগ্যজনক পশ্চাদাপসারণের ফলে মানবতার কল্যাণে অর্থ ব্যয় না হয়ে অকল্যাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পৃথিবীর অসংখ্য আদম

সন্তানকে দারিদ্র সীমার নীচে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের অভাবে শতকোটি আদম সন্তান মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অগণিত অর্থ-সম্পদ নিছক আমোদ-ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নামে ব্যয় করা হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ধুমপান আর মদের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, বস্ত্রহীন ও চিকিৎসাহীন রেখে বন্য পশু-প্রাণীর পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। নিছক শখের বশে অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে।

আবিষ্কার, উদ্ভাবন তথা বিজ্ঞানের জগৎ থেকে যখন ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন পরকালের ভীতিশূন্য লোকগুলো সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তারা সীমা-পরিসংখ্যাহীন অর্থ এবং নিজেদের মেধা ব্যয় করে মানবতা বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। হত্যা ও মানুষকে বিপন্ন করার নিত্য-নতুন উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করা হচ্ছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে ঈমানহীন লোকগুলো যখন মানব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, তখনই গোটা পৃথিবী জুড়ে মহাভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই ভাঙ্গন ও বিপর্যয়, অশান্তি-অনাচার আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ওপরে চাপিয়ে দেননি। এগুলো মানুষের নিজের হাতেরই উপার্জন। আল্লাহ বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ-

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। (সূরা রূম-৪১)

আল্লাহ ভীতিহীন লোকগুলো যখনই কোনো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে, তখনই সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আখিরাতের ভীতিহীন স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত লোকগুলো পৃথিবীর নেতৃত্বে আসীন, এদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড হলো পৃথিবীর পরিবেশকে অশান্ত করে তোলা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً-

এরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ফাসাদে ভরে তোলে। সেখানের মর্যাদাবান-সম্মানীত লোকগুলোকে লাঞ্ছিত করে। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। (সূরা নামল-৩৪)

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঈমানহীন লোকগুলো মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনের প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বের আসন যখন দখল করেছে, তখন শুধু মানবতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গোটা পৃথিবীর পরিবেশই বিনষ্ট হয়েছে। এদের কর্মকান্ডের কারণে পৃথিবীর প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। উর্ধ্বজগতে যে ওজন স্তর রয়েছে, তাতে ফাটল ধরেছে তাদেরই ভারসাম্যহীন কার্যকলাপের

দরুন। পবিত্র কোরআন ঈমানহীন লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরেছে–

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ–

সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল ও প্রাণীকুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়। (সূরা বাকারা-২০৫)

ক্ষমতার দম্ভে এরা গোটা পৃথিবীর মানুষগুলোকে নিজের গোলামে পরিণত করতে চায়। ভিন্ন দেশের ধন-সম্পদের লোভে এরা যে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা এরা করে না। সাধারণ চক্ষু লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এরা অন্য দেশে আগ্রাসন চালায়। এদের ঘৃণ্য চরিত্র আল্লাহর কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ–

তুমি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই দেখতে পাবে--পাপাচার, সীমালংঘন ও অবৈধ সম্পদ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে। (সূরা মায়িদা-৬২)

নিজেদেরকে এরা গোটা দুনিয়ার মোড়ল মনে করে। ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে এরা দুর্বল জাতিসমূহের প্রতি অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়। আল্লাহর কোরআন তাদের কর্মকান্ড এভাবে প্রকাশ করেছে–

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً–

তারা পৃথিবীতে অবৈধ পন্থায় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে যে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে? (সূরা হামিম সিজদা-১৫)

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে সামগ্রিক অরাজকতা চলছে, গরীব জাতিগুলোর ওপর নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করা হচ্ছে, নিছক ক্ষমতার গর্বে ক্ষুধার্থ মজলুম জাতিসমূহের ন্যায্য সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের ভান্ডার পরিপূর্ণ করা হচ্ছে, ক্ষমতাশালী লোকগুলো দুর্বল মানুষগুলোর প্রভুর আসনে বসে আপন লোভ-লালসা ও খেয়াল-খুশীর বেদীমূলে তাদের যাবতীয় অধিকার বিসর্জন দিচ্ছে, সুবিচার ও ন্যায়-নীতির মূলোৎপাটন করে জুলুম ও অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ লোকদেরকে কোণঠাসা করে এবং অসৎ ও নীচমনা লোকদেরকে স্বগর্বে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে, তাদের অশুভ প্রভাবে জাতিসমূহের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, ন্যায়-পরায়ণতা, মহানুভবতা ও যাবতীয় সৎ গুণাবলীর উৎসসমূহ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা, অসততা, পরস্বার্থ অপহরণ, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নৃশংসতা, না-ইনসাফী ও যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ড ও অনাচারসমূহের পুঁতিগন্ধময় নালার মুখ খুলে দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর স্বঘোষিত মোড়লদের মনে পররাজ্য দখলের লিন্সা উগ্র হয়ে উঠেছে, তারা দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোর ওপর তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। দুর্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতা হরণ করে, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে নিজেদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাস পূর্ণ করার লক্ষ্যে চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে স্বাধীন মানুষের গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব কিছুর মূলে যে কারণ নিহিত রয়েছে, তাহলো পৃথিবীর মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগে ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকগুলোর অনুপস্থিতি। তারা যদি 'হক'-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর চেহারা এমন করুণ আকার ধারণ করতো না।

হক-এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এবং মানব জীবনে সার্বিক ক্ষেত্রের যাবতীয় দিকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার ট্রাফিক পুলিশের যে দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম মিল্লাতের ওপর অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব যদি তারা যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে গোটা মানবতা বর্তমানে এই করুণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতো না। মানুষসহ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদরাজি তথা সার্বিক পরিবেশে যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকগুলোর পতনে পৃথিবী এক তিক্ত পরিবেশের মোকাবেলা করছে। পৃথিবী থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিদায় গ্রহণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্রতা, অত্যাচার আর নির্যাতন এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রয়েছে, সেই পথটি হলো মুসলমানদের নিজ জীবনে 'হক'-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং পৃথিবীর মানুষদেরকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান করা। এই দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করতে থাকলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে পূর্বের ন্যায় আবার পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকদের হাতে তুলে দেবেন–এটা মহান আল্লাহর ওয়াদা এবং তাঁর ওয়াদাই সবথেকে সত্য।

'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী

মানুষের জীবনে কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথমে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। এরপর সে ব্যক্তির প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হবে যে, সে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করার বিষয়টিকে এবং আমলে সালেহ্ করাকে নিজের জন্য কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ বলে মনে করেছে, সেই পথের দিকে অপরকেও সে আহ্বান জানাবে এবং এর নামই হলো 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত। ঈমানদার ব্যক্তিকে দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং এই কাজকে মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয় কর্ম চাঞ্চল্যের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজেই এই উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ লক্ষ্য রাখতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্যই হলো, তারা মহান আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে। তারা মানুষকে পার্থিব কোনো বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে না। বস্তুগত স্বার্থের দিকে আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে না। পৃথিবীর বিশেষ কোনো জাতি, দেশ বা কোনো নেতার প্রতি আনুগত্য করার জন্য আহ্বান জানাবে না। 'হক'-এর দাওয়াত যারা দেবে, তাদের দাওয়াত হবে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর একত্বের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত ভিন্ন কোনো জীবন বিধান অনুসরণ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, বন্দেগী, আরধনা-উপাসনা ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা যাবে না। একমাত্র তাঁর আইন ব্যতীত অন্য কারো রচিত আইন মানা যাবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না। এই কথার দিকেই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী দাওয়াত দেবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (সূরা হামীম সাজ্দাহ্-৩৩)

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার সেই পরিবেশে, যে পরিবেশে মুসলমানদের ওপরে নির্মম-নিষ্ঠুর লোমহর্ষক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে। আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, তারপর তা যখন অঙ্গারে পরিণত হয়ে প্রচন্ড তাপ নির্গত করতে থেকেছে, তখন মুসলমানদেরকে ধরে শরীর থেকে বস্ত্র খুলে উন্মুক্ত দেহে সেই আগুনের অঙ্গারের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে যাঁদের ওপরে নির্যাতন করা হয়েছে, হযরত খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা ছিলেন তাঁদের একজন।

একদিন তাঁকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উন্মুক্ত শরীরে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তোমার পিঠে অমন গর্ত এবং কোমরটি এতো সরু কেনো? এমন পিঠ আর কোমর তো আমি কারো দেখিনি!'

হযরত খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'ভাই ওমর, তোমার বোধহয় মনে নেই, ইসলাম কবুল করার অপরাধে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে রক্তাক্ত করেছে, অনাহারে রেখে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিয়েছে। তারপরও যখন আমি ইসলাম ত্যাগ করিনি তখন তারা আগুনের অঙ্গারের ওপরে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আমার শরীরের গোস্ত-চর্বি গলে গলে আগুন নিভে গিয়েছে, তবুও তারা নির্যাতনে বিরতি দেয়নি। আগুনের অঙ্গারসমূহ আমার পিঠের ভেতরে প্রবেশ করেছিলো, তখন থেকে আমার পিঠে যে দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, আজো পর্যন্ত তা মুছে যায়নি।'

যখন মুসলমানদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছিলো, যে সময়ে মুসলমান হবার অর্থই ছিলো নিজেকে ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না, এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মুসলমানরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলো, আমি একজন মুসলমান।

তারা হাসি মুখে যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও নির্মম মৃত্যুকে কবুল করে এ কথা অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে, 'যে মুসলমানদের ওপরে তোমরা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছো, যাদেরকে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিচ্ছো, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছো, লাঞ্ছিত অপমানিত করছো, যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

'আমি একজন মুসলমান' মানুষের জন্য এর থেকে উচ্চতর স্তর আর দ্বিতীয়টি নেই। বিস্তীর্ণ এই যমীন, বিশাল ঐ আকাশ তথা গোটা মহাবিশ্বের যিনি অধিপতি সেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হলো মুসলমান, একামাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব দেবে, তাঁরাই হলো শাসক শ্রেণী আর সবাই শাসিত। পৃথিবীর যাবতীয় নে'মাত তাদের জন্য এবং পরকালেও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাতের অধিকারী হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র তাঁরাই কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী। মানুষের এর থেকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয় দ্বিতীয়টি আর নেই। সুতরাং মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় পেশ করা সবথেকে গর্বের ও অহঙ্কারের বিষয়। আমি মুসলমান–মহান আল্লাহর সবথেকে ঘনিষ্ঠ একজন, এটাই আমার পরিচয়।

নিজের এই পরিচয় পেশ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ধন-সম্পদ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'আমি মুসলমান'। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত মানুষের ভেতরে ঐ ব্যক্তির কথাকে সবথেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি নিজে ঈমান এনেছে, ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করেছে এবং মহান আল্লাহর পথ অনুসরণ করার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মানুষকে মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করার, আনুগত্য করার আহ্বান জানিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছে যে, 'আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি, আমি মহান আল্লাহর আনুগত্য করছি। আমি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছি, অতএব তোমরাও তাঁরই বিধান অনুসরণ করো। আমি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব কবুল করেছি, তোমরাও একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো।' এই কথার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সর্বোত্তম কথা যমীনের বুকে ও আকাশের নীচে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সুতরাং 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর সর্বপ্রথম গুণ হলো সে মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং এই কাজের বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই কামনা করবে। পৃথিবীর কোনো উদ্দেশ্য মনে গোপন রেখে সে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে না। দাওয়াত দেবে যেমন একমাত্র আল্লাহরই দিকে, তেমনি একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে দাওয়াতী কাজ করবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে দুঃসাহসী হতে হবে

'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার কাজটি অসীম সাহসের কাজ, কোনো ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে দাওয়াতের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অস্থির ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী যারা, তাদের পক্ষে মানুষের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত পৌঁছানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন কবুল করে অকুতোভয়ে রাসূলের সাহবায়ে কেরাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা পৃথিবী থেকে যাদেরকে বিদায় করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

পৃথিবীর বড় বড় রাজা-বাদশাহ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী সেনাপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের ওপরে চোখ রেখে নির্ভীক চিত্তে তাঁরা 'হক'-এর দাওয়াত পেশ করেছেন। দৃঢ়পদে এবং অকম্পিত কণ্ঠে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তদানীন্তন যুগে সমকালীন বিশ্বে ফেরাউন ও নমরুদের মতো শক্তিধর ও সামরিক শক্তির অধিকারী দ্বিতীয় কোনো শাসকের অস্তিত্ব ছিলো না। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম গ্রেফতারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে সেই ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তার চোখের ওপরে চোখ রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, 'তুমি জুলুম করছো, এই জুলুম ত্যাগ করে সেই আল্লাহর গোলামী করো—যিনি তোমার আমার এবং গোটা বিশ্বলোকের রব।'

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও দোর্দন্ড প্রতাপশালী নমরুদের দরবারে একই কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই সমকালীন যুগের শাসকদের সামনে একই ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেই 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগেই মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে যারাই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, দুর্বলতা-কাপুরুষতা, লোকলজ্জা, দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদির উর্ধ্বে অবস্থান করেই 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন।

'হক'-এর সন্ধান যারা পায়নি, তারা মহাক্ষতির দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হচ্ছে। 'হক'-এর দাওয়াত বঞ্চিত মানুষগুলো সাগরের অথৈ জলে নিমজ্জিত, সর্বগ্রাসী হুতাশনে পরিবেষ্টিত, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিপদগ্রস্ত, ছায়া ও খাদ্য-পানিহীন উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে তারা মৃতবৎ–এদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার মানেই হলো তাদের কাছে 'হক'-এর দাওয়াত পৌছানো। মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মালায় নিমজ্জিত লোকগুলোর প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টাকারীকে উত্তাল তরঙ্গের সাথে লড়াই করেই ডুবন্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হয়। সর্বগ্রাসী অগ্নি শিখায় পরিবেষ্টিত মানুষগুলোকে যারা উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়, প্রজ্জ্বলিত অনলের প্রচন্ড তাপকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যেতে হয়। ঘন তমসাবৃত যামিনী দুর্গম গিরি কান্তার মরুর যাত্রীদের দৃষ্টিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কিন্তু অগ্রসরমান যাত্রী তার যাত্রা ক্ষণিকের জন্যও স্থগিত করে না। কারণ অন্ধকার পথের পথিকের জানা থাকে যে, অন্ধকার যতো বেশী গভীর হবে পূর্ব দিগন্তে নবারুণের আগমনী বার্তা ততোই জোরে ঘোষিত হতে থাকবে।

অন্ধকারের সূচীভেদ্য আবরণ ভেদ করে সাহসী যাত্রীরা সম্মুখপানে অগ্রসর হলে পূর্ব নীলিমায় তরুণ তপন উদিত হয়ে গোটা ধরণীকে যখন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে তখন তমসাবৃত যামিনীর তেজোদীপ্ত দুর্বিনীত যাত্রীদের পথের যাবতীয় বাধা স্বাভাবিকভাবেই অপসৃত হয়। পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে পথিমধ্যে বাধার অলংঘনীয় বিন্ধ্যাচলের দিকে হাতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে ব্যর্থ হবে। লক্ষ্যস্থল যদি যোজন যোজন দূরে অবস্থিত হয় আর পথের দূরত্বের দুর্ভাবনায় পথিক যদি যাত্রা পথে কদম উঠানোর পূর্বেই মনের ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে পথিক তার কাংখিত স্থানে পৌছতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি হিমশীতল শুভ্র তুষার আবৃত পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ বিজয় আকাংখায় যারা মনস্থির করেছেন তারা শৃঙ্গ আরোহন পথে প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শীতল হাতছানিকে নির্মম পায়ে পদদলিত করেই তাদের লক্ষ্যস্থলে দৃঢ়পদে পৌছতে সক্ষম হন।

সূর্যের প্রচন্ড কিরণে উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর যাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, মরুভূমির বিশালতা দেখে ঘাবড়ালে তা অতিক্রম করা যাবে না। ভয়াল জলধির উত্তাল উর্মিমালার হিংস্র কিরীটে

পদাঘাত করে যারা যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তারাই কেবল পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের অবস্থান নিরূপন করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী মিথ্যার বিজয় ভেরীর উচ্চ নিনাদে যারা কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে মসজিদ ও খানকার চার দেয়ালের মধ্যে আত্মরক্ষা করে তাদের পক্ষে মহাসত্যের দুন্দুভী বাজানো অসম্ভব। গাজী অথবা শাহাদাতের দুর্দমনীয় উগ্র কামনা হৃদয়ে যারা পোষণ করে তারাই কেবল মহাসত্যের দুন্দুভীতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং মহাসত্যের প্রতি যারা আহ্বান জানাবেন, 'হক'-এর দাওয়াত যারা দেবেন, তাদেরকে দুঃসাহসী হতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে যারা নিজের হাত-পায়ের শৃংখল ও কণ্ঠের জিঞ্জির মনে করে, সত্য প্রকাশের কাজের মধ্যে যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি দেখতে পায়, তাদের পক্ষে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার কাজ কোনো ভীরু-কাপুরুষের কাজ নয়, দুর্বল চিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারী লোকদের কাজ নয়, কুকুরের চিৎকারেই যাদের হৃদকম্পন শুরু হয়, এ কাজ তাদেরও নয়। এ কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সর্বপরি নিজের প্রাণকেও বাজি রাখতে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি সংখ্যাধিক্যের পরোয়া করে না এবং একা হলেও অকম্পিত কণ্ঠে 'হক' উচ্চারণ করার মতো হিম্মত রাখে।

দৈহিক নির্যাতন, সামাজিকভাবে অপদস্থ হওয়া, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা, জান-মালের ক্ষতি স্বীকারে যারা প্রস্তুত রয়েছে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরী ও ফাঁসীর মঞ্চকে স্বাগত জানাতে যারা দন্ডায়মান, কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই 'হক'-এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে ময়দানে ভূমিকা রাখা এবং 'হক' উচ্চারণ করা সম্ভব। কারো রক্তচক্ষু, গর্জন আর নির্মম চাবুকের নৃত্য দেখে এবং গোটা পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজের কৌশল পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু এই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কোনো সুযোগ নেই। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, গোটা বিশ্বলোকের রাজাধিরাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দাওয়াত দানকারী ময়দানে একা-নিঃসঙ্গ নন। মহান আল্লাহ বলেন- قَالَ لَاتَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى-

তোমরা ভয় পেয়ো না, শঙ্কিত হয়ো না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি এবং দেখছি। (সূরা ত্বা-হা-৪৬)

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেন, মহান আল্লাহ তার সাথে থাকেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা যখন সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই তিনি সাহায্য প্রেরণ করবেন। আর যারা 'হক'-এর বিরোধিতা

করবে, তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ মহান আল্লাহই করবেন। অতএব কোনো শক্তির পরোয়া না করে 'হক'-এর দাওয়াত দিতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে নির্ভীক চিত্তে দাওয়াতী কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে আদেশ দিয়েছিলেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُوَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ-اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ-الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ-

হে নবী! তোমাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শিরককারীদের মোটেও পরোয়া করো না। যেসব বিদ্রূপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা হিজর-৯৪-৯৬)

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেবেন, তাকে অবশ্যই অটুট মনোবলের অধিকারী হতে হবে। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এ সম্পর্কে আলোচ্য সূরার তাফসীরে ঈমানের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দাওয়াত দেয়ার কাজে যারা বাধার সৃষ্টি করে, মহান আল্লাহর শক্তির মোকাবেলায় তারা মাছির পাখার অনুরূপও নয়, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ছাপ হৃদয় ও মন-মগযে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও মহানত্বের সুস্পষ্ট ছাপ যার মন-মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একমাত্র তার পক্ষেই একাকী গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে বুক টান করে বিরোধিদের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে নির্লোভী হতে হবে

'হক' প্রতিষ্ঠার ময়দানে ব্যক্তিত্বহীন লোকজন অচল মুদ্রার অনুরূপ। এদের পক্ষে কোনো ব্যাপারেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করা, দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, প্রতিকূল ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করা, বিরোধিদের আক্রমনের মোকাবেলায় উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যাবতীয় লোভ-লালসা প্রত্যাখ্যান করে নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অনমনীয় থাকা ব্যক্তিত্বহীন লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই ধরনের লোকগুলো সাধারণ মানুষের কাছে নিজ চরিত্রে বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করলেও এদের ব্যক্তিত্বের থলে প্রকৃতপক্ষে শূন্য এবং এই শূন্যতা বিরোধিদের পক্ষের চতুর লোকদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। তারা এ কথা ভালো করে বোঝে, লোকটি মুখে যা দাবি করে, সে দাবির সাথে তার অন্তরে দৃঢ়তা নেই। ভয়-ভীতি বা পার্থিব লোভ-লালসার কাছে সে লোকটি নিজেকে সোপর্দ করে দেবে। সুতরাং

'হক' বিরোধী লোকদের কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অনমনীয় হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ-

যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে। (সূরা রূম-৬০)

বিরোধী পক্ষ 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে যেন দুর্বল বা ব্যক্তিত্বহীন মনে না করে। তারা একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করলো অথবা নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলো, নিন্দা আর অপবাদের ঝড় তুললো, 'হক'-এর প্রতি আহ্বানকারীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকলো আর অমনি 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারী মনোবল হারিয়ে ফেললো, উৎসাহ-উদ্দীপনা তার ভেতর থেকে বিদায় নিলো, দাওয়াতী কাজের ময়দান ত্যাগ করে ঘরে নিশ্চুপ বসে রইলো, দাওয়াত পেশকারী যেন এমন হালকা ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হয়।

দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য 'হক' বিরোধিরা নানা ধরনের লোভ-লালসা প্রদর্শন করবে, উচ্চপদ, সম্মান-মর্যাদা, পার্থিব দিক থেকে অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিতে চাইবে। জাতীয় সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে 'হক'পন্থীদেরকে সাময়িকের জন্য হলেও আপোষের পথে পরিচালিত হবার অনুরোধ করবে, এসব কিছুর মাথায় পদাঘাত করে 'হক'-এর দাওয়াতী অব্যাহত গতিতে চালাতে হবে। নিজেদেরকে উদ্দেশ্য সচেতন হতে হবে, লক্ষ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে সর্বাধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্কল্পে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং আমলে সালেহ্‌র বর্মে নিজ চরিত্র দুর্ভেদ্যভাবে পরিবেষ্টিত করতে হবে।

বিরোধী পক্ষ যেন এ কথা অনুভব করতে পারে, এই লোকগুলোকে ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা প্রদর্শন করে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কোনো প্রতারণা-প্রবঞ্চনার কূটজালে এদেরকে বন্দী করা যাবে না। কোনো মূল্যেই এদেরকে ক্রয় করে মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না। কোনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবতে ফেলে, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে, পত্র-পত্রিকায় এদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এদেরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না। প্রয়োজনে এরা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু মচকাবে না। এরা আপোষের চোরাগলিতে হারিয়ে যায় না। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর প্রতি ছুড়ে দেয়া যে কোনো অস্ত্রই ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে, এ ধরনের ব্যক্তিত্বই তাকে গড়তে হবে-আর এই ব্যক্তিত্ব গড়ার একমাত্র সহায়ক শক্তি হলো ঈমান ও আমলে সালেহ্।

'হক'-এর দাওয়াত দামকারীর এই ব্যক্তিত্ব দেখে সাধারণ মানুষ যখন এ কথা অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, এই ব্যক্তি মুখে ও লেখনীর মাধ্যমে যে কথার দিকে, যে আদর্শের

দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই কথা ও আদর্শের ব্যাপারে লোকটি প্রকৃত অর্থেই আন্তরিক। কারণ লোকটি সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছে, সে যে কথার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে, লোকটি সেই কথাগুলো প্রত্যেক পদে স্বয়ং অনুসরণ করছে। সুতরাং লোকটি যা বলছে তা অবশ্যই সত্য এবং কল্যাণকর। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সাধারণ মানুষের ভেতরে ঐ অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর লক্ষ্যে আমলে সালেহ্‌র বর্মে নিজেকে সর্বপ্রথম আবৃত করতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ তার দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষের ভেতরে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে এর বিনিময় আশা করা যাবে না। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, 'হক'-এর দাওয়াত বিক্রয় যোগ্য কোনো পণ্যের নাম নয়। এই কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। প্রত্যেক নবী-রাসূল যখন তাঁদের জাতির কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন, তখন তাঁরা জাতিকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে-

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا-اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ-

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে দাওয়াতের কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার কাজের বিনিময় আমার আল্লাহর কাছে রয়েছে। (সূরা হূদ-৫১)

'হক'-এর দাওয়াত দানকারী আল্লাহকে সাহায্য করে

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়ন করে একজন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম হবার যোগ্যতা অর্জন করে। এই যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই মানব জীবনে সফলতা অর্জনের প্রথম দুটো গুণ-ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র কথা আলোচ্য সূরায় সর্বপ্রথমে বলা হয়েছে। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা, সফলতা অর্জন ও কল্যাণ লাভের জন্য সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর গোলাম হতে হবে। আর এই গোলাম হবার জন্যই ব্যক্তিকে ঈমান আনতে হবে এবং আমলে সালেহ্ করতে হবে। কিন্তু মহান আল্লাহর সাহচর্য, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা অর্জনের একমাত্র পথ হলো ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর সাহায্যকারী হতে হবে। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ হিসাবে বর্তমান পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোকজন সাধারণ মানুষকে নানা পথপ্রদর্শন করে থাকে।

অমুক পীর সাহেবের মুরীদ হলে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ দেখিয়ে দেবেন, বছর ব্যাপী রোযা পালন করলে, গোটা জীবন ব্যাপী রাতের পর রাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলে, অমুক দোয়া বা তস্‌বীহ্ দিনরাতের অমুক সময় সংখ্যায় এত বার জপ করলে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা যাবে-এসব কথা বলে ঈমানদারকে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে নফল নামায-রোযা অবশ্যই

আদায় করতে হবে। কিন্তু সাথে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে, তাঁরা কোনো পথ অবলম্বন করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মহান আল্লাহর সাহায্যকারী। আর আল্লাহর সাহায্যকারী যারা হয়, একমাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে অবস্থান করেও আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থান করেন।

আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া বলতে কি বুঝায়, সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। মহান আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং এই কাজে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'আল্লাহকে সাহায্য করা' বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ-স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেই সাথে মানুষকে সত্য ও মিথ্যা পথও প্রদর্শন করেছেন। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে সত্য ও মিথ্যা পথের যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের গায়েবী শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর কোনো নাফরমান বা বিদ্রোহী বান্দাকে তাঁর বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য করেন না।

গায়েবী শক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা কিতাব অবতীর্ণ করে, যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে এ কথাই বুঝিয়ে থাকেন যে, 'আমার বিধান অনুসরণ করা বা না করার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে। তুমি আমার নাফরমানী করতে পারো, আমাকে অস্বীকার করতে পারো, আমার বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করতে পারো। কিন্তু তোমার এই ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা থাকার পরও তোমার উচিত হলো, আমার গোলামী ও দাসত্ব করা। কারণ তোমাকে আমিই সৃষ্টি করে লালন-পালন করছি আর এ কাজে আমার সাথে অন্য কেউ-ই শরীক নেই। যদি তা না করো তাহলে তোমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর যদি আমার দাসত্ব কবুল করো, তার উত্তম বিনিময়ও আমি প্রদান করবো।'

এভাবে যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে মহাসত্যের পথে পরিচালিত করা হলো মহান আল্লাহর কাজ। কিন্তু এই কাজ তিনি স্বশরীরে আগমন করে বা বান্দাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে করেন না। তিনি নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করে এই কাজ করে থাকেন। মহান আল্লাহ সর্বশেষ এই কাজ করেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাঁর বিদায়ের পরে এই কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উম্মতদের ওপরে। সুতরাং কোনো মানুষ যখন অন্য মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালো, সেই ব্যক্তিই মহান আল্লাহর কাজে সাহায্য করলো। আর আল্লাহর কাজে যারা সাহায্য করে, একমাত্র তারাই মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। 'হক'-এর

দাওয়াত দেয়া হলো আল্লাহর কাজে সাহায্য করা। যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেন, মহান আল্লাহর ভাষায় তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ-

আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। (সূরা হজ্জ-৪০)

সাধারণ মানুষে স্বভাব হলো, কোনো ক্ষমতাবান লোকের সাথে যদি তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকে, তাহলে সে তা গর্বভরে প্রকাশ করে। এতে করে সে এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করে যে, অমুক ক্ষমতাবান লোকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং আমার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ বা অশোভনীয় ব্যবহার করার পূর্বে সতর্ক হওয়া উচিত, আমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, এ কথা ঐ ক্ষমতাবান লোকটি জানতে পারলে তিনি এর কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

ক্ষমতাবান ও সম্মান-মর্যাদার অধিকারী লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে সাধারণ লোকজন আগ্রহ পোষণ করে, তাদের কোনো খেদমত করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু যে কাজটি করলে এই মহাবিশ্বের মালিক সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা যাবে, তাঁর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করা যাবে, তাঁর বন্ধুত্ব ও সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই কাজটি থেকে একশ্রেণীর ঈমানদার দুঃখজনকভাবে নিজেকে বিরত রেখেছে। সেই কাজটি হলো 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া। 'আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকারী' এর থেকে অহঙ্কার ও গর্বের বিষয় মানুষের জন্য আর কি হতে পারে! সুতরাং 'হক'-এর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে আর এ পথেই নিজেকে 'আল্লাহর সাহায্যকারী'দের দলে শামিল করতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেবেন, তিনি যে বিষয়ে অন্য মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয়ে তাকে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে। শ্রুতি মধুর ভাষায়, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাওয়াত দিতে হবে। 'হক'-এর দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে, সে পন্থাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখিয়ে দিয়েছেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ-

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রব-এর পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা নাহল-১২৫)

যাকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, দাওয়াত দানকারী সর্বপ্রথমে তার মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী কোন্ রোগে আক্রান্ত, তা যদি ডাক্তার সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার যাবতীয় চিকিৎসাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, কোন প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি 'হক'-এর কথাগুলো চম্বুকের মতোই গ্রহণ করবে এবং তার ভেতরে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। যারা ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে-তার সামনে শ্রোতাদের ধরন কেমন। তিনি কোন্ ধরনের শ্রোতাদের সামনে কথা বলছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

শ্রোতা কোন্ ধরনের কথা ধারন করার উপযুক্ত, তার মন-মানসিকতা কথা শোনার অনুকূলে রয়েছে কিনা, তা অনুধাবন করে 'হক'-এর দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ কেউ-ই সমস্যা মুক্ত নয়, সর্বোত্তম কথাও সমস্যার ভারে আক্রান্ত মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কথা শুনতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মনে ভিন্ন চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। দাওয়াত দানকারীর কথার প্রতি সে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। দাওয়াত দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির রয়েছে, জরুরী কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে কোথাও তার যাওয়া প্রয়োজন, এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সঠিক সময় নির্ধারণ করে 'হক'-এর দাওয়াত পেশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হবে, সেই অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বা কথা এগিয়ে যেতে হবে। শ্রোতা যদি অনুভব করে যে, লোকটি তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার মনে দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। সুতরাং এমন কোনো আচরণ বা কথা বলা যাবে না, যা শ্রোতাকে দাওয়াত গ্রহণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতা এ কথাই যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। 'আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পরিচালিত করার জন্য লোকটি আন্তরিকতার সাথেই আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, লোকটি সত্যিকার অর্থেই আমার কল্যাণকামী'-দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলে দাওয়াতী কাজে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

শ্রোতার ব্যক্তিত্বে, অহংবোধে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং বিষয়েরও অবতারণা করা যাবে না। দাওয়াত দেয়ার, বলার ও উপস্থাপনের ধরন হতে

হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যেন শ্রোতা অতি সহজেই কথকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটা একটি সাধারণ বিষয় যে, মিষ্টভাষী ও বিনম্র লোকদের প্রতি অন্যান্য লোকজন সহজেই আকৃষ্ট হয়। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে এসব বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। শ্রোতা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য সরাসরি আঘাত করা যাবে না। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে শ্রোতার মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সত্যই তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দাওয়াত দানকারী যখন এ কথা অনুভব করবেন, শ্রোতা অযথা বিতর্ক সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

যার কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করার মতো কোনো কথা বলে, তাহলে দাওয়াত দানকারীকে অসীম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিপক্ষ যতো অপসন্দনীয় ও বিরক্তি সৃষ্টিকারী কথাই উচ্চারণ করুক না কোনো, এর মোকাবেলা সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে করতে হবে। মন্দের জবাবে মন্দ বা নোংরামীর জবাব নোংরামী দিয়ে দেয়া 'হক'-এর বিপরীত কাজ। ধীর স্থির মস্তিষ্কে ঠান্ডা মাথায় প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলতে হবে এবং তার খারাপ আচরণের অনুরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না। যার কাছে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার আচরণ আর দাওয়াত দানকারীর আচরণ যদি সমমানের হয়, তাহলে দাওয়াতের কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী যে কোনো ধরনের অশোভন আচরণ সর্বোত্তম ভদ্রতার মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে হবে। কোরআন এভাবে শিক্ষা দিচ্ছে-

لاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ-

এসব লোকদের অশোভন আচরণকে ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও। (সূরা হিজর-৮৫)

'হক'-এর দাওয়াতের ময়দানে শয়তান সবথেকে বেশী সক্রিয় থাকে। একজন লোক যখন 'হক'-এর দাওয়াত গ্রহণ করে, তখন শয়তানের অনুচরের সংখ্যা হ্রাস পায়। আর মানুষ যেন কোনো ভাবেই সত্য গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, শয়তান এদিকেই অধিক তৎপর থাকে। এ জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সতর্ক থাকতে হবে, তিনি যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন, কোনোক্রমেই যেন তার সাথে কোনো একটি দিক দিয়েও তিক্ততার সৃষ্টি না হয়। শ্রোতার কথায় অনেক সময় মন-মানসিকতা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ধারন করতে হবে। দাওয়াত দানকারীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শয়তান তার প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাকে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করতে হবে। (বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা ফালাক ও নাসের তাফসীর পাঠ করুন।)

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সর্বক্ষেত্রে কোরআনের যুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে এবং শ্রোতাকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে তিরমিযী হাদীসে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা এসেছে এভাবে যে-

مَنْ قَالَ بِه صَدَقَ-وَمَنْ عَمِلَ بِه أُجِرَ-وَمَنْ حَكَمَ بِه عَدَلَ- وَمَنْ دَعَاالَيْهِ هُدِىَ الى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ-

এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।'

অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে যারা কোরআন থেকে যুক্তি পেশ করে কথা বলে, তাদের কথার মধ্যেই সত্যতা বিদ্যমান থাকে। জীবনের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে যারা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে যারা কোরআনের দেয়া রায় অনুসারে বিচার ফায়সালা করে, তাদের বিচারই ন্যায় বিচার হয়ে থাকে। আর কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে যারা আহ্বান করে, তারাই সবথেকে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণময় পথের দিকে আহ্বান করে।

'হক' বিরোধিদের ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা

আলোচ্য সূরার তাফসীরে আমরা ইতোপূর্বে গাধা ও খাসীর গল্পের অবতারণা করে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, খাসীর যত্ন তার মালিক এ জন্য বৃদ্ধি করেছে যে, কোরবানীর চাঁদ উঠেছে এবং তাকে কোরবানী করা হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ বিরোধী লোকদেরকে তাদের ঈমানহীন সৎকাজের বিনিময় হিসাবে এই পৃথিবীতে অধিক ধন-ঐশ্বর্য্য দান করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্র পেছনে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না বিধায় তাদের পাওনা এই পৃথিবীতেই পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে করে অতীত যুগে ফেরাউন, নমরূদ এবং তাদের অনুরূপ প্রত্যেক যুগে যারা ভূমিকা পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে সম্পদশালী করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে শান-শওকত, চাকচিক্য ও অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়েছে। যারাই মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের ভূমিকা পালন করছে, তাদেরকে এভাবেই পৃথিবীতে কর্মের বিনিময়ে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে।

'হক' বিরোধী লোকদের এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোকগুলো দ্বীনে হক সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এরা প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে

না, তারা ইসলাম বিরোধী আদর্শের মোকাবেলায় দ্বীনে হক-এর দুর্বলতা আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোর ক্রমাগত অসফলতা এবং ইসলাম বিরোধিদের চাকচিক্যপূর্ণ ও জাঁকজক এবং পার্থিব নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেখে ধারনা করে যে, আল্লাহ বিরোধী লোকগুলোই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব অর্জন করুক, তারাই সর্বত্র সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক, প্রভাব বিস্তার করুক আর যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেয়, তারা তারা দুর্বল ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে থাক-এটাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।

কারণ ইসলাম বিরোধী শক্তির বাহ্যিক চাকচিক্য, জাঁকজমক ও সাজ-সজ্জা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সৌন্দর্য, উন্নতি-অগ্রগতির কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অনুসরণ করতে থাকে। তারা উপায়-উপদানের প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের নীতি-আদর্শ ও কর্ম কৌশলকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীরা নিজেদের কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন করার তেমন কোনো উপায়-উপাদান পাচ্ছে না, এদের লোকবল নেই, অর্থবল নেই, প্রচার যন্ত্র নেই, কোনো কিছুরই প্রাচুর্যতা নেই। ব্যক্তি জীবনেও এরা দারিদ্রতার সমুদ্রে নিমজ্জিত। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাই এটা। তিনি হকপন্থীদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখবেন।

দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকগুলো এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে 'হক' তথা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এখন বরং নামায-রোযা, কোরআন তিলাওয়াত ও তসবীহ্ জপার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী পরিবেশে জীবন-যাপন করাই যুক্তি সংগত। এই ধরনের অমূলক চিন্তা-ভাবনা যারা করে, তারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকগুলোর অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন-

فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعَنَّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

নিজ কর্মপন্থার ওপরে দৃঢ়-মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (সূরা ইউনুস-৮৯)

দ্বীনে হক বিরোধী, মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে যারা জীবন-যাপন করে না তাদের অঢেল ধন-সম্পদ দেখে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী নিজের অভাব ও দারিদ্রতার কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্যও মনোক্ষুন্ন হবে না। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আখিরাতের জীবনে সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন আর ঐ লোকগুলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ-

আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পৃথিবীতে যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা হিজ্‌র-৮৮)

আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে একজন লোক ছিলো, পবিত্র কোরআন যাকে 'কারূণ' নামে উল্লেখ করেছে। এই লোকটি নিজ জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিলো। সরকারী অনুকম্পা লাভ করে এই ব্যক্তি বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছিলো। তার ইতিহাস আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ-وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ-اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ-وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ-اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে কারূণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফেরাউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দিলেন, তখন লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো- قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ-

এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি।

এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا-وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-

সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না। (সূরা কাসাস-৭৮)

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে এক শ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা শোনাচ্ছেন-

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِه فِىْ زِيْنَتِه قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ-

একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, 'আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।' (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি-লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন

করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, 'তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল।' হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা শোনাচ্ছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ–

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, 'তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না। (সূরা কাসাস-৮০)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্‌নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর স্থির মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক উত্তম যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা খুব দ্রুত তাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَخَسَفْنَا بِه وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ-فَمَا كَانَ لَه مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَه مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ-وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَه بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ-لَوْ لاَ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّه لاَ يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না। (সূরা কাসাস-৮১-৮২)

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না।

'হক'-এর দাওয়াত যারা দেন, তারাও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার পথ কন্টকাকীর্ণ পথ-এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে চলতে গেলে নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হতে হবে। নিন্দা, অপবাদ আর কটুবাক্য বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে। এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতায় বিসন্নতা ছেয়ে যেতে পারে। মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, 'আমি যে লোকগুলোকে ধ্বংস আর ক্ষতির পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণ আর সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, সেই লোকগুলোই আমাকে এভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করছে।' মনে এই ধরনের চিন্তা জাগরূক হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূলও দাওয়াতের ময়দানে লোকদের কাছ থেকে এমন আঘাত পেতেন। তাঁর মনও ব্যথাভারাক্রান্ত হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার পথনির্দেশনা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এভাবে দিয়েছেন-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর বন্দেগী করে যেতে থাকো। (সূরা হিজ্‌র-৯৭-৯৯)

অর্থাৎ 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, নিন্দা-অপবাদ, কলঙ্ক হকপন্থীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার প্রচার করা হচ্ছে, তার মোকাবেলা করার শক্তি তারা একমাত্র নামায ও মহান আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। নামায-রোযা আদায়, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতা থেকে বিসন্নতা দূর করে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করবে, সাহসিকতা ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং 'হক'-এর দাওয়াত পেশকারীকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে, যার ফলশ্রুতিতে গোটা পৃথিবীর মানুষের ছুড়ে দেয়া নিন্দাবাদ, অপবাদ আর প্রতিরোধের মোকাবেলায় দাওয়াত দানকারী অটুট মনোবলের সাথে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ধৈর্যের ব্যাপক ও সামগ্রিক অর্থ

আলোচ্য সূরার শেষে যে গুণটি অর্জনের জন্য বলা হয়েছে, তাহলো মানব জীবনের সবথেকে বড় গুণ। সে গুণটির নাম হলো ধৈর্য বা সবর। মানুষ যখন মিথ্যার বিপরীত সত্যকে গ্রহণ করবে, পৃথিবীর যাবতীয় মিথ্যা আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি ত্যাগ করে একমাত্র সত্য আল্লাহর বিধান গ্রহণ করবে, সেই অনুসারে জীবন চালাবে এবং এই বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যা শক্তি সত্যের বাহকদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। নানা ধরনের নির্যাতন, নিষ্পেষন, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। এই অবস্থায় আল্লাহর বিধানের ওপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেবে। অসীম ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দ্বীনি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেভাবে নবী ও তাঁর সাহাবাগণ এগিয়ে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ধৈর্য তথা 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদারদের গোটা জীবনই ধৈর্যের

জীবন। ঈমানের পথে পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব আদেশ দিয়েছেন, তা পালন করার ব্যাপারে ধৈর্যের প্রয়োজন। যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকা জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা ও পরিহার করে চলাও ধৈর্যের প্রয়োজন। প্রতিটি পদে যে পাপের হাতছানি ও আকর্ষণ, তা থেকে দূরে অবস্থান করা জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। গভীর নিশীথে আরামের শয্যা ত্যাগ করে নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গেলে বৈষয়িক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এ অবস্থায় পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গেলে বিপদ-আপদ, মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে আলিঙ্গন করতে হয়, এসব ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ব্যতীত সফল হওয়া যায় না এবং ঈমানও টিকিয়ে রাখা যায় না। ঈমান গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা থেকে শুরু করে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে, সমাজের সাথে, দেশের প্রচলিত আইনের সাথে এবং শয়তানের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ না করলে ঈমানের ওপরে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে হিজরাত ও জিহাদের প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়েও ধৈর্য নামক মহৎ গুণটির একান্ত প্রয়োজন। এই অবস্থায় একজন মুমিন একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাকে প্রতি পদে পদে পরাজয় বরণ করার ঝুঁকি থেকে যায়। সফলতা অর্জন করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য একটি মুমিন সমাজ বা দলের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল হয়, সমস্ত লোকগুলো পরস্পরকে ধৈর্যের প্রেরণা দিতে থাকে এবং মহাপরীক্ষার সময় তার পেছনে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ঈমানদারদের সমাজ–দল বা সমাজের ও দলের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তখন সেই সমাজ বা দলের গতি হয় অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্বার। এক দুর্বিনীত অদম্য শক্তিতে ধৈর্যশীলদের সেই দল আত্মপ্রকাশ করে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণের সমাহার যে দলের কর্মীদের মধ্যে ঘটবে, একমাত্র সেই দলের পক্ষেই সম্ভব দেশের বুক থেকে অন্যায়-অবিচার আর অনাচার ও পাপাচার দূর করা। সেই দলকে মহান আল্লাহ অবশ্যই বিজয় দান করবেন এবং দেশ ও জাতির নেতৃত্ব তাদেরকে দান করবেন। একদিন তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণহীন শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

সবর বা ধৈর্যের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অভিধানে 'সবর' শব্দের অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'বিরত রাখা, বাধা দেয়া।' আবার কোনো ক্ষেত্রে এর অর্থ করা হয়েছে, 'ইচ্ছার দৃঢ়তা,

সঙ্কল্পের পরিপক্কতা এবং এমন শক্তিকে প্রয়োগ করে লালসা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ করা, যার সাহায্যে একজন মানুষ নিজের প্রবৃত্তির তাড়না, কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে বা দ্বীনি আন্দোলনের পথে বাহ্যিক বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে না থেমে অব্যাহত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় যে শক্তির মাধ্যমে, তাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়।

যে কোনো ধরনের লোভ-লালসা এবং আবেগ-উচ্ছাসের ভাবধারাকে সংযত রাখাও 'সবর'-এর অন্তর্গত। অহেতুক ব্যাকুলতা প্রকাশ না করা, তাড়াহুড়া না করা, বিপদ শঙ্কুল অবস্থা দেখে না ঘাবড়ানো, লোভ-লিপ্সা ও বাঞ্ছিত উত্তেজনা পরিহার করাও 'সবর'। ধীরস্থির মনোভাব সহকারে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবরকারীদের অন্যতম গুণ। ঈমানদার ব্যক্তির সামনে বিপদ-আপদ ও কঠিন অবস্থা সম্মুখে এলে 'সবর' তার ভেতরে সচেতনতা সৃষ্টি করে দেয় এবং পদস্খলন থেকে তাকে মুক্ত রাখে। 'সবর' এমন একটি সুন্দর গুণ যে, তা উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থাতেও ক্রোধ ও রাগের তীব্রতা হ্রাস করে মানুষকে অবাঞ্ছনীয় কর্ম থেকে বিরত রাখে। বিপদের ঘন-ঘটা সমাচ্ছন্ন হয়ে এলেও এবং অবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটতে থাকলেও 'সবর' মানুষের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি ও জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত হওয়া থেকে হেফাজত করে। মানুষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অতি আগ্রহে দিশাহারা হয়ে অনেক সময় অপরিপক্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সেই ব্যবস্থাকে সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকরী মনে করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। 'সবর' এমন একটি উত্তম গুণ যে, মানুষকে এই অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকে ঢালের ভূমিকা পালন করে।

নিতান্ত বৈষয়িক স্বার্থ, বড় অঙ্কের মুনাফা বা লাভ, ভোগ-বিলাস ও আত্মতৃপ্তির আকর্ষণ অনেক সময় মানুষকে লোভাতুর বানিয়ে দেয়। এই অবস্থায় নিপতিত হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং মন-মানসিকতায় দুর্বলতা ছেয়ে যায়। 'সবর' এসব অবস্থা থেকে মানুষকে দূরে রেখে মূল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে প্রত্যেক কদমে সবর করতে হয়। এই ময়দানে 'সবর' নামক গুণটির অভাব দেখা দিলে বা এই গুণের ভেতরে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। আন্দোলনের সাথীদের সবার গুণ-বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা অনেক সময় পসন্দের বিপরীত হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাথীর কথাবার্তা ও আচার আচরণকে 'সবর' বা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। ধৈর্যের অভাব ঘটলেও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটবে, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে। 'সবর'-এর অভাবে নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে প্রতিপক্ষের সামনে টিকে থাকা যাবে না এবং ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يـٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا-اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

হে ঈমানদারগণ! কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হয়, তখন দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্য সহকারে সব কাজ আঞ্জাম দিও, নিশ্চিত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল-৪৫-৪৬)

সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করাও 'সবর'

পৃথিবীতে মৌসুম পরিবর্তন হয় এবং এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। শীতের মৌসুমে গোটা প্রকৃতিতেই পরিবর্তনের একটি ধারা বইতে থাকে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মানুষ, সবার দেহেই পরিবর্তনের সেই বাতাস ছোঁয়া দিয়ে যায়। বিশেষ করে মানুষের ত্বকে শুষ্কতা বিরাজ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদ জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। উদ্ভিদ তার শ্যামলিমা হারিয়ে শুষ্ক আকার ধারণ করে। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে উদ্ভিদ জীর্ণতা ও শুষ্কতার আক্রমণ প্রতিহত করে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে সর্বত্র পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। কোনো কিছুই চিরদিন একই অবস্থায় বিরাজ করে না। মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো ব্যক্তি বা জাতির জীবনেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রূপে বিদ্যমান থাকে না। এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং এটাই মহান আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতি।

এক শ্রেণীর মানুষের অবস্থা হলো, তাদের জীবনে যখন কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটে, তখন তারা অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তাদের ভঙ্গি থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিপূর্ণ। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করে, অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। হাঁটা, চলাফেরা, ওঠা-বসায়, পোষাক-পরিচ্ছদে একটা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। পূর্বে সে কি ছিলো, কোন্ জীর্ণ দশা থেকে সে বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছে, এ কথা কল্পনা করার কষ্টটুকুও করতে চায় না। অহমিকা-দাম্ভিকতা, ক্ষমতা আর সম্পদের নেশায় সমস্ত কিছুকে নিজের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করতে চায়।

পক্ষান্তরে এই অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটে, বিপদ-মুসিবত তাকে গ্রাস করে, ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন তারা হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। নিজের তকদিরকে ধিক্কার দিতে থাকে এবং আপন স্রষ্টার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি অভিশাপ

দিতেও এদের বিবেকে বাধে না। কিন্তু যারা ঈমানদার এবং সালেহ্কারী ধৈর্যশীল, তাদের অবস্থান এমন হয় না। তাদের জীবনে কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটলে তারা মহান আল্লাহ্ প্রতি অধিক মাত্রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, গর্ব অহঙ্কারে তাদের বুক ফুলে ওঠে না। আবার হঠাৎ কোনো বিপদ-মুসিবত তাদের ওপর আপতিত হলেও তারা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে, পরম ধৈর্যের সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তারা সততার পথ অবলম্বন করে চলে। শুভ পরিবর্তনে গর্ব অহঙ্কারে ফেটে পড়া আর বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হলে হতাশাগ্রস্ত হওয়া, এই হীনতা ও নীচতা কেবলমাত্র তারাই মুক্ত, যারা 'সবর' নামক গুণ অর্জন করতে পেরেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ-أُوْلَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ-

এই ত্রুটি থেকে কেবল সেই লোকেরাই মুক্ত, যারা ধৈর্য অবলম্বনকারী এবং নেক আমলকারী। আর তারাই এমন যে, ক্ষমা ও বড় পুরস্কার তাদেরই জন্য রয়েছে। (সূরা হূদ-১১)

যেসব ব্যক্তি বা জাতি কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজেদের মন-মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, সময়ের পরিবর্তন তথা শুভ পরিবর্তন ঘটলে সাথে সাথে নিজের কথা, চলাফেরা, ব্যবহারে ও মন-মানসিকতা পরিবর্তিত করে না, দাম্ভিকতা-অহঙ্কার প্রকাশ করে না, সর্বাবস্থায় এক যুক্তিসঙ্গত, সতত ও সুস্থ আচরণ রক্ষা করে জীবন পরিচালনা করে, তারাও ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত। অবস্থার অনুকূলে এবং অর্থ, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রশংসা-যশ ও জনবলের বিপুলতায় সামান্যতম অহঙ্কারের চিহ্নও প্রদর্শন করে না। আবার কোনো সময় বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ববোধকেও বিনষ্ট করে না। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নে'মাতের রূপ ধারণ করেই আসুক অথবা বিপদ-মুসিবতের রূপেই আগমন করুক, সর্বাবস্থায় তারা সততার নীতি অবলম্বন করে ধৈর্য ধারণ করে–এই লোকগুলোকে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীল, আমলে সালেহ্কারী এবং ক্ষমা ও পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

ধৈর্য বা 'সবর' এমন এক দুর্লভ গুণ, এই গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে যেমন সফলতা অর্জন করতে পারে এবং পরকালের জীবনেও কল্যাণ লাভ করবে। এই গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করে থাকে। নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা তথা লালসা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিজেদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ঝোঁক-প্রবণতাকে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। মহান আল্লাহর নিষেধমূলক কাজে, তাঁর অপসন্দনীয় কোনো কাজে তারা নিজেদেরকে জড়িত করে না। ঘুষ গ্রহণ করে অবৈধ পথে কাউকে কোনো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিলে, নৈতিকতা বিরোধী কোনো অবৈধ ব্যবসার সাথে নিজেকে জড়িত করলে প্রচুর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হওয়া যায়, যাবতীয় অভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিলাসী

জীবন-যাপন করা যায়, এসব সুযোগ সামনে উপস্থিত দেখেও ঈমানদার মহান আল্লাহর নির্দেশে ধৈর্য অবলম্বন করে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মাথায় পদাঘাত করে।

যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গিয়ে পার্থিব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, নিজের প্রভাব-প্রতিপতি হারিয়ে যায়, তবুও ধৈর্য অবলম্বন করে সততার পথেই অটল অবিচল থাকে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এবং পরকালের চিরস্থায়ী শুভ ফলের আকাংখায় পৃথিবীতে যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে আত্মসংযম করে, পাপ-অপরাধের দিকে নিজের প্রবৃত্তির তীব্র আকর্ষণ ও ঝোঁক-প্রবণতাকে যারা 'সবর' নামক অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করে, এরা পরকালেও যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে, তেমনি এই পৃথিবীতেও সাধারণ মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সততার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মানসিকতা বর্তমান অপরাধে নিমজ্জিত পৃথিবীতেও দেখা যায়। ঘুষখোর, অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী, আত্মসাৎকারী ও লোভী ব্যক্তিকে কেউ-ই সুদৃষ্টিতে দেখে না বা একান্ত বাধ্য না হলে কোনো মানুষ তার প্রশংসাও করে না। কিন্তু ধৈর্য অবলম্বন করে যারা এসব কাজের সুযোগ থাকার পরও অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সততাকে উচ্চে তুলে ধরে, সাধারণ মানুষের কাছে তারা সম্মান ও মর্যাদার পাত্রে পরিণত হন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সততা অবলম্বনকারী তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের সম্পর্কে সূরা রা'দ-এর ২২ নম্বর আয়াতে বলেন-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ-

তাদের অবস্থা এমন যে, নিজেদের রব-এর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।

অন্যায়ের মোকাবেলা ন্যায় দ্বারা করাও 'সবর'

অহঙ্কারী ও দাম্ভিক লোকগুলো সাধারণত অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। অন্যের কোনো আচরণ বা কথা পসন্দ না হলে সাথে সাথে অহঙ্কারী ব্যক্তি হীন আচরণ করে মনে মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে যে, 'সে-ও ছেড়ে কথা বলেনি, প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।' পথ চলতে অসতর্কতা বশতঃ কারো দেহের সাথে ধাক্কা লাগলে এই শ্রেণীর লোকগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অধীনস্থ লোকদেরকে কোনো কাজের আদেশ করা হয়েছে। সে কাজ করতে ভুল

করলো অথবা কাজটি করতে একটু দেরী হয়ে গেলো। অহঙ্কারী ধৈর্যহীন লোকগুলো তৎক্ষণাত অধীনস্থদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে রূঢ় আচরণ করলো। অর্থাৎ এসব লোকদের মধ্যে ধৈর্যের বড়ই অভাব। ধৈর্যহীনতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না, মানুষকে অকল্যাণের দিকেই নিক্ষেপ করে।

মহান আল্লাহর সন্তোষ অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা অন্যায়ের মোকাবেলা অন্যায় দিয়ে নয়-বরং ন্যায় ও পুণ্য কাজের মাধ্যমে করে। অপরাধের মোকাবেলা অপরাধ দিয়ে নয়, পাপের প্রতিবন্ধকতা পাপ দিয়ে নয়-সৎকাজ ও কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে করে। ঈমানদার ধৈর্যশীল লোকদের ওপরে যারা জুলুম-অত্যাচার করে, তার জবাবে এরাও জুলুম-অত্যাচার করে না। তারা জুলুমের মোকাবেলা ইনসাফের মাধ্যমে করে। তাদের বিরুদ্ধে যতোই অশালীন ভাষা, মিথ্যাচার ও প্রচার মাধ্যমে অপবাদ ছড়ানো হোক না কেনো, এসবের জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে তারা সততা ও শালীনতার মাধ্যমেই জবাব দিয়ে থাকে। কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করলে তার সাথেও তারা অনুরূপ আচরণ করে না, বরং বিশ্বাসপরায়ণতাই প্রদর্শন করে।

মহান আল্লাহর সন্তোষ অনুসন্ধানে তৎপর ধৈর্যশীল লোকগুলো অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে করে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاَتَكُونُواْ امَّعَةً-تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُونَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُواْ اَنْفُسَكُمْ-اِنْ اَحْسَنَ اَنْ النَّاسُ اِنْ تَحْسِنُوْ وَاِنْ اَسَاؤْ اَفَلاَ تَظْلِمُواْ-

তোমরা নিজেদের কর্মনীতিকে অন্য লোকদের কর্মনীতির অনুসারী বানিও না। এমন বলা ঠিক নয় যে, লোকজন ভালো করলে আমরাও ভালো করবো আর অন্যেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো, বরং তোমরা নিজেদের মন ও নফসকে এক নিয়মের অনুসারী বানাও। লোকজন সৎকর্ম করলে তোমরাও সৎকর্ম করবে আর লোকজন অন্যায় করলেও তোমরা জুলুম করবে না।

আরেকটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার মালিক মহান আল্লাহ আমাকে নয়টি কথার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে চারটি নির্দেশ এমন যে, (১) আমি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হই কি অসন্তুষ্ট-সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথাই বলবো। (২) যে আমার হক আত্মসাৎ করবে, আমি তার হক আদায় করবো। (৩) যে আমাকে বঞ্চিত করবে, আমি তাকে দান করবো। (৪) যে আমার ওপর জুলুম করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'

উল্লেখিত হাদীসে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সবই 'সবর' বা ধৈর্যের সাথে সম্পর্কিত। ধৈর্যহীন লোকদের পক্ষে মহান আল্লাহর নির্দেশসমূহ কোনোক্রমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।' মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, 'তোমার সাথে যে ব্যক্তি কারবার করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না, তাকে শাস্তি দানের উত্তম পন্থা এই যে, তুমি তার সাথে আল্লাহকে ভয় করে কারবার করবে।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর নীতি ছিল, তিনি সব সময় ক্ষমতাসীন লোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। নিজের কোনো প্রয়োজনেই তিনি কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের কাছে ধর্ণা দেননি। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ কামনা করতেন, তাঁর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রের শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শাসকদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতেন। তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন লোক ছিল পেশায় জুতার কারিগর। লোকটি প্রতিদিন রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে হট্টগোল করতো। এতে করে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) অসুবিধা অনুভব করলেও কখনো লোকটির প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করেননি।

একদিন রাতে তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রতিবেশী সেই লোকটির বাড়ি থেকে কোনো হট্টগোল শোনা যাচ্ছে না। দীর্ঘ দিন ধরে যা ঘটে আসছে, আজ তার ব্যতিক্রম দেখে তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, নেশাগ্রস্ত হয়ে হট্টগোল করার কারণে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লোকটিকে জেলখানায় বন্দী করেছে। তিনি কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলেন খলীফার দরবারে। যাঁকে অনুরোধ করেও খলীফার দরবারে আনা যায় না, সেই লোকটি স্বয়ং খলীফার দরবারে আসছেন, এটা দেখে খলীফা এবং তার সভাসদবৃন্দ অবাক হয়ে গেলেন। স্বয়ং খলীফা উঠে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, 'আপনি কেনো কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছেন, আমাকে সংবাদ দিলে আমিই আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করতাম।'

ইমাম বললেন, 'আমি আমার নিজের কোনো প্রয়োজনে আপনার দরবারে আসিনি। আমার একজন প্রতিবেশী পেশায় জুতার কারিগর। মদপান করে হট্টগোল করেছে আর সে কারণেই আপনার লোকজন তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করেছে। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিন।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) তাঁর মদ্যপ প্রতিবেশীকে মুক্ত করে আনলেন। দিনের পর দিন লোকটির বিরক্তকর আচরণ ইমাম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। বাড়িতে ইমাম নামাযে দাঁড়িয়েছেন অথবা গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করছেন, এমন সময় লোকটি

নেশাগ্রস্ত হয়ে হৈ-চৈ করেছে। তিনি অসুবিধা অনুভব করেছেন কিন্তু কখনো লোকটিকে তিরস্কার করেননি। লোকটির যাবতীয় অন্যায় আচরণ তিনি পরম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। ইতিহাস কথা বলে, সেই দিনের পর থেকে লোকটি আর কখনো মদ স্পর্শ করেনি। সহিষ্ণুতার এটাই উত্তম বিনিময়। ইমামের ধৈর্য ঐ মদ্যপ লোকটিকে চিরদিনের জন্যই মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'

অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'-কথাটি বর্তমান অসহিষ্ণু পরিবেশে লালিত-পালিত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অভিনব মনে হতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, এই অস্ত্র প্রয়োগ করেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্বর জাতির ওপরে সার্বিক দিক দিয়ে প্রধান্য বিস্তার করে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন, 'আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।' অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করার বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে পবিত্র কোরআন শরীফে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ-ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا-وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

হে নবী! সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শক্রতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না। (সূরা হামীম সিজ্‌দা-৩৪-৩৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী এবং নবীর অনুসারীদেরকে মক্কায় কোন্ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াতে নির্দেশ দিলেন যে, 'সৎকাজ এবং অসৎকাজ এক ধরনের নয়। অসৎকাজকে মিটিয়ে দিতে হবে সবথেকে উত্তম সৎকাজের মাধ্যমে।' শুধু তাই নয়, অসৎকাজকে সৎকাজের মাধ্যমে মোকাবেলা করলে এর শুভ পরিণাম কি হবে, সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'তুমি দেখবে, যারা তোমাকে চরম শক্র মনে করতো, তারা তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাবে।' অসৎকাজকে সৎকাজের মাধ্যমে কারা মোকাবেলা করতে সক্ষম, তাদের গুণাবলীও জানিয়ে দিলেন যে, 'যারা অতিমাত্রায় ধৈর্যশীল, কেবল তাদের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব।' এই কাজ যারা করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, 'এরা হলো ভাগ্যবান এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।'

উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে মক্কার সেই পরিস্থিতি সামনে রাখতে হবে, যে পরিস্থিতিতে এই নির্দেশ আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথা আমরা ইতিহাস থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সে সময় মুসলমান হবার অর্থই ছিলো, অর্থই ছিলো নিজেকে ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না। এরপরেও মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ অবতীর্ণ হলো, 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো, 'আমি মুসলমানদের একজন।'

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী নির্যাতনের এমন কোনো পন্থা নেই যা তারা প্রয়োগ করেনি। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূলের অনুমোদনক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশত্যাগ করে ভিন্ন দেশে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেম। সেখানেও তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেয়া হয়নি। মক্কা থেকে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো সে দেশে গিয়ে সে দেশের শাসকবর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। চরম হঠকারিতা ও আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করা হচ্ছিলো। আর বিরোধিতার ক্ষেত্রে মানবতা, ভদ্রতা ও নৈতকতার সর্বশেষ সীমাও ধৃষ্টতার সাথে লঙ্ঘন করা হচ্ছিলো।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পিত অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো। আল্লাহর রাসূলকে অপমান-অপদস্থ করা, তাঁর সম্পর্কে দেশ-বিদেশের লোকদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও কলা-কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছিলো। বর্তমান যুগে যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত সংগঠন ও এর সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে সাম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সে যুগেও একদল লোককে এই দায়িত্ব দিয়েই ময়দানে সক্রিয় করা হয়েছিলো, যারা আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে।

শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে নির্যাতনের যতগুলো ঘৃণিত পন্থা সে সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তার সবগুলোই ইসলামপন্থীদের ওপরে নির্মমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিলো। একদল লোককে রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যারা দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াতী কাজে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে যে কোনো ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করতো।

রাসূল যখনই কোনো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, বা কোনো সমাবেশে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কথা বলতেন, অমনি সেখানে এমন হট্টগোল সৃষ্টি করা হতো, যেন সাধারণ মানুষ আল্লাহর দ্বীনের কথা শুনতে না পারে। এভাবে করে এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, দাওয়াতী কাজের সফলতা সম্পর্কে হতাশা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো আশা পোষণ করার উপায় ছিলো না।

ঠিক এই পরিবেশে রাসূল ও তাঁর সাথীদেরকে মহান আল্লাহ দিক নির্দেশনা দিয়ে জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে, যে ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডে তারা লিপ্ত, যে দুষ্কর্ম তারা করছে, তাদের ঘৃণিত দুষ্কর্ম এর তোমাদের সৎকর্ম কখনোই সমান নয়। যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে, তাদের অপকর্ম আর তোমাদের অনুসৃত সৎনীতি ও সৎকর্ম সমান্তরাল নয়। যদিও তোমাদের সৎকর্ম বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত। কিন্তু এ কথা তোমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, বর্তমানে সৎকর্ম ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত হলেও এর ভেতরে এমন শক্তি লুকায়িত রয়েছে, যা উপযুক্ত পরিবেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করে যাবতীয় অসৎকর্মকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে নিঃশেষ করে দেবে। আর দুষ্কর্মের নিজ দেহে এমন দুর্বলতা বিদ্যমান, অসৎকর্মের নিজ দেহ এমন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত যে, নিজের রোগ যন্ত্রণায় অসৎকর্ম স্বয়ং আত্মহত্যা করতে বাধ্য। অর্থাৎ অসৎকর্মের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই তা স্বয়ং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ইতোপূর্বে তাই হয়েছে।

কারণ মানুষের ভেতরে সৃষ্টিগতভাবেই এমন এক প্রকৃতি বিদ্যমান রয়েছে যে, যে প্রকৃতি অসৎকর্মকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। অসৎকর্ম যারা করে এবং যারা তার সহযোগী শক্তি, তাদের চেতনার জগতেও এ কথা জাগ্রত থাকে যে, তারা যা করছে তা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অসত্য। তাদের এই অন্যায় কর্মকান্ডের বিনিময়ে অন্য লোকদের মনে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হবে, এই আশা তারা নিজেরা পোষণ করা তো দূরে থাক, বরং নিজেদের কর্মকান্ডের কারণে নিজের বিবেকের কাছে তারা লজ্জিত থাকে, যদিও বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে সে লজ্জা তারা প্রকাশ পেতে দেয় না। এভাবে অসৎকর্মশীল লোকদের মনে এমন এক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যে শক্তি তার অসৎ ইচ্ছা ও সঙ্কল্পকে প্রতি মুহূর্তে দুর্বল করতে থাকে।

এই অবস্থায় ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত সৎকর্ম বিরতিহীনভাবে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই অসৎকর্মের ওপরে সৎকর্ম বিজয়ী হয়। কারণ সৎকর্ম স্বয়ং এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যা মানুষের মানস জগতে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রাণের দুশমনকেও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করে। প্রাণের দুশমন তার প্রতিপক্ষের সৎকর্মের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়-প্রত্যেক যুগের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করেছে। সৎকর্মশীল লোকগুলোর সাথে যখন অসৎকর্মশীল লোকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং তা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে, তখন এই উভয় দলের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ভেতরে যারা

অসৎকর্মশীল লোকদেরকে সমর্থন করতো, তারাও অসৎকর্মে লিপ্ত লোকদের বিভৎস গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখে তাদেরকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয় এবং সৎকর্মশীলদের লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সৎকর্মশীল এবং তাঁরা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত ছিলেন। আর প্রতিপক্ষ ছিলো অসৎকর্মশীল এবং তারা বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সক্রিয় ছিলো। বছরের পর বছর ধরে উভয় দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-সংঘাত চললো। রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী যে কোনো ধরনের অসৎকর্মের জবাব সৎকর্মের মাধ্যমেই দিতে থাকলেন। আর অসৎকর্মশীল লোকগুলো প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার আশায় তাদের যাবতীয় ঘৃণ্য উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে নিজেদের নিকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিলো। ফলে সাধারণ মানুষের ভেতরে তাদের প্রতি এক অবিমিশ্র ঘৃণা সৃষ্টি হলো এবং অসৎকর্মশীল লোকগুলোর ভেতর থেকে একটি বিরাট সংখ্যক লোক ক্রমশ নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করে নিজ দল ত্যাগ করে সৎকর্মশীল লোকদের দলে গিয়ে শামিল হতে থাকলো।

এভাবেই অসৎকর্ম নিজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো এবং শেষ পর্যন্ত অসৎকর্মের ওপরে সৎকর্ম বিজয়ী হলো। কিন্তু এই বিজয় এক দিনে বা এক বছরে আসেনি। এই বিজয় অর্জন করার জন্য প্রয়োজন পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার। সময় যতো গড়াতে থাকে, অসৎকর্মের অভ্যন্তরীণ নোংরামী ততোই তার দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। এই দুর্গন্ধে এক সময় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে অসৎকর্মের উৎসমূলকে উৎখাত করে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে।

সূরা হামিম সিজ্‌দার উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসৎকর্মের মোকাবেলা শুধুমাত্র সৎকর্মের মাধ্যমেই করতে বলেননি, বলেছেন সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে। পবিত্র কোরআনের গবেষকগণ এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির সাথে যদি কেউ অন্যায় আচরণ করে আর সে ব্যক্তি যদি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা হলো শুধুমাত্র সৎকর্ম। আর অন্যায় আচরণ যার সাথে করা হলো, সেই ব্যক্তি যদি অন্যায় আচরণকারীকে ক্ষমাও করে দিলো এবং সুযোগ বুঝে তার উপকারও করলো, এটাই হলো সর্বোত্তম সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্যায়কারীকে শুধু ক্ষমাই করা হলো না, তার প্রতি অনুগ্রহও করা হলো। এভাবেই অসৎকর্মের মোকাবেলা সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে করা হলো।

এই কাজের শুভ পরিণতি কি দাঁড়াবে, সে কথাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'অসৎকর্মের মোকাবেলা যদি সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে করা হয়, তাহলে প্রাণের শত্রুও এক সময় পরম আপনজনে পরিণত হবে।' এমনটি হওয়াই

স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই এই গুণটি নিহিত রয়েছে। একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, যার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি সবকিছু জেনে শুনেও নীরব থাকে তাহলে অবশ্যই এটা সৎকাজের মধ্যে গণ্য হবে-কিন্তু তার এই সৎকাজ কটুবাক্য প্রয়োগকারীকে তার হীন কর্ম থেকে বিরত করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি কটুবাক্য প্রয়োগকারীকে তিরস্কার না করে তার কল্যাণ কামনা করে, সুযোগ পেলে তার উপকার করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নিজের বিবেকের কাছে লজ্জিত হবে এবং হীন কর্ম থেকে নিজেকে বিরত করবে।

পৃথিবীতে এমন ধরনের মানুষও রয়েছে, যারা প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার সামান্য সুযোগও হাতছাড়া করে না। এরা সবসময় প্রতিপক্ষের দুর্বলতা অনুসন্ধান করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে। অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করতে হবে-এই নীতি অনুসরণ করে সে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকলো। প্রতিপক্ষ এই নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন সুযোগ যদি আসে যে, শত্রু লোকটি মারাত্মক বিপদে পড়েছে, এই অবস্থায় তার দ্বারায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি তার শত্রুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে গেলো। এই পরিস্থিতিতে শত্রুতায় লিপ্ত লোকটির পক্ষে পুনরায় কোনো ধরনের ক্ষতিকর কাজ করা তো দূরে থাক, সে বরং পরম আপনজনে পরিণত হবে এতে কেনো সন্দেহ নেই।

তবে সর্বক্ষেত্রে এই নীতি অবলম্বন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম কোন্ পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে শত্রুর শত্রুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই 'অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্ম দিয়ে করার' নীতি অবলম্বন করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল মক্কী জীবনে এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং সেটা ছিল ঐ নীতি অবলম্বনের উর্বর ময়দান। কিন্তু মদীনার জীবনে সবর্ত্র আল্লাহর রাসূল ঐ নীতি অবলম্বন করেননি এবং সেই ময়দান ঐ নীতি অবলম্বনের অনুকূল ছিল না। মদীনার ও খায়বরের ইহুদীদের অসৎকর্মের জবাব আল্লাহর রাসূল দীর্ঘদিন যাবৎ সৎকর্মের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ রাসূলের এই নীতিকে দুর্বলতা মনে করে ইসলামী রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়েই দিতে হয়েছে।

সুতরাং সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে যে কেনো ধরনের দুশমন অনিবার্যভাবে পরম আপনজনে পরিণত হয়ে যাবে, এই ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ পৃথিবীতে এমন নিকৃষ্ট ও জঘন্য

মানুষের অস্তিত্বও রয়েছে, যাদের অসৎকর্মের জবাব সৎকর্মের মাধ্যমে দিলে, তাদেরকে ক্ষমা করলে এবং তাদের উপকারের জন্য সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিলেও তারা এগুলোকে দুর্বলতা মনে করে কয়েকগুণ উৎসাহের সাথে শত্রুতা করতেই থাকে। এসব নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোকদের অপকর্মের জবাবে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ যে পন্থায় দিয়েছেন, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে সেই পন্থাই গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাবুকের ইতিহাস দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় আল্লাহর রাসূল যদি সে সময় তাবুকের প্রান্তরে বিপুল শক্তির সমাবেশ না ঘটাতেন, তাহলে প্রতিপক্ষ ইসলামী শক্তিকে নিতান্তই দুর্বল ভেবে চারদিক থেকে স্রোতের মতোই ইসলামের ওপরে আছড়ে পড়তো।

অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা, এটা কোনো মামুলি বিষয় নয়। এই কাজ করতে হলে অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল, অপরিবর্তনীয় সঙ্কল্প, নিজেকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং যাদের রয়েছে অপরিসীম সহনশীলতা, তাদের পক্ষেই অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব। মুসলিম হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক নরঘাতক রিচার্ড–যে রিচার্ড হাজার হাজার মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-তরুণকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল, যার সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' তার বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত' বলে। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক 'গিবন' চিহ্নিত করেছেন, 'শোণিত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কজ্রবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'। যুদ্ধের ময়দানে এই নরঘাতকের অস্ত্র যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, মানবতার বন্ধু সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী তখন তাকে হত্যা না করে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নরপশু রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার খৃষ্টান সাথীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তখন মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন গোপনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নাম অসৎকর্মকে সৎকর্মের মাধ্যমে মোকাবেলা করা।

সাময়িকভাবে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব হলেও কঠিন সঙ্কল্প ও অপরিসীম সহনশীলতা সহকারে জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে প্রত্যেক পদক্ষেপে এই নীতি বাস্তবায়ন করা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা 'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে এবং এই পথের প্রত্যেক বাঁকে ওৎ পেতে থাকা বিপদ-মুসিবতকে মোকাবেলা করার মতো 'সবর বা ধৈর্য' নামক বর্মে নিজেকে আবৃত করেছে।

কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত লোকদেরকে ইসলাম বিরোধী এমন ধরনের নিকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়, যারা ন্যায়-নীতি, সততা,

নৈতিকতা, সুন্দর আচরণ, ভালো ব্যবহার, উত্তম কথা তথা কোনো ধরনের সৎ গুণের তোয়াক্কা করে না। দাম্ভিকতা, মূর্খতা ও অহঙ্কার যাদের চরিত্রের ভূষণ, তাদের অপকর্মের মোকাবেলা শুধুমাত্র সৎকর্ম দিয়েই নয়–সর্বোত্তম সৎকর্ম দিয়ে করা ঐ লোকগুলোর দ্বারাই সম্ভব, যারা প্রত্যেক পদে রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্পবদ্ধ। মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিলো, মক্কা বিজয়ের পরে সেই অত্যাচারী লোকগুলো যখন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীদের সামনে অপরাধীর ভঙ্গিতে উপস্থিত ছিলো, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীরা সামান্য কটুবাক্যও তাদের প্রতি প্রয়োগ করেননি।

এর নামই 'সবর বা ধৈর্য' এবং এই গুণকে নিজ চরিত্রের ভূষণে পরিণত করতে ব্যর্থ হলে দাওয়াতী কাজ যেমন সফলতা অর্জন করতে পারবে না, তেমনি মহান আল্লাহর দরবারে সেই সম্মান ও মর্যাদাও লাভ করা যাবে না, যে সম্মান ও মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদেরকে দান করবেন। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত প্রত্যেকটি লোককে এই 'সবর বা ধৈর্য' নামক গুণ অর্জন করতে হবে, যারা এই গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদের সফলতা ও কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে যে, পৃথিবীতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করলে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করা গেলেও পৃথিবীর জীবনে কিছুই পাওয়া যাবে না–এই ধারণা মারাত্মক ভুল। কারণ এই নীতি অবলম্বন করলে কেবলমাত্র পরকালের জীবনেই সফলতা আসবে তা নয়, পৃথিবীর জীবনেও সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি লাভ করা যায়। যেসব লোক প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্কারী, কোনো ব্যাপারেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না, লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অবলম্বন করে, মানুষকে অর্থ, শক্তি, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে উপকার করে, তারা মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করে। সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। এই ধরনের কোন্ লোক বিপদে নিপতিত হলে সমাজের সবথেকে খারাপ লোকটিও তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ধৈর্য অবলম্বনকারী সৎলোকগুলো অভাবের মধ্যে থেকেও যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তা দুষ্কৃতিতে নিমজ্জিত রাজপ্রাসাদের অধিকারী লোকগুলো লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য অবলম্বনকারী লোকগুলোকে এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। (সূরা নাহ্ল-৯৬)

ধৈর্যশীলদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

ঈমানদার কখনও ধৈর্যহীন হয় না, তাঁর ঈমান তাকে ধৈর্যহীন হতে দেয় না। ধৈর্যহারা তারাই হয়, যাদের কোন অভিভাবক নেই। যাদের ওপরে কোন শক্তি নেই, যারা আশ্রয়হীন, যাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই তারাই কেবল ধৈর্যহীন হতে পারে। কিন্তু ঈমানদার বান্দা জানে যে, তার অভিভবাক হলেন সমস্ত ক্ষমতার অধিশ্বর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন। (সূরা বাকারাহ্-২৫৭)

মুমীন বান্দা জানে, তাঁর রুজির মালিক হলেন আল্লাহ। 'হক'-এর পথ অবলম্বন করলে তার রুজির ওপরে আঘাত আসতে পারে, তার সন্তান-সন্ততি অনাহারে থাকতে পারে, এ ধরনের চিন্তায় ধৈর্যহারা হয়ে সে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ-

বলো, আমি আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নেব কি ? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুজী দান করেন, রুজী গ্রহণ করেন না ? (সূরা আন'আম-১৪)

মুমীন বান্দারা বলে, আমি কি সেই আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে, তার বিধান অমান্য করে মানুষের বানানো বিধান ও আইন-কানুনের সামনে মাথানত করবো, যিনি ঐ বিশাল আকাশ সৃষ্টি করে তা সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যিনি এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন, প্রাণীকুলের আহার যিনি দিচ্ছেন, তার আইন বাদ দিয়ে আমি অন্য কারো আইন মানতে পারি না। কারণ আমার আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন-

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ-

সেই বিধানই অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতি তোমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তোমরা নিজেদের রব-কে বাদ দিয়ে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষককে অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ-৩)

ঈমান মানুষের ভেতরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে, সবচেয়ে উত্তম বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ। তাঁর আল্লাহ তাঁকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন-

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ-نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ-

জেনে রেখো, আল্লাহ-ই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক; তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও বন্ধু। (সূরা আন্‌ফাল-৪০)

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আল্লাহর মোকাবেলায় এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-يُحْىٖ وَيُمِيْتُ-وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ-

অবশ্যই আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তোমাদের কোনো সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে। (সূরা তওবা-১১৬)

ঈমানদার হয় সহনশীল-সবরকারী এবং তার ভেতরে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। একজন মানুষ গোনাহ্ করবে এটাই স্বাভাবিক। গোনাহ্ করার কারণে মুমীন আল্লাহর ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। এ অবস্থায় শয়তান এসে তাকে এ কথা বলে প্রতারিত করতে চায় যে, 'তোমার আর কোনো উপায় নেই, তুমি এত গোনাহ্ করেছো যে, এই গোনাহ্ তোমাকে অবশ্যই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।'

এভাবে প্রতারণা করে মুমীনকে হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টা করে শয়তান। কিন্তু ঈমানদার বান্দাকে শয়তান এ জন্য প্রতারিত করতে পারে না, কারণ সে জানে যে, অপরাধ করেছে সে, আর তার আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী। ক্ষমা করতে তিনি ভালোবাসেন। সে যে গোনাহ্ করেছে, তার এই গোনাহের থেকে আল্লাহর রহমত অনেক বড়। সেই আল্লাহই পবিত্র কোরআনে বলেছেন- لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ-

আমার রহমত থেকে কখনও হতাশ হবে না। (আল কোরআন)

মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাকে জানিয়েছেন, আমার রহমত থেকে মুহূর্তের জন্যও নিরাশ হবে না। তুমি যদি পাহাড় সমান গোনাহ্ করে থাকো, তাহলে জেনে রেখো, আমার

রহমত পাহাড়কে অতিক্রম করে আকাশে পৌঁছে যাবে। আর তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় তাহলে আমার রহমত আমার আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

সুতরাং গোনাহ্ করলে আল্লাহর কাছে তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন—এই বিশ্বাস মুমীন অন্তরে পোষণ করে। ঈমানদারের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি হলেই সে নামাযে দাঁড়িয়ে যায় এবং নামাযের মাধ্যমেই সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে। সবর বা ধৈর্য হলো অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ। সবরই হলো সকল প্রকার সাফল্য ও সার্থকতার চাবিকাঠি। সবর ব্যতীত কোনো মানুষই কোনো ধরনের কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ-اِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِيْنَ-وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ-وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرتِ-وَبَشِّرِ الصّبِرِيْنَ-الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ-قَالُوْا اِنَّا لِلّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رجِعُوْنَ-اُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ-وَاُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ-

হে ঈমানাদরগণ! ধৈর্য ও নামাযে সাহায্যে প্রার্থনা করো, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা হয় না। আমি নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনাহার, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলবে, 'আমরা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, আল্লাহর রহমত তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথের যাত্রী। (সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৭)

হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

কোন ধরনের দূরারোগ্য রোগে ঈমানদার আক্রান্ত হলে সে ধৈর্যহারা হয় না। রোগের কারণে সে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণে না। তার মনের ভেতরে এ আশা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, আল্লাহ তাঁর রোগ অবশ্যই ভালো করে দেবেন। এভাবে ঈমান মানুষের ভেতরে মানসিক প্রশান্তি আর ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মূর্তি পূজায় লিপ্ত তাঁর জাতিকে বলেছিলেন–

فَانَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ-وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ-

তোমাদের ঐ মূর্তিগুলো তো আমার শত্রু আর আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ–যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি যখন ক্ষুধার্ত হই তখন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং আমি যখন তৃষ্ণার্ত হই তখন তিনি আমাকে পান করান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জীবন দান করবেন। আমি তাঁর কাছেই আশা পোষণ করি যে, বিচারের দিনে তিনি আমার ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা শূ'আরা–৭৭-৮২)

সুতরাং কোনো ঈমানদার যখন দীর্ঘস্থায়ী রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে তখন সে মুহূর্তের জন্যও ধৈর্যহীন হয় না। ধৈর্যহারা তো হয় সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিজের প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে না। যে ব্যক্তি কাফের–সেই কেবল আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হতে পারে––ধৈর্যহারা হতে পারে। হতাশা ব্যক্ত করা, নিরাশ হওয়া ও ধৈর্যহীন হওয়া হলো কুফ্রী। ধৈর্যহীন হওয়া––হতাশা ব্যক্ত করা, নৈরাশ্য প্রকাশ করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ।

হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালামের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অকল্পনীয় রোগ যন্ত্রণায় তিনি দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর গোটা শরীরে পচন ধরেছিল, তা থেকে যে দুর্গন্ধ নির্গত হতো, ফলে কোনো মানুষ তাঁর পাশে যেতে পারতো না। গোটা শরীরে রক্তাক্ত ক্ষত, তার ভেতরে পোকা বাসা বেঁধেছে। একদিকে রোগ যন্ত্রণা অপরদিকে পোকার কামড়ে তিনি জর্জরিত। তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। প্রতিবেশীগণ সহ্য করতে পারলো না। তাঁকে এলাকা থেকে বের করে দেয়া হলো। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় স্বজন তাকে ত্যাগ করলো। তবুও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না।

নেই–কোথাও কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সাহায্য করার। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি হতাশ বা ধৈর্যহারা হননি। নিরাশা––হতাশার ও ধৈর্যহীনতার সামান্যতম চিহ্নও তাঁর

রোগাক্রান্ত চেহারায় প্রতিভাত হয়নি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ স্থান তাঁর দেহে অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে রোগ আক্রমণ করেনি। অবশেষে রোগ যখন তাঁর জিহ্বায় আক্রমণ করলো, জিহ্বায় পচন দেখা দিল তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাকুলতা রোগের কারণে ছিল না। তাঁর ব্যাকুলতা এ জন্য ছিল যে, মুখের ভেতরে জিহ্বাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি ঐ মহান আল্লাহর নাম কী ভাবে উচ্চারণ করবেন ! এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি কী ভাবে আল্লাহকে ডাকলেন, আল্লাহর কোরআন আমাদেরকে তা শোনাচ্ছে-

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ-فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَابِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ-

স্মরণ করো, যখন সে তার রব-কে ডাকলো, 'আমি রোগগ্রস্ত হয় পড়েছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।' আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং সেই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য। (সূরা আম্বিয়া-৮৩-৮৪)

হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামের দোয়ার ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন, 'তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, দোয়ার এই ভঙ্গিমা যে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, 'আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।' এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলেন। সূরা সাদ-এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে বললেন-

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ-هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ-

নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এতে ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য। (সূরা সা-দ-৪২)

এই আয়াত থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। সে ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি

পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময় এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল।

হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকলে মহান আল্লাহ উল্লেখ করতেন। যতটুকু মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ততটুকু মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। তিনি এক মহান পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর সে ভূমিকা সম্পর্কে মহান আরশে আজিমের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সনদ দান করেছেন যে, তাঁর এই ভূমিকা চিন্তাশীলদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। সূরা সাদ-এর ৪১-৪২ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا-نِعْمَ الْعَبْدُ-اِنَّهٗ اَوَّابٌ-

আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রব-এর অভিমুখী।

উল্লেখিত আয়াতে হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করার পূর্বে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, আমি সোলাইমানকে অগণিত নে'মাত দানে ধন্য করেছিলাম। কিন্তু সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি এবং আমাকে ভুলে যায়নি। কখনো সে অহংকার করেনি। এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ এবং ধৈর্য তাঁর কাছে ততো বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উলটো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা ইবলিস, ফেরাউন, নমরুদ, কারুণসহ যুগের বা শতাব্দীর ফেরাউনদের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে তওবা করে দীনতা সহকারে তার রব-এর সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতোপূর্বে দাউদ আলাইহিস সালাম ও সোলাইমান আলাইহিস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়েছে। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম ইস্তিগ্ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জ্বিনদের ওপর কর্তৃত্ব এবং দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

এরপরেই হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমি যেমন সোলাইমানকে নে'মাত দান করে পরীক্ষা করেছিলাম, সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি আয়ূবের কাছ থেকে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে রোগগ্রস্থ করে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

যখন সে প্রচুর নে'মাত লাভ করেছিল, তখনও সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি, আবার যখন তার কাছ থেকে ধন-দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাঁর আপনজনরা রোগের কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, কঠিন রোগ তাকে দিনের পর দিন সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, তখনও সে আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি। ধৈর্যহীন হননি এবং নিরাশ হয়ে হতাশা ব্যক্ত করেননি। উভয় অবস্থাতেই সে আমার শোকর আদায় করেছে–আমার রহমতের ওপরে আশাবাদী থেকেছে।

বুখারী হাদীসে কিতাবুল আম্বিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো একদিন হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালাম গোছল করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণের তৈরী পঙ্গপাল তাঁর শরীরের ওপরে এসে আছ্‌ড়ে পড়তে থাকে। তিনি তা দ্রুত হাতে ধরে নিজের কাপড়ের ভেতরে জমা করতে থাকেন। এ সময় মহান আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বলেন, হে আয়ূব ! তুমি দেখতে পাচ্ছো, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি ?

অর্থাৎ আমি তো তোমাকে প্রচুর দান করেছি, তবুও কেনো এসব স্বর্ণের পঙ্গপাল ধরে জমা করছো ? আল্লাহর নবী হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে রাব্বুল আলামীন, তুমি আমাকে অনেক দান করেছো, কিন্তু এরপরেও তো তোমার রহমত ও বরকত হতে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালাম প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আবার এক সময় তিনি একেবারে কপর্দক শুন্য হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি তাঁকে ত্যাগ করেছিল, পরীক্ষায় সফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরে মহান আল্লাহ তাঁকে পুনরায় সমস্ত কিছুই দান করেছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

কোরআনের বর্ণনার অর্থ এটা নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচন্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে হুকুম দিলাম তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।'

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আয়ূব আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা।

কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো।' হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আয়ূব আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো, নিজের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।'

অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, সুসময়ে অনুকূল অবস্থায় আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভাল-মন্দ সরাসরি একমাত্র ঐ আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে একেবারে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে একেবারে চরম দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় উপনীত করতে পারেন। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য হলো, যে কোনো অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহীন হওয়া উচিত নয়। ধৈর্যহীন হওয়া ও হতাশা ব্যক্ত করা বড় ধরনের গোনাহ্।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

ঈমানদার ব্যক্তি কখনও বিপদে ধৈর্য হারায় না। জীবনের চরম মুহূর্তে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। যে কোন ধরনের বিপদই আসুক না কেন, ঈমানদার আল্লাহর ওপরে ভরসা করে। এটা হলো ঈমানের বাস্তব উপকারিতা। ঈমান মানুষের ভেতরে ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। কারণ ঈমানদার এ কথা জানে যে, বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জীবনের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তাঁর অন্যান্য ভাইগণ তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি গর্তে নিক্ষেপ করলো। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি অস্থির হননি। এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। তাঁর এই বিপদের মধ্যে কতবড় কল্যাণ যে নিহিত ছিল, তখন তিনি যেমন অনুভব করতে পারেননি তেমনি উপলব্ধি করতে পারেনি তাকে যারা হত্যা করার উদ্দেশ্যে গর্তে নিক্ষেপ করেছিল তারাও।

কেনান শহরের একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করা হলো, এরপর তিনি গিয়ে পৌঁছলেন সুদূর মিশরে। সেখানে তিনি প্রথমে হলেন সে রাষ্ট্রের অর্থ ও খাদ্যমন্ত্রী এবং তারপরেই তিনি সেদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। তাঁর ওপরে যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, সে বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু বিপদ যখন মুখ ব্যাদন করে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ

আলাইহিস্ সালামের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পৃথিবীর আলো-বাতাস তিনি আর কোনদিন দেখতে পাবেন, ভোগ করতে পারবেন, মুক্ত আলো-বাতাসে তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এমন কোন আশা-ই যখন ছিল না, তখনও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলোর অবস্থা তেমনি হতে হবে। তাহলেই কল্যাণ লাভ করা যাবে—তার পূর্বে নয়।

মিশরেও উপনীত হয়ে বিপদ তাঁর পিছু ত্যাগ করলো না। অপূর্ব সুন্দর চেহারার কারণে একশ্রেণীর নারীর দল তাঁকে কলুষিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলো। তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হলো তখন তাঁর ওপরে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলো। এখানেও তিনি ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। প্রকৃতপক্ষে নীতি নৈতিকতা বিরোধী এবং আল্লাহ বিরোধী কোন কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হবার পূর্বে ঈমানদার-আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এমন স্থানকেই অধীক প্রাধান্য দান করেন, যে স্থান সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা থাকে যে, সেখানে তাকে চরম কষ্টের মধ্যে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। সেখানে যতই কষ্ট হোক না কেন, এমন কাজ করতে ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই রাজী হবে না, যে কাজ করে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না। এ কারণেই নবী রাসূল ও তাদের দৃঢ় অনুসারী দ্বীনি আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলো প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুন্ডকে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিকে, ফাঁসির রশিকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, এমন কাজ তাঁরা করেননি। অন্যায়ের সামনে তাঁরা কখনো মাথানত করেননি।

যৌন উন্মাদ সেই নারীর কামনা-বাসনা পূরণ করতে হবে, নয় তো তাঁকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে পথ খোলা ছিল দুটো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যত্নের সাথে ধৈর্যকেই লালন করলেন। কারাগারকেই তিনি বেছে নিলেন। এই অবস্থায় নিপতিত হয়ে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর কাছে কি আবেদন করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে—

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ-وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَ هُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ-فَاسْتَجَابَ لَه رَبُّه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ-اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

ইউসুফ বললো, হে আমার রব ! এরা আমার কাছ থেকে যে কাজ পেতে চায় তার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি অধিক পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের কূট-কৌশলকে তাঁর কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। (সূরা ইউসুফ-৩৩-৩৪)

আল্লাহর কোর্আন বলছে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বিপদে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, 'তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো।'

তাঁর এই আবেদনের ধরণ থেকেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, এই সময় হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম যে অবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন, এই আয়াত কয়টি এই ঘটনার এক আশ্চর্যজনক চিত্র পেশ করেছে । উনিশ-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক, যাযাবর জীবনের অবদানে এক অপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তিনি। দারিদ্র্য, পরদেশ, আপন ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার ও যবরদস্তিমূলক দাসত্ব প্রভৃতি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে আসার পর ভাগ্য তাকে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাধিক সভ্যতা-সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যের রাজধানীতে এক বড় ধনবান ও পদাধিকারী ব্যক্তির ঘরে এনে পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে এই ঘরের স্ত্রীলোকটির সাথে তার দিন-রাতের দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার ছিল। প্রথমে-সেই নারীই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা গোটা রাজধানী শহরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর গোটা শহরের অভিজাত ও ধনবান পরিবারের নারীগণ তাঁকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। এই সময় তাঁর চতুর্দিকে অসংখ্য ছলনাময়ী জালের আকর্ষণ সবসময় এবং সবস্থানেই তাকে জড়াতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার মনে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বন্যা-প্রবাহ জাগিয়ে তোলার জন্য, তার আল্লাহভীতি ভেঙ্গে চুরমার করে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য সীমাহীন ষড়যন্ত্র-চেষ্টা-সাধনা চলতে থাকে।

যেদিকেই তিনি যান, সেদিকেই দেখেন গুনাহ ও দুষ্কৃতিপূর্ণ চাকচিক্য ও জাঁকজমক সহকারে তাকে গ্রাস করার জন্য দুয়ার খুলে অপেক্ষায় দন্ডায়মান। যাদের ভেতরে ঈমান নেই, তারা পৃথিবীতে পাপের পথ নিজেরা সন্ধান করে আর পাপ স্বয়ং তার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঈমানদারের সন্ধানে ফিরতে থাকে। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জন্যও তাই ঘটেছিল। পাপ অপেক্ষা করে আছে, যে মুহূর্তেই তার মনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একবিন্দু ঝোক-প্রবণতা দেখা যাবে, ঠিক তখনই সে নিজেকে সামনে পেশ করে দেবে। রাতদিন অহর্নিশি তিনি এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাটাচ্ছেন। কোনো এক মুহূর্তে তার ইচ্ছা-বাসনায় একবিন্দু শিথিলতা দেখা দিলেই অপেক্ষমান পাপের শত-সহস্র দরজার যে কোনো একটিতে প্রবেশ করতে পারেন।

এ ধরনের অবস্থায় একজন ঈমানদার আল্লাহ-বিশ্বাসী বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবক যে সাফল্যের সাথে এ ধরনের শয়তানী আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন, তা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ধৈর্য কোন পর্যায়ে উপনীত হলে, সেই চরম মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করা যায়, তা ভাষায় ব্যক্ত করার বিষয় নয়-হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়। আর ঈমান না থাকলে এ ধরনের ধৈর্য্যও সৃষ্টি হয় না এবং বিষয়টি অনুভবও করা যায় না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের আত্মসংযমের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির পরও আত্মচেতনা ও নৈতিক পবিত্রতার অতিরিক্ত অবদান এটাই ছিল যে, এতবড় একটি মারাত্মক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরও তার হৃদয়ে কখনো কোনো অহংকার জাগেনি। এ জন্য তিনি কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করেননি বা নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেননি। কখনো এই গৌরব তার মনে জাগেনি যে, কত শত রূপসী-যুবতী নারী আমার জন্য পাগল-পারা, অথচ এরপরও আমার পদস্খলন ঘটেনি।

এই ধরনের অহংকার প্রকাশের পরিবর্তে তিনি বরং স্বীয় মানবীয় দুর্বলতার কথা চিন্তা করে কেঁপে কেঁপে উঠতেন আর বারবার বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্র কাছে কাতর প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ্ ! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এতসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাতছানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। হে আমার প্রতিপালক! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও, তুমিই আমাকে বাঁচাও! কখনই যেন আমার পদস্খলন না ঘটে, এই ভয়ে কম্পমান আমি!'

আসলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের এটা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুকতম অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, ধৈর্য, সত্য পথে চলা, আত্মসংযম, মানসিক ভারসাম্য প্রভৃতি যেসব অসাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল, এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এমন কঠোর ও কঠিন পরীক্ষার সময়ে সেসব গুণাবলী উৎকর্ষিত হয়ে উঠে-পূর্ণ শক্তিতে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ঈমান আনার পরে পরীক্ষা না এলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না, এই ঈমান তার ভেতরে কি কি গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঈমান আনার উপকারিতা কি, তা পরীক্ষায় নিমজ্জিত না হলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না। এ জন্য ঈমানদারের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা অনিবার্য।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে মহান আল্লাহ ঐ সকল নারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কারাগারের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে যাবতীয় অপকৌশল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। এভাবে হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের কারারুদ্ধ হওয়া ছিল মূলত তাঁর এক বিরাট নৈতিক বিজয় এবং মিসরের রাজন্যবর্গ ও শাসক শ্রেণীর লোকদের চরম নৈতিক পরাজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা। ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম কোনো অপরিচিতি ও অজ্ঞাত-কুলশীল লোক ছিলেন না। সমগ্র দেশে-অন্তত রাজধানীতে সর্বশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে জানতো ও চিনতো। বস্তুত যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অধিকাংশ পদস্থ ও অভিজাত ঘরের নারীগণই ছিল পাগল প্রায়, যার রূপ-সৌন্দর্যের অগ্নিজ্বালায় নিজেদের ঘর-বাড়ি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে দেখে মিসরের শাসক শ্রেণী তাকে জেলে প্রেরণ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত মনে করলো, এমন ব্যক্তির দেশব্যাপী পরিচিতি যে কতটা ব্যাপক ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে।

তার সম্পর্কে যে মিসরের প্রতিটি নগরে, জনপদে আলোচনা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু এই লোকটি যে কত উন্নত, মজবুত ও নির্মল চরিত্রের মানুষ, সেটাও

সবাই জেনে গিয়েছিল। তারা এটাও জানতে পেরেছিল যে, লোকটিকে তার নিজের কোনো অপরাধের কারণে কারারুদ্ধ করা হয় নি; বরং কারারুদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র এ জন্য যে, মিসরের রাজন্যবর্গ নিজেদের ঘরের নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার তুলনায় এই নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করার সবচেয়ে সহজতম পথটি অবলম্বন করেছিল।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই অকারণে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে রাখা বেঈমান ও স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যন্ত প্রাচীন ও চিরন্তন রীতি। এ ব্যাপারেও বর্তমানের স্বৈরাচারী-গণতন্ত্রের আলখেল্লাধারী শাসকগণ চার হাজার বৎসর পূর্বের স্বৈরশাসকদের তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু নয়। যদি কোন পার্থক্য সেকালের স্বৈরাচার আর এ কালের স্বৈরাচারের মধ্যে থেকেই থাকে, তা হলো শুধু এটুকু যে, সেকালের শাসকেরা 'গণতন্ত্রের' দোহাই দিত না আর একালের জালিম শাসকগণ তাদের যাবতীয় স্বৈরাচারী কর্মকান্ড বৈধ করার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের লেবাস ব্যবহার করে। সেকালের স্বৈরশাসকগণ আইনের কোন মাধ্যম ব্যতীতই বে-আইনী কর্মকান্ড পরিচালিত করতো, আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ তাদের প্রতিটি অবৈধ বাড়াবাড়ির 'বৈধতা' প্রমাণের জন্য পূর্বেই একটা আইন তৈরী করে নেয়। সেকালের স্বৈরশাসকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য সরাসরি লোকদের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতো আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ যার ওপর হামলা করে, তার সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এই লোকটির দ্বারা শুধু তাদের নয়, দেশ ও জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক কথায়, সেকালের স্বৈরশাসকগণ শুধু জালিম ছিল আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ জালিম তো বটেই সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদী ও নির্লজ্জও।

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে কারাগারে বন্দী করা হলো। তাঁর অপরাধ, তিনি ঐসব নারীদের যৌবনের কামনা-বাসনা পূরণ করেননি। তথাকথিত এই অপরাধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য আল্লাহর নবীকে তারা বন্দী করেছিল। কারাগারের ভেতরেও তিনি নীরবে বসেছিলেন না। কারা কর্তৃপক্ষ ও সমস্ত কারাবন্দীদের কাছে তিনি আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের মতই দেখা দিলেন। তাঁর ভেতরে মহান আল্লাহ যে গুণাবলী নিহিত রেখেছিলেন, জান্নাতের যে সুবাস দিয়ে দিয়েছিলেন, তা গোটা কারাগারকে আমোদিত করে তুলেছিল।

সেখানের সমস্ত বন্দী এবং কারা কর্তৃপক্ষের কাছে এক সময় তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের রব বা প্রতিপালক হতে পারে না। প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। কারাগারের সমস্ত লোকজন তাঁর কাছে যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতো। জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই তারা পরামর্শের জন্য ধর্ণা দিত। তিনি কারা-জীবনে কিভাবে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং তাঁর কারাগারের সাথীরা তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কিভাবে আসতো এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে-

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ-قَالَ اَحَدُ هُمَآ اِنِّىْ اَرٰنِىْ اَعْصِرُ
خَمْرًا-وَقَالَ الاٰخَرُ اِنِّىْ اَرٰنِىْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْهُ-نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِه-اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ-قَالَ
لاَيَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِه اِلاَّ نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِه قَبْلَ اَنْ
يَّاْتِيَكُمَا-ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ-اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰه وَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ-وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاءِ ىْ
اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ-مَاكَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰه مِنْ
شَىْءٍ-ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰه عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ-يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ
اللّٰهُ ا لْوَاحِدُ الْقَهَّارُ-مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِه اِلاَّ اَسْمَاءً
سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ-اِنِ
الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰه-اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَا لنَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ-يٰصَاحِبَىِ لسِّجْنِ اَمَّا اَحَدُ
كُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّه خَمْرًا-وَاَمَّاالاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ
رَّاْسِه-قُضِىَ الاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ-وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهُ
نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّه فَلَبِثَ
فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ -

কারাগারে তাঁর সাথে আরো দু'জন দাস প্রবেশ করেছিল। একদিন তাদের একজন তাকে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি। অপরজন বললো, আমি দেখেছি যে, আমার মাথার ওপর রুটি রাখা আছে আর পাখি তা খাচ্ছে। উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।

ইউসুফ বললো, এখানে তোমরা যে খাবার লাভ করো, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেবো। আমার রব আমাকে যে জ্ঞান-ভান্ডার দান করেছেন, এটা সেই জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনা ও পরকালকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করেছি। আর আমার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানবতার প্রতি এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যতীত আর অন্য কারো দাস বানাননি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁর শোকর আদায় করে না। হে কারাগারের বন্ধুরা আমার ! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না সেই এক আল্লাহ-যিনি সব কিছুর ওপরে বিজয়ী-মহাপরাক্রমশালী।

তাঁকে ত্যাগ করে তোমরা যাদের দাসত্ব করো, তারা কয়েকটি নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো। আল্লাহ্ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো জন্য নয়। তাঁর আদেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপন পন্থা, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

হে কারাগারের বন্ধুরা আমার ! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন নিজের প্রভু (মিসর অধিপতি)-কে শরাব পান করাবে। আর আরেকজনকে শূলে চড়ানো হবে। আর পাখি তার মাথার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে, তার ফয়সালা হয়ে গেল। (সূরা ইউসুফ-৩৬-৪২)

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে যখন বন্দী করা হয়, তখন তার বয়স সম্ভবত কুড়ি-একুশ বৎসরের বেশি ছিল না। ইতিহাস বলে, জেল থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি যখন মিসরের শাসক হলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। আর কোরআন বলে যে, জেলখানায় তিনি 'বিদআ' ছিনিন' অর্থাৎ কয়েক বছর পর্যন্ত ছিলেন। আরবী ভাষায় 'বিদআ' শব্দটি দশ সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

যে দুইজন গোলাম জেলখানায় হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের সঙ্গে প্রবেশ করেছিল, ইতিহাসে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের একজন ছিল মিসর অধিপতির শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান আর অপরজন ছিল রুটি প্রস্তুতকারীদের প্রধান। এই দুই ব্যক্তিকে মিসর অধিপতি এই অপরাধে জেলে প্রেরণ করেছিল যে, একবার এক খাওয়ার মজলিসে পরিবেশিত রুটিগুলো তিক্ত লেগেছিল আর শরাবের একটা পাত্রে মাছি পাওয়া গিয়েছিল।

আল্লাহর কোরআনের বর্ণনা হলো, 'উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।'

জেলখানায় হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে কি দৃষ্টিতে দেখা হত, এই কথা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উপরে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্মুখে রেখে বিবেচনা করলে এ সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ হয় না যে, এরা হযরত ইউসূফ আলায়হিস্

সালামের কাছেই কেনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতে এসেছিল এবং 'আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ লোক' বলে তাঁর খেদমতেই বা কেন এত ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করলো।

কারণ কারাগারের ভেতরের ও বাইরের সব লোকেরই জানা ছিল যে, এই ব্যক্তি কোন অপরাধ করে জেলে আসেন নি; বরং তিনি একজন সদাচারী ও পবিত্র চরিত্রের লোক। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ও তিনি নিজের পবিত্রতা ও আল্লাহভীরুতার প্রমাণ দিয়েছেন। একালে সমগ্র দেশে তাঁর অপেক্ষা পবিত্রতর ব্যক্তি একজনও নেই। এমনকি দেশের ধর্ম-নেতাদের মধ্যেও তাঁর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে কেবল কয়েদীরাই যে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো তাই নয়, বরং জেলখানার অফিসার ও কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এই লোক দু'জনের ভেতরে একজনের অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের প্রধানের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং মদ পরিবেশনকারী তার পূর্ব পদে বহাল হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক 'হক'-এর দাওয়াত

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার পূর্বে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম যে ভাষণ দান করলেন, ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মূল প্রাণবস্তুই হলো তাঁর সেই ভাষণ। আর স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত তওহীদ সংক্রান্ত ভাষণগুলোর মধ্যেও এটা অতি উত্তম সম্পদ। কোরআন আমাদেরকে জানায় যে, হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের ছিল নবী-জনোচিত এক 'মিশন' এবং এর দাওয়াত ও প্রচার কার্য তিনি জেলখানা থেকেই শুরু করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনাটিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ময়দানে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই এই ঘটনাটি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় এবং এ থেকে আন্দোলনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র কাহিনী শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনা কোরআনে বর্ণনা করেননি। এর একাধিক দিক এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণা করলে এমন কতকগুলো দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, যা অবগত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সেদিকগুলো হচ্ছে—

এই প্রথমবার আমরা হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে দেখতে পাই। এর পূর্বে তাঁর জীবন কাহিনীর আর যেসব দিক কোরআন মজীদ উজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে পেশ করেছে, তাতে আমরা শুধু তাঁর উন্নত চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তাতে 'হক'-এর প্রচার ও দাওয়াত দেয়ার কোনো চিহ্নই আমরা দেখতে পাই না। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলো নিছক প্রস্তুতি ও আত্মগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। নবুয়াতের দায়িত্ব এই কয়েদখানার পর্যায়েই তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়। আর নবী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

নিজের মূল পরিচয়ও তিনি এই প্রথমবার লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন। এর পূর্বে আমরা দেখতে পাই, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সম্মুখে আসা যে

কোনো অবস্থাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে কবুল করেছেন। কাফেলার লোকেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনিত হলেন, যখন তাঁকে আযীযে-মিসর-এর কাছে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হলো-এর কোনো একটি পর্যায়েও তিনি নিজেকে ইবরাহীমের প্রপৌত্র ও ইসহাক আলায়হিস্ সালামের পৌত্র ও হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের পুত্র ছিলেন বলে কোনো পরিচয়ই দেননি। তাঁর বাপ-দাদা কোনো অপরিচিত লোক ছিলেন না। কাফেলার লোক মাদিয়ানবাসীই হোক কি ইসমাঈলী, তারা উভয় পরিবারের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মিসরের লোকেরাও অন্তত হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না, বরং হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যে ভংগীতে তাঁর ও হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালামের উল্লেখ করছেন, তাতে অনুমান করা যায় যে, এই তিন মহান ব্যক্তির খ্যাতি মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম বিগত চার পাঁচ বছর যাবৎ যেসব দুরাবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন কখনো নিজের বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সেসব হতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করেন নি।

সম্ভবত তিনি নিজেও অনুভব করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য এই ধরনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে থেকে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে নিছক 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের খাতিরে তিনি এই মহাসত্য উদঘাটন করলেন যে, তিনি কোনো নতুন ও অপরিচিত দ্বীন পেশ করছেন না; বরং হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের পরিচালিত তওহীদের দাওয়াত ও প্রচার কার্যের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সাথেই তাঁর সম্পর্ক। এ ধরনের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছিল যে, অতীতের সব কালে ও সব যুগেই সত্যপন্থী লোকেরা যেদিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তিনি সেই শাশ্বত চিরন্তন মহাসত্যের দিকেই লোকদের আহ্বান জানাচ্ছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই তিনি নবী নির্বাচিত হয়েছেন।

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যেভাবে তাঁর দাওয়াত পেশ করার সুযোগ বের করেছিলেন তাতে 'হক'-এর দাওয়াত প্রচারের এক চমৎকার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা এই ছিল যে, দুইজন লোক তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা বলে-নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রমাণ দিয়ে তাঁর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়। জওয়াবে তিনি বলেন, 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আমি তোমাদের বলবোই, কিন্তু আমি যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলবো তা কোন্ উৎস হতে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তা পূর্বেই জেনে নাও।'

এভাবেই তিনি তাদের কথার ভেতর থেকেই কথা বলার সুযোগ বের করে তাদের সম্মুখে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন শুরু করলেন। 'হক' প্রচারের এই ধরণ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, কারো মনে যদি সত্যই 'হক' প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে এবং এর কৌশলও তার জানা থাকে, তাহলে সে অতি সহজেই কথার ধারাবাহিকতাকে খুব সুন্দরভাবে নিজের কথার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর যার মনে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কোন চিন্তা বা আগ্রহই নেই, তাদের সম্মুখে সুযোগের পর সুযোগ এসে চলে যায়; বিরাট বিরাট মাহফিলে

তারা বক্তা হিসেবে গমন করে, কিন্তু সেটাকে নিজের কথা বলার সুযোগ হিসেবে কখনো গ্রহণ করে না। এমন ধরনের ওয়াজ তারা করে যে, নিজেরা কি বলছে তাও তারা জানে না এবং অগণিত শ্রোতাদেরকে কোনদিকে নিয়ে যেতে চায়, সে লক্ষ্যও তাদের থাকে না।

পক্ষান্তরে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে যে প্রচার করতে আগ্রহী হয়, সে তো সুযোগের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে থাকে আর সে সুযোগ এলেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুযোগ সন্ধান আর নির্বোধ লোকের অমার্জিত প্রচার-সময় জ্ঞান এবং উপযুক্ত পরিবেশের জ্ঞান যাদের নেই, মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে, রাস্তা-পথে যে কোন পরিবেশে, কার মন-মানসিকতা কেমন আছে তার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দাওয়াত দেয়া শুরু করে-এই দুইয়ের মাঝে শত যোজন পার্থক্য রয়েছে। এই শেষোক্ত লোকেরা সময় ও সুযোগের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেয়ার চেষ্টা করে এবং এভাবে ইসলাম প্রচারের নামে লোকদের মধ্যে অযথা মতপার্থক্য সৃষ্টি ও বাকবিতন্ডা সৃষ্টি করে উল্টো ইসলামের প্রতিই তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দেয়।

এ ঘটনা থেকে লোকদের কাছে দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইউসূফ প্রথমেই দ্বীনের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি পেশ করতে শুরু করেননি; বরং লোকদের সামনে তিনি দ্বীনের সেই মূল সূচনা বিন্দুর কথাই পেশ করেন যেখান থেকে সত্য দ্বীনের পথ বাতিল পন্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এই সূচনা বিন্দুটি হলো তওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য। এমনকি এই পার্থক্যকেও তিনি এমন যুক্তিসংগত পন্থায় স্পষ্ট করে তোলেন যে, সাধারণ বুদ্ধির কোনো লোকই তা অনুভব না করে থাকতে পারবে না। বিশেষ করে এই সময় যাদের লক্ষ্য করে তিনি কথা বলছিলেন, তাদের মন-মগজে তো এই কথাটি তীরের মত বসে গিয়েছিল। কেননা তারা ছিল চাকরিজীবি গোলাম আর তারা এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করছিল যে, একজন মনিবের গোলাম হওয়া অনেক মনিবের গোলাম হওয়া অপেক্ষা ভালো। অনুরূপভাবে তারা আরো উপলব্ধি করেছিল যে, বান্দাদের বন্দেগী করা অপেক্ষা গোটা জাহানের মালিক ও মনিবের গোলামী করাই অধীক কল্যাণকর।

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম এখানে শ্রোতাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে ও তাঁর ধর্ম অবলম্বন করতেও বলেন নি। তাঁর দাওয়াত দেয়ার ভঙ্গি ছিল বড়ই বিস্ময়কর ধরনের। তিনি লোকদেরকে বললেন, 'চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ আমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। তিনি কেবল নিজের ছাড়া আমাদেরকে আর কারোই বান্দাহ্ বানান নি, কিন্তু লোকেরা তাঁর শোকর করে না, বরং শুধু শুধুই তারা মনগড়াভাবে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নেয় ও সেগুলোরই দাসত্ব করে।'

এমন কি তিনি শ্রোতাদের ধর্মমতেরও সমালোচনা করেন, কিন্তু তা করেন খুবই বুদ্ধিমত্তা সহকারে। তাতে কারো মনে একবিন্দু কষ্ট দেয়ার নীতি তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে, এই যে সব মাবুদকে তোমরা অন্নদাতা, নে'মাতদাতা, দুনিয়ার মালিক,

ধন-সম্পদের প্রভু, বা রোগ-স্বাস্থ্যের নিয়ামক ইত্যাদি বলে অভিহিত করো, এ সবই অন্তঃসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নামগুলোর পেছনে কোন প্রকৃত অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী মালিক ও প্রতিপালক বলে কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। আসলে সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যাকে তোমরাও বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী বলে মানো। তিনি অপর কারো জন্য প্রভু, উপাস্য বা মাবুদ হওয়ার কোন সনদই নাযিল করেন নি। জগত পরিচালনার সমস্ত অধিকার ও ইখতিয়ার তিনি নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশই এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারোই বন্দেগী করবে না।

এভাবে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের জীবনের মূল্যবান প্রায় দশটা বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনগুলো পার হয়ে গেছে। কারাগারে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেননি। ইসলামী আদর্শ কারা-কর্তৃপক্ষ এবং বন্দীদের মাঝে প্রচার করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর গোলামী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর যমীনে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাঁরা যে কোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেনো, মুহূর্ত কালের জন্যও তাঁরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিল হন না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর রহমতের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি ধৈর্যহারা হননি। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন তারপরে কারাগার থেকে তাকে সম্মানের সাথে বের করে এনেই মহান আল্লাহ্ তাঁকে দেশের শাসকের পদে আসীন করেছিলেন।

ফুল যেখানেই ফোটে তার আপন সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ সে ফুলের সৌরভ অনুভব করে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে মহান আল্লাহ সে যুগের সুগন্ধ যুক্ত ফুল হিসেবেই শুধু প্রেরণ করেননি, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সেই ইউসুফ নামক ফুল থেকে সুগন্ধি গ্রহণ করবে। সে ফুল যুগ যুগান্তরে সৌরভ ছড়াবে। সে ফুল আজ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাঁর অমোছনীয় সেই সুবাস রয়ে গেছে এবং থাকবে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

শুধু ইউসুফ আলাইহিস্ সালামই নন, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, তিনিও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি, সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে হারিয়েও তিনি এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। মানুষের কাছে তিনি তাঁর হৃদয়ের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করেননি। আল্লাহর কাছেই তিনি আবেদন পেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কি বলেছিলেন, কোরআন আমাদেরকে শোনাচ্ছে–

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ–

আমি সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করবো (সূরা ইউসুফ-১৮)

তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদেরকে বলেছিলেন, আমি আমার মনের যন্ত্রণার কথা এক মাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছেই করছি না এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছি না।

তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু তারাই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সে কথা কোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে শুনাচ্ছেন-

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ-يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلاَتَا يْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ-اِنَّه لاَيَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার আবেদন আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছেই করছি না। আর আল্লাহর কাছ থেকে আমার যা জানা আছে তা তোমাদের নেই। হে আমার ছেলেরা ! তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সন্ধান করো। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু কাফেররাই। (সূরা ইউসুফ-৮৬-৮৭)

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম বয়সের একটা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের অন্যান্য ভাইগণ খাদ্যের সন্ধানে মিসরে যেতে বাধ্য হলেন, এক পর্যায়ে যখন তাঁর সাথে ভাইদের পরিচয় হলো, তখন তিনি মিসরের শাসক। ভাইদেরকে তিনি কোন শাস্তি দেননি এমনকি কোনো কটু কথাও বলেননি। তাদের কাছ থেকে তিনি যখন শুনলেন, পিতার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছে। তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম পিতার জন্য নিজের শরীর মোবারকের জামা তাঁর ভাইদেরকে দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এই জামা আব্বার চেহারার ওপর রাখলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর হারানো দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর পবিত্র জামা নিয়ে মিসর থেকে বাড়ির পথে অর্থাৎ কেনআনে যাত্রা করেছিল।

মিসর এবং কেনআন, এই দুইটি দেশের মাঝে বেশ ব্যবধান। তবুও মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের গন্ধ হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের নাসারন্ধ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই অনুভূতির কথা প্রকাশ করতেই তাঁর পরিবারের লোকজন তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, এটা আপনার মনের কল্পনা। যেদিন থেকে ইউসুফ হারিয়ে গেছে, সেদিন থেকে আপনি তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করছেন। সেই চিন্তা আপনাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, আপনি এখন পর্যন্ত আশায় আছেন, ইউসুফ একদিন ফিরে আসবেই। এটা আপনার সেই পুরনো কল্পনা। এ সম্পর্কে কোরআন বলছে-

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلاَ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ-قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ-فَلَمَّآ اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيْرًا-قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ-اِنِّىْ

اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ-قَالُوْا يٰاَبَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ-قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ-اِنَّه هُوَالْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ-

এই কাফেলা যখন (মিসর থেকে) যাত্রা করলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে বসে) বললো, আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি। তোমরা যেন বলে না বসো যে আমি বয়সের কারণে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন। তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী এসে পৌছলো, তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের ওপর রাখলো আর সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, আমি না তোমাদেরকে বলছিলাম, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। সবাই বলে উঠলো, আব্বাজান ! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যই অপরাধী। সে বললো, আমি আমার রব-এর কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইউসুফ-৯৪-৯৮)

আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি–হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের এই কথা থেকে নবী-রাসূলদের অসাধারণ শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কাফেলা হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের জামা নিয়ে সবেমাত্র মিসর থেকে রওয়ানা করলো আর এই দিকে শত শত মাইল দূরত্বে থেকে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম আপন সন্তান হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের 'সুবাস' পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও জানতে পারা যায় যে, নবী-রাসূলদের এই শক্তি তাঁদের নিজস্ব ও স্ব-উপার্জিত নয়; এটা একান্তভাবে আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্ই দান করেছেন বলে তারা এই শক্তির অধিকারী হয়েছেন। আর আল্লাহ্ যখন যে পরিমাণ চান, তাদেরকে সেই শক্তি কাজে লাগানোর সুযোগ দেন। হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম অনেক বছর ধরে মিসরে রয়েছেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম তাঁর কোনো গন্ধ অনুভব করলেন না। কিন্তু সহসাই অনুভূতি-শক্তি এত বেশী তীব্র হয়ে উঠলো যে, তাঁর জামা নিয়ে মিসর থেকে রওয়ানা হতেই তিনি বাড়িতে বসেই হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের সুবাস লাভ করতে শুরু করলেন।

ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন–এই কথাগুলো হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের পরিবারের লোকজনের। তাদের কথার ধরণ দেখে মনে হয় যে, গোটা পরিবারে হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম ছাড়া আর কেউ পিতার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতো না এবং হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম নিজেও তাঁর পরিবারের লোকদের মানসিক ও নৈতিকহীনতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন।

পক্ষান্তরে যে ঘরের প্রদীপের আলো বাইরের জগতকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলছিল; কিন্তু স্বয়ং সে ঘরের লোকেরা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর তাদের দৃষ্টিতে সে 'প্রদীপ' এক টুকরা কয়লার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতির এই নির্মম পরিহাসের সাথে ইতিহাসের প্রায়

সকল বড় বড় ব্যক্তিত্বেরই সাক্ষাত ঘটেছে। এই পৃথিবীতে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য যারা আগমন করেছেন, নবী-রাসূলদের অবর্তমানে যারা ইসলামী মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য অক্লান্ত শ্রম দান করছেন, আগামীতেও করবেন, ইসলামকে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা নিজের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাদের অধিকাংশের পরিবারের লোকজনের অবস্থা হলো, তারা সত্য পথ অবলম্বন করতে আগ্রহী হয় না। অথচ তাদের ঘরের ভেতরেই মহাসত্যের মশাল আলো বিকিরণ করতে থাকে। যেমন হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের কয়েকজন সন্তান, তাদের পিতা এবং ভাই হলেন আল্লাহর নবী। কিন্তু তারা সেই পিতার কাছ থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেদেরকে পূর্ণ মুসলিমে পরিণত করতে পারেনি।

এখানে এ কথাও চরম সত্য যে, অধিকাংশ নবীগণ যখন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভ করেছেন, তখন তারা অবিবাহিত বা সন্তান-সন্ততিহীন ছিলেন না। তাদের সন্তান-সন্ততিও নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে পরিবার গঠনের শুরু থেকেই তাদেরকে আল্লাহর আইন পালনে অভ্যস্থ করার কোন সুযোগ ছিল না। তবুও নবীগণ তাদের সন্তানদের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেন তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

বর্তমানে পরহেজগার হিসেবে পরিচিত এমন কিছু লোকজন দেখা যায়, যাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী। তাদের সন্তান কেনো এমন হলো, এ প্রশ্ন তাদের কাছে করলে তারা নবীদের সন্তানদের উদাহরণ পেশ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু পারিবারিক জীবন গঠন করার পূর্বেই যিনি দ্বীনি আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছেন, তিনি তো তার পরিবারে ইসলামী পারিবেশ বিরাজ করে এমন ধরনের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই গ্রহণ করবেন। যেন সেই পরিবারে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে। দ্বীনি আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ লোকজন এ দায়িত্ব পালন করেন না। ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। সন্তানকে তারা শিশু বয়সে সাথে নিয়ে আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অভ্যস্থ করে তুলেন না। এমনকি অনেকে মসজিদেও সাথে করে নিয়ে যান না। শিশু বয়স থেকে শিশুকে যে কাজে অভ্যস্থ করে তোলা হয়নি, ইসলাম বিরোধী এই পরিবেশে তারা বড় হয়ে দ্বীনি আন্দোলন পসন্দ করবে কিভাবে ? এ কথা ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এসব সন্তানদের পিতাগণ নবীদের সন্তানদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

ঈমানদার ব্যক্তির গোটা জীবনই হলো ধৈর্যের জীবন। আল্লাহর ওপরে সে থাকে আশাবাদী। কারণ সে জানে, তার ওপরে যতবড় বিপদই আসুক না কেন আশ্রয় লাভ করার একটি স্থান তার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে উন্মুক্ত রয়েছে, তাঁর আশ্রয় দাতা হলেন আল্লাহ। আমরা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের জীবনে দেখতে পাই, যখন তাঁকে বিশাল আকৃতির একটি মাছ

উদরস্থ করে পানির অতল তলদেশে চলে গেল-এমন বিপদ তার ওপরে নেমে এলো যে, এমন ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদে কোন মানুষ কখনও নিমজ্জিত হয়নি। কোন মানুষ এই ধরনের বিপদের কথা কল্পনাও করেনি। তার ওপরে যখন এমন বিপদ দেখা দিল, তখন তিনি অধৈর্য হননি। ভয়ে আতঙ্কে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় নি। তিনি সাহস হারাননি। আল্লাহর ওপরে ছিল তার অবিচল আস্থা।

ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে তিনি বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একদিকে রাতের ঘন অন্ধকার। অপরদিকে পানির নিচের অন্ধকার। আরেকদিকে মাছের পেটের অন্ধকার। এই ত্রিবিধ অন্ধকারে বিপদে নিমজ্জিত হয়ে তিনি মাছের পেটের ভেতরে বসে স্থির বিশ্বাসে আর্তচিৎকার করে উঠেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকেই শুধু বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন, বিষয়টি এমন নয়, বরং আয়াতে বলা হয়েছে, আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে যারা ভুল করবে এবং সেই ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে সাহায্য করবো। মহান আল্লাহ বলেন-

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ-اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ-وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ-وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো, 'তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।' তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া-৮৭-৮৮)

এমন একস্থান থেকে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, যেখান থেকে আবেদন করলে সে আবেদন কেউ শুনতে পাবে না এবং সে আবেদন শোনার মত শক্তি ও ক্ষমতাও কারো নেই। তার সে করুণ আর্তনাদ পানির ভেতরে কেউ শুনতে পেলো না, পৃথিবীর কেউ শুনতে পেলো না। আকাশের কেউ শুনলো না। কিন্তু সর্বশ্রোতা মহান আল্লাহ সে আবেদন শুনেছিলেন। তিনি মাছের পেটের ভেতরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দিলেন যে, মাছ বাধ্য হলো তাকে উদগীরণ করে দিতে।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার ইউনুসের ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে বিপদ মুক্ত করলাম। এমনিভাবে আমার কোনো মুমিন বান্দাহ্ যখন কোন অপরাধ করে বসে এবং এ কারণে সে পৃথিবীতে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর সে নিজের ভুল অনুভব করতে পেরে আমার কাছে যখন সাহায্য কামনা করে, তখন আমি তাকে সাহায্য করি। এটাই আমার নীতি, আমি

আমার বিপদগ্রস্ত বান্দার আহ্বান শুনে নীরব থাকি না। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন–

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-

জেনে রাখো, দুঃখ আর কষ্টের পরে রয়েছে সুযোগ সুবিধা আর অস্বচ্ছলতার সাথেই রয়েছে উদার সস্বচ্ছলতা। (সূরা আলাম নাশরাহ্)

যত বড় বিপদই আসুক না কেন, এই বিপদের পরেই মহান আল্লাহ তাঁর গোলামদের ওপরে রহমত নাযিল করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, অন্ধকার যত গভীর হয়, পূর্বাশার প্রান্তে সূর্যের উদয় লগ্ন ততই এগিয়ে আসে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর গোলামদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন– وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-

তোমরা মনভাঙা হয়োনা, চিন্তাগ্রস্থ হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।

হতাশা মানুষের চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আসে, বিবেক বুদ্ধি প্রকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

না-হো-না-উমিদ, না উমিদি জাওয়ালে ইল্ম ও ইরফান হ্যায়

উম্মিদে মর্দে মুমিন হ্যায় খোদাকে রাজদানুঁ মে।

হতাশাবাদীদের অন্তর্গত হয়ো না, হতাশা-নৈরাশ্য মানুষের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিকে ধ্বংস করে। মুমিনদের আশা খোদার রহস্যবিদ বান্দাগণের অন্তর্গত।

শয়তানের প্ররোচনা ও 'সবর'

শয়তান স্বয়ং অস্থির চিত্তের ও অহঙ্কারী। এ জন্য যারা ধৈর্য অবলম্বন করে, শয়তান নানাভাবে তাদের ভেতরে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে তাদেরকে মহান আল্লাহর রহমতের ছায়া থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবীর উপস্থিতিতে একবার একজন লোক সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। তিনি নীরবে প্রতিপক্ষের কটুবাক্য শুনতে থাকেন আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকরের নীরবতা দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

প্রতিপক্ষ কটুবাক্য প্রয়োগ করেই চলেছে। এক সময় হযরত আবু বকরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো এবং তিনি প্রতিপক্ষকে কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের গালিগালাজের জবাব দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো এবং বিরক্তির ভাব ছেয়ে গেলো। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর আল্লাহর রাসূলের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। পথিমধ্যে তিনি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করছিলো, তখন আপনি নীরবে হাসছিলেন, কিন্তু যখনই আমি তার গালির জবাব দিলাম, আপনি অসন্তুষ্ট হলেন, এর কারণ কি?

আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি যতক্ষণ নীরব থেকে প্রতিপক্ষের কটুবাক্য সহ্য করছিলে, ততক্ষণ তোমার সাথে থেকে একজন ফেরেশ্‌তা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু তুমি যখনই লোকটির গালির জবাব দিলে তখনই সেই ফেরেশ্‌তার স্থানে শয়তান এলো। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

শয়তান নানাভাবে প্ররোচিত করে ধৈর্যশীলদেরকে ধৈর্যহীনতার পথে ঠেলে দিতে চায়। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা অনুভব করতে পারো তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন। (সূরা হামীম সাজ্‌দা-৩৬)

(শয়তান কিভাবে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের দ্বারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে আমরা তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা নাস-এর তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের সাথে সূরা নাস-এর তাফসীর একত্রে পাঠ করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।)

মুমিনের জীবন ও 'সবর'

ঈমান আনার পরে একজন মানুষকে তার মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক পদে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'ঐ তিন সময় ধৈর্য অবলম্বন করার সর্বোত্তম সময়-বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হলে ধৈর্য ধারণ করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং এই বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, যেমন নামাযের ক্ষেত্রে। নামাযে যখন কোনো মানুষ দন্ডায়মান হয়, তখন তো সে মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যেমন ধৈর্যহীনতার পরিচয় তেমনি মহান আল্লাহর শানে বেয়াদবির শামিল।

রাষ্ট্রপ্রধান, কোনো মন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় পদে আসীন ক্ষমতাবান কোনো লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। কখনো দেখা পাওয়া যায় কখনো পাওয়া যায় না। নানাজনের কাছে ধর্ণা দিয়ে যদিও কারো ভাগ্যে দেখা করার সুযোগ ঘটে, তবুও সংক্ষিপ্ত সময়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হয়। যাদের ভাগ্যে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে তারা কেউ তাড়াহুড়া করে না। বরং কতটা বেশী সময় তার সামনে থেকে নিজের অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করতে পারবে, মানুষ সেই সুযোগ খুঁজতে থাকে। যিনি সাক্ষাৎ করছেন এবং যার সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে, তারা উভয়ে মানুষ এবং মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

কিন্তু নামাযের মাধ্যমে যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে, তিনি অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের যে কোনো প্রয়োজন মুহূর্তকালের মধ্যে পূরণ করতে সক্ষম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কারো কাছে ধর্ণা দিতে হয় না, লাইন ধরতে হয় না এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সাক্ষাতের জন্য সময় ভিক্ষা চাইতে হয় না। গোপনে-প্রকাশ্যে, আলোয়-অন্ধকারে এবং যমীনে ও আকাশে যেখানে খুশী, সেখানেই তাঁকে সিজ্দা দিয়ে যে কোনো প্রয়োজনের কথা তাঁর দরবারে পেশ করা যায়। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'বান্দা ঐ সময়ে মহান আল্লাহর সবথেকে কাছাকাছি হয়ে যায়, যখন সে আল্লাহকে সিজ্দা করে।' নামায এমনই এক ইবাদাত যে, কোনো মাধ্যম ব্যতীতই বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। বান্দা যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তার মনে এই চেতনা জাগ্রত থাকতে হবে যে, সে আল্লাহকে দেখছে না, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে দেখছেন। সে আল্লাহর কথা শুনছে না কিন্তু সে যা বলছে, তা তিনি শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন। সে শূন্য কোনো স্থানে সিজ্দা দিচ্ছে না, বরং সে আল্লাহ তা'য়ালার পায়ের ওপরে মাথা রেখে তাঁকে সিজ্দা দিচ্ছে। তার প্রত্যেকটি স্পন্দন আল্লাহ তা'য়ালা লক্ষ্য করছেন—এই চেতনা তার ভেতরে জাগ্রত রাখতে হবে। সম্মান-মর্যাদা, হায়াত, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা তথা সমস্ত কিছু চাওয়া-পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। এই নামাযে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর মানুষ এই নামাযেই সর্বাধিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে। যথাযথভাবে চার রাকাআত ফরজ নামায আদায় করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তার চার ভাগের এক ভাগ সময়ে চার রাকাআত নামায শেষ করে।

নামায আদায় করতে হবে পরম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভয়ের সাথে। যখন যে ওয়াক্তের নামায আদায় করা হচ্ছে, সে সময় মনে এই চেতনা জাগ্রত থাকবে যে, এরপরের ওয়াক্ত নামায আদায় তথা আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্দা করার সুযোগ নছিবে আর না-ও জুটতে পারে। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। সুতরাং এই নামাযই তার জীবনের শেষ নামায। এই চেতনা যদি মনে জাগ্রত থাকে, তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই সে ব্যক্তি পরম যত্নের সাথে গভীর শ্রদ্ধায় আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্দা করবে। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীর মধ্যে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদ থেকে কখন ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে, এই চিন্তায় তারা অস্থির থাকে।

শুধু নামাযই নয়, মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে পরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। রোযা পালনের ক্ষেত্রে অনাহারে সারা দিন অতিবাহিত করা—এ ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। রোযা রেখে অস্থিরতা প্রকাশ করা, কথায় কথায় ক্রোধান্বিত হওয়া, চেহারায় মলিনতা ফুটিয়ে তোলা অসহিষ্ণুতার নামান্তর। যে উদ্দেশ্যে রোযা ফরজ করা হয়েছে, এসব কাজ সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত। মানুষের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের মধ্যে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের গুরুত্ব যেমন, রোযা পালনের ক্ষেত্রে পানাহার ত্যাগ করার গুরুত্বও অনুরূপ। শুধুমাত্র পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়। রোযা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ইবাদাতের দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক দিক অন্যটি

হলো অভ্যন্তরীণ দিক। যেমন নামায, মানুষ আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেও নামায আদায় করতে পারে আবার প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যেও নামায আদায় করতে পারে।

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেও জিহাদ করতে পারে আবার লোক সমাজে প্রশংসা অর্জন, নিজের বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যেও জিহাদ করতে পারে। কিন্তু রোযা এমন একটি ইবাদাত, যা প্রদর্শন করার কোনো উপায় নেই। এই জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, রোযার পুরস্কার মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং প্রদান করবেন। যে আল্লাহর ভয়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসের খর-তাপের মধ্যে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ার পরও সামনে উপস্থিত ঠান্ডা পানির পেয়ালার দিকে আল্লাহর ভয়ে রোযাদার হাত বাড়ায় না। যে আল্লাহর ভয়ে রোযাদার ধৈর্যের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানি পানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সেই আল্লাহর ভয়েই রোযাদার ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে, গীবত, চোগলখুরী, পরচর্চা-পরনিন্দা, অপরের দোষ অনুসন্ধান, লজ্জাহীনতা, সুদ-ঘুষ তথা যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে এবং এসব কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তা অবলম্বন করবে।

রোযা পালনের জন্য পেটকে যেমন খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে, অনুরূপভাবে দেহের মন-মস্তিষ্কের দ্বারাও রোযা পালন করতে হবে। চোখ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কিছু না দেখার অর্থ হলো চোখের রোযা। মহান আল্লাহর অপসন্দীয় স্থানে গমন করা থকে পা-দুটোকে বিরত রাখা হলো পায়ের রোযা। আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কর্ম থেকে হাত দুটোকে বিরত রাখা হলো হাতের রোযা। মন-মস্তিষ্ক দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের বিপরীত কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা হলো মন-মস্তিষ্কের রোযা।

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধৈর্য অবলম্বন করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সফলতা। বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না। স্ত্রীর পরনে কাপড় নেই, সন্তান-সন্ততি ছিন্ন পোষাকে রয়েছে, অর্থের অভাবে ভালো স্কুলে পড়ানো যাচ্ছে না। নিজের মাথা গোঁজার মতো একটি বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করতে হয়, বাড়ির মালিক কটু কথা শোনায়। অবৈধ সুযোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জনের অনেক পথ খোলা রয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই অভাব মোচন হয়। কিন্তু যে কোনো অবৈধ পথ থেকে নিজেকে পরম ধৈর্যের সাথে বিরত রেখে সততার পথে অটল অবিচল থাকতে হবে।

যখন থেকে ঈমান আনা হলো, সেই মুহূর্ত থেকেই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানদারকে জীবনের প্রত্যেক পদে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। এদিক ওদিক হাত বাড়ালেই বিপুল অর্থের মালিক হওয়া যায়। সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাউকে একটু অবৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেই অঢেল অর্থ লাভ করা যায়, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করলেই অনেক কিছু লাভ করা যেতে পারে। এসব সুযোগ যখন সামনে উপস্থিত হয়, শয়তান তখন অভাব আর দৈন্যতার চিত্রগুলো দৃষ্টির সামনে প্রকট করে তোলে।

সুস্বাদু ফলের মৌসুম চলে যাচ্ছে, প্রতিবেশীর সন্তান সেই ফল খাচ্ছে আর নিজের সন্তান অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছে। ছিন্ন পোষাকের কারণে সন্তানকে স্কুলের সহপাঠিরা বিদ্রুপ করে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর পরনের দামি শাড়ির দিকে নিজের স্ত্রী করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভালো তরকারী নেই, সন্তান-সন্ততি পেট ভরে ভাত খায় না। অসুস্থ বৃদ্ধা মাতা ওষুধের অভাবে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। এসব যন্ত্রণাদায়ক চিত্রগুলো শয়তান ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখের সামনে প্রকট করে তুলবে, যখন অবৈধ অর্থ লাভের সুযোগ সামনে এসে উপস্থিত হবে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করা বড়ই কঠিন, তবুও ঈমানদারকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে ইসলামের বিপরীত শক্তি বিশাল বিপুল শক্তি ও জাঁকজমক সহকারে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। অর্থ, জনশক্তি, উপায়-উপকরণ ও প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ময়দানে তৎপরতা প্রদর্শন করে। অপরদিকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত লোকগুলো সংখ্যায় তাদের তুলনায় নিতান্তই অল্প। এদের অর্থ নেই, জনশক্তি নেই, বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মতো তেমন কোনো উপায়-উপকরণও নেই। এই অবস্থায় এক শ্রেণীর লোক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে, 'এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ঐ বিশাল শক্তির সাথে কি মোকাবেলা করা সম্ভব?' বদরের প্রান্তরে মুমিনদের সংখ্যা ছিল প্রতিপক্ষের তুলনায় নিতান্তই অল্প। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ-اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَبِرُوْنَ يَغْلِبُوْامِائَتَيْنِ-وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا-

হে নবী! মুমিন লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে দশ ব্যক্তি যদি ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুই শতের ওপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এমন থাকে, তাহলে সত্য অবিশ্বাসীদের এক হাজার লোকের ওপর তারা বিজয়ী হতে পারবে। (সূরা আনফাল-৬৫)

ধৈর্যই সফলতার চাবিকাঠি। অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্য নামক সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করতে না পারলে কোনোক্রমেই সফলতা অর্জন করা যাবে না। প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁর জাতির পক্ষ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তারা ধৈর্যের বর্ম দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করেছেন। হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, যে সময় ইসলাম বিরোধিদের নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না?'

অর্থাৎ আমরা তো প্রতিপক্ষের নির্যাতনে শেষ হয়ে গেলাম, এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির জন্য আপনি কি মহান আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন না? আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিন দল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর থেকেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহর শপথ! এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বরামাউত পর্যন্ত নিশঙ্ক চিত্তে ভ্রমণ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

অর্থাৎ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে, তাহলেই সফলতা অর্জন করা যাবে। ধৈর্যের মধ্যে বিরাট বরকত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا-فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ-وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

অতএব তোমাদের মধ্যে যদি এক শত লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর আর হাজার লোক এমন হলে দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর আদেশে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্য ধারণকারী। (সূরা আনফাল-৬৬)

স্বাধীনভাবে আল্লাহর গোলামীর ক্ষেত্রে 'সবর'

এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পসন্দ করে কিন্তু বিষয়টি তার পরিচিত মহল বা কর্মক্ষেত্রে গোপন রাখে। মনে মনে চিন্তা করে, সে যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পসন্দ করে, এই কথাটি জানাজানি হয়ে গেলে লোকজন তাকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়ীক, পশ্চাদপদ বলবে। কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবত আসবে বা কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি চাকরী থেকেও বরখাস্ত করতে পারে, তখন অনাহারে থাকতে হবে। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের ওপরে যখন নির্যাতন চলেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তবুও তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা যে লোকগুলোকে খুঁজে বের করে নির্যাতন করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

ধৈর্যের কোন্ সীমায় উপনীত হলে একজন মানুষ এভাবে নিজেকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারে, তা অনুধাবন করার বিষয়। আল্লাহর গোলাম হিসাবে

নিজেকে গড়তে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। আর আল্লাহর গোলামী স্বাধীনভাবে করতে গেলে যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তাই করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ-كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ-ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ-الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا-اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ-وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো! আমার যমীন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগী করো। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতই না উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য-তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রব-এর প্রতি আস্থা রাখে। কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা আনকাবুত-৫৭-৬০)

মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা যেখানে অবস্থান করছো, সেখানে যদি তোমরা আল্লাহর গোলামী করতে অপারগ হও, আল্লাহর গোলামী করার পরিবেশ না থাকে, আপন প্রভুর আইন-বিধান অনুসরণ করতে না পারো, তাহলে সেস্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহর পৃথিবী বিশাল-বিস্তীর্ণ, কোনো সঙ্কীর্ণ স্থান নয়। যেখানেই তোমরা স্বাধীনভাবে আপন প্রভুর গোলামী করতে পারবে, আল্লাহর বিধান স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে, সেখানে চলে যাও অর্থাৎ হিজরত করো। দেশ, জাতি ও চাকরীর মায়ায় এমন স্থানে থেকো না, যেখানে থাকলে আল্লাহর গোলামী করা যায় না। সুতরাং দেশ, জাতি ও চাকরীর গোলামী করো না, আল্লাহর গোলামী করো।

চাকরী, দেশ ও জাতিকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে যদি আল্লাহর গোলামী করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে এসব কিছুকে ত্যাগ করে আল্লাহর গোলামী করার দাবীকেই অগ্রাধিকার

দিতে হবে এবং এটাই ঈমানের পরিচয়। এই ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী, তারা চাকরী, দেশ ও জাতিকে অগ্রাধিকার দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা প্রকৃতই মহান আল্লাহর গোলামী করতে আগ্রহী, তারা দেশ ও জাতি প্রেমিক হতে পারে কিন্তু দেশ, জাতি ও চাকরীর পূজারী হতে পারে না। তার কাছে আল্লাহর গোলামী হয় সমস্ত কিছুর থেকে অধিক প্রিয় এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে সে আল্লাহর গোলামীর মোকাবেলায় বিকিয়ে দেয় কিন্তু পৃথিবীর কোনো স্বার্থের কাছে আল্লাহর গোলামীকে বিকিয়ে দেয় না।

আল্লাহর গোলামীকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে, নিজেকে কোরআনের অনুসারী বলে পরিচয় দিতে গেলে বা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজে জড়িত, এই পরিচয় দিতে গেলে সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে অথবা প্রাণও হারাতে হতে পারে--এসব অমূলক চিন্তা যেনো তোমাদেরকে দুর্বল করতে না পারে। কারণ সম্মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ বা পৃথিবীর কোনো একটি স্বার্থও চিরস্থায়ী কোনো জিনিস নয়। এমনকি তোমার নিজের প্রাণও চিরস্থায়ী নয়। তোমার চোখের সামনেই দেখছো, একজন মানুষও চিরঞ্জীব নয়। একদিন না একদিন সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। চিরকাল থাকার জন্য কোনো একটি প্রাণের আগমনও এই পৃথিবীতে ঘটেনি।

সুতরাং এই পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামীর পথ পরিহার করে কিভাবে নিজের সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্ন রাখবে এবং নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলবে, এসব বিষয় নিয়ে অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। বরং চিন্তা করো, ঈমানকে কিভাবে হেফাজত করবে, আল্লাহর গোলাম হিসাবে কিভাবে নিজেকে সঠিক পথে অটুট রাখবে। কারণ শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। যদি পৃথিবীতে নিজের সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের আশায় ঈমানের পথ পরিহার করো, নিজের প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে ঈমান বিকিয়ে দাও, তাহলে তোমরা মহাক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং আমার দরবারে যখন তোমাদেরকে উপস্থিত হতেই হবে, তখন কি সম্পদ নিয়ে আমার সামনে দন্ডায়মান হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে জীবন পরিচালিত করো। দেশ, জাতি, সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রাণের জন্য ঈমানকে কোরবানী দেবে, না ঈমানকে হেফাজত করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত স্বার্থকে কোরবানী দেবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি মনে করে থাকো যে, পৃথিবীতে আমার বিধান অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করলে তোমরা পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, সম্মান-মর্যাদা তথা যাবতীয় নে'মাত থেকে বঞ্চিত হবে, লোকজন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদেরকে ব্যর্থ বলে উপহাস করবে-করুক না, কোনো পরোয়া করো না। যাবতীয় পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করো এবং বিশ্বাস করো তোমরা ব্যর্থ নও। হাশরের ময়দানে তোমাদের যাবতীয় অভাব শুধু পূরণ করাই হবে না, বরং তোমাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।

আপন রব-এর গোলামী করার কারণে যদি তোমাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়, নিজ জাতিকে ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করো। এর উত্তম প্রতিদান আমি তোমাদেরকে দেবো।

তোমাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম যদি এমন হয় যে, সেখানে আমার গোলামী করতে পারছো না। তাহলে সে মাধ্যম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। জীবিকার চিন্তায় আমার গোলামী থেকে বিরত থেকো না। পৃথিবীতে তোমাদের দৃষ্টির সামনে অসংখ্য-অগণিত পশু-প্রাণী রয়েছে, তারা জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদেরকে প্রতিপালন করছে বা তাদের খাদ্য যোগাচ্ছে। আমি আল্লাহ তাদের খাদ্য যুগিয়ে থাকি। পানির অতল তলদেশে বা পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় ছোট্ট একটি পোকাও না খেয়ে থাকে না। যখনই তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আমি আল্লাহ তার রিযিক সরবরাহ করে থাকি।

সুতরাং স্বাধীনভাবে আমার গোলামী করার জন্য যদি তোমাদেরকে চাকরী হারাতে হয়, দেশ ত্যাগ করতে হয়, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তাহলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করো। ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করো। অসহায় প্রাণীকূলকে আমি রিযিক দিচ্ছি, তোমাদেরকেও আমিই রিযিক দেবো। রিযিক্-এর ব্যাপারে পেরেশান হয়ো না, ধৈর্য ধারণ করো-আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবো।

'হক'-এর দাওয়াতের ময়দানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন একটি সময় সামনে এসে উপস্থিত হয়, যখন একজন ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সহায়-সম্পদ ও নির্ভরতা থেকে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ উন্মুক্ত থাকে না। এই অবস্থায় যারা আগামী দিনে কিভাবে জীবন বাঁচাবে, রিযিক কোথা থেকে আসবে, মাথা গোঁজার ঠাঁই কোত্থেকে জুটবে, পরিবার, পরিজনের মুখে কি তুলে দেবে এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে যায়, তাদের পক্ষে সফলতা অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে যারা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে অসীম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এবং প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৃঢ়পদে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, যে কোনো বিপদ-মুসিবতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে, সফলতা তাদেরই পদচুম্বন করে। এই শ্রেণীর লোকদের অসীম ত্যাগ, কোরবানী আর অপরিসীম ধৈর্যের বিনিময়ে পৃথিবীর বাতিল শক্তি মাথানত করে এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।

অভিযোগহীন 'সবর'

বিপদ-মুসিবত, রোগ-শোক, ত্যাগ-তিতীক্ষা ইত্যাদির কঠিন ও বিভিষীকাময় স্তর অতিক্রম করলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করা যাবে। আর এসব পর্যায় অতিক্রম করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অভিযোগ না করে, চোখের পানি না ফেলে, কাকুতি-মিনতি না জানিয়ে, অস্থিরতা প্রকাশ না করে এবং চিত্ত চাঞ্চল্য না ঘটিয়ে অটল ও অবিচল থেকে যে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটানো হয়, তাকেই সর্বোত্তম ধৈর্য বলা হয় এবং পবিত্র কোরআনে এই ধরনের ধৈর্যকে 'সাবরুন জামিল' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই ধরনের ধৈর্যই সবথেকে অধিক পসন্দনীয়।

নবী-রাসূলদের জীবনে এই ধরনের 'সবর' ছিল তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আগুনের কুন্ডে ফেলে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটেনি। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম সন্তান হারিয়ে এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেন, তিনি কোনো অভিযোগ করলেন না। হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের গোটা দেহে পচন ধরলো, তাঁর আপনজন তাঁকে ত্যাগ করলো, তিনি কোনো অভিযোগ করলেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো, তায়েফে হতাশাব্যঞ্জক কথা দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হলো, তায়েফের ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ উচ্ছৃঙ্খল যুবকদেরকে আল্লাহর রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা একটির পর একটি পাথর ছুড়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র দেহ মোবারক ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। আঘাতের যন্ত্রণায় রাসূলের পবিত্র পা দুটো আর উঠতে চায় না। তিনি হাঁটতে পারছেন না, বেঈমান-কাফিররা তাঁকে হাঁটতে বাধ্য করছে, তিনি যখনই হাঁটা শুরু করছেন অমনি তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের ওপর পুনরায় পাথরের বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন তায়েফে আল্লাহর রাসূল তিনবার জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন।

জ্ঞান ফিরে আসা মাত্র তিনি রক্তাক্ত দুটো হাত আল্লাহর দরবারে উঠালেন, কিন্তু আঘাতকারীদের প্রতি কোনো অভিশাপ দিলেন না। বরং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এই লোকগুলো আমাকে চিনতে পারেনি। ওরা জানে না যে আমি তোমার নবী। ওরা না জেনে আমাকে আঘাত করেছে। আমাকে আঘাত করা হয়েছে, এ কারণে তুমি ক্রোধান্বিত হয়ে ওদের ওপরে গযব নাযিল করো না। তুমি যদি ওদেরকে গযব দিয়ে ধ্বংস করে দাও, তাহলে আমি দ্বীনের দাওয়াত দেবো কার কাছে?'

আল্লাহর ফেরেশ্‌তা দল মারাত্মকভাবে আহত নবীর কাছে এসে বলেছেন, 'আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন। আমরা এই পাহাড়গুলো উঠিয়ে তায়েফের কাফির-বেঈমানদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।' আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'ওদেরকে যদি তোমরা শেষ করে দাও, তাহলে আমি 'হক'-এর দাওয়াত কার কানে পৌঁছাবো?' এভাবে করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়েছেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। ওহুদের ময়দানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর নবীকে ঘিরে রেখেছেন। শত্রুদের অস্ত্রের সমস্ত আঘাত রাসূলের পবিত্র শরীরে যেন না লাগে, এ জন্য সাহাবাগণ রাসূলকে ঘিরে মানববন্ধন তৈরী করে নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করতে যেয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাত বরণ করলেন। কাফির বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমন করছিল।

এ সময় কাফেরদের তীরের আঘাতে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ কোটর ছেড়ে বের হয়ে এলো। মুখের কাছে এসে চোখ ঝুলতে থাকলো। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর পাশে থেকে কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে থাকলেন। আল্লাহর রাসূল তুনীর থেকে তীর বের করে হযরত সা'দের হাতে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'হে সা'দ ! তোমার ওপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক, তুমি তীর চালাও।'

হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিলেন যে, কাফিরদের সমস্ত আঘাতগুলো যেন তাঁর দেহেই লাগে, আল্লাহর রাসূল যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে তরবারী ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমনকারী কাফিরদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এক সময় শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র হলো যে, মাত্র ১২ জন আনসার আর মক্কার মোহাজির হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত আর কেউ নবীর পাশে স্থির থাকতে পারলেন না।

এ অবস্থায় কাফিরদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে আল্লাহর রাসূল ঘোষনা করলেন, 'আক্রমনের মুখে শত্রুদেরকে যে ব্যক্তি পিছু হটতে বাধ্য করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।' হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি শত্রুদেরকে আক্রমন করবো।' আল্লাহর রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন না। আনসারদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আক্রমন করতে যাবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে শাহাদাতবরণ করলো। আল্লাহর রাসূল পুনরায় পূর্বের অনুরূপ ঘোষনা দিলেন। হযরত তালহা পুনরায় এগিয়ে এলেন। এবারও আল্লাহর রাসূল তাঁকে নিষেধ করলেন। এভাবে পরপর ১২ জন আনসারই শাহাদাতবরণ করলেন। এবার আল্লাহর রাসূল হযরত তালহাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি সিংহ বিক্রমে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মক্কার জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ সাহাবাদের বেষ্টনীর ওপর দিয়ে দোজাহানের বাদশাহকে আঘাত করার জন্য বারবার তরবারীর আঘাত হানছে। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শূন্য হাতে সে তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তরবারীর আঘাতে তাঁর একটা হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই, ঘাতকরা আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করছে। আর করুণার সিন্ধু সেই চরম মুহূর্তেও মহান আল্লাহর কাছে ঘাতকদের জন্য দোয়া করছেন, 'রাব্বিগ্ফিরলি ক্বাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন-হে আল্লাহ ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা যে কিছুই বুঝে না।'

সাহাবাগণ রাসূলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তীর এসে বিদ্ধ হতে পারে, আমরা আমাদের বুক দিয়েই তীর প্রতিরোধ করবো।'

রাসূল যাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন, সেই জালিমের দলই রাসূলকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসে আঘাতের পরে আঘাত করছে। জালিম ইবনে কামিয়া তরবারী দিয়ে বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারায় আঘাত করলো। তার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর নবীর মাথার লোহার শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া ভেঙ্গে চেহারা মোবারকে প্রবেশ করলো। তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে বললেন, 'ঐ জাতি কি করে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয় ! অথচ সে নবী তাদেরকে আল্লাহর দিকেই আহ্বান করছে।'

কোনো কোনে বর্ণনায় এসেছে, হযরত তালহা স্বয়ং মারাত্মকভাবে আহত, একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গোটা দেহে তীর ও তরবারীর আঘাত। তবুও তিনি আল্লাহর রাসূলকে নিজের কাঁধের ওপরে নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নিজের দেহের প্রতি সামান্য খেয়াল ছিল না। তাঁর দেহ থেকে ঝর্ণাধারার মতই রক্ত ঝরছিল। সেদিকে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি তখন অনুভব করছিলেন, আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে হবে। আল্লাহর নবীকে নিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় পৌঁছে নবীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি আর হযরত উবাইদাসহ অনেকেই অন্য দিকে যুদ্ধ করছিলাম। নবীর সন্ধানে এসে দেখলাম তিনি আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন করতে অগ্রসর হতেই তিনি বললেন, 'আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা দেখলাম তাঁর জ্ঞান নেই এবং শরীর থেকে একটা হাত বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ৮০ টিরও বেশী আঘাত ছিল তাঁর শরীরে। আল্লাহর রাসূল পরবর্তী কালে হযরত তালহা সম্পর্কে বলতেন, 'কেউ যদি কোন মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

হযরত তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হত। ওহুদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলতেন, 'সেদিনের যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত তালহা।' আল্লাহর নবী হযরত তালহাকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফিরদের আঘাতে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র দান্দানৃ মোবারক শাহাদাতবরণ করেছিল। তাঁর চেহারা মোবারকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবীর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রক্ত যখন বন্ধ হলো না, তখন বিছানার একটা অংশ পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে দেয়ার পরে রক্ত বন্ধ হয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে যারা তৎপর রয়েছেন, 'সবর' তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আল্লাহর জান্নাত এমনিতেই লাভ করা যাবে না। বাতিলের মোকাবেলায় ও বিপদ-মুসিবতে 'সবর' তথা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ-

তোমরা কি মনে করেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি, তোমাদের মধ্যে কারা তাঁর পথে জিহাদ করতে এবং 'সবর' অবলম্বন করতে প্রস্তুত? (সূরা ইমরাণ-১৪২)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতই মুজাহিদ এবং কোন্ ব্যক্তি যাবতীয় বিপদ-মুসিবত ও শত্রুর মোকাবেলায় হিমাচলের মতোই অটল অবিচল থেকেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ -

অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো, যাতে করে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ এবং দৃঢ়তা ও সবর অবলম্বনকারী কে তা আমি দেখে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি। (সূরা মুহাম্মাদ-৩১)

'সবর'-এর উত্তম প্রতিদান

'সবর' পবিত্র কোরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি শব্দ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণত 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে, অবিচলতা, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, মন-মেজাজের সমতা, ধীরতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও বরদাস্ত করা। এ ছাড়াও 'সবর' শব্দটি বহুবিদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, 'সবর' শব্দের অর্থ হলো ধৈর্য। 'সবর'-এর একটি অর্থ ধৈর্য এ কথা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু ধৈর্যের অর্থ এটা নয় যে, কেউ একজন অন্যায়ভাবে আঘাত করলো আর আঘাতকারীর প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে বলা হলো, আপনি স্বয়ং আঘাত পাননি তো!

এর নাম 'সবর' নয়, বরং 'সবর' হলো বিপদে হতাশ না হয়ে, ভেঙ্গে না পড়ে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে অটল অবিচল থাকা। ঠান্ডা মাথায়, ধীর স্থির মস্তিষ্কে বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার কৌশল অবলম্বন করার নামই হলো 'সবর'। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে। বিষয়টি স্পষ্ট অনুধবান করার জন্য সেই গল্পটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়, যে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি বিষধর সাপ একজন পীর সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছিলো, 'হুজুর, আমি আপনার মুরীদ হতে এসেছি।' পীর সাহেব সেই সাপকে বললেন, 'আমি তো কোনো সাপকে মুরীদ করিনা।'

সাপ অনুনয় করে বললো, 'হুজুর আমি বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি মুরীদ হবার জন্য। আপনি দয়া করে আমাকে মুরীদ করে নিন।' সাপের পীড়াপিড়ীতে অবশেষে পীর সাহেব বললেন, 'আমি তোমাকে আমার মুরীদ করতে পারি এক শর্তে। সে শর্তটি হলো, তুমি কাউকে দংশন করতে পারবে না।' সাপ বিনয়ের সাথে জানালো, 'আপনার শর্ত আমি মেনে নিলাম। আর কখনো কাউকে আমি দংশন করবো না।'

পীর সাহেব সাপকে মুরীদ বানিয়ে তাকে কিছু যিকর শিখিয়ে দিলেন। সাপ বিদায় নিয়ে চলে গেলো এবং একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পীর সাহেবের শিখানো যিকর করতে থাকলো। সেই ক্ষেতের মালিক ক্ষেতে এসে ধান কাটতে লাগলো। সন্ধ্যার পরে লোকটি কাটা ধানের গোছাগুলো বোঝা বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যাবে, কিন্তু বোঝা বাঁধার রশি সে সাথে আনেনি। এদিক ওদিক সে রশির আশায় তাকালো। সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে। সাপকে লোকটি রশি মনে করে উঠিয়ে নিয়ে ধানের গোছাগুলো একত্রিত করে শক্ত করে বাঁধলো। লোকটি রশি মনে করে সাপকে দিয়ে যখন ধানের গোছা বাঁধছিলো, সাপ তখন রাগে ফুঁসছিলো আর মনে মনে বলছিলো, 'ব্যাটা আহাম্মক, আমাকে তুমি রশির মতো ব্যবহার করছো। আমি যদি পীর সাহেবের মুরীদ না হতাম, তাহলে এতক্ষণে তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।'

রশি হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে সাপকে দুমড়ানো মোচ্‌ড়ানো হয়েছে। ফলে সাপের ঘাড় মচ্‌কে গেলো। লোকটি ধানের বোঝা বাড়িতে নিয়ে সেই সর্প রূপী রশি ফেলে দিলো। সাপ অনেক কষ্টে পীর সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে করুণ স্বরে জানালো, 'আপনি এমন এক যিকর আমাকে শিখিয়েছেন, যে যিকর করতে গিয়ে আমার ঘাড় মচকে গিয়েছে।' পীর সাহেব অবাক কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য কথা! যিকর করলে মন-মানসিকতা পবিত্র হয়, কারো ঘাড় তো মচ্‌কে যায় না। তোমার ঘাড় কেমন করে মচ্‌কালো?'

সাপ তখন সম্পূর্ণ ঘটনা পীর সাহেবকে শুনালো। ঘটনা শুনে পীর সাহেব সাপকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ব্যাটা আহাম্মক! আমি তোমাকে দংশন করতে নিষেধ করেছি কিন্তু ফোঁস করতে তো নিষেধ করিনি। যখন তোমাকে রশি ভেবে তোমার শরীরে হাত দিয়েছিলো, তখন যদি তুমি ফোঁস করে উঠতে, তাহলে তিন লাফ দিয়ে লোকটি ছুটে পালাতো, তোমার ঘাড় মচ্‌কাতো না।'

সুতরাং ধৈর্যের অর্থ এটা নয় যে, অকারণে একজনের ওপরে নির্যাতন করা হবে আর নির্যাতিত ব্যক্তি নীরবে তা সহ্য করে বলবে, 'আমি ধৈর্য ধারণ করছি, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেছেন, তিনি ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন।' এর নাম ধৈর্য নয়। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি, বিপদ-মুসিবত মোকাবেলা করতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে, আর এটার নামই হলো 'সবর'। এই 'সবর' যারা অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দেবেন। সূরা নাহ্‌ল-এর ১২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ–

তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো তাহলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

ধৈর্য ধারণকারীদের বা 'সবর' অবলম্বনকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, এর অর্থ হলো-যারা লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার মোকাবেলায় সত্য ও সততা এবং ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়-নীতির পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এসব ক্ষতি যারা কোনো ধরনের অভিযোগ ব্যতীতই বরদাশ্ত করে। পৃথিবীতে অবৈধ পথ অবলম্বন করলে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেতো, তা সবই যারা ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করেছে। যারা ভালো কাজের শুভ প্রতিদান লাভ করার জন্য পরম ধৈর্যের সাথে মৃত্যুর পরের জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। ধৈর্য ধারণকারী এসব লোকদের জন্য মহান আল্লাহ বিরাট নে'মাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ-وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা 'সবর'-এর পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। (সূরা নাহ্ল-৯৬)

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যারা 'সবর' অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিসাব করে কোনো প্রতিদান দেবেন না। সীমা সংখ্যাহীন বেশুমার প্রতিদান 'সবর' অবলম্বনকারীদেরকে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার-১০)

ঈমান এনে, আমলে সালেহ্ করে এবং 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যারা ইসলাম বিরোধিদের জুলুম-নির্যাতন ও অপবাদ-মিথ্যাচারের মোকাবেলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করবে, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত ও তার সম্মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে যে কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবত এবং কষ্ট বরদাশ্ত করবে, যাবতীয় ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সততা অবলম্বন করে দৃঢ়পদ থাকবে, শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা-বাসনাকে অবদমিত করে দ্বীনি আন্দোলনে অটল থাকবে, অবৈধ পথ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করবে, পাপের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করবে এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার পরিবর্তে অর্জিত অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করবে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সম্বর্ধনা দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا-

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا-

এরা হলো সেসব লোক, যাদের প্রদান করা হবে উন্নত মনজিল। এটা তাদের সবরের প্রতিফল। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস! (সূরা ফুরকান-৭৫-৭৬)

'সবর' অবলম্বনকারীদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করবেন। জান্নাতে ফেরেশ্‌তারা চারদিক থেকে এসে তাদেরকে সালাম জানাবেন এবং এই সুসংবাদ দেবেন যে, তোমরা এখন এমন স্থানে এসে পৌঁছেছো যেখানে শান্তি আর নিরাপত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। এখানে তোমরা যাবতীয় বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। কোনো শঙ্কা বা ভয়-ভীতির আশঙ্কা এখানে নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ-سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

ফেরেশ্‌তাগণ চারদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষনের ধারা অব্যাহত থাক। তোমরা পৃথিবীতে যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, তার বিনিময়ে তোমরা এর অধিকারী হয়েছো। সুতরাং কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর! (সূরা রা'দ-২৩-২৪)

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের সারা বৈষয়িক জীবনই হলো 'সবর'-এর জীবন, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার কঠিন জীবন। জ্ঞানের উন্মেষ হওয়া অথবা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের নফস-এর অবৈধ কামনা-বাসনা দমন করা, মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলা, যে কাজগুলো আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন তা তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের সময়, মেধা, শ্রম, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা-প্রতিভা, প্রয়োজনে নিজের প্রাণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য কোরবান করা, যে কোনো বিপদ-মুসিবতে অটল-অবিচল থাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যারা করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا-وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا-مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ-لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا-وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا-وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا-وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا-عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا-وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا-وَاِذَا

رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا-عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ-وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ-وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا-اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا-

অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সেদিনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ-স্ফূতি দান করবেন। আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তাদেরকে সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না, শীতের প্রকোপও নয়। জান্নাতের বৃক্ষ রাজির ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং তার ফলমূল সবসময় তাদের আয়ত্তাধীনে থাকবে (তারা ইচ্ছানুসারে তা ভোগ করতে পারবে)। তাদের সম্মুখে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সেই কাঁচ পাত্রও রৌপ্য জাতীয় হবে। এবং সেগুলো (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মত পূর্ণ করে রাখবে! তাদেরকে সেখানে এমন সূরাপাত্র পরিবেশন করানো হবে যাতে শুকনা আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

এটা হবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, যাকে সালসাবীলও বলা হয়। তাদের সেবাকার্যে এমন বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। তোমরা সেখানে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নে'মাত আর নে'মাতই তোমাদের চোখে পড়বে এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমারা দেখতে পাবে। তাদের ওপর সুক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক অথবা মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে এবং তাদের রব তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। এটাই হলো তোমাদের শুভ প্রতিফল। কারণ তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়েছে। (সূরা দাহার-১১-২২)

(জান্নাত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা নাবা-এর ৩১ আয়াত থেকে ৩৬ আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

মানুষ মাত্রেই ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তার আমলনামায় কম-বেশী গোনাহ্ রয়েছে। তবে যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ্ করেছে, 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে যেসব বিপদ-মুসিবত এসেছে, তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ-

যারা ধৈর্য অবলম্বন করেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান। (সূরা হূদ-১১)

ঈমানের প্রভাবে ইতিহাসের বিস্ময়কর বিপ্লব

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো, একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। মানবতা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলো এবং পৃথিবী তার যাবতীয় উপকরণসহ ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলছিলো। রাসূলের আবির্ভাবকালে সারা পৃথিবীর-অবস্থা সেই ঘরের অনুরূপ ছিলো, যার ভিত্তি এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের তীব্র আঘাতে ভঙ্গর করে দিয়েছিলো। পৃথিবীর মানুষগুলোর অস্তিত্ব নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেরা যেন ছিলো নগণ্য ও মূল্যহীন। বৃক্ষ, তরু-লতা, প্রস্তরখন্ড, আগুন-পানি ও ঊর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্র এবং তারকারাজিসহ বস্তমাত্রই উপাস্য হিসাবে মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছিলো।

মানুষের চিন্তার জগতে এতটাই স্থবিরতা ও বিশৃংখলতা নেমে এসেছিলো যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থূল সত্যগুলো অনুধাবন করতেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলো এবং তাদের অনুভূতি ভুল পথে চলছিলো। স্থূল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থূল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিলো। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত এবং সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। রুচি তাদের এতটাই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তিক্ত ও বিস্বাদ জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিলো। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো-ফলে বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্খীদের সাথে শত্রুতা এবং শত্রু ও অকল্যাণকামীদের সাথে ছিলো তাদের গভীর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা।

তদানীন্তন পৃথিবীতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি বস্তুই যেন ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে সজ্জিত ছিলো। সে সমাজে অরণ্যে বসবাসের উপযোগী হিংস্র নেক্ড়ে তুল্য মানুষগুলোকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছিলো। সে সমাজে দুরাচারী-অপরাধীরা ছিলো সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকগুলো ছিলো অপাংক্তেয়, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ এবং সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ সে সমাজে আর কিছুই ছিলো না। গোটা সমাজের আচার-আচরণ ছিলো ধ্বংসাত্মক যা সারা দুনিয়াকেই ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত করেছিলো। শাসক শ্রেণী ও বিত্তবানরা অর্থ-সম্পদকে হাতের ময়লা এবং সাধারণ মানুষগুলোকে নিজেদের ক্রীতদাস মনে করতো। তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ সাধারণ মানুষের প্রভুর আসন দখল করেছিলো। তারা সাধারণ লোকদের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করতো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করা হচ্ছিলো অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিলো এবং মানবীয় গুণাবলী থেকে কোনো উপকার গ্রহণ বা যথাস্থানে তা ব্যবহার করা হচ্ছিলো না। বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ব্যবহৃত হচ্ছিলো

অন্যায়-অত্যাচারের ক্ষেত্রে। উদারতা ও বদান্যতা ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপব্যয় ও অপচয়ে। আত্মমর্যাদাবোধ ব্যবহৃত হচ্ছিলো অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায়। ধীশক্তি ও মেধা ব্যবহৃত হচ্ছিলো প্রতারণা ও অপকৌশলে। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে।

তদানীন্তন পৃথিবীতে মানব সম্পদ সুদূর অতীতকাল থেকেই বিনষ্ট হচ্ছিলো। সে সময়ে মানুষই ছিলো এমন কাঁচামাল যার ভাগ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোনো কারিগর জোটেনি–যিনি মানব সম্পদ ব্যবহার করে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন। মানুষগুলো ছিলো যেন সেই মূল্যবান শস্যক্ষেত্র, যা আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। এমন কারো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই আগাছা উৎপাটিত করে শস্য ক্ষেত্রসমূহ শস্য ফলনের উপযোগী করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতি-গোষ্ঠী ছিলো না, রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত হতো সেই বদ্ধ উন্মাদদের দ্বারা, যারা সেই শক্তি ব্যবহার করতো ধ্বংসাত্মক পন্থায়। আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত বিকৃত জীবন-যাপন করছিলো।

যেসব বস্তু ছিলো মানুষের অধীন এবং পৃথিবীতে যা অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষেরই কল্যাণের জন্য, যেসব বস্তু মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং যাদের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি-পুরস্কার দেয়ার একবিন্দু ক্ষমতা নেই, মানুষ সেসব বস্তুকে উপাস্য জ্ঞানে তার সামনে মাথানত করতো। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষগুলো এমন বিকৃত ধর্মের অনুসারী ছিলো, আখিরাতের জীবন দূরে থাক–চলমান জীবন-যিন্দেগীতে যার কোনোই প্রভাব ছিলো না এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রে, মন-মস্তিষ্কে ও আত্মার ওপর যার কোনোই ক্ষমতা ছিলো না।

ধর্মজ্ঞানে তারা যা অনুসরণ করতো, চরিত্র ও সমাজ সেই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিলো না। তাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এমন ছিলো যে, যেমন একজন শিল্পী বা কারিগর তার কর্ম শেষ করে ক্লান্তি জনিত কারণে বিশ্রামের জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছেন এবং পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যটি সেইসব লোকদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সমাজে যারা বিত্তবান এবং ধর্মীয় আসনে আসীন। এখন তারাই পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিপতি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের ভাগ্য নিয়ন্তা তারাই এবং সমস্ত কিছুই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে অধিক কিছু ছিলো না। ইতিহাসের কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আণবিক বোমা প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিলো, ছাত্রটি তার সঠিক উত্তর দেবে বটে– কিন্তু সঠিক উত্তর বলার সময় তার মন-মস্তিষ্ক আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতার ভয়ে আতঙ্কিত হবে না এবং তার ওপর কোনো প্রভাবও পড়বে না। ঠিক তেমনি ছিলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান–তাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতো না। আল্লাহর গুণাবলী

সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভয়, শ্রদ্ধা ছিলো না, তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের কোনো চিত্র তাদের হৃদয়ে ছিলো না। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো অস্পষ্ট, যার ভেতরে কোনো গভীরতা ও শক্তি ছিলো না। ফলে সেই ঈমানের বাস্তব রূপায়নও ছিল তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালাতসহ প্রেরণ করলেন, যাতে করে তিনি মুমূর্ষ মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। বিশ্বনবীর আবির্ভাব মানবমন্ডলীকে নবজীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নতুন উত্তাপ, নবতর শক্তি, নবতর প্রত্যয়, নতুন কৃষ্টি-সভ্যতা ও নতুন সমাজ দান করলো। তাঁর আগমনে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মে নবজীবনের সূত্রপাত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি যে বিধান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করলেন, তা বাস্তবে অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ঈমান আনলো, তাদের স্বভাব-চরিত্রে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো এবং এই ঈমানদার লোকগুলোর দ্বারা মানব সমাজে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো−ইতিহাসের বুকে তা ছিলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিলো একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, গভীরতা, বিশালতা ও সার্বজনীনতা, বিস্তৃতি এবং মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া−এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর বিপ্লবের অনন্যদিকসমূহ। রাসূল কর্তৃক সাধিত এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোনো জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য ছিলো না। এটা ছিলো ঈমানী বিপ্লব এবং সেই ঈমান তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্লাবিত করে বাস্তব জীবনের প্রত্যেক দিক ভাসিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁদেরকে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এই ঈমানই তাদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এনেছিলো এবং হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করেছিলো। মহান আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, তাঁর কাছে পার্থিব জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব দিতে হবে−ঈমান এই অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো। ফলে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর সমীপে ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত অবস্থায় দন্ডায়মান হতেন এবং রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে সিজ্দায় লুটিয়ে পড়তেন।

ঈমান তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি এবং নফসের তথা প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। ঈমানই তাঁদের মধ্যে ঊর্ধ্বজগৎ ও যমীনের মালিকের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধিই করছিলো এবং তাঁদেরকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের পথে অগ্রসর করিয়েছিলো। রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও যুদ্ধ-মারামারি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত ছিলো এবং অস্ত্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো মজ্জাগত। ঈমান তাদের সেই হিংস্রতা ও সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে এবং আরবীয় অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের আদেশ-নিষেধের সামনে তাঁরা মোমের মতোই গলে পড়তেন। সামান্যতম কাপুরুষতা যাদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যেতো না, তাঁরাই ঈমানের প্রভাবে অবৈধ কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিতেন। ঈমানের প্রভাবে তাঁরা এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সহ্য করেছিলেন, পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায় অথবা কোনো জাতি-গোষ্ঠী সহ্য করেনি।

চিন্তার জগতে ঈমানের প্রভাব

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো ঈমানদার মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের ভেতরে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঈমানের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

নবোত্থিত ঈমানদারদের এই দলটি ছিলো এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর ভিত্তি। ঈমানদারদের এই দলের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সঙ্কট সন্ধিক্ষণে হয়েছিলো যখন পৃথিবী ধ্বংসের একপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। ঈমানদারদের দল পৃথিবীকে ধ্বংসের প্রান্ত থেকে সরিয়ে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো, যে বিপদ পৃথিবীর সামনে মুখ ব্যাদন করে অপেক্ষা করছিলো। ঈমানদারদের ঐ দলের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। ঈমানের কারণে তাঁদের ভেতরে দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল পিপাসা সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহর দ্বীনকে উপলব্ধি করার তৃষ্ণা এবং আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো। সুখে দুঃখে যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিলো। যে অবস্থায়ই তাঁরা থাকুন না কেনো, ঈমান তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করতো।

ঈমান তাঁদের মধ্যে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজ-সাধ্য বিষয়ে পরিণত করেছিলো। ফলে পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করায় তাঁরা

অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঈমান আনার পূর্বে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং আল্লাহর কোরআনের অসংখ্য আদেশ-নিষেধের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে, নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে ও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা খুব সহজ-সাধ্য বিষয় ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত করেছিলো। তাঁরা ঈমান আনার ব্যাপারে শুধু মাত্র কালেমা পাঠের জন্য নিজের কণ্ঠকেই ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদের মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঈমানের ছায়াতলে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

ঈমান আনার পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসূল যা সিদ্ধান্ত দিতেন, সে ব্যাপারে তাঁদের সামান্যতম মতানৈক্যের অবকাশ থাকতো না। একমাত্র ঈমানই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

নিজের অজান্তে কোনো সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় ঈমানই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। ঈমানের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

ঈমান তার মন-মস্তিষ্কে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে। তার ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। ঈমানই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে ঈমানই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না, এমন নীরব নির্জন স্থান, যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ দেখে ফেলবে-এই ভয় ছিলো না-সেখানেও একমাত্র ঈমানই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ঈমানী শক্তির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহীদের বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তূপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।' এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে-অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের।

ঈমান জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছিলো

তাওহীদের প্রতি ঈমান তাঁদের মাথা করেছিলো উঁচু এবং গর্দান করেছিলো উন্নত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি তথা রাজা-বাদশাহ্, শাসকগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী লোকের সামনে তাঁদের মাথা নত হবে-এটা ছিলো তাঁদের কল্পনার অতীত। ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার মহানত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, পৃথিবীর চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন-এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট রয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ্ যেন মাটির বানানো পুতুল-যাদেরকে মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাহ্কে সিজ্দা দিতে ব্যস্ত, তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করলেন; 'আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মহামূল্যবান বস্তু দ্বারা রাজদরবার সজ্জিত, পায়ের নীচের কার্পেট থেকে শুরু করে রুস্তমের দেহের পোষাক ও বসার আসন মহামূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত এবং রুস্তমের মাথায় হিরা-জহরত খচিত মুকুট। অথচ হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরনে সাধারণ পোষাক, তাঁর সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ-দেহ বর্মাবৃত। তিনি রুস্তমের দরবারের সেই মহামূল্যবান গালিচার ওপর দিয়েই নিজের ঘোড়া চালিয়ে রুস্তমের মুখোমুখি হলেন। দরবারের লোকগুলো তাঁকে সামরিক সরঞ্জাম ত্যাগ করে রুস্তমের সামনে যেতে উপদেশ দিলো।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছো। আমার অবস্থা যদি তোমাদের দরবারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা না করো, তাহলে আমি এখনই ফিরে যাবো।' রুস্তম তার দরবারের লোকদের বাধা দিয়ে বললো, 'তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই আসতে দাও।' হযরত রিবঈ বর্শার সূচালু অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দরবারে বিছানো কার্পেট মাড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন আর তার বর্শার অগ্রভাগের চাপে কার্পেট কয়েক স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলো। রুস্তমের লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছো?

তিনি ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে সোপর্দ করার জন্যই এসেছি। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলছে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে টেনে নেয়ার জন্যই এসেছি।' মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁদের হৃদয়ে এমনই নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো-যা ছিলো বিস্ময়কর! আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে মশগুল করেছিলো এবং জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহশীল আর পৃথিবীর জীবনের প্রতি চরমভাবে বীতস্পৃহ করেছিলো। আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সামনে এমনভাবে ভেসে উঠতো যে, সেই চিরস্থায়ী শান্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা সামান্য কয়েকটি খেজুর খাওয়ার সময়ও ব্যয় করেননি, দুনিয়ার সমস্ত পিছুটানের প্রতি পদাঘাত করে শত্রু বুহ্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।

ওহুদের ময়দানে সেই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে হযরত আনাস ইবনে নযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআযের সাথে দেখা হতেই তিনি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই সা'দ, আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ওহুদ পাড়ারের ওপাশ থেকে আমি জান্নাতের ঘ্রাণ অনুভব করছি।' হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম আনাস ইবনে নযর শহীদদের মিছিলে শামিল হয়েছেন। তাঁর দেহে ৮০ টিরও অধিক

আঘাত ছিলো, প্রত্যেকটি আঘাত ছিলো সামনের দিকে এবং তাঁকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছিলো যে, তাঁকে চেনার কোনো উপায় ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙ্গুল দেখে তাঁকে শনাক্ত করেছিলো।

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমার আব্বা ছিলেন শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি এবং তিনি ঘোষণা করছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।' তাঁর ঘোষণা শুনে এমন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যাঁর পরনে ছিলো জীর্ণ পোষাক। লোকটি বললো, হে আবূ মূসা! তুমি কি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলকে এই কথা বলতে শুনেছো?' তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে এই কথা শুনেছি।' তখন লোকটি নিজের পরিচিতজনদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমার জীবনের শেষ সালাম গ্রহণ করো।' এ কথা বলেই সে তাঁর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে কোষমুক্ত তরবারি হাতে শত্রু বুহ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করলো।

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আক্রমন করতে বদ্ধপরিকর। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাস্ত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফের বাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারী নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফেরদের আক্রমন প্রতিহত করতে থাকলেন।

কাফেরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁর এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো, কাফেরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্ত্বাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফেরদের সামনে ঢালের মতই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর রাসূলকে আক্রমন করছিল।

শত্রুদের তীব্র আক্রমনের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একাকী শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারী দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তার আদর্শের বিপরীত পথে চলবে? (সূরা ইমরান-১৪৪)

কাফেরদের তরবারীর আরেকটি আঘাতে হযরত মুসআবের দ্বিতীয়টি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবারও তিনি পূর্বের মতই ঐ কথাটি উচ্চারণ করলেন। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীন রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। শাহাদাতের অমিয় সুধা তিনি পান করলেন।

তিনি যে মুহূর্তে শাহাদাত বরণ করেন, সে সময়ের সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা হলো, ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে বার বার আঘাত পেয়ে তিনি যে কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, সেই কথাটিই পরবর্তীতে হু-বহু কোরআনের আয়াত হিসাবে আল্লাহর রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত পরে তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিবেন, সেই সিদ্ধান্তই তিনি তাঁর এক প্রিয় বান্দার মুখ দিয়ে তাঁর শাহাদাতের মুহূর্তে যেন জানিয়ে দিলেন।

হযরত মুসআব ইসলামের শত্রুদেরকে এবং মুসলমানদেরকে যেন স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল মাত্র। তিনি মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়ে এক সময় এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করবেন। ইতোপূর্বেও নবী রাসূলগণ এভাবে সত্য পৌঁছে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যে সত্য পৃথিবীতে এনেছিলেন তাদের বিদায়ের কারণে সে সত্যর মৃত্যু ঘটবে না। মহাসত্যের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখার মৃত্যু নেই। যে আদর্শের বীজ সত্যের বাহকেরা বপন করে যান, তার অঙ্কুরোদগম সত্যের বাহকদেরকে হত্যা করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সময়ের ব্যবধানে তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে মহীরুহ ধারণ করবেই। ইসলামী আদর্শবাদী দলকে নিষিদ্ধ করে বা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে আদর্শকে হত্যা করা যাবে না, এ কথাই যেন শাহাদাতের পূর্বক্ষণে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলে গেলেন।

দাফন কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শতছিন্ন পোষাক। সে পোষাকও রক্ত আর বালিতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমন্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল হযরত মুসআবের এই করুণ অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবাগণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সাহাবাগণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদোরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাঁক-জমক পূর্ণ পোষাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম দূত হিসাবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই। একমাত্র ঈমানই তাঁকে এই দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলো।

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। সুন্দরী তন্বী তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের রণপ্রান্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাতিল শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারী হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রুবাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

সুন্দরী তন্বী তরুণী স্ত্রীর সাথে বাসর শয্যার কোনো মধুর স্মৃতিই হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিহাদের ময়দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। স্ত্রীর মধুর আলিঙ্গনের চেয়ে তিনি বাতিল শক্তির রক্তলোলুপ তরবারীর নিষ্ঠুর আলিঙ্গনকেই অধিক পছন্দ করেছিলেন। যুদ্ধ অবসানে আল্লাহর রাসূল শহীদদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালার সদ্য বিবাহিতা-বিধবা স্ত্রী যুদ্ধের ময়দানে এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল ব্যতীত দাফন করবেন না।'

আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল এসে নবীকে অবগত করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাকে গোছল দেয়ার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ্ তাঁর ওপর এত খুশী হয়েছেন যে, জান্নাতে তাঁর গোছলের ব্যবস্থা করেছেন।'

আল্লাহর রাসূল সাহাবাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ হযরত হানযালার লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধ যুক্ত পানি ঝরছে। ঈমানের টানে পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

পৃথিবীতে যারা ইসলামের মুজাহিদ নামে পরিচিত, তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত শাহাদাত বরণ করা। সাফল্যের শেষ স্তর হলো শাহাদাত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ দানের মধ্যে যে কি তৃপ্তি তা ভাষায় প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলামের প্রেমিক যারা তাঁরা শুধু হৃদয়ের সুষমা দিয়েই অনুভব করেছেন। শাহাদাত বরণ করার মধ্যে কি যে অপূর্ব স্বাদ, তা শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। ঈমানদারদের প্রাণ শাহাদাতের উদগ্র কামনায় ব্যাকুল থাকে। তাদের আত্মা শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী সুধা পান করার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনে। তাদের মন ছুটে চলে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক প্রভাময় পৃথিবীতে। সে পৃথিবীতে তাদের দেহ-মন জান্নাতের সুষমা মন্ডিত স্নিগ্ধ বারিধারায় অবগাহন করে।

ওহুদের রণপ্রান্তরে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে রণদামামা বেজে ওঠার শব্দে মদীনার ইসলামী সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছিল শাহাদাতের জান্নাতি আবেশ। মুসলিম সমাজের যুবক, বৃদ্ধ, শিশু আর নারীরা তাদের দেহের তপ্ত রক্ত ইসলামের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। জিহাদের আহ্বান শুনে মদীনা নগরী এমনভাবে সজ্জিত হয়েছিল, যেন নববধু সুসজ্জিতাবস্থায় শরীরে সুগন্ধির প্রলেপ দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। মুসলমানদের ললাটে নবী প্রেমের দ্যুতি পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হযরত আমর ইবনে জমুহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নববীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে আগ্রহী নয়। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে এভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল হযরত আমরের সন্তানদেরকে বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা দিও না। হয়তো আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত নছীব করবেন।'

হযরত আমরের চার সন্তান ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি তাঁর সন্তানদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, সন্তানদের চেহারায় শাহাদাতের তীব্র আকাংখা। রণসাজে সজ্জিত সন্তানদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের মতই দেখাছিল। হযরত জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সন্তানদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা ওহুদের পথে অদৃশ্য হলেন। তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাত বরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। পঙ্গু পিতার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দোল খেলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর সাহাবী তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া কামনা করে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

আল্লাহর নবীর পঙ্গু সাহাবী হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমন করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশেপাশেই তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাত বরণ করলেন। কাফেরদের শানিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আমর ইবনে জমুহর স্ত্রী স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে ওহুদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। ওহুদের প্রান্তর ত্যাগ করতে উট রাজী হলো না। রাসূলকে এ কথা জানানোর পরে আল্লাহর রাসূল পঙ্গু সাহাবীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিলো ?'

স্ত্রী জানালেন, 'হে আল্লাহর! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, 'হে আমার আল্লাহ ! তুমি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

এ কথা শোনার পরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু সজল নয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নবুওয়্যতী দৃষ্টি শুভ্র মেঘমালা পার হয়ে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে সপ্তম আসমানের ওপরে আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে গিয়ে পৌছলো। অপূর্ব মধুময় স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিল রাসূলের পবিত্র অধরে। উন্মুক্ত দক্ষিণা মলয় সমিরণে দোল খাওয়া কচি লতার মতই রাসূলের মাথা মোবারক সামান্য হেলে উঠলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাঁকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়নে শুইয়ে দাও।' রাসূলের আদেশ অনুসারে হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ওহুদের রক্তাক্ত উপত্যকায় অন্তিম শয়নে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। ঈমান এভাবেই তাঁর ভেতরে শাহাদাতের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকজন নারীও ছিল। তাঁরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে সেবা-যত্ন করতেন। তাঁরা মশক ভর্তি করে পানি এনে সৈন্যদেরকে পান করাতেন এবং পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় মশক ভর্তি করে আনতেন। সৈন্যদের ক্ষতস্থানে তাঁরা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। মুসলিম বাহিনী যখন হঠাৎ শত্রুবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়ে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আহত সৈন্যদের সেবা করায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন শত্রু বাহিনী চিৎকার করে বলছে, 'কোথায় মুহাম্মাদ! তাঁর সন্ধান করতে থাকো, সে জীবিত থাকলে আমরা কেউ বিপদ মুক্ত নই। তাঁকে হত্যা করতেই হবে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উম্মে আম্মারা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করছেন, সেদিকে শত্রুবাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে যাচ্ছে। তিনি কোমল দেহের অধিকারী একজন নারী, তবুও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। নিজের প্রাণ শেষ হয়ে যায় যাক, কোন আফসোস নেই। তাঁদের মত শত কোটি জীবনের তুলনায় আল্লাহর রাসূলের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। রাসূলকে এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

হযরত উম্মে আম্মারা হাত থেকে পানির পাত্র সজোরে নিক্ষেপ করলেন। যৎ সামান্য যে অস্ত্র হাতের কাছে পেলেন তাই উঠিয়ে নিয়ে উল্কার গতিতে রাসূলের সামনে উপস্থিত হলেন। একটা ঢাল যোগাড় করে তিনি শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধ করতে লাগলেন। শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র ছিল যে, অনেক বিখ্যাত মুসলিম বীরও ময়দানে টিকে থাকতে পারেননি। অথচ এ ধরনের মারাত্মক এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত উম্মে আম্মারা অতুলনীয় বিক্রমে শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন।

তিনি তীর বেগে ছুটে একবার ডানে এবং আরেকবার বামে যাচ্ছিলেন, যেন শত্রুবাহিনীর কেউ রাসূলের কাছে যেতে না পারে। তাঁর দুটো সন্তানও ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করছিলেন। শত্রুপক্ষ যখন দেখলো, এই নারীর কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছা যাচ্ছে না, তখন তারা হযরত উম্মে আম্মারার ওপরে আক্রমণ চালালো। একজন কাফির তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত উম্মে আম্মারা সে আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি তরবারীর আঘাত করে কাফিরের ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শত্রু সৈন্যও মাটিতে পড়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে হযরত উম্মে আম্মারার দুই সন্তানকে তাঁদের মা'কে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করলো।

এক পর্যায়ে তাঁর সন্তান আহত হলো। কলিজার টুকরা সন্তানের রক্তাক্ত দেহ দেখেও মায়ের মধ্যে সামান্য ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো না। সন্তানকে তিনি কোনো ধরনের সান্ত্বনার বাণীও শোনালেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তে সন্তানের ক্ষতস্থানে ব্যন্ডেজ বেঁধে দিয়ে আদেশ দিলেন, 'দ্রুত ময়দানে গিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

আল্লাহর রাসূল তাঁর এই মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আম্মারার সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেই তিনি বারবার মহান আল্লাহর কাছে তাঁর এই মহিলা সাহাবীর জন্য দোয়া করছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে হযরত উম্মে আম্মারার সামনে এলো ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে আঘাত করেছিলো। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে সতর্ক করে বললেন, 'হে উম্মে আম্মারা ! সতর্ক হও ! এই জালিম তোমার সন্তান আব্দুল্লাহকে আহত করেছে।'

নবীর কথা শুনে হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে যেন সিংহের শক্তি এসে জমা হলো। তিনি তরবারি দিয়ে পুত্রের ওপর আঘাতকারীর ওপরে এমন শক্তিতে আঘাত হানলেন যে, তাঁর আঘাতে শত্রু সৈন্য দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বীর জাহান্নামী আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়ার সাথেও হযরত উম্মে আম্মারা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে কামিয়াহ বারবার রাসূলকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছিল। সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত উম্মে আম্মারার মত একজন কোমল দেহের নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে ইবনে কামিয়াকে প্রতিরোধ করছিলেন। আক্রমনকারী জালিমের দেহ ছিল লৌহ বর্মে আবৃত। হযরত উম্মে আম্মারা জালিমকে হত্যা করার জন্য তরবারির আঘাত করেন। কিন্তু জালিমের দেহে বর্ম থাকার কারণে হযরত উম্মে আম্মারার তরবারি ভেঙ্গে গেল। জালিম এবার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর এই বাঘিনীর ওপর আক্রমন করলো। তিনি ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করতে গিয়েও কাঁধে মারাত্মক আঘাত পেলেন।

কিন্তু রাসূলের এই মহিলা সাহাবী সামান্যতম কাতর হলেন না। আহত দেহ নিয়েই তিনি আল্লাহর দুশমনের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখলেন। তাঁর মোকাবেলায় টিকতে না পেরে জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ইসলামের এই বঘিনীর কোমল শরীরে ইসলামের শত্রুরা ১২ স্থানে আঘাত করেছে। এতগুলো আঘাত পাওয়ার পরও তিনি যুদ্ধে বিরতি দেননি। আল্লাহর রাসূলকে অক্ষত রাখার জন্য তিনি নিজের প্রাণের কোন পরোয়া করেননি। মৃত্যুকে তাঁরা পায়ের ভৃত্য মনে করতেন। তাঁরা শহীদী মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াতেন। পৃথিবীর বুকে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র পুরুষই ময়দানে রক্ত দান করেনি। মুসলিম নারীগণ কোন দিক থেকে কোন অংশেই পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের জন্য স্বামীকে, সন্তানকে, ভাইকে, পিতাকে, নির্বিশেষে নিজের প্রিয় প্রাণও উৎসর্গ করেছে। আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সামান্যতম কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেনি আর ঈমানী শক্তিই তাঁদেরকে এই পথে অগ্রসর করিয়েছিলো।

মূতার যুদ্ধে ঈমানদারদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। এক সময়ের ক্রীতদাস, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তানের সতই দেখতেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি নবীর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তাঁকেই ঈমান দীপ্ত বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই একজন করে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করা হতো। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন

সেনাপ্রধান আল্লাহর রাসূল নিযুক্ত করলেন। বিষয়টা ছিল অন্য যুদ্ধের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। দ্বিতীয় প্রধান করা হলো হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। তৃতীয় প্রধান করা হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে।

আল্লাহর নবী ঘোষনা করলেন, 'যায়িদ শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর, জাফর শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে আব্দুল্লাহ। সে-ও যদি শাহাদাতবরণ করে তাহলে মুসলিম বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করবে।' কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইহুদী আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মন্তব্য করেছিলো, 'খোদার শপথ ! এই তিনজনই আজ শাহাদাতবরণ করবে।'

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপনিত হয়ে জানতে পারলো, তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য শোরহাবিল এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে এবং আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দক্ষতার সাথে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এক সময় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। এরপর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতাকা হাতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একলক্ষ বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্যর এক অসম যুদ্ধ হচ্ছে। হযরত জাফরের ঘোড়া আহত হলো। শত্রু পক্ষ তাঁর বাম হাত কেটে দিলে তিনি ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাত কেটে দিলে তিনি কাটা বাহু দিয়ে পতাকা উড্ডীন রাখলেন। এরপর তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মুখ দিয়ে পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; 'তাঁকে জান্নাতে এমন দুটো পাখা দান করা হয়েছে যে, সে পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।'

এবার এগিয়ে এলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারি চালনা করতে করতে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী তাঁকে এক টুকরা গোস্ত দিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ক্ষুধার্ত, এই টুকু খেয়ে তরবারি চালনা করুন।' গোস্তের টুকরা তিনি মুখে দিয়েছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, একজন মুসলিম সৈন্য বড় বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি গোস্তের টুকরা ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার জন্য এ পৃথিবীতে খাবারের কোনো প্রয়োজন আর নেই।' হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোটা দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি তাঁর শরীরে তরবারী এবং বর্শার ৯০ টি আঘাত দেখেছি। সমস্ত আঘাতগুলো ছিল সামনের দিকে।'

এই যুদ্ধের সংবাদ আল্লাহর মদীনাতেই ফেরেশতার মাধ্যমে দেয়া হচ্ছিলো। কে কখন শাহাদাত বরণ করছেন, আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবাদেরকে শোনাচ্ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূলের সামনে যেন মূতার প্রান্তর তুলে ধরা হয়েছিল। যুদ্ধের

দৃশ্য দেখে দেখে তিনি বর্ণনা করছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন হযরত ইয়ালী ইবনে মাম্বাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তিনি সংবাদ বলার আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমিই সংবাদ বলবে না আমি তোমাকে শোনাবো ?' তিনি রাসূলের মুখ থেকে যুদ্ধের ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম ! আপনি বাড়িয়েও বলেননি কিছু কমও বলেননি।' ঈমানী চেতনা তাঁদের মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছিলো।

ঈমান জীবনের বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো

একজন বেদুঈন ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরত করতে আগ্রহী।' খয়বরের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় আল্লাহর রাসূল সেই বেদুঈনের অংশ পৃথক করে রাখলেন। তাঁকে যখন তাঁর অংশ দেয়া হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 'এ সম্পদ তাঁকে কেনো দেয়া হচ্ছে?' তাঁকে জানানো হলো, 'এটা তোমার প্রাপ্য অংশ।' সেই বেদুঈন সম্পদের অংশ হাতে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সম্পদের আশায় ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি যেন আমার কণ্ঠে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়, আমি শাহাতাদবরণ করি এবং জান্নাতে যেতে পারি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তোমার চুক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করবেন।' যুদ্ধ শেষে সেই বেদুঈনের লাশ যখন পাওয়া গেলো, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তি সঠিক ছিলো, আল্লাহও তাঁর আশা পূরণ করেছেন।' এসব লোকগুলো ঈমান আনার পূর্বে কী বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই না করছিলো! তাঁরা কোনো নিয়ম-পদ্ধতি, জীবন বিধানের পরোয়া করতো না এবং কোনো শক্তির আনুগত্যও করতো না। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করতো, তারা সেদিকেই ছুটে যেতো। ভ্রান্তির বেড়াজালে ছিলো তারা বন্দী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলো। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা,

অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ঈমানের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন ঈমানের দাবি অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও ঈমান নির্দেশিত পন্থায়। ঈমানের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ঈমানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীকে কবুল করতে হবে। আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই।

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ঈমানের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন–ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। ফুযালা নামক এক ব্যক্তি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে ঈমান আনার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি–আমি আল্লাহর গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।'

ঈমান তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই।

আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে, শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' ঈমান এভাবেই তাঁদের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো।

সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে শেষ কথা

মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচ্য সূরায় যে চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষসহ যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবন ধারনের ব্যবস্থাও স্বয়ং তিনিই করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি প্রয়োজনীয় পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং মানুষকেও তিনি জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন কোনো পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম নয়, যে পথে চললে সে পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু নিচয় ব্যবহারের জ্ঞান মানুষকে দেয়া হয়েছে আর সফলতা ও ব্যর্থতার পথনির্দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ কোন্ পথ অবলম্বন করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ পৃথিবী ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে, সে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তিনি সে পথপ্রদর্শন করেছেন।

তিনি সফলতা ও ব্যর্থতার পথ মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, আর কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের এই উভয় জগতের জীবন সাফল্যমন্ডিত হবে। আলোচ্য সূরা আসরে মানুষের স্রষ্টা, মানুষের সফল জীবনে উত্তম প্রতিদান দেয়ার মালিক এবং ব্যর্থ জীবনে অশুভ পরিণতি ভোগ করানোর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো ব্যক্তি বিশেষকে, কোনো দল-গোষ্ঠীকে বা কোনো বিশেষ দেশের মানুষকে লক্ষ্য করা এ কথা বলা হয়নি যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। বরং 'ইনসান' শব্দ ব্যবহার করে গোটা মানবমন্ডলীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তারা মহাক্ষতিতে নিমজ্জিত। সমস্ত মানুষ ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবমান।

এতটুকু বক্তব্য পেশ করে মানবমন্ডলীকে হতাশার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করা হয়নি। সাথে সাথে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে এবং কোন্ কাজসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করলে মানুষ সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম

হবে। মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় হবে, তা আলোচ্য সূরা আসরে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমেই বলা হয়েছে, মানুষকে ঈমান আনতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন, তেমনভাবে ঈমান আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, শুধু ঈমান আনলেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা যাবে না। সেই সাথে ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল পৃথিবীতে জীবন-যাপনের লক্ষ্যে যে বিধান পেশ করেছেন, সেই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঈমান এনে ও আমলে সালেহ্ করে যে ব্যক্তি মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বার্থপরের মতো নিজেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে না, অন্য মানুষকেও মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে। অর্থাৎ যে জীবন ব্যবস্থা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করলে মহাক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে এবং সফলতা অর্জিত হবে বলে সে বিশ্বাস করে তা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করছে, সেই জীবনাদর্শ অনুসরণ করার জন্য অন্য মানুষকেও আহ্বান জানাবে। যার ভেতরে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে, তা মানুষ সমাজে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে সদাতৎপর থাকবে।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার ও সফলতা অর্জন করার চতুর্থ বিষয়টি হলো, 'হক' অনুসরণ করতে গিয়ে এবং 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট, বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্মুখে আসবে তার মোকাবেলায় ধৈর্য তথা 'সবর' অবলম্বন করতে হবে। 'হক'-এর অনুসরণ করতে গেলে এবং মানব সমাজে 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলে 'হক' বিরোধী গোষ্ঠী ময়দান ছেড়ে দেবে না। সম্মুখে তারা প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে দেবে। 'হক' অবলম্বনকারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে, মিথ্যাচার ছড়াবে, শারীরিকভাবে প্রহৃত করবে, অপমান ও লাঞ্ছিত করবে। সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে। কারাগারে নিক্ষেপ করবে, ফাঁসির রশিতে ঝুলাবে। দেশ থেকেও বিতাড়িত করবে। নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেবে। এসব কিছুর মোকাবেলায় সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করে 'হক'-এর পথে অটল-অবিচল থাকতে হবে, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে মন্‌যিলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর নামই হলো ধৈর্য।

এই চারটি কাজ বিশ্বস্ততার সাথে আঞ্জাম দিতে পারলেই মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা অর্জন করা যাবে। আর এই চারটি কথাই আলোচ্য সূরা আসরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম এই চারটি কাজ করেছেন। যুগে যুগে যাঁরা সফলতার পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁরাও এই চারটি কাজকে জীবনের অন্য সকল কাজের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই চারটি কাজ যারা

সফলভাবে করতে পেরেছেন, তাঁরাই মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টির আওতায় এসেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন। কবি বলেন-

পড়্‌গিয়া যিছ্‌ পর নযর বান্দাকো মাওলা কর দিয়া
আগিয়া যিছ্‌ দাম মে জোশ্‌, কাত্‌রা কো দরিয়া কর দিয়া।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের রহমতের দৃষ্টি যদি তাঁর কোনো গোলামের প্রতি নিপতীত হয়, তাঁর সে গোলাম বাদশায় পরিণত হয়ে যায়। তাঁর রহমতের দৃষ্টি যদি এক ফোঁটা পানির প্রতি নিপতীত হয়, সে পানি ফোঁটা অগাধ জলধীতে পরিণত হয়ে যায়।

আল্লাহর কোরআনের গবেষকগণ বলেছেন, মানুষ যদি সূরা আসর সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূলের সাহাবাদের দৃষ্টিতে এই সূরাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলেই তারা একে অপরকে এই সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাঁরা একে অপরকে এই সূরা না শুনিয়ে বিদায় গ্রহণ করতেন না। এই সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে ভাবের এক মহাসমুদ্র প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই সূরাটির মূল আলোচিত বিষয় হলো, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি এবং কোন্‌ পথে তার ধ্বংস ও বিপর্যয় তা স্পষ্টভাবে এই সূরায় বলে দেয়া হয়েছে। মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরার ভেতরে মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেন ক্ষুদ্র ঝিনুকের মধ্যে একটি মহাসমুদ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এই সূরার তাফসীর করে শেষ করা যাবে না। শেষ পর্যায়ে পুনরায় চিরসত্য সেই কথাটি উল্লেখ করছি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার পদ এবং অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হবার অর্থ সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতার অর্থ হলো, আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণকে নিজ চরিত্রের অলঙ্কারে পরিণত করা। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বুদ্ধিমত্তার সাথে অতিক্রম করে নিজেকে মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়ে তোলার নামই হলো সফলতা।

বস্তুত এই সূরায় বিবৃত চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, যে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ-লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন-নিষ্পেষন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণমুক্ত-ভীতিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সূরা আসরের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফিক এনায়েত করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জী

١- تفسير الجامع الاحكام القران

٢- تفسير جامع البيان

٣- تفسير درالمنثور

٤- تفسير فتح القدير

٥- تفسير قرطبى

٦ -تفهيم القران

٧- فى ظلال القران

٨- تفسير ابن كثير

٩- تفسير روح المعان

١٠- تفسير روح البيان

١١- تفسير البغوى

٢١- تفسير الفخر الرازى

٣١- تفسير الطبرى

٤١- بخارى

٥١- مسلم

٦١- ابوداؤد

٧١- ترمذى

٨١- ابن ماجه

٩١- نسائ

٢٠- البيهقى

١٢- رياض الصالحين

٢٢- طبرانى

٣٢- مسند احمد

٢٤- زاد المعاد

26. Siratun-Nababiya by Abul Hasan Ali Nadvee.

26. Siratun-Nabee by Allama Shibli Noomani.

27. Al-Zihad by Allama Moududee.

28. Sirat-A-Sarwar-e-Alam by Allama Moududee.

29. The Life of Muhammad by Muhammad Hosain Heykal.

30. Encyclopeadia of Religion and Ethics

31. Al-Quran the Ultimate Miracle by Ahmed Deedat.

32. The Expanding Universe by John Gribbin.

33. Stars and Planets by Ian Ridpath.

34. Space Time Physics-Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler.

35. Light Upon Light by Ferdous Khan.

36. Nature, Spirituality and Science by Sukhraj Tarneja.

37. Dawn of A New Era by Sir Barnard Lovell.

38. The Study of The Physical World. Cheronis, Parsons & Ronneberg.

39. The Story of our Earth by Richard Carrington.

40. The Solar Family by Peter Francis.

41. The Origin of Man by Dr. Maurice Bucaile.

42. Astronomy The Cosmic Journey by W. k. Hartman.

43. Biological Science by D. E. Meyer and R. Buchanan.

44. Medical Embryology for Medical colleges.

45. The Creation of the Universe by G. Gamow.

46. The Life and Death of Stars by Geoffery Bath.

47. To the Edge of Eternity by John Gribbin.

তাফসীরে সাঈদী
সূরা আল-আসর
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী